"উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ।"

ধূমকেতু।

মাসিকপত্র ও সমালোচনার সমালোচন।

অনাহূত।

বহু দূর হ'তে ওগো বহু আশা ল'য়ে
তোমার দুয়ারে আজি দাঁড়ানু আসিয়া,
ডেকে নিবে সমাদরে কিংবা ঘৃণা ভরে
নাহি জানি দ্বার হ'তে দিবে তাড়াইয়া!

নব বরষের নব অরুণ-কিরণ
দিতেছে সকল বিশ্ব আজি ভাসাইয়া;
নবীন মাধুরী মাখা সকল অবনী
পলে পলে উঠিতেছে পুলকে হাসিয়া!

এ শুভ নিমেষ মাঝে চাহে আজি প্রাণ
সবারে লইতে বুকে আলিঙ্গন দিয়া;
ছুটিতে সবার সাথে একলক্ষ্য পানে
আত্ম-পর ভেদাভেদ সব পাসরিয়া!

(তাই) সাধিতে নূতন বর্ষে নূতন সাধনা
সমাগত অনাহূত দ্বারে এক জনা!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

...ম খণ্ড] ...শাখ ১৩১১ । [...ম সংখ্যা ।

"উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ ।"

ধূমকেতু।

মাসিকপত্র ও সমালোচনার
সমালোচন।

অনাহূত।

বহু দূর হ'তে ওগো বহু আশা ল'য়ে
তোমার দুয়ারে আজি দাঁড়ানু আসিয়া,
ডেকে নিবে সমাদরে কিংবা ঘৃণা ভরে
নাহি জানি দ্বার হ'তে দিবে তাড়াইয়া!

নব বরষের নব অরুণ-কিরণ
দিতেছে সকল বিশ্ব আজি ভাসাইয়া;
নবীন মাধুরী মাখা সকল অবনী
পলে পলে উঠিতেছে পুলকে হাসিয়া!

এ শুভ নিমেষ মাঝে চাহে আজি প্রাণ
সবারে লইতে বুকে আলিঙ্গন দিয়া;
ছুটিতে সবার সাথে একলক্ষ্য পানে
আত্ম-পর ভেদাভেদ সব পাসরিয়া!

(তাই) সাধিতে নূতন বর্ষে নূতন সাধনা
সমাগত অনাহূত দ্বারে এক জনা!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

কামধেনু ও কল্পতরু।

কামধেনু সবৎসা গাভী। কিন্তু ইনি বৎসবতী, গোচারণের মাঠ-বিহারিণী, গোশালানিবাসিনী গোপ-দুহ্যা নিকৃষ্টা গাভী নহেন।—ইঁহার নিকট, প্রীতি ও ভক্তির সহিত, তদ্গতচিত্তে, যে ব্যক্তি যাহা কামনা করিত, গোমাতা তাহাকে তাহাই দান করিতেন। এই হেতুই ইহাঁর নাম,—কামধেনু। এক একটি কামধেনু, কঠোর-সাধনা-লভ্য এক একটা দেবদুর্লভ ঐশ্বর্য্য বা দৈবী শক্তি বিশেষ। আমরা পুরাণাদিতে যে কএকটি কামধেনুর কথা শুনিতে পাই, তাঁহারা সকলেই তপোবনবাসিনী, সাক্ষাৎ তপঃফলস্বরূপা, গোরূপিণী দেবতা। জমদগ্নির নন্দা, অঙ্গিরার সুনন্দা, কশ্যপের সুশীলা, ভরদ্বাজের সুরভি ও বশিষ্ঠের নন্দিনী না করিয়াছেন কি, না করিতে পারিতেন কি?

ভরদ্বাজ মুনি, সুরভির প্রসাদে, চক্ষের পলকে, প্রয়াগের কূলে, কি প্রকারে, স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া, কি ভাবে, একবার চতুরঙ্গ-বাহিনী-সহ ভরতের, আরবার লঙ্কাবিজয়িনী কপিসেনাসহ রামচন্দ্রের অলৌকিক অভ্যর্থনা ও আতিথ্য করিয়াছিলেন, যিনি রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই তাহা সম্যক্ অবগত আছেন। নন্দিনীর কীর্ত্তি অধিকতর বিচিত্র ও বিস্ময়াবহ।

বৎস-বৎসলা নন্দিনী, তপোবনের তৃণ ভোজন করিয়া, হোমের দুগ্ধ যোগাইতেন; এবং ভক্ত ও আশ্রিত সেবককে মায়ের মত স্নেহ করিতেন। তাঁহার অনুগ্রহে, পুত্রার্থী পুত্র, ধনার্থী ধন ও ধর্ম্মার্থী ধর্ম্মের পথ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইত। কিন্তু একদিকে তিনি, যেমন স্নেহ মমতা ও দয়া দাক্ষিণ্যে করুণাময়ী জননী, অন্য দিকে আবার, রণরঙ্গিণী চামুণ্ডার ন্যায়, উগ্রবীর্য্য ও রুদ্রতেজে বিশ্বনাশিনী ভয়ঙ্করী;—শত্রু সম্মুখীন হইলে,—সে শত্রু অদ্বিতীয়

বীর ও শক্তিসম্পন্ন মহারাজা বিশ্বামিত্র হইলেও, নন্দিনী, নাকের নিশ্বাসে, তাঁহাকে সৈন্যসামন্তসহ বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেন। কামধেনু নন্দিনীর নিকট পরাভূত হইয়াই বিশ্বামিত্র, চিরকালের তরে, রাজদণ্ড ফেলিয়া দিয়া কমণ্ডলু গ্রহণ করেন, এবং প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া তপোবনের পর্ণকুটীরে আশ্রয় লন। বস্তুতঃ, কামধেনু তপোবনের বস্তু হইলেও, পৃথিবীপতির প্রার্থনীয় ও জগদ্দুর্লভ স্পৃহণীয় সম্পদ্।

নবযুগে,—নূতন সভ্যতার নূতন আলোকে, রেলওয়ে-শৃঙ্খলিত, লোক-কোলাহল-পূর্ণ নগরমালায় সুসজ্জিত ভারতের মাটীতে তপোবনের সে বিজন-বিরাম,—সে নীরব-কান্তি অসম্ভব কথা; এমন কি, এখন উহা একবারে উপন্যাসের অলীক কল্পনায় পরিণত হইয়াছে। এখন ভারতে বেসরকারি অরক্ষিত অরণ্য নাই। রক্ষিত অরণ্যে, 'বেণেতি' বন-বিভাগে দেব-কল্পনার সেই অপার্থিব বস্তু কল্পতরুও নাই। ব্রাহ্মণকুলে মুনি নাই, মুনিকুলে সে ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা বা জমদগ্নি নাই। সুতরাং, কসাই-করমর্দ্দিত গোকুলেও এখন আর কুত্রাপি কামধেনুর উদ্ভব-সম্ভাবনা নাই।

কামধেনু নাই; কামধেনুর কথা আছে। কল্পতরু নাই; কল্পতরুর কল্পনা আছে।—স্পর্শমণি নাই; স্পর্শমণির সে সুখদ স্বপ্ন আছে। বস্তুতঃ মনোজগতে ও কল্পনারাজ্যে এখনও এ সকলের প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি ও আধিপত্য প্রচুর পরিমাণে রহিয়া গিয়াছে।

যাহারা, জাগন্ত স্বপ্নে, হীরকাদি জহরতখচিত, জগৎবাছা সুন্দরী রথচাইল্ডের বড় বেটীকে, দিবসে দশবার বিবাহ করে, এবং ভাঙ্গা কুঁড়ের কল্পনাবলে, "দরবারে খাসের" বাহার কলাইয়া ময়ূরসিংহাসনে আরোহণ করিয়া কৃতার্থ হয়, তাহারা কখনও স্পর্শমণি াতে পাইয়া সোনার মানুষ হইবে, সোনার আটায় সোনার ঘৃত নি মাখিয়া, সোনার দাঁতে চিবাইবে ও সোনার খট্টায় বসিয়া,

তবকের তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া, সোনার বিদ্রীতে সোনার আমীরী তামাক টানিবে, কখনও কল্পতরুর সম্মুখীন হইয়া, তাহা হইতে অমানুষিক ও অলৌকিক অমৃত ফল পাড়িয়া খাইবে এবং বিনা অধ্যয়ন ও বিনা সাধনায় সরস্বতীর বড় পুত্র কালিদাস সাজিয়া, পৃথিবীর মিল্‌টন, বায়রণ ও সেরিডন, জয়দেব বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীদাস ও ভারত চন্দ্র এবং মধু, হেম ও নবীন প্রভৃতি, যে যুগে যাঁহার ললাটে যশের জয়মাল্য দোলিয়াছে, তাঁহাকেই তোপে উড়াইয়া দিতে চাহিবে,অথবা কখনও কামধেনুর পুচ্ছ ধরিয়া, সংসারের সকল সাধ পুরাইয়া লইতে প্রয়াসপর হইবে ; এবং চির-ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষভাজন প্রতিবেশী রাম বা শ্যামের সর্ব্বনাশ সাধনার্থ কামধেনুর ক্রোধ জাগাইয়া, অমিত্র বিশ্বামিত্রের দমনযোগ্য যবন-সেনা সৃষ্টি করিয়া লইবে ; ইহা কোন ক্রমেও বিস্ময়াবহ বা বিচিত্র কথা নহে। বস্তুতঃ পৃথিবীর যত লুব্ধপ্রকৃতি অলস, সমাজের ওছা, অকর্ম্মা বা কুকর্ম্মা জীব, ও যাহারা ঈদৃশ জাগন্ত নিদ্রায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া, দিবা-স্বপ্ন দর্শনে নিত্য অভ্যস্ত, তাহারা প্রাণের ভিতর লুকাইয়া, লুকাইয়া,প্রতিনিয়তই কামধেনু ও কল্পতরুর ধ্যান, ধারণা ও আরাধনায়, এইরূপে সময়ের বোঝা লঘু করিয়া লইতে ভালবাসে।

এ সকল দিবা-স্বপ্ন বা অসার কল্পনার কথা থাকুক, এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, শাস্ত্র ও কাব্যবর্ণিত কামধেনুর ন্যায় দুর্লভ পদার্থ কি তবে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে? প্রকৃতই কি কল্পতরু ও কামধেনুর কোন অস্তিত্ব নাই? তাহা হইলে, চির-কামনাকুল অথচ অলস ও অকর্ম্মা অসংখ্য কামধুক বা দোহনব্যব-সায়ী যে, সর্ব্বত্র কামধেনুর অন্বেষণে, ক্ষুধিত সর্প, শৃগাল ও বৃকের ন্যায়, অবিরাম ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদিগের গতি হইতেছে কি? তাহারা অবশ্যই মনে মনে শতবার এই প্রশ্ন

করিতেছে,—"হায় সেই নন্দিনী, সুনন্দা ও সুরভি এখন কোথায় ? সে কামধেনু কি তবে যথার্থই আর ইহলোকে নাই ?" আমরা তাহাদিগের এই প্রশ্নের উত্তরে, তাহাদিগকে আশ্বাসিত করিবার নিমিত্তই বলিতেছি,—"আছে।" কামধেনু না থাকিলে, তাহাদিগের ব্যবসায় ও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত। তাহারা যখন আছে, তখনই তাহাদিগের বুঝিয়া লওয়া উচিত যে, তাহারা যে কামধেনুর সুখস্বপ্নে নিত্য মোহিত, তাহাদিগের সেই চির-অবলম্ব ও নিত্য উপাস্য কামধেনুও আছে। তবে সে কামধেনু কোথায়, এক্ষণ ইহাই বিবেচ্য ও বক্তব্য।

যোগাশ্রম-বর্দ্ধিতা, ঋষিপালিতা, আশ্রম-দেবতার ন্যায় সর্ব্বজন-পূজিতা সেই ধেনুরূপিণী মূর্ত্তিমতী কামধেনু এখন নাই সত্য, কিন্তু উহার কামধেনুত্ব যেন অন্য আকারে, বহু স্থানে অল্পাধিক মাত্রায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বিবর্ত্ত, ক্রমবিকাশ, বা Evolution এর অবশ্যম্ভাবি পর্য্যায়,—অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তৃণভোজী কামধেনু এখন গোতনু ত্যাগ করিয়া, ঘৃতান্নপুষ্ট মানবদেহে একটু অধিকতর সম্প্রসারিত ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কামধুক্‌, নিরাশ হইও না, নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বসিয়া থাকিও না। অনুসন্ধান কর, ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখ ;—"Eat, drink and be merry" এই উছল তরল-তরঙ্গে তরি ভাসানই যখন মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়াছ, তখন একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ।—একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলেই বুঝিতে পাইবে, স্বভাবের টানে, তুমি আপনি যাঁহার দ্বারস্থ, তোমার সেই প্রভুভাবাপন্ন পরমপোষ্টৃবর মহামহিমই মানব-দেহ-নিবদ্ধ তোমার সেই কল্পনাবিজৃম্ভিত, স্বপ্নকল্পিত চির-সন্তজনীয় কামধেনু।

গোরূপা কামধেনু রক্ষক, প্রতিপালক ও অভিভাবক ভিন্ন তিলার্দ্ধও তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিতেন না। গোমাতা কোন নিষ্কাম,

নির্লিপ্ত মহাতপা ঋষিকে আপনার রক্ষক ও অভিভাবক বরণ করিয়া লইয়া, তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতেন। ব্যবসায়ী কামধুক্ সে কামধেনুর ত্রিসীমায়ও ঘেঁষিতে সাহস পাইত না। তাঁহার কামধেনুত্ব,—যথাকাম ঐশীশক্তি, দয়াধর্ম্মের অবতার মহাজ্ঞানী ঋষি কর্ত্তৃক নিয়মিত রহিয়া, প্রতিনিয়তই জগন্মঙ্গল্য উদার-ব্রতে প্রযুক্ত হইত।

কিন্তু এক্ষণকার মানবরূপী কামধেনুগণ, কোন রক্ষক, প্রতি-পালক, বা অভিভাবকের মুখাপেক্ষা করেন না। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা আপনারাই অন্য শত অনাথ ও অনাশ্রিতের আশ্রয় ও অবলম্ব, তাঁহারা আবার আশ্রিত হইবেন কাহার? তাঁহারা অন্যের রক্ষক ও অভিভাবক, তাঁহাদের আবার রক্ষক ও অভিভাবক হইবে কে? নিরামিষভোজী হরিতকীজীবী মুনি ঋষি তাঁহাদের মখমলমণ্ডিত চত্বরোপরি স্বর্ণ, রৌপ্য বা গজদন্তনির্ম্মিত মহার্হ আসনে আসীন পলান্নসুবাসিত উচ্চ সমাজে অপাংক্তেয়। তাপসকল্প জ্ঞানবান্ দরিদ্র সে আমীরী দরবারে চির-অগ্রাহ্য। সুতরাং, তাঁহারা আপনাদিগকেই আপনাদিগের অভিভাবক ও রক্ষক স্থির করিয়া লইয়া, নিশ্চিন্ত থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে এক এক করিয়া অসংখ্য ব্যবসায়ী কামধুকের হাতে গড়াইয়া পড়েন। অতএব, তাঁহাদিগের আশ্রিত পীযুষপ্রসূ সম্পদলক্ষ্মী বিপথে চালিত হইয়া, কালভুজঙ্গীর ন্যায় বিষ উদ্গিরণ করিবে, বিচিত্র কি? সে বিষের অনল উদ্গারে প্রথমতঃ চারিদিক্ ঝলসিয়া যায়;—অবশেষে আপনারাও উহাতে অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে দগ্ধ হইতে থাকেন। যে স্থানে এই শ্রেণীর একটি কামধেনুর বিকাশ বা বি-পাক সংঘটিত হয়, সেখানে চক্ষের পলকে, চারিদিক হইতে, অনন্ত কোটি কামধুক্ আসিয়া, দোহন-দ্রোণি করে লইয়া, তাঁহার চারি দিকে চক্রব্যূহ রচনা করিয়া ঘেরিয়া দাঁড়ায়।

কামধেনু ও কল্পতরু এক কথা নহে;—একটি গাভী, অন্যটি তরু। মানব-কামধেনু ও মানব-কল্পতরু কিন্তু একই শ্রেণীর জীব; তবে প্রকার ও প্রকৃতিতে এক নহে। যাঁহাদিগের একদিকে আছে বাঁটভরা দুধ, অর্থাৎ ভাণ্ডার ভরা ধন, অন্যদিকে আছে "দর্প-কল ককুদ্বান্," বলীবর্দ্দ বা কামষণ্ডের ন্যায় শৃঙ্গতাড়ন, খুর-প্রহরণ বা কূর্দ্দন ও গর্জ্জন,—অর্থাৎ পাশব-শক্তির পাশব-ক্রীড়া, পাশব-উৎপীড়ন ও পাশব-আস্ফালন, তাঁহারাই তাঁহাদিগের চিরপোষ্য, প্রেষ্য ও চতুর কামধুকৃদিগের পক্ষে চিরসম্ভজনীয় কমনীয় কাম-ধেনু। মানব-কামধেনুগণ ধনবৈভব ও বৈষয়িক গৌরবগুরুত্বে বড় হইলেও, মানসিক শক্তি-সম্পদে চিরদরিদ্র ও যার-পর-নাই হীন-দশাগ্রস্ত। কিন্তু, যাঁহারা অর্থসামর্থ্যসম্পন্ন ধনশালী, অথচ মানসিক প্রতিভায় প্রতিভান্বিত,—জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দয়া ধর্ম্ম ইত্যাদি মহোচ্চ মানসিক ও হৃদয়িক সম্পদে ভাগ্যবান্, তাঁহারা, কামধেনুর সমগ্র উপকরণ, ঐশ্বর্য্য ও শক্তি সত্ত্বেও, কখনও কামধেনু নহেন;—তাঁহারাই পৃথিবীর সর্ব্বত্র, সকল সময়েই, কল্প-পাদপ ও কল্পতরুরূপে সম্মানার্হ ও পূজাস্পদ। শুধু ধনী বলিয়া কথা কি? মানব-কল্প-তরুগণ, নির্ধন ও দীনভাবাপন্ন কুটীরবাসী কাঙ্গাল হইলেও, প্রাণ-গত উচ্চতা ও হৃদয়িক উদারতায়, মহারাজাধিরাজ সম্রাট্ অপে-ক্ষাও বড়।

কামধেনু আপনাকে আপনি বুঝিয়া লইতে অসমর্থ। মানব-কাম-ধেনুর মানসিক স্থায়িভাব এই,—"আমি কামধেনু,—আমার মত বড় কে? আমি না করিতে পারি কি?—না করিয়াছি কি?—শুকায় শুকাইয়া যাউক—ঐ অপার অসীম সমুদ্র, আমি আমার এক বাঁটের একধারা দুগ্ধে, চক্ষের নিমেষে, উহা পরিপূর্ণ করিয়া দিব। আছ, আছ তুমি বিশ্বামিত্র, সাবধান, বৈরভাবে তুমি আমার সন্নিহিত হইও না, আমি এক হুঙ্কারে তোমারও সকল দর্প চূর্ণ

করিয়া ফেলিব। আর তোমরা অষ্টবসু; তোমরাও গর্ব্বভরে আমার পুচ্ছ স্পর্শ করিতে আসিও না; আমি একবার কোপ-নয়নে তাকাইলে, তোমরাও তন্মুহূর্ত্তেই স্বর্গচ্যুত, ভূপতিত ও চিরবিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।"

কামধেনুর শক্তি এমনই বটে। মানব-কামধেনুগণ, পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যবলে, যথার্থই এরূপ কামধেনু-শক্তিরই ছিটা ফোঁটা আয়ত্ত করিয়া, মনের আবেগে ফুলিয়া, বড়ই ঘটা সহকারে সংসার-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের কুলোপাধি ও পৈতৃক উত্তরাধিকারিত্বের মহিমায় চিরদিনই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। তাঁহারা, অহং ভাবের কুমন্ত্রণায়,আপনাকে যাহাই বুঝিয়া রাখুন না কেন, তাঁহারা কিন্তু, প্রকৃতপ্রস্তাবে, কোন কালেও স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নহেন। যাহাহউক, তাঁহারা এইরূপ বৃথাগর্ব্ব ও অজ্ঞতা-মূলক অভিমানে অন্ধ হইয়াই পরিচিত, পরীক্ষিত ও পরিগৃহীত কাণ্ডারীর উপদেশ উপেক্ষা করিয়া, কাণ্ডারীবিহীন তরণীর মত, ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ান এবং অবশেষে অজ্ঞাতসারে চতুর কাম-ধুকের লুক্কায়িত কামনার বশবর্ত্তী ও অধীন হইয়া, সংসারক্ষেত্রে পদে পদে বিপন্ন ও বিড়ম্বিত হইতে থাকেন। তাঁহারা কখনও কাম-ধুক্‌দিগের চন্দন-চর্চ্চিত সরসসুরভি ক্ষণস্থায়ি পূজা-পুষ্পে আপ্যায়িত, কখনও স্তুতিস্তবের স্নিগ্ধ-মধুর বচন-বিন্যাসে মন্ত্রমুগ্ধ। কামধেনুগণ কামধুক্‌দিগের প্রয়োজনকেই আত্মপ্রয়োজন জ্ঞানে আত্মহারার ন্যায়, কখনও গর্ব্বী বিশ্বামিত্রের গর্ব্ব চূর্ণ করার নামে, পদানত ও বিনীত দীলিপের শোণিতলিপ্ত মাংসই সিংহের কবলে উৎসর্গ করিতে উদ্যত হন; কখনও বা, বিনা দোষে, বিনা কারণে, কামধুকের ইঙ্গিতে, প্রফুল্ল ও প্রস্ফুট চন্দ্রমাকে কক্ষচ্যুত করিবার নিমিত্ত, শৃঙ্গ-আস্ফালন করেন; কখনও আবার শুষ্ক সমুদ্রকে দুগ্ধধারায় পূর্ণ করার অছিলায়, জ্ঞানবাপীর পুণ্যসরোবরে মূত্র পুরীষ ত্যাগ করিয়া,

বাহাদুরীর ভাবে পুচ্ছ নাড়িয়া নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হন; এবং কখনওবা প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির ভগ্ন করিয়া, শৌণ্ডিকালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা পুরুষার্থ প্রকাশে যত্ন করেন। এও শক্তি, সেও শক্তি। যাহা কিছু পার্থক্য, তাহা ঐ শক্তি-প্রয়োগ-প্রণালী ও প্রয়োগ-কর্ত্তার মনোগত ভাবে। হাবড়া অন্ধ মানব-কামধেনুগণ, কামধুকের চক্ষে দেখেন, কামধুকের কানে শুনেন, এবং কামধুকের জিহ্বায়ই অন্ন চাখিতে অভ্যস্ত হইয়া, একবারে অস্তিত্বশূন্য হইয়া রহেন। কামধুকেরা তাঁহাদিগকে অহোরাত্র জোঁকের মত শোষণ বা দোহন করে। তাঁহারা বুঝিয়াও ইহা বোঝেন না, অথবা বুঝিতে চাহেন না। অবশেষে, ক্রমশঃ হীনরক্ত ও হীনশক্তি হইয়া, উৎখাতমূল তরুর ন্যায়, ঢলিয়া পড়েন। তখন অবশ্যই তাঁহাদের চক্ষু ফোটে। কিন্তু তখন আর প্রতিকারের পথ থাকে না;—তাঁহাদিগের বাঁটের অক্ষয় ভাণ্ডার শুকাইয়া যায়, উহাতে তখন আর বৎসের প্রাণ রক্ষার উপযোগি দুধটুকুও অবশিষ্ট রহে না। ইহা নিতান্তই দুঃখজনক ও ক্লেশকর বিড়ম্বনা নয় ত কি?

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মানব-কামধেনুই একশ্রেণীর জীব। কিন্তু সমস্ত মানব-কল্পতরু একশ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট নহে। কেহ, বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানবৈভবে, প্রতিভাপ্রদীপ্ত কল্পপাদপ। কেহ, কাব্য, সাহিত্য ও ভাষাসম্পদে কুসুমগুচ্ছসজ্জিত, মণিরত্নমণ্ডিত রুচির-তনু কল্পতরু। কেহ, শক্তি সামর্থ্যে, দুর্ব্বল ও বিপন্নের আশ্রয়-মহীরুহ। কেহ, দয়াধর্ম্ম ও উদারতায় সুখ-শীতল অক্ষয় বট। এবং কেহ, ধনে, মানে ও দানে চির-আরাধ্য অশ্বত্থ। কিন্তু সকল শ্রেণীর কল্পতরুই, জীবনের মূলমন্ত্র বা ব্রত-সঙ্কল্পে, এক ও অভিন্ন।—সকলেরই এক এককথা—আত্মবিস্মৃতি ও পরার্থে আত্মদান।

তাঁহারা আপনাকে দেখেন না; আপনার কথা ভাবেন না। গর্ব্বে কখনও তাঁহাদিগের মস্তক উচ্ছ্রিত বা উন্নত হইতে জানে না।

তাঁহারা যত বেশী ফলবান্, তত বেশী অবনত ও নম্র। ঝড় বহিয়া যায়, তাঁহারা ঝড়ের সহিত দুঃসহ কঠোর-সংগ্রামে আপনি ছিন্নশাখ, ভগ্নবাহু ও ছিন্নবিছিন্ন হইয়া, আশ্রিতদিগকে আবরিয়া রাখেন; এবং উন্নত শাখাস্থিত সুপক্ক ফলরাশিকে মাটীতে ছড়াইয়া দিয়া, সকলের সহজলভ্য সরসভোগ্য করিয়া দেন। আকাশের বজ্র বিদ্যুৎ সংহার মূর্ত্তিতে গর্জ্জিয়া আইসে, তাঁহারা ধীর, স্থির ও অটল। তাঁহারা আপনারা উহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহাদের ছায়ায় বসিয়া, ক্ষুদ্র তৃণ, লতা ও গুল্মগণ উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-আলোকে, নির্ভয়ে হেলিয়া দুলিয়া, নৃত্য করে। কেহ তাঁহাদিগের মূলে কুঠার আঘাত করিলেও, তাঁহারা তাঁহাকে ছায়াদানে বিরত হন না, বরং যেন করপত্রাঙ্গুলি সঙ্কেতে মৃদু সমীরকে আহ্বান করিয়া, সেই ক্রূরকর্ম্মা মারাত্মক রিপুরও সেবা করিয়া সুখানুভব করেন এবং কৃপার কোমল-করে তাহার কপালের ঘাম পুছাইয়া দিয়া আনন্দিত হন।

যদিও এই সংসার, কামধেনু ও কামধুকেরই প্রসর ক্রীড়াক্ষেত্র, রঙ্গভূমি বা বিস্তৃত ব্যবসায় বন্দর, তথাপি ইহার কোন কোন স্থান এখনও কল্পপাদপের শীতল ছায়ায় যার-পর-নাই প্রীতিপদ ও মধুর। কামধেনুর আস্ফালন ও কামধুকের চাতুরি দেখিয়া কেহই অন্তরে ভীত বা শঙ্কিত হইও না, একটু কষ্ট স্বীকার কর; অগ্র পশ্চাৎ চিন্তা করিয়া, অন্তশ্চক্ষুর উন্মীলনে, ভাল করিয়া পথ দেখিয়া লইয়া, ধীর পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হও, কল্পতরুর ছায়া তোমার একবারেই দুর্লভ বা দুষ্প্রাপ্য হইবে না। তুমি বিদ্যাব্রাহ্মণ্যশূন্য, জ্ঞানবিজ্ঞান-বিহীন অন্ধতমসাচ্ছন্ন কাঙ্গাল, ভয় কি ভাই হতাশ হইও না, গুরু-রূপী কল্পতরু চিনিয়া লও, তাঁহার সঞ্জীবন-মন্ত্রে তোমার আঁধার ঘরে আলো ফুটিবে। তুমি কাব্য ও সাহিত্য-রস-পিপাসু তৃষার্ত্ত চকোর, তুমি যদি সাহস পাও, উড়িয়া উড়িয়া একটু উপরে উঠিতে

চেষ্টা কর, তুমিও একটু ঊর্দ্ধ জগতে তোমার চিরপ্রিয় চন্দ্রের জ্যোৎস্নামাখা কল্পতরুর দেখা পাইবে, এবং মুহূর্ত্তেকে মন্দাকিনী, ভোগবতী ও ভাগীরথীর ত্রিধারায় তোমার ঐ নিদারুণ তৃষা প্রশমিত হইয়া যাইবে। তুমি সংসার-ক্লিষ্ট পাপতাপদগ্ধ আতুর বা আর্ত্ত, যদি পার, তুমিও হাঁটুতে ভর করিয়া উঠ ও একবার কায়ক্লেশে নগর, বন্দর, গ্রাম, প্রান্তর, মাঠ ও বন খুঁজিয়া, তোমার মনোমত কল্পতরু বাছিয়া লও; দেখিবে,স্পর্শ মাত্রই তাঁহার প্রীতিমধুর শীতল-ছায়ায় তোমার ঐ চিরক্লেশিত, ঐ চির জর্জ্জরিত প্রাণ জুড়াইবে। তুমি নিরাশ্রয়, নিরবলম্ব দরিদ্র, তুমিও যদি উৎসুক হও, এবং কামধুকের সহজসাধ্য নিকৃষ্টবৃত্তিতে উপেক্ষা দেখাইয়া, কামধেনুর পরিবর্ত্তে কল্পতরুর আশ্রয় লও, ও কল্পপাদপের পদমূলে 'তুভ্যং নমঃ' বলিয়া, তোমার সরল প্রাণের গলৎধার অশ্রুর অঞ্জলি ঢালিয়া দিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে, তোমার পর্ণশালায়ও দেখিও, অচিরেই পদ্মালয়ার স্থির পদ্মাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর তুমি, চিরগৌরবাবহ কামধেনু, তুমিও যদি ইচ্ছা কর, ও কামধুকের যাদুমন্ত্রের মোহিনী কাটাইয়া, সাহসের সহিত অগ্রবর্ত্তী হইতে সক্ষম হও, তুমিও কল্পতরুর ছায়াস্পর্শে কৃতার্থ হইতে পার। তুমি কল্পতরুর শরণাপন্ন হইলে, একদিকে তোমার সম্পদলক্ষ্মী ধনের পর ধনের ভাণ্ডার প্রসব করিয়া বর্দ্ধিত হইবে, অন্যদিকে তোমার সেই বিলাসলোলুপা-চঞ্চলা, দয়াময়ী মায়ের প্রাণে সঞ্জীবিত হইয়া, বিপন্নকে আশ্বাস দান করিবে, দুঃখকাতর আর্ত্তের অশ্রু পুছাইয়া দিবে এবং নিরন্নের, অজ্ঞ ও অন্ধ সন্তানের হাতে শিক্ষার আলোকশলাকা ধরাইয়া দিয়া, চিরতরে তাহার অসহ্য দুঃখ ও অভাব দূর করিবার পথ খুলিয়া দিবে।

যাঁহারা মর্ত্ত্যলোকের মানব-কল্পতরু, তাঁহারাই স্বর্গলোকের ভাগ্যবান্ দেবতা। তাঁহারাই ধন্য। পরের প্রাণবলশোষক স্বার্থের

সঞ্চয় বিলাসের ফুৎকারে পলকে উড়িয়া যায়; কিন্তু পরার্থ-ব্রতে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়াও উদারপ্রাণ কল্পতরুর অক্ষয় ভাণ্ডার শূন্য হয় না। কুবের সেখানে আপনি স্বর্ণ বৃষ্টি করেন। কমলা অন্নপূর্ণা সাজিয়া, আপনি আসিয়া কল্পতরুর মূলে দেউল প্রতিষ্ঠিত করিতে ভালবাসেন। কল্পতরুর আশ্রিত অলৌকিক দৈবশক্তির ইহাই এক বিচিত্র মাহাত্ম্য যে, উহা দানে ও ব্যয়ে ক্ষয়িত না হইয়া, শত গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, যাঁহার প্রবৃত্তি আছে, শক্তি আছে, এবং এ সকলের উপরে, সাধনার একটু বল আছে, আমরা তাঁহাকে করযোড়ে অনুরোধ করি, তিনি মানব-সমাজে, এই কঙ্করাকীর্ণ দগ্ধ মরুতে, কল্পতরুরূপে দণ্ডায়মান হইতে প্রাণপণে যত্ন করুন। আর অদৃষ্ট দোষে, যাঁহার সে শক্তিসম্পদ্ নাই, অথবা থাকিয়া থাকিলেও অবস্থাবৈগুণ্যে তাহা ফুটিতে পারে নাই, মৃতবৎ অসাড় বা নিদ্রিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তিনিও কল্পতরুর সুখ-সংসর্গে সেই নিদ্রিত শক্তির উদ্বোধন করিয়া জীবনে কৃতার্থ হইতে চেষ্টা করুন। আপনি কামধেনু, সকলেই আপনাকে পুষ্পচন্দনে পূজা করিতে অভ্যস্ত, আপনিও ঐ শূন্যগর্ভ পূজার আড়ম্বরে, ঐ পূজ্য-ভাবে চিরমুগ্ধ না রহিয়া, আপনারও পূজ্য পদার্থ জগতে আছে, এই সত্যে আস্থা স্থাপন করিয়া, পূজকের বিনীতবেশে পূজার্হ কল্পপাদ-পের আশ্রয় গ্রহণ করুন। কল্পতরুর স্বাস্থ্যকর পুণ্যসমীরে আপনি তরিয়া যাইবেন, আর আপনার ঐ চির পোষ্য ও নিত্য প্রতিপাল্য, বৎসভাবাপন্ন কাঙ্গালগুলিকেও কৃতার্থ করিতে সমর্থ হইবেন।

পৃথিবীর যত কামধেনু কল্পতরুর মূলে প্রীতির পুষ্পদামে প্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধনে, চিরকালের তরে বাঁধা পড়িবে, পৃথিবীর এমন সুদিন কখনও হইবে কি?

শ্রী—

বর্ষ-স্মৃতি।

অয়ি শৈলেন্দ্র-শোভিতা, সাগর-সেবিতা,
জননি জনমভূমি,
আজি গত বরষ অন্তে—নব বরষ-প্রান্তে,
কেন বিষাদিতা তুমি ?
অনন্তে মিশিছে আজি বর্ষ এক;
মা ব'লে কি কেহ ডাকে কি আরেক,
তাই কি বিষণ্ণ, তাই কি ক্ষুন্ন,
অশ্রু বহিছে কপোল চুমি,
অয়ি শৈলেন্দ্র-শোভিতা, সাগর-সেবিতা,
জননি জনমভূমি !

আজি বিশাল অবনী, করি জয়-ধ্বনি,
উঠিছে উন্নতি-সোপানে,
তবে অয়ি মা আমার, কেন আজ তুই
বিলুণ্ঠিতা ধূলি-শয়নে ?
বীরকীর্ত্তিময়ী, জ্ঞানগর্ব্বে ভরা—
আজো সে গৌরবে পূর্ণ বসুন্ধরা,
অতীত কাহিনী, মানস-বাহিনী
অশ্রু আনিছে নয়নে,
অয়ি জ্ঞানগৌরবিণি, নাহি কি গো কেহ,
দুঃখ ঘুচাতে এখনে ?

যদি বরষে বরষ, এইরূপে হবে
বিফল তোর,
তবে হে দীনা জননি, তব দুখ-নিশি
হবে কি ভোর ?
আজি বরষের এই প্রথম প্রভাতে,
নবীন উষার কিরণ-সম্পাতে,
স্মরি তোর স্নেহ, জাগিবে না কেহ
মুছাতে নয়ন-লোর,
হে মহিমাময়ি, জ্ঞানগরীয়সি,
লাঞ্ছিতা জননী মোর।

কভু, তোরই মা বিদ্যা, তোরই মা বুদ্ধি,
জগতে দিয়াছে জ্ঞান,
আজি জগতের, পদতলে হায়,
তোরি মা হয়েছে স্থান !
তোরি কীর্ত্তিরাশি আজিও স্মরিলে,
গর্ব্বে স্ফীত বক্ষ, আনন্দ উথলে,
পুনঃ কোন শুভ দিনে, পশিবে শ্রবণে
গত সে বিজয়-গান,
চির বিষাদিনী, প্রফুল্ল হেরিব
ও মুখ বিষাদ-ম্লান।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিষয়ে জর্ম্মাণ দার্শনিকদিগের মত।

ক্রম বিকাশের দিক্ হইতে বিচার করিতে গেলে, গ্রীক্ দার্শনিক-দিগের পরেই জর্ম্মাণ দার্শনিকদিগের মত অভিব্যক্ত করা উচিত। জর্ম্মাণ দার্শনিকগণ দার্শনিকতত্ত্ব নির্ণয়ে গ্রীক্ দার্শনিকগণ হইতে অনেক সহায়তা পাইয়াছেন। আমরা আমাদের সুবিধার জন্য জর্ম্মাণ দার্শনিকগণের মত সর্ব্বশেষে ব্যক্ত করিলাম।

জর্ম্মাণ দার্শনিক বমগার্টন (Baumgarten)।—তিনি সর্ব্ব প্রথমে জর্ম্মাণিতে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব দার্শনিকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে দার্শনিক উল্ফ (Wolff) ও লেবনিজ (Leibnitz) উজ্জ্বল জ্ঞান (clear conception) সম্বন্ধে মাত্র আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ইন্দ্রিয়-সম্ভূত জ্ঞান (sensuous knowledge) এর কার্য্য সম্বন্ধে আদৌ আলোচনা করেন নাই। তাই তাঁহাদের দর্শনশাস্ত্র অপূর্ণ রহিয়াছে। বমগার্টন বলেন যে, উজ্জ্বল জ্ঞান দ্বারা সত্য (truth) জানা যায়, এবং ইন্দ্রিয়সম্ভূত জ্ঞান দ্বারা সৌন্দর্য্য জানা যায়। ইন্দ্রিয়সম্ভূত জ্ঞানের পূর্ণত্বেই সৌন্দর্য্যের জন্ম। শিল্প (art) শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুকরণ করিয়া থাকে। তাঁহার মতে প্রাকৃতিক দৃশ্যই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। বমগার্টনের মত একদেশদর্শী। তিনি সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের দিক্ মাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, সৌন্দর্য্যের ভাবের দিক্ তিনি একবারে স্পর্শ করেন নাই।

দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ কাণ্ট (Kant)।—তাঁহার সৌন্দর্য্য বিষয়ক মত জানিতে হইলে, তাঁহার সমগ্র দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার দর্শন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া, তাঁহার

দর্শনশাস্ত্রে বস্তুবিষয়ক জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। এই বিচার-প্রণালীর তিনটি শাখা—(ক) উজ্জ্বল জ্ঞান সম্বন্ধীয় বিচার—এই অংশে তিনি জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞানলাভের সহজ (aprion) উপকরণগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন; (খ) কার্য্যোপযোগী জ্ঞানসম্বন্ধীয় বিচার—এই অংশে তিনি ইচ্ছাশক্তির সহজ উপকরণগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন; (গ) রুচিসম্বন্ধীয় বিচার—এই স্থানে তিনি সুখ দুঃখের স্বাভাবিক উপকরণগুলি নির্ণয় করিয়াছেন। এই রুচি সম্বন্ধীয় বিচার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ও উদ্দেশ্যতত্ত্ব। কাণ্ট সৌন্দর্য্যতত্ত্বের বর্গ চতুষ্টয় (four categories) এর দিক্ হইতে বিচার করিয়াছেন। গুণতঃ সৌন্দর্য্য আমাদিগকে নিঃস্বার্থ আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। এই লক্ষণ সুন্দর, প্রীতিকর (agreeable) ও মঙ্গলজনক (good) হইতে ভিন্ন। সংখ্যাতে ইহা বিশ্বজনীন আনন্দ। সম্বন্ধে (In relation) ইহা উদ্দেশ্যবিহীন উপযোগিতা। আকারে (In modality) ইহা অপরিহার্য্য আনন্দ (necessary satisfaction)। বর্ত্তমান সময়ে মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও সৌন্দর্য্যের এই কএকটি বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কাণ্ট স্থলবিশেষে, সরলতা, বিনয়, সৎসাহস ইত্যাদি নৈতিক ভাবসমূহ নিউটনোক্ত সাতটি মৌলিক বর্ণেতে আরোপ করিয়াছেন। এই সব উক্তি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কলাবিদ্যার সৌন্দর্য্য অপেক্ষা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে কলাবিদ্যা তিন ভাগে বিভাজ্য —(ক) মুখপ্রসূত কলাবিদ্যা (বাগ্মিতা ও কবিত্ব); (খ) দৃশ্য পদার্থ সম্বন্ধীয় কলাবিদ্যা (স্থপতিবিদ্যা ও চিত্রবিদ্যা); (গ) ভাবসম্বন্ধীয় কলাবিদ্যা সঙ্গীত ও বর্ণ-শিল্প (colour-art)। কাণ্ট জগৎকে অনেক নূতন সত্য শিক্ষা দিয়াছেন। হার্ডার (Herder)

কাণ্টের মতের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। হার্ডার বলেন, পূর্ণতার জ্ঞান হইতেই সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের উৎপত্তি। হার্ডার সমস্ত সুন্দর বস্তুর কোন সাধারণ আকৃতি স্বীকার করেন, কাণ্ট তাহা করেন না। অনেক বিষয়ে সমালোচকের মত অপেক্ষা কাণ্টের মতই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়।

সেলিঙ্ (Schelling)—তিনি সৌন্দর্য্যবাদ, তাঁহার প্রচারিত অধ্যাত্মবাদ (Transcendental Idealism) এর উপর স্থাপিত করিয়াছেন। সেলিঙ্ বলেন, জ্ঞাতা (subject) ও জ্ঞেয় (object) অচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত। জ্ঞাতা ভিন্ন জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব, জ্ঞেয় ভিন্নও জ্ঞাতার অস্তিত্ব অসম্ভব। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিপরীত দিক্ প্রদর্শক দুই কেন্দ্র—কিন্তু অভিন্নরূপে যুক্ত। এক অদ্বয় জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধের উপর অধ্যাত্মবাদ স্থাপিত হইয়াছে। তিনি দর্শনশাস্ত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(ক) জ্ঞানোৎপত্তি সম্বন্ধীয়, (খ) ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধীয়, (গ) কলাবিদ্যা সম্বন্ধীয়। শেষোক্ত দর্শনে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের প্রকৃত সম্মিলন প্রদর্শিত হইয়াছে। কলাবিদ্যাতে আত্মা নিজ তত্ত্বোপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। শুধু তাহা নহে, অনন্ত সুখের আভাসও লাভ করিয়া থাকে। শিল্পীর উৎপাদিকা শক্তির ভিতর দিয়া, অদ্বয় জ্ঞান (Absolute) জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের একত্বরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। শিল্প দর্শনশাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ। শিল্পের সৌন্দর্য্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হইতে শ্রেষ্ঠ। সৌন্দর্য্যের আকৃতি (form) সম্বন্ধে সেলিঙের মত অস্পষ্ট। কোন স্থানে বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৌন্দর্য্যের আকৃতি, এরূপ বলিয়াছেন। অন্য স্থানে প্লেটোর ন্যায় তিনি সুন্দর বস্তুর মৌলিক আদর্শ আছে, স্বীকার করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ দার্শনিক হিগেল (Hegel)।—তাঁহার মত বুঝিতে হইলে, তাঁহার সমগ্র দর্শনশাস্ত্র মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করা

আবশ্যক। হিগেলের মত মোটামুটি এই,—তিনি বলেন যে, এক অদ্বয় (Absolute) জগতের মূলতত্ত্ব। তাঁহার সমগ্র দর্শন অদ্বয়ের স্বগতি (self-movement of the absolute) এর উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই অদ্বয় জ্ঞান, জড় ও জীবজগতে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইতেছে। কোথাও শুদ্ধ বুদ্ধিরূপে (as pure thaught), কোথাও বাহ্যরূপে (as external), এবং কোথাও আত্মজ্ঞানরূপে (as self-cognisant thaught) প্রকাশ পাইতেছে। তিনি বলেন যে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থের ভিতর দিয়া অদ্বয়ের প্রকাশই সৌন্দর্য্য (The beautiful is defined as the shining of the idea throngh a sensuous medium)। বহুত্বের একত্বই সৌন্দর্য্যের আকৃতি (The form of the Beautiful is unity of the manifold)। অদ্বয় জ্ঞান জড়জগতের বহুত্বের একত্ব সম্পাদন করিতেছে। তিনি জীব-সৌন্দর্য্যের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন। সেলিঙের ন্যায় তিনিও বলেন যে, কলাবিদ্যাতে সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। শিল্পের ন্যায় উপকরণরাশির মধ্য দিয়া জীবন্তরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর শিল্প, উপকরণ (matter), ও আকৃতি (form) এর ভিন্ন ভিন্নরূপ সংযোগের উপর নির্ভর করে। প্রাচ্য শিল্পে উপকরণের প্রাবল্য দৃষ্ট হয় এবং কল্পনাসম্ভূত শিল্পে আকৃতি বা গঠনের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। হিগেল কলাবিদ্যাকে, আকৃতি ও উপকরণের আধিক্যানুসারে, নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত করিয়াছেন ; (১) স্থপতিবিদ্যা (Architecture)—ইহাতে উপকরণের প্রাবল্য অধিক দৃষ্ট হয় ; (২) ভাস্কর বিদ্যা (Sculpture)—ইহাতে উপরকণ অপেক্ষা জ্ঞানের আধিক্য অধিক দৃষ্ট হয় ; (৩) চিত্রবিদ্যা (Painting)—ইহাতে ভাস্কর বিদ্যা অপেক্ষা গঠনের বা জ্ঞানের আধিক্য দৃষ্ট হয় ; (৪) সঙ্গীত বিদ্যা (Music)—ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-প্রকাশিকা কলা-

বিদ্যা; (৫) কাব্য (Poetry)—ইহা বিশ্বজনীন ভাব প্রকাশক। অন্যান্য সমস্ত শিল্প ইহাতে নিহিত রহিয়াছে।

হিগেলের মতে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার মত এরূপ ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, ইহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য নহে।

Weisse, Ruge, Rosenkranz, Schasler প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অল্পাধিক পরিমাণে হিগেলের মতের অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মত স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন।

থিয়োডর ভিসার (Theodor Vischer) এর মত।—তিনি অনেকাংশে হিগেলের শিষ্য। তিনি সৌন্দর্য্যতত্ত্ব তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—(ক) সৌন্দর্য্যবিষয়ক দর্শন, (খ) আংশিক অস্তিত্বরূপী সৌন্দর্য্য, (গ) প্রকৃত সৌন্দর্য্য অথবা কলাবিদ্যা। তিনি বলেন, স্থানে আবদ্ধ জ্ঞানই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। তাঁহার কৃত কলাবিদ্যার বিভাগ; (১) দর্শনেন্দ্রিয়জ কলাবিদ্যা (স্থপতি বিদ্যা, ভাস্কর বিদ্যা ও চিত্র বিদ্যা)। (২) শ্রবণেন্দ্রিয়জ কলাবিদ্যা (সঙ্গীত); (৩) কল্পনাসম্ভূত কলাবিদ্যা (কাব্য)। তাঁহার কৃত দর্শনশাস্ত্র অনেক স্থলে দুর্ব্বোধ।

হারবার্ট (Herbart)।—তিনি মনোবিজ্ঞানের দিক্ হইতে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিচারে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি সুন্দর বস্তুতে অদ্বয় জ্ঞানের প্রকাশ আদৌ দেখিতে পান না। তাই তিনি সৌন্দর্য্যের উপকরণ গুলি মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সোপেনহর (Schopenhauer)।—তিনি বলেন যে, সমস্ত জগৎ এক ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ। সুন্দর বস্তুতে যে পরিমাণে এই ইচ্ছাশক্তি কার্য্য করে, তাহারা সেই পরিমাণে সুন্দর।

Von Kirchmann।—তিনি হিগেলের সৌন্দর্য্যবিষয়ক মতের ভ্রম-প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান

প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি পর্য্যবেক্ষণ ও অনুমান দ্বারা সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব নির্ণয়ে অগ্রসর হইয়াছেন।

লেসিঙ (Lessing)।—তিনি শিল্পের উন্নতি-সাধনকল্পে অনেক অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন। তিনি কাব্যের ও চিত্রবিদ্যার সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রাচীন ভাস্কর বিদ্যা ও চিত্রবিদ্যা দৃশ্য সৌন্দর্য্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দুইটি শিল্পের আকাশ অবলম্ব্য। সুন্দর বস্তুর পক্ষে আকৃতি ও বর্ণ যতদূর প্রয়োজনীয়, কাব্যের পক্ষে পদ ততদূর প্রয়োজনীয়। কাব্য কার্য্যের দ্বারা, বস্তু ও দৃশ্য সমূহ চিত্রপটে উদিত করিয়া দেয়। চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর বিদ্যা বস্তুর দ্বারা কার্য্যের কথা মনে সমুদিত করে। অতএব ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, দৃশ্য শিল্প হইতে কাব্যের প্রকাশিকা শক্তি অনেক বেসী। লেসিঙ সৌন্দর্য্য মূলতঃ কি পদার্থ, এ প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হন নাই।

সিলার (Schiller)।—তিনি সৌন্দর্য্যবিষয়ে কাণ্টের দার্শনিক মত অনেক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি রুচিতত্ত্ববিষয়িণী শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি সৌন্দর্য্য বিষয়ক স্পৃহা ও ক্রীড়ার স্বাভাবিক স্পৃহার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন। ক্রীড়ার স্বাভাবিক স্পৃহা, দুইটি স্পৃহার সংযোগে উৎপন্ন,—উপাদানঘটিত ও আকৃতি ঘটিত। উপাদানঘটিত স্পৃহা আন্তরিক চিন্তার যাথার্থ্য সম্পাদন করিয়া থাকে এবং আকৃতিঘটিত স্পৃহা আকার প্রদান করিয়া থাকে। তাঁহার মতে সৌন্দর্য্যজ্ঞান বর্দ্ধনের এই দুইটি নিয়ম,—মনুষ্যের নৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিকতা (Sociability)। সৌন্দর্য্যজ্ঞান-পারদর্শী ব্যক্তির হৃদয়ে ইন্দ্রিয়জ ও জ্ঞানজ শক্তির একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সৌন্দর্য্য মূলতঃ কি,— এ বিষয়ে তাঁহার কোন স্পষ্ট মত দেখিতে পাওয়া যায় না। গেটে (Goethe), জিনপল (Jean Paul), Winckelmann প্রভৃতি

আরও অনেক জর্ম্মাণ পণ্ডিতদিগের মত উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে তাঁহাদের মত উল্লেখ করিলাম না।

হেল্ম্হলট্জ (Helmholtz), ফেক্নার (Fechner) প্রভৃতি কতিপয় জর্ম্মাণ পণ্ডিত কলাবিদ্যার উপকরণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাবলে, অনেক নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। অদ্য আমরা পাঠকবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। আগামী প্রবন্ধে আমাদের নিজ মত ব্যক্ত করিয়া, সৌন্দর্য্যতত্ত্বের উপসংহার করিবার ইচ্ছা রহিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅভকুমারগুহ, এম্, এ, বি, এল্।

উচ্ছ্বাস

আকুল পরাণে কেরে যায় গেয়ে,
তটিনী বাহিয়া নিশীথ সময়ে,
তার সঙ্গীতের সুর শোকে ভরপুর,
কত না কাতর বিরহে বধুঁর,
জাগায় অতীত কথা;—
কোথা হ'তে এল, চলেছে কোথায়,
কাহার উদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়,
আপনার মনে গেয়ে চ'লে যায়,
হৃদয়ে কতই ব্যথা!
তিল তিল করি হ'ল যুগান্তর,
গিয়াছে ভাঙ্গিয়া সংসার পিঞ্জর,

প্রাণের পাখিটি কোমল সুন্দর,
জনমের মত উ'ড়ে,
তারে খুঁজিয়া, খুঁজিয়া, বিষাদিত হিয়া,
কতই কাঁদিয়া মরে!
ভ্রমি জনপদ, প্রান্তর, কানন,
গিরি, নদ, নদী কত অগণন,
শ্মশানে শ্মশানে নিশি জাগরণে,
আকুল আহ্বানে, কাতর বচনে,
খুঁজিয়াছে তারে নয়ন-সলিলে,
জনমের সাধ গিয়াছে বিফলে।
ছিল কতই তাহার লাবণ্য অতুল,
কোমল যেমতি কুসুম-মুকুল,
অন্তরেতে স্নেহ অনন্ত অকুল,
ছিল অধরে তাহার বচন মধুর,
সোহাগে হৃদয় সদা ভরপুর,
এমনি করুণাধার,
আজো যেন হায়, প্রাণে বয়ে যায়,
তাহার স্নেহের ধার!

পর্ব্বত-শিখরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
আধফুট স্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
বাহু পসারিয়া নিঝরিণী-বালা,
যেন বিরহ-সন্তাপে হইয়া উতলা,
তার অতীতের স্মৃতি হৃদয়ে লইয়া,
চলিয়াছে বালা উধাও হইয়া,
উছলি উছলি তপত নিশ্বাসে,

চিড়িয়া হৃদয় আলু থালু বেশে,
নগরে নগরে ভ্রমিয়া সতত,
তাহারি উদ্দেশে ব্যর্থ মনোরথ।

ব্যথা ভরা ক্লান্তপ্রাণে,
কেরে যায় গে'য়ে, এমন করিয়ে,
কাঁদায়ে জগত-জনে?
এ পরাণে জ্বালা সহে না যে আর
পু'ড়ে হ'ল ছাই দেহ সুকুমার,
মরমে মরমে কত না গোপনে,
কি যেন প্রবাহ বহে নিশি, দিনে,
করিয়া পরাণ ক্ষয়,
সকলি গিয়াছে, স্মৃতি টুকু আছে,
করিতে জীবন লয়।
দাঁড়াও দাঁড়াও আমরাও আজ,
ত্যজিয়া সংসার লোক-ভয়, লাজ,
তোমারি সহিত ভ্রমি দেশে, দেশে,
তোমারি মতন অশ্রু-জলে ভে'সে,
নূতন বেদনা লইয়া পরাণে,
করিব সাধনা তাহারি কল্যাণে,
যাব ত্যজিয়া পরাণ তাহারি উদ্দেশে,
সে শান্তির আগার গিয়াছে যে দেশে।

ভবের গাজন ও ভাবের চড়ক।

"দে পাক, দে পাক, দে পাক।"

হাঁপ ছাড়িয়া প্রাণ বাঁচিল ;—ঢাক থামিয়াছে। চৈত্রের রৌদ্র। রোদ ত নয়,—ডাইলিউট্ করা (Diluted) আগুন। তপ্ত ধূলির ক্ষিপ্ত হোলী! তাহাতে কর্ণপটহে ঢাকের অষ্টপ্রহরব্যাপী ট্যাঙ্, ট্যাঙ্, ট্যাঙ্, এ, সকলের উপরে গাজনের তাণ্ডব নৃত্য! ইহা কি মানুষের প্রাণে সয়? ভায়া নব বর্ষ, তোমার শুভাগমনে যে, চিরজাগস্ত গাজনতলা, ক্ষণকালের তরে ঠাণ্ডা হইয়াছে, অন্য কোন কারণে না হউক, শুধু এই কারণেই, তোমাকে শত নমস্কার করি।

বৎসর সকলেরই যায়। কাহারও যায়, শরতের জ্যোৎস্নায়,—জগদ্ধাত্রী, বিশ্বজননী জগন্ময়ী মায়ের উদ্বোধন ও আবাহনে; কাহারও, যায়,—প্রশান্ত হেমন্তে শস্য-মণ্ডিত সোনার মাঠে, নবান্নের হলহলায়, পিতৃপুরুষের পবিত্র পার্ব্বণে এবং কাহারও যায়,—বড় দিন ও খৃষ্টমাসের ঢল ঢল আনন্দ-তরঙ্গে। আর বাঙ্গালীর? —বাঙ্গালীর বৎসর যায়, চৈত্রোৎসবের তাণ্ডব কাণ্ডে,—বাণ ফোড়া ও ভেক্ ধরার বিচিত্র অভিনয়ে।

যে ভাবেই হউক, আপদ গিয়াছে। চৈত্র, চৈত্র-উৎসব ও বৎসর কএক মাসের জন্য সমস্তই গিয়াছে। নববৎসর, তুমি আবার আসরে নামিবার ফাক পাইয়াছ। নূতন পাঁজি তোমার হাতে, পুরাতন রবির নূতন ফোঁটা তোমার কপালে,—আর নিয়তির পট তোমার বগলে। ওটি তুমি এখন লুকাইয়া রাখিবে, এবং ক্রমে ক্রমে খুলিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া চলিতে থাকিবে। উহাতে কত

লঙ্কার উদয় ও লয়, কত দেবতার আবির্ভাব ও তিরোভাব, কত দানবের উত্থান ও পতন, কত কি লুক্কায়িত রহিয়াছে, কে বলিবে? যাহা হউক, তোমার পুঁজি তুমি লুকাইয়া রাখিতে চাও, রাখ, আমি উহা দেখিতে ইচ্ছা করি না। তুমি ভাল হও, মন্দ হও,—তুমি সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের নিদান, শান্তিনিকেতন অথবা প্রলয়ের অগ্রদূত, যাহাই হও না কেন, তুমি নূতন, অপরিচিত;—সুতরাং, তোমার পেটের কথা যেরূপই হউক, স্বাগত সম্ভাষণের বেলা তুমি বেস লেপাফাদুরস্ত ও সর্ব্বাংশেই ভাল;—সকলেরই প্রণম্য। পুরাতন, জুলিয়াস সীজর হইলেও, তাঁহার সীজরত্বের শেষ পরিণাম শোণিতসিক্তদেহে ধরাবলুণ্ঠন, আর নূতন ব্রুটাস, সেই সীজরের পদানুসারী, আজ্ঞাবাহী অনুচর হইলেও, নূতন বলিয়াই, প্রথম অভ্যর্থনায় তাঁহার জন্য উচ্চ মঞ্চের উন্নত আসন ও পুষ্পবৃষ্টির সানন্দ-সংবর্দ্ধন। নূতন বলিয়াই তোমার এত মহিমা। সকলে তোমাকে নমস্কার করিতেছে, আমিও তোমাকে নমস্কার করিলাম।

আমার সঙ্গে সঙ্গে, নবরঙ্গে নিত্যরঙ্গী, ভাবী গাজনের বাবু সন্ন্যাসীরাও, এই দেখ, কেমন ভক্তিভরে তোমাকে প্রণাম করিতেছেন। তুমি, তাঁহাদের নূতন ঢঙে, নূতন সঙ্কল্পে, নূতন গাজনের নূতন দীক্ষার নূতন মন্ত্র শুনিয়া মনে মনে হয়ত হাসিতেছ। এ সকলের, তুমি ভাবিতেছ, তুমি করাঙ্গুলিস্পর্শেই, সমস্ত উলট পালট করিয়া ফেলিবে; আমিও জানি, তুমি তাহা করিবে। কিন্তু ভাবের নূতনত্ব ফুরাইয়া গেলে, শেষে যেমনই হউক, এখন, তুমিও তাঁহাদিগের টাট্‌কা তয়েরি সদ্য গঠিত Resolution বা প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে দাঁড়াইলে, কথায় তাঁহাদিগের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। তাঁহাদিগের মৌখিক সঙ্কল্পের বোম্বার্ডমেণ্টে, তুমি নব-বর্ষত তুচ্ছ কথা, যুগযুগান্ত পর্য্যন্ত হার মানিয়া উড়িয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতেও যাইবে। বাঙ্গালী কথায় হঠিয়াছে, ইহা যেমন অশ্রুত-

পূর্ব্ব অসম্ভব কথা, বাসী বা পুরাতন সঙ্কল্পের শর্ত্ত রক্ষার্থ সে, কখনও মাথা ঘামাইয়াছে, ইহাও তেমনই অভূতপূর্ব্ব অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

এ সকল কথা থাকুক, ভাই নববর্ষ, তুমি আসিয়াছ, বেশ। আসিয়াছ বটে, কিন্তু এক পলও ত দাঁড়াইলে না, দাঁড়াইয়া কাহারও একটি কথাও ত শুনিলে না! যে-ই আসিলে, সে-ই চলিলে! তোমার চিরচলন্ত রথ, কোন কালেও কি থামিতে শিখে নাই? কিন্তু যাইতেছ কোথায়? পায়ে ধরি, কাকুতি করিয়া বলি, ভাই তুমি আমাকে বলিয়া দাও,—তুমি কোথায় যাও?—তোমার এ পথ কখনও ফুরাইবে কি,—তুমি এই মূর্ত্তিতে আবার কখনও ফিরিয়া আসিবে কি?

নববর্ষ অনেক দেখিয়াছি। জীবনের প্রারম্ভে, যে সকল নববর্ষ আসিতেন, তাঁহারা বড়ই প্রফুল্ল, বড়ই আনন্দময় ছিলেন। তাঁহারা হাসিয়া খেলিয়া চলিয়া যাইতেন। তাঁহাদের পরে, যাঁহারা আসিতেন, দেখিয়াছি, তাঁহাও খুব আমোদী, হাসী খুসী ও সৌখীন গোছের ছিলেন। তাঁহারা কত সুখের স্বপ্ন দেখাইতেন, কত অলকার চারু দৃশ্য খুলিয়া, কত নন্দন-কাননের সুরভি দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, কত কি দেখাইয়া, রঙ্গ করিয়া চলিয়া যাইতেন। কৈ তাঁহাদের কেহই ত আর ফিরিয়া আসিলেন না! এখন যে তোমরা আইস এবং চলিয়া যাও। তোমাদিগের কাহারও আকৃতি প্রকৃতিতে আর সে সময়ের সে ভাব দেখিতে পাই না। তোমাদিগের এক চক্ষে হাসি, আর এক চক্ষে কান্না, তোমাদিগের ললাটের একার্দ্ধে মেঘভাঙ্গা জ্যোৎস্না, অপরার্দ্ধে ঘনঘটার ঘোর অন্ধকার। যাহা হউক, তোমরাও ত একবার গেলে, আর কখন এমনই ভাবে ফিরিয়া আইস না!—ইহা কি?

তুমি যাইতেছ, আমরাও তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছি। কিন্তু কি বিচিত্র, তুমি কি কৌশলে বুঝি না, আমাদিগকে এড়াইয়া

চলিয়া যাইতেছ। তোমার পরবর্ত্তী নববর্ষকে অভিবাদন করিবার নিমিত্তই যেন, আমাদিগকে ফাকি দিয়া সরিয়া পড়িতেছ। আসিবা মাত্রই তিলে তিলে পলে পলে, তুমি তিল তিল করিয়া পুরাতন হইয়া যাও। তোমার এ গতি-রহস্য কে আমাকে বুঝাইয়া দিবে?

তুমি আসিলে। ঢঙের ঢাক ও রঙের গাজন থামিল। তুমি চৈত্রের তাণ্ডব উৎসব থামাইয়াই, আবার আগামী চৈত্রোৎসবকে যেন অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আহ্বান করিয়া, স্থিরপরিমিত পাদবিক্ষেপে চম্পট দিতেছ। তুমি চড়ক থামাইলে। পুলিশ তোমার সহায়। সে রাজদণ্ডের নিগড় দেখাইয়া বাণফোড়া বন্ধ করিল। চড়ক গাছে গোটা মানুষটাকে বাঁধিয়া ঢাকের তালে তালে ঘুরাণ রহিত করিয়া দিল। কিন্তু হায়, এই জাঁকের চড়ক থামিলেও, ঐ পাকের চড়ক;—ভবের গাজন থামিল কৈ?

মানুষের গবর্ণমেণ্ট, পিপীলিকার গৃহকন্না। জগৎ-যন্ত্রের অলড় ব্যবস্থা, গবর্ণমেণ্টের হুকুমে কখনও নিয়মিত হয় কি? উহা আইনের খবর লইল না। পুলিশের লাল পাগড়ির পানে দৃক্‌পাতও করিল না। ভবের গাজনে, ভবের অপরিবর্ত্তনীয় অমোঘ আজ্ঞা বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে গর্জ্জিল,—"দেপাক, দেপাক, দেপাক।" তুমি নববর্ষ সম্মুখে। তোমাকে দেখিয়াও সে অনুজ্ঞার সুর বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না। ঐ শুন, অসীম ব্যোমদেশ ভেদ করিয়া, ব্যোমকেশের এই মহাধ্বনি অবিশ্রান্ত উত্থিত হইতেছে,—"দেপাক দেপাক, দেপাক!" অন্য দূরে থাকুক, তুমিও ত, দেখিতেছি, ঐ হুহুঙ্কারেই সঙ্কুচিত ও জড়সড়। তুমিও ক্ষণকাল তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিলে না, 'বববম্ বম্' বলিয়া তুমিও যে ঐ দে পাকের অব্যর্থ ঘূর্ণপাকেই ঘুরিয়া চলিলে!

শুধু তুমি নহ। ঘুরিতেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্ত। ভবের গাজনে সকলেই বাণফোড়া সন্ন্যাসী,—সকলেই ঐ চিরচলন্ত চড়কে অহো-রাত্র ঘূর্ণ্যমান। অণু পরমাণু ঘুরিতেছে। অণু পরমাণু দল বাঁধিয়া,

মেঘ বা কুয়াসা সাজিয়া, বম্ ভোলানাথ বলিয়া 'দেপাকের' ডাকে গা ঢালিয়া দিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া নূতন ব্রহ্মাণ্ডের ভিত্তি পত্তন করিতেছে। পৃথিবী ও গ্রহ, চন্দ্র ও উপগ্রহ, এবং সূর্য্য ও তারা—বিশ্বকর্ম্মার অসীম কারখানার যতগুলি কল, সমস্তই চড়কের পাকে পড়িয়া অবিশ্রান্ত ঘূর্ণায়মান। চন্দ্র ও উপগ্রহগণ প্রদক্ষিণ করিতেছে, পৃথিবী ও গ্রহদিগকে। পৃথিবী ও গ্রহগণ, চাঁদের মণি গলে দোলাইয়া, প্রদক্ষিণ করিতেছে সূর্য্যকে, সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছেন, গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি সমস্ত আত্মপরিজনসহ, অন্য বৃহত্তর সূর্য্যকে এবং সে সূর্য্যও আবার তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতরকে। সেই শ্রেষ্ঠতর আবার কোন্ শ্রেষ্ঠতমকে, কে তাহা বলিবে? কিন্তু 'দেপাক, দেপাক, দেপাক' গাজনের এই ডাক অনন্তব্যোমব্যাপী, এই মহাধ্বনির তিলার্দ্ধের তরেও নিবৃত্তি নাই;—এই মহান্ ঘূর্ণপাকেরও কোন কালে বিরাম বা বিরতি নাই।

জড় ব্রহ্মাণ্ডনিচয় ব্যোম-পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদিগের গতি-পথ চির-নির্দ্দিষ্ট ও চির-স্থির। তাহাদিগের প্রদক্ষিণের লক্ষ্যও চিরতরেই একনিষ্ঠ। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গলগ্নকীট,—জীব-জগতের কথা অন্যরূপ। তাহাদিগের জড়তনু ঘুরিতে থাকে, আপন আপন ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের বিধিনির্দ্দিষ্ট গতিতে,—ভবের বিশ্ববিকাশক স্থিতিলয়বিধায়ক মঙ্গল গাজনে; আর তাহাদিগের মন ঘুরিয়া বেড়ায় অসংখ্য অনির্দ্দিষ্ট পথে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিভিন্ন চড়কে। কখন্ কে কাহার 'দেপাক দেপাক' ডাকে আত্মহারা হইয়া, কোন্ পাকে, কাহাকে প্রদক্ষিণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, বস্তুতই তাহার কোনরূপ নিশ্চয়তা নাই।

সাধারণতঃ গাজনে ঘূর্ণনের গতি, হয় দক্ষিণাবর্ত্ত, না হয়, বামাবর্ত্ত। এতদ্ভিন্ন উহাতে অন্য প্রকার গতি অসম্ভব। কিন্তু ভাবের চড়ক, এমনই বিচিত্র প্রণালীতে গঠিত যে, উহাতে ঘূর্ণনের যত

প্রকাশ গতি, কল্পনায় আইসে, তৎসমস্তই সম্ভবপর। উহার গতি কখনও দক্ষিণাবর্ত্ত, কখনও বামাবর্ত্ত, কখনও উর্দ্ধ হইতে অধঃপ্রসৃত, কখনও অধঃ হইতে উর্দ্ধ-উদ্গত। কখনও সমধরাতলের মসৃণ পথে তরলিত, আবার কখনও অসমধরাতলের অসমানবর্ত্মে তরঙ্গায়িত। ইহা ভিন্ন আরও কত প্রকারের আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন উহাতে অহো-রাত্র চলিতেছে, আপন আপন চড়কের ঘূর্ণপাকের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

ভাবের চড়কে, স্বাধীন ইচ্ছার স্বাস্থ্যকর গতি ও আধিপত্য আছে বলিয়া, অনেকেই মনে মনে গুমর করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে আধিপত্য একবারেই নাই। গাজনে যে গা ঢালিয়াছে, সেই প্রথম মনে ভাবিয়াছে,—"আমিই ভবের গাজনে ভাবের "মহাতমা" বা প্রধান সন্ন্যাসী।" কার্য্যকালে চড়কের পাকে পড়িলে আর এ ভাব রহে নাই; সকলেই আপনাকে অন্যের বাণফোড়া চেলা বুঝিয়া মাথা হেট করিয়া ছুটিয়াছে। বস্তুতঃ এ গাজনে, তুরঙ্গ, কুরঙ্গ ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বা মহিষ, যে যে মূর্ত্তিতে, চড়কে চড়ুক না কেন, কেহই পরকীয় শক্তির আয়ত্ত ও রজ্জু নিবদ্ধ ক্রীড়াপুত্তল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সুশীল ও সুন্দর যুবক, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খের ন্যায়, স্বগৃহে সযত্ন-রক্ষিত, এবং বংশের ভবিষ্যৎ আশারূপে চিরসংবর্দ্ধিত ও সম্মানিত। যুবক কৃতবিদ্য, বিদ্যানুরক্ত ও সারস্বত-সাধনায় আজন্মদীক্ষিত। জ্ঞানতৃষ্ণার ভাবময় আবেগে, আশৈশব আবর্ত্তিত রহিয়া, যুবক এই এক বিশেষ ভাবে পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। আজি অকস্মাৎ কোন্ মদিরেক্ষণার মদির নয়ন, তাঁহার নয়নপথে, কটাক্ষের বিলোল চমকে কি কহিয়া গেল, যুবক আর স্থির থাকিতে পারিল না! ভাবের চড়ক "বম্ ভোলা" বলিয়া বিপরীত আবর্ত্তে ঘুরিতে লাগিল। সেই চক্ষু ও সেই কটাক্ষ যেন, তাহার সম্মুখে আসিয়া, বারংবার করতালি

দিয়া, নাচিয়া নাচিয়া গাইতে লাগিল,—"দে পাক, দে পাক, দে পাক।"

জগৎ ঘুরিয়া গেল। যুবক প্রথম ভুলিল, তাহার সেই সারস্বত-সাধনার সঞ্জীবন- মন্ত্র। তাহার পরে নিমীলিত হইল, জ্ঞান-নেত্রের স্ফুরন্ত দৃষ্টি। ক্রমে ঘূর্ণপাকে খসিয়া পড়িল হাতের পুঁথি; নিবিয়া গেল প্রতিভার সেই প্রফুল্ল জ্যোতি; অদৃশ্য হইল, পিতা মাতা, ভাই, বন্ধু প্রভৃতি চিরপ্রিয় গুরুজন ও পরিজনের চির প্রীতিকর পবিত্রস্মৃতি; এবং অবশেষে উড়িয়া গেল,—ভবিষ্যতের আশা, বংশ-গৌরব ও আত্মমর্য্যাদা। কিন্তু চড়কের সেই, "দে পাক্ দে পাক্" আর থামিল না। এইরূপ কটাক্ষের ঘূর্ণপাকে, কত সতী পতি-প্রদক্ষিণব্রত পরিত্যাগ করিয়া বিপাকের পাকে অতলে ডুবিয়া যায়! কত সোনার সংসার ছারক্ষার হয়! কত গ্রহ কক্ষচ্যুত ও কত দেবতা স্বর্গভ্রষ্ট হন। কে তাহা গণনা করিয়া দেখিয়াছে?

নানা শাস্ত্রে অধীতী প্রগাঢ় পণ্ডিত, কাঙ্গালের কুটীরে বিদ্যা-দানের সদাব্রত খুলিয়া, বন-ফল-মূলে মুনি-জীবন যাপন করিতেছিলেন। কোথা হইতে বিলাস-বিলোলা লালসা আসিয়া, তাঁহার তপঃক্লিষ্ট জীর্ণ পিঞ্জরে উঁকি দিয়া, তাঁহার ঐ দারিদ্র্যলাঞ্ছনের প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গেল। অভাবের পীড়ন দুঃখ হইলেও, এতদিন অন্য প্রকারে গৌরবের আস্পদস্বরূপ ছিল, সহসা দারিদ্র্যের সে গৌরব ভাঙ্গিয়া পড়িল। যে হাতের আয়ত্ত-চিহ্ন,—লোহার বলয় খসিয়া পড়িলে, রাজধানী নবদ্বীপ আঁধার হইত, সেই হাত আজি, সেই লোহার বলয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, সুবর্ণ বলয়ের জন্য অধীর হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ আর তাঁহার পাণ্ডিত্যের পুঁজি লইয়া স্থির রহিতে পারিলেন না। ঋষিত্ব ও আচার্য্যত্ব দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, ভাবের চড়কে নূতন পাকে ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন। এ ঘূর্ণাবর্ত্তে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কোথায় পড়িয়া

রহিল;—তিনি অসম ধরাতলের অসমবর্ত্মে তরঙ্গায়িত গতিতে ধনীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন। নূতন চড়কের নূতন পাকে, যেন চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া, বীণাপাণি বাণীও, তাঁহার কণ্ঠে নটীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বসিতে কিছু মাত্র লজ্জা অনুভব করিলেন না। ব্রাহ্মণ যৎকিঞ্চিৎ রজত কাঞ্চনের প্রত্যাশায়, কখনও স্বচ্ছন্দ-বিলাসী মর্কটের মুখভঙ্গিতে রামচন্দ্রের শ্যামকান্তি দেখিয়া ভাবের ফুলে স্তুতির মালা গাঁথিলেন। কখনও শাইলকের শোণিতশোষী নীরব গাম্ভীর্য্যে যুধিষ্ঠিরের প্রশান্ত ঔদার্য্য অনুভব করিয়া গান্ধার গ্রামে তান ধরিলেন। এবং কখনও বা শুণ্ডিকালয়ের গণ্ডী পার হইয়া, সমাজে অপাংক্তেয় ও বিড়ম্বিত হইয়া পড়িলেন!

কেহ স্ত্রী, পুত্র, পরিজন লইয়া সুখের সংসার পাতিয়া, ভবের গাজনে স্বভাবের আবর্ত্তে ঘুরিতেছিল। সহসা গুরুজি আসিয়া ভবের চড়কে নূতন ভাবে, 'দে পাক দে পাক' হাকিলেন, আর অমনি, ঐ শান্ত, দান্ত গৃহস্থ পরিজনের অশ্রুনীরে অভিষিক্ত হইয়া দণ্ড কমণ্ডলু করে মহাবর্ত্তে ঝম্প প্রদান করিয়া, কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল!

কেহ আজন্ম সন্ন্যাসী। কাহার কি যেন কুহকে তাহার ছিন্ন কন্থা ও জীর্ণ বহির্ব্বাসের ভিতরে সহসা বাসনার অনল জ্বলিয়া উঠিল। সে অমনি কৌপীনের গ্রন্থিতে কু-জ্ঞান, করঙ্গে কু-রঙ্গ ও ভিক্ষার ঝুলিতে ফুলধনু চাপিয়া রাখিয়া, নূতন ভাবের নূতন চড়কে, গাল বাজাইয়া গা ঢালিয়া দিল।

যদি চক্ষু থাকে, চাহিয়া দেখ, ভাবের চড়কে, মনোজগতে অহোরাত্র কিরূপ বিপ্লবজনক বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। ইহা দেখিলে, তোমার ঐ নিমেষশূন্য নির্ভীক চক্ষেও তাক লাগিবে। কখনও কমনীয়কান্তি কাম, কখনও ক্রূরকটাক্ষ আরক্তনেত্র ক্রোধ, কখনও দৃক্‌পাতশূন্য গম্ভীরবদন অভিমান, কখনও ব্যাদিতবদন লেলিহান-

জিহ্বা লোভ, কখনও ভারাক্রান্ত মুদিতনেত্র মোহ, যাহার যখন যেখানে সুবিধা হইতেছে, সেই সেখানে "দে পাক, দে পাক দে পাক" এই সাধা মন্ত্র হাকিয়া, ভাবের চড়কে ভিন্ন ভিন্ন আবর্ত্তে বাণবিদ্ধ জীবদিগকে ইচ্ছা মত ঘুরাইয়া লইতেছে। ভাবের চড়কে কখনও আমের মুকুলে ফলিতেছে মাকাল। কখনও পদ্মের কোরকে ফুটিতেছে সুঁদী। আবার কখনও করিণীর গর্ভে ভেক্ ও ভেকের ডিম্বে বাসুকি। এ ঘূর্ণন, এ আবর্ত্ত বস্তুতঃ সর্ব্বনাশা ভয়ঙ্কর তূর্ণড অপেক্ষাও শতগুণে ভয়াবহ।

ভবের গাজনে, ভাবের এই মহা চড়কে তুমি ঘুরিতেছ; ক্ষুদ্র কীট আমি, আমিও অহোরাত্র ঘুরিতেছি। কখন কোন্ পাকে কাহার চড়কে, আমার উদ্দেশ্যে 'দে পাক দে পাক' ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, আমি কখন কাহার বাণফোড়া সন্ন্যাসী সাজিয়া, কোন্ আবর্ত্তে বিবর্ত্তিত ও বিড়ম্বিত হইতেছি, বুঝিতেছি না। সখে, নববর্ষ, তুমি আমাকে ইহা বুঝাইয়া দিবে কি?

নববর্ষ, দেব, তুমি সামান্য নও। তুমি মহাকালের সন্তান; কাল তোমার নাম। তোমার গলদেশে, স্যমন্তক ও মরকতের পর পর বিন্যাসে গাঁথা মণি-মালার ন্যায়, আলোক ও আঁধার,—দিবস ও রজনীর বিচিত্র মাল্য দোদুল্যমান। তোমার এক অঙ্গে নীরব গাম্ভীর্য্যের গভীর স্তম্ভন; অন্য অঙ্গে ঝড়, ঝটিকা, বজ্র, বিদ্যুতের রোমাঞ্চকর ভীমগর্জ্জন; এক দিকে প্লাবনের প্রলয়-কল্লোল ও ভূকম্পের ভীষণ হিল্লোল; অন্য দিকে প্রগাঢ় সুষুপ্তির মধুর শান্তি বা বিনোদ-বিরাম। তোমার এক অঙ্গে নিদাঘের জ্বালা, অন্য অঙ্গে শিশিরের শীত সঙ্কোচ; এক দিকে শরতের অমল জ্যোৎস্না, অন্য দিকে বসন্তের প্রফুল্ল পদ্ম। হে বহুরূপিন্, হে অনন্তশক্তিধর দেব, তোমাকে নমস্কার করি।

তুমি শুধু ঢাক বাজাইয়া আইস, এবং ঢাক বাজাইয়া চলিয়া যাও,

যে স্থূলবুদ্ধি এই তক বুঝিয়া "ভোঃ স্বাগত ভবান্" বলিয়া অভ্যর্থনার রীতি-রক্ষা করিয়াই নিশ্চিন্ত হয়, সে অর্ব্বাচীনের তথাবিধ শান্তি, প্রকৃতির স্তনন্ধয় শিশু অবিকশিত অপরিস্ফুট জীবের স্পৃহণীয় হইলেও, মনুষ্যের যোগ্য উপভোগ্য নহে। তুমি মহাকালের অঙ্গনিবদ্ধ সামান্য একটি বুদ্‌বুদ্ সত্য, কিন্তু মানুষের পক্ষে অসামান্য। তোমার ঐ পরিমিত আয়তনে কত জাপের অভিনব বিজয়-বিষাণ নিনাদিত ও কত বুরের বীরগর্ব্ব চূর্ণীকৃত হয়। কত কুরুক্ষেত্র, প্রলয় হুঙ্কারে তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া, শ্মশানের বিষাদ-নিস্তব্ধতায় ঢলিয়া পড়ে! কত সাহারা, সাগর, কত সাগর প্রান্তরের শ্যামকান্তিতে পরিণতি পাইয়া ইতিহাসের অঙ্গে উপন্যাসের প্রকরণ বা পরিচ্ছেদ গাঁথিয়া দেয়! তুমি সামান্য নও, তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার।

কিন্তু একটি নিবেদন, তুমি মহাশক্তির সন্তান, শক্তিমান্। তুমি ইচ্ছা করিলে, না করিতে পার কি? তুমি, আমার সঙ্গে হাসিয়া, খেলিয়া, আমোদে প্রমুদিত হইয়া, পলে পলে আমার পরমায়ুধন হরণ করিয়া লইয়া যাও। তোমার মত সন্ধানী চোর জগতে দুটি সম্ভবে না। তুমি শুধু তস্কর নও; তুমি সময় সময়, দস্যুর ন্যায়, রোগ ও শোকের সাহায্যে, আমার সেই ক্ষুদ্র তহবিলের উপর বাটপারি করিতেও সঙ্কুচিত হও না। আমার শত স্তবস্তুতি, প্রণামপ্রণতি, আরাধনা ও আরতিতেও তোমার ঐ বজ্রকঠোর ব্রতসঙ্কল্পের অন্যথা ঘটাইতে পারে না। কিন্তু তুমি এক দিকে যেমন ভাঙ্গ, আর এক দিকে আবার তেমনই গড়। তুমি শুক্রশোণিত যোগে শিশু দেহ গড়াইয়া, তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর। শিশুকে কিশোর ও কিশোরকে যৌবনের কান্তিতে বিলসিত করিয়া, পূর্ণাবয়বে মানুষ করিয়া তুল। দেহের উপর তোমার এত আধিপত্য, মনের উপর কি তোমার কোনই কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব নাই?—এত পার, মনের দুটি পটল খুলিয়া দিয়া অমানুষকে মানুষ বানাইতে

পার না কি? আমি ভাবের চড়কে, আবেগের পর আবেগের উচ্ছ্বাসে, যার তার হাতে বাণফোড়া সন্ন্যাসী বনিয়া, অলক্ষ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অধঃপাতের পথে গড়াইয়া পড়ি, তুমি চক্ষে দেখ, তোমার চন্দ্র ও সূর্য্যকে আমার কৃতকর্ম্মের সাক্ষী করিয়া রাখ, অথচ আমাকে এ বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত একবারও একটু যত্ন কর না। এ তোমার কেমন স্বভাব, দেব?

আমি তোমার আশ্রিত, তোমার পদানত, তোমারই তরঙ্গে ভাসমান মানবতরুর অপক্ব ফল। পায়ে ধরি, কাকুতি করিয়া বলি, নববর্ষ যদি আসিয়াছ, এবার আমার এই উপকারটুকু করিয়া যাও,—তোমার ঐ পদ্মহস্ত বুলাইয়া আমার আঁধলা নয়নের দৃষ্টি খুলিয়া দাও। আমি ভাবের চড়কে অপথে অনিচ্ছায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। তুমি যদি আসিয়াছ, দয়া করিয়া, ঐ সৌর জগতের ন্যায়, আমার জন্যও একটা চিরস্থির আবর্ত্ত-বর্ত্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া যাও। যে ধ্রুব নক্ষত্র মানব জীবনের কেন্দ্র, মানব প্রাণ যে অমলজ্যোতি, সুখশীতল উজ্জল প্রভার জন্য চির-লালায়িত, দেখাইয়া দাও, আমার সেই ধ্রুবতারা,—সেই চিরপ্রস্ফুট প্রফুল্ল সূর্য্য কোথায়। বলিয়া যাও, কোন্ পথে কি ভাবে ঘুরিলে, আমার সেই সূর্য্যকেই প্রদক্ষিণ করা হইবে। এই কর, আমি যেন আর ডানে বাঁয়ে হেলিয়া, জোনাকি বা আলেয়াকে সূর্য্য ভ্রম করিয়া, বিপাকে আবর্ত্তিত ও জীবনে বিড়ম্বিত না হই। নববর্ষ, আমার এই সামান্য উপকারটুকু তুমি করিবে কি? তুমি এই উপকার করিয়া, যদি ইচ্ছা হয়, আমার আয়ুর ভাণ্ডার একবারেই নিঃশেষে লুটিয়া লইয়া যাও, আমি কোন আপত্তি করিব না; বরং দুই হাত তুলিয়া প্রাণ ভরিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব;—আর বম্ ভোলানাথ বলিয়া, ভবের গাজনে, আমার সেই প্রাণদেবতা,—ভোলানাথেরই পানে চক্ষু রাখিয়া মনের আনন্দে 'দেপাক দেপাক দেপাক'

হাকিয়া, চিরকালের তরে, আপনাকে জগন্মঙ্গল্য শৈব-উৎসবে উৎসর্গ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইব।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু।

মানসী-প্রতিমা।

অয়ি শুভে, আজি তোমা চাহি জাগাইতে
তোমার নিভৃত-কক্ষে পশি ভক্তি ভরে,
সুপ্ত ভাবে কেন্দ্র রূপে বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের
বিরাজিছ যথা তুমি চেতনা-রূপিণী
অন্তরাত্মা মাঝে, স্নেহ প্রেম বাৎসল্য
প্রণয়ে গঠিত তুমি তাই অশরীরা,
সৌন্দর্য্যের রাণী তুমি,—তব রূপে তাই
বিশ্ব উদ্ভাসিয়া উঠে, বুঝি এ কারণে
ভালবাসা সৌন্দর্য্যের অভেদ মিলন
জ্ঞান সঙ্গে জ্ঞেয় যথা; সান্ত্বনা বচনে
লাঞ্ছনার কশাঘাতে জীবন সংগ্রামে
শ্রান্ত মানবের প্রাণে কভু দাও তুমি
মাতৃস্নেহ, বন্ধু-প্রেম, দাম্পত্য-প্রণয়,
শীতল প্রলেপ আহা! নমি তোমা দেবি,
দাও শক্তি পারি যেন অনন্তের তানে
মিশাইতে নিজ তান; পঞ্চভূত-কোলে
নশ্বর এ দেহ যবে যাইবে মিশিয়া,
তুমি শুভ্র জ্যোতিঃরূপে স্নিগ্ধ আলো ঢালি
অজ্ঞেয় সত্যের পথে ভাসিতে ভাসিতে
মিশিও আনন্দে মহাজ্যোতির্ম্ময় কোলে।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

বাক্‌-সংযম।

আমি ইচ্ছা করি কথা কহিব না; ইচ্ছা করি, বিনা কথায় সুখ-লাভ করিব। কত প্রতিজ্ঞা করি, কেন করি জানি না, কিন্তু একি প্রমাদ! কোথা হইতে কিসের এক স্রোত আসিয়া, আমার সে প্রতিজ্ঞার বালুকা-সেতু ভাসাইয়া লইয়া যায়। শেষে মনে হয়—পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার ভাষাগুলিও বাক্‌-সংযমের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। শেষে দেখি, সেই বালুকা-সেতুও ঐ প্রবাহে মিশিয়া গিয়াছে, মিশিয়া প্রবাহকে আরও কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। মনে ভাবি কেন এমন হয়? দেখি আমি বড় তরল। তরল জল গভীর স্থানে পঁহুছিলেই কতক্ষণ ভীষণ আবর্ত্ত তুলিয়া, কল্লোল-কোলাহলে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া, আপনারই প্রবাহে পতিত পদার্থ সমূহকে আপনারই আবর্ত্তে আবর্ত্তিত করিয়া, আপনারই অতল স্পর্শ আশ্রয় স্থানের দিকে লইয়া যাইতে যাইতে, আবার পূর্ব্ব প্রবাহের পূর্ব্ব আকর্ষণে নিম্ন মুখে চলিয়া যায়। মনে হয়, কেন আমি এমন তরল হইলাম, কেন এমন নিম্নমুখীন প্রবাহে ছুটিলাম, এ প্রবাহে কি জোয়ার নাই? শুধুই ভাটা? মনে হইল, গাঢ় বস্তুর শিথিল অবস্থাই সৃষ্টি; জমাট বরফের শিথিলতাই জল, গম্ভীরতার বিচ্যুতিই তরলতা। মনে হইল, দৃশ্য পদার্থের সৌন্দর্য্যের অনুভবে, দৃশ্য বস্তুর অনৈসর্গিক শোভনাধ্যাসে এক দিন এই শিথিলতা, এই বিচ্যুতি জাগিয়াছিল, সেই হইতে সৃষ্টির নিম্নমুখীন প্রবাহ ছুটিয়াছে। শোভনাধ্যাসে জাগতিক ভাব, ভাবের তরল অবস্থাই ভাষা। আদি প্রেমিকের আদি ভাষা ওঙ্কার। জীব জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়, ইন্দ্রিয়ের স্বস্ব বিষয়ের অনুভূতিতে শোভনাধ্যাসের সাহায্যে হৃদয়ের ভিতরে একরূপ সৌন্দর্য্যের ঘনীভূত অবস্থা উপস্থিত হয়। বিষয় কামুকের

কামনার উত্তেজনার উত্তাপে সেই বরফবৎ জমাট ভাবরাশি ক্রমে তরল হইয়া ভাষা হয়। ক্রমে ভাব ফুরাইতে থাকে, ভাষাও কমিতে থাকে। বস্তু দর্শনের বিরাম নাই, ইন্দ্রিয় সুপ্ত, তথাপি মনের চিন্তার বিরাম নাই, তাই নিত্য নূতন ভাবের সৃষ্টি, তাই নিত্য নূতন ভাষার সৃষ্টি। সৃষ্টিতে 'কেন ?' নাই,—স্বভাবের আজ্ঞা। বাসনা অনাদি, তাই স্বভাব বা প্রকৃতিও অনাদি, তাই সৃষ্টিও অনাদি। তাই 'কেন ?' এই প্রশ্নের অবসর না দিয়াই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ানুভূতি, মনের স্মৃতি ও চিন্তা, শোভনাধ্যাস ভাবের আবির্ভাব, ভাষার সৃষ্টি। আবার মনে হয়, জমাট বরফ, তরল জল, প্রবাহে পরিণতি, সমুদ্র-সঙ্গম, বরফের এই কএক অবস্থা। সব ছাড়িয়া সমুদ্র-সঙ্গম দেখ,—বরফ নাই, সেই পূর্ব্বের তরল জলের বিভিন্ন সত্তা নাই, প্রবাহের বেগ নাই, সমস্তই আত্মহারা হইয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। তখন কল্লোল কোলাহল নাই, আবর্ত্ত নাই, জলকণাসমূহ জল-নিধির স্বরূপে মিশিয়া শান্ত হইয়া গিয়াছে। একদিন সূর্য্যদেব যে ক্ষুদ্র জলকণাকে পিতার ক্রোড় হইতে কর-সংযোগে উঠাইয়া লইয়া মেঘের ক্রোড়ে রাখিয়াছিলেন, মেঘ আবার হিমালয়ের ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়াছিলেন, সেই ক্ষুদ্র জলকণা প্রাণের জ্বালায় তরল হইয়া মর্ম্মভেদী কোলাহলে ছুটিয়া আজ পিতার ক্রোড়ে পুনরায় মিশিয়া শান্ত হইয়াছে। জলের অবস্থাও যেমন, ভাষার অবস্থাও কতকটা ঠিক সেইরূপ। যে স্থান হইতে ভাষার সৃষ্টি, যাহা ভাষার প্রধান আশ্রয়, তাহার ক্রোড়ে ভাষা স্থাপন কর, ভাষা নীরব হইবে, নীরবে ভাবরূপে তোমার অশান্তি দূর করিবে, নতুবা কোন্ শক্তি তোমার আছে, তুমি বিরহিণী ভাষাকে সাজাইয়া গুজাইয়া সন্তুষ্ট রাখিতে পার ? তুমি মনে করিবে, ও তোমার মত নির্জ্জীব লোকে মনে করিবে, ভাষা বেস জিল ; কিন্তু ভাষা কি মনে করিবে, তাহার সাজসজ্জা হইল ?

হৃদয়বান্ কি মনে করিবে ভাষা সাজিল ? বিরহে সাজগোজ ভাল লাগে না। সাজগোজে হৃদয়ের জ্বালা দূর হয় না, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় না। "সন্তাপ এবোহন্তর দাহহেতুর্নতক্রুবো ন ব্যজনাপনেয়ঃ" ভাষার এই অন্তর্দ্দাহের সন্তাপ বাহিরের ব্যজন-বীজনে দূর হইবার নহে। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না করিয়া ভাষা বাহির কর, নির্জ্জীব দেখাইবে ; নির্জ্জীব ভাষায় প্রাণ শীতল হয় না। আবার সেই সমুদ্রের দিকে লক্ষ্য কর—কি বিশাল সমুদ্র! উপরের পূর্ণচন্দ্র নিজের বিশাল বক্ষে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া সেই মহীয়ান্ সমুদ্রে যখন ভাব উপস্থিত হয়, কি হয় তখন ? বিশালবক্ষ আপনাতেই আপনি বিস্ফারিত হইয়া উঠে ; কি এক সুখের ভাবে আপনার হৃদয় নাচিতে থাকে, তীর অতিক্রম করে না, হৃদয়ের বেগ সময়ে হৃদয়েই লুকাইয়া যায়। মহীয়ানের স্বভাব এই। ক্ষুদ্র আমি, ক্ষুদ্র আমার ভাব, তাই নদীর মত উদ্বেলিত হইয়া পড়ে, তাই ভাব ভাষা হইয়া যায়। সসীম বিষয় লইয়া ভাব, তাই ভাবও ফুরায়, ভাষাও ফুরায়। আবার বিষয় সম্বন্ধ, আবার ভাব, আবার ভাষা হয় ;—হয়, থাকে, যায়। আমি মনে করি, ভাষাকে কত নিত্য নূতন শোভায় সাজাইয়া বাহির করিব, কিন্তু মূর্খ আমি, বিহগ-শাবককে সোনার পিঞ্জরে নিত্য নূতন শোভায় সাজাইয়া সন্তুষ্ট করিয়া, তাহার মাতৃ-ক্রোড়ের সুখ ভুলাইয়া দিতে চাই। "হা হা হন্ত তথাপি জন্ম বিটপি-ক্রোড়ে মনোধাবতি" বিহগ শিশুর মন যে জন্মভূমিতে যাইবার জন্য পাগল, তাহা আমি বুঝি না। আমি বিহগ-শিশুর সুমিষ্ট স্বর শুনিতে চাই, বিহগ-শিশুর নিকট মানবোচিত শব্দ চাই, তাহা পাই না, কেবল পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষি-শাবকের আর্ত্তস্বর শুনিয়া বিরক্ত হই, তাই মনে হয়, বিহঙ্গ-শিশুর নিকট আর্ত্তনাদের পরিবর্ত্তে মানব-ভাষা প্রার্থনা করিতে হইলে, প্রথম তাহাকে "রাম রাম" শিখাও, তোমার বিরক্তি আসিবে না। তার পর রাম রাম শিখাইয়া "বুলি" ধরাইয়া ছা

দাও। বিহগ-শিশু "রাম রাম" শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রতিধ্বনিকেও 'রাম রাম' শিখাইয়া সকলের শ্রবণ মন পুলকিত করিয়া শেষে আপন জন্মভূমিতে যাইয়া এতকালের দুঃখ ভুলিবে; মাতৃ-ক্রোড়ে লুকাইয়া নীরবে পরমানন্দ লাভ করিবে। যাহা চাও, তাহাই পাইবে, নতুবা তোমার বাক্-সংযম অসম্ভব।

শ্রীকেদারনাথ কাব্য সাঙ্খ্যতীর্থ।

কুমারসম্ভব।

দ্বিতীয়সর্গ।

(১)

এ হেন সময়, ইন্দ্রে অগ্রে করি
ত্রিদিব নিবাসী যত,—
তারকা-পীড়নে নিপীড়িত অতি,
ব্রহ্মলোকে সমাগত।

(২)

মলিন-মুখশ্রী সে সুর-সমাজে
আবির্ভিলা পদ্মযোনি,—
নিমীলিত-পদ্ম সরোবরে যথা
ভাতে প্রাতে দিনমণি!

(৩)

তবে সে বাগীশে,— সর্ব্বস্রষ্টা যিনি,—
সর্ব্বতঃ বদন যার,
অর্থযুত বাক্যে, তাহারা সকলে
স্তবে করি নমস্কার।—

(৪)

"আদিতে সৃষ্টির এক আত্মা তুমি;
গুণত্রয় ভাগতরে,
রূপভেদ শেষে, লভিলে, ত্রিমূর্ত্তে,
নমি তোমা ভক্তিভরে।

(৫)

হে জনমহীন, যে অমোঘ বীজ
তুমি নিক্ষেপিলে জলে,
তা হ'তে উদ্ভূত বিশ্ব চরাচর,—
প্রভব তোমায় বলে।

(৬)

প্রকাশিয়ে একা, তিন অবস্থায়,
আপন মহিমা তুমি,
হ'লে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের আর
একই কারণ-ভূমি।

(৭)

সৃজন-ইচ্ছায় ভিন্নতনু তুমি
পুং স্ত্রী,—তব ভাগদ্বয়।
এ উৎপদ্যমান সৃষ্টির তারাই
জনক জননী হয়।

(৮)

আপন কালের পরিমাপে তব
বিভক্ত দিবস যামি;—
তব জাগরণে জাগ্রত জগত,
প্রলয়, ঘুমালে তুমি।

(৯)

জগতের আদি তুমি হে অনাদি,
জগদীশ নিরীশ্বর;

আপনি অযোনি, যোনি জগতের,
নিরন্ত, অন্তকবর।

(১০)

আত্মজ্ঞান যোগে, জান আপনাকে;
নিজেই নিজেরে গড়।
আপন সামর্থ্যে আপনাতে পুনঃ
আপনাকে লয় কর।

(১১)

তুমি সূক্ষ্ম, স্থূল, লঘু, গুরু, দ্রব,
সংযোগ-কঠিন তুমি,
তুমি ব্যক্তাব্যক্ত *; অণিমাদি ভাব
তব ইচ্ছা অনুগামী।

(১২)

উদাত্তাদি তিন স্বরে উচ্চারণ,
† প্রণবে আরম্ভ যার,
যে বেদের কর্ম্ম,— যজ্ঞ, ফল,—স্বর্গ,
তুমি হে প্রণেতা ‡ তার।

(১৩)

পুরুষের তরে নিয়োজিতা, লোকে
প্রকৃতি তোমারে ভণে,
প্রকৃতির পুনঃ নির্লিপ্ত দর্শক
পুরুষো তোমাই জানে।

---

* কার্য্য ও কারণ। † ওঁকার।

‡ কেহ কেহ কারণও বলেন।

(১৪)

পিতৃদেরো পিতা তুমি, ভগবন্,
শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠতর,
স্রষ্টাদেরো স্রষ্টা, দেবেরো দেবতা
তুমি পরম ঈশ্বর।

(১৫)

তুমি হব্য, হোতা, তুমি ভোজ্য, ভোক্তা,
তুমি নিত্য অনশ্বর,
তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ধ্যানের সে ধন,
তুমি ধ্যাতা ধ্যানপর।

ক্রমশঃ।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

(মাসিক সাহিত্য)।

সাহিত্য। মাঘ। "সাহিত্য সেবকের ডায়েরী" পূর্ব্ববৎ এক-টানা সুরে চলিয়াছে,—না আছে জোয়ার না আছে ভাঁটা। 'জগৎ জীবনের মনসার গীত' নামক প্রবন্ধে প্রচ্ছন্ননামা কবি জগৎ জীবন ও তৎপ্রণীত মনসার গীতের আলোচনা করা হইয়াছে। "শক্তি" একটি সুন্দর কবিতা। শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর খেলা নামক কবিতাটিও মন্দ হয় নাই, ধীবর কন্যার কণ্ঠে প্রবালের মালা দেখিয়া মনে হয়, ধীবরের অবস্থা ভাল ছিল, কেবল অভ্যাসের দোষ ছাড়াইতে না পারিয়াই রৌদ্র বৃষ্টিতে কষ্ট করিয়া মৎস্য ধরিত। শ্রীযুক্ত আবদুলকরিম "নূতন মুসলমান বৈষ্ণব কবি" প্রবন্ধে মুসলমান কবি লালবেগের নাম মাত্র পরিচয় দিয়াছেন।

"সেকালে অকাল" প্রবন্ধের লেখক বিবিধ ঐতিহাসিক প্রমাণাদি দ্বারা দেখাইয়াছেন, দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষের নিত্য সহচর। এমন কি, ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান সম্রাট্ আকবরের রাজত্ব কালও দুর্ভিক্ষের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। ভারতের রামরাজ্যে দুর্ভিক্ষ হইত কি না, লেখক সে কথা কহেন নাই।

"ঋণমুক্ত" একটি গল্প, সাহিত্যে প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত নহে। সাহিত্য-সম্পাদক এই সংখ্যায় মাসিক সাহিত্য সমালোচনা উপলক্ষে গল্পলেখকদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, লেখক তাহা পড়িয়া দেখিবেন। নিজের ঘরের জিনিস বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। "অনুমান ও হনুমান" একটি দার্শনিক হেঁয়ালী। আমরা রস গ্রহণ করিতে পারিলাম না। "মহম্মদ" স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যালের অসমাপ্ত রচনা। পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ইহা একটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ হইত, বলিয়াই মনে হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর "শঙ্করদেব" প্রাচীন আসামী কবিশঙ্কর ও তাহার কবিতার পরিচায়ক। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ঘোষের 'মধুর মরণ' একটি সনেট। কবিতার প্রতিপাদ্য কি, বুঝিতে পারিলাম না। সে জন্য কবি চিন্তিত হইবেন না। না বুঝিতে পারাই যে আজি কালিকার ভাল কবিতার সার্টিফিকেট। "শব্দনি তাৎপর্য্য অর্থনি কোচিন্তা?"

নবপ্রতিভা। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ। নবপ্রতিভার সর্ব্ব প্রথমেই কবিতাকুঞ্জ; কিন্তু কুঞ্জে উল্লেখযোগ্য কবিতা দৃষ্ট হইল না। কবিতা নির্ব্বাচনে সম্পাদকের আরও একটু অবধান প্রার্থনীয়। "হিন্দুজ্যোতিষ" জ্যোতিষ শাস্ত্রে যখন বিন্দুমাত্রও অধিকার নাই, তখন মনে করিয়াছিলাম, এ প্রবন্ধ লইয়া নাড়াচাড়া করা আমাদের ক্ষমতার বাহিরে। পড়িয়া দেখিলাম, কতকগুলি মতের সংগ্রহ করা ভিন্ন এ প্রবন্ধে লেখক বিন্দুমাত্র নিজস্ব দান করেন নাই। আমার কথা,—লেখকের গল্প লিখা উদ্দেশ্য, না গল্পচ্ছলে

একটি আধ্যাত্মিক কথার ব্যাখ্যা করিয়া নবপ্রতিভার পাঠকবর্গকে উপহার দিলেন বুঝিলাম না।

"ভগ্নহৃদয়" একটি প্রাণহীন, গল্প। শুধু বিশেষত্ব রক্ষা করিলেই গল্প লেখা সার্থক হয় না। রঘুনাথ শিরোমণি প্রবন্ধে পুরাতন কথার চর্ব্বিতচর্ব্বণ। রঘুনাথ শিরোমণির জীবনবৃত্তান্ত শিক্ষিত লোকমাত্রেই অবগত আছেন, নূতন কথা না থাকিলে, এরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া লাভ কি?

"জিউ-জিৎসু" বাঙ্গালী মাত্রেরই পাঠকরা উচিত। লেখক আর একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, জিউজিৎসু প্রণালীর বিস্তারিত বিবরণ সঙ্কলিত করিয়া দিলে, বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইতেন।

'তেলিয়া গড়' একটি সুখপাঠ্য রচনা। আমরা পড়িয়া তৃপ্ত হইলাম।

"অকাল বোধন" অকাল বোধনের সমালোচনা সম্বন্ধেও আজি কালি অকাল।" কারণ গল্পটি ক্রমপ্রকাশ্য, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ চলিতেছে।

বঙ্গদর্শন। মাঘ ও ফাল্গুন। ধূমকেতুতে, সময় সময়, বান্ধব ও বঙ্গদর্শনের সমালোচনা হয়। ধূমকেতুতে বান্ধব ও বঙ্গদর্শনের সমালোচনা! কেহ এইমাত্র কহিয়াই বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠেন; কেহ চক্ষু রাঙাইয়া দুটা কটুকথা শুনাইতেও ছাড়েন না; এবং কেহ কেহ,—"অর্ব্বাচীন ধূমকেতুর পক্ষে ইহা নিতান্তই বেয়াদবী বা ধৃষ্টতা, গম্ভীর ভাবে এই উক্তি করিয়া, যেন একটু মুরব্বিয়ানা করিয়া লইতেই ভাল বাসেন। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, সমালোচনায়ও কি আবার অধিকারীভেদে অধিকারভেদ বা জুরিজ্ডিকশনের কোন তারতম্য আছে? যদি তাহা থাকিয়া থাকে, তবে বড়ই বিভ্রাটের কথা। কোন্ সাহিত্য বা সংবাদপত্রের সমালোচনার জুরিজ্ডিকশন কোন্ পর্য্যন্ত, এই কুলপঞ্জিকা রচনা বা সমালোচনার এই

মেল-বন্ধন সহজ কথা নহে। ইহাতে একদিকে বল্লালের রাজশক্তি ও অন্যদিকে দেবীবরের মনঃশক্তির প্রয়োজন। বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্রে তেমন বল্লাল বা দেবীবর কেহ আছেন কি?

বান্ধব ও বঙ্গদর্শনের সমালোচনা যদি ধূমকেতুর পক্ষে ধৃষ্টতা হয়, তাহা হইলে, কালিদাস ও ভবভূতি, মিল্‌টন, হোমার ও শেক্ষ-পীর এবং বাল্মীকি ও ব্যাসের সমালোচনা, বান্ধব ও বঙ্গদর্শনের পক্ষেও, এই হিসাবে, একটু ধৃষ্টতার মত কর্ম্ম হইবে না কেন? কিন্তু বান্ধব ও বঙ্গদর্শনে, এই ধৃষ্টতা কখনও না হইয়াছে, এমন নহে।

এক তানসেন গাইবেন, আর এক তানসেন তাহা শুনিয়া মুগ্ধচিত্তে বাহবা দিবেন, অথবা তান ছুটিলে ভ্রূভঙ্গি করিবেন। তানসেন ভিন্ন অন্যের পক্ষে ইহা ধৃষ্টতা! ইহাই যদি হয় সাহিত্যিক শিষ্টতার পাঠ, তাহা হইলে, সকল সাহিত্যিকেরই ব্যাগ ব্যাগেজ লইয়া, সাহিত্যিক-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়া কর্ত্তব্য। যে পড়ে, সে-ই পঠিত বস্তুর সমালোচনা করে। সমালোচনা যদি হয়, অধিকারী-ভেদে ধৃষ্টতা ও অপরাধ, তাহা হইলে, সাহিত্যের ব্যবসায় বন্ধ করিয়া সাহিত্যিকদিগের একবারে পটল তোলাই কর্ত্তব্য। বাল্মীকি আর ব্যাস লিখিবেন গ্রন্থ। সে গ্রন্থ পড়িবেনও তবে বাল্মীকি আর ব্যাস। কি জানি, যদি নিম্ন শ্রেণীর লোকে উহা পড়িয়া, তাহার পাপমুখে সমালোচনায় দুই একটা কথা বলিয়া বইসে, তাহা হইলেইত সর্ব্বনাশ, একপক্ষে মানহানি, অন্য পক্ষে প্রাণহানি। এরূপ হইলে, বড় লোকদিগের পক্ষে গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত সূত্র ধরিয়া চলিলেই ভাল হইবে,—

"আপনি, লিখিব, আপনি পড়িব,
আপনি করিব গান,
আপনি শুনিব, করতালি দিব,
আপনি মজাব প্রাণ।"

যাহা হউক, সমালোচনার সম্পর্কে এইরূপ জুরিজুডিকশন যখন আজি পর্য্যন্তও নির্দ্ধারিত হয় নাই, তখন ধৃষ্টতার কলঙ্কে কলঙ্কিত হইলেও, ধৃষ্ট ধূমকেতু তাহার স্বাভাবিক চাপল্যের অনুরোধে, বঙ্গদর্শন পড়িয়া মনে যে ধারণা হইয়াছে, এবারও তাহা সরল প্রাণে বলিয়া যাইবে। ইহার পরে, ভবিষ্যতে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা ভবিষ্যতের অবস্থা বিবেচনায় করা যাইবে।

"সাহিত্যের আদর্শ"। প্রবন্ধটি সুলেখিত। ইহাতে জানিবার, বুঝিবার ও ভাবিবার যোগ্য অনেক কথা আছে।

"চণ্ডালী" ও "নারী।" মাঘের সংখ্যায় এই দুইটি কবিতা আছে। "চণ্ডালী" বৈশালীর প্রান্তগ্রামবাসিনী চণ্ডালতনয়া ;— চণ্ডালের দীন কুটীরে রূপের জীবন্ত উৎস। এই হেতুই বৈশালীর চণ্ডালী কবির চক্ষু আকর্ষণ করিয়া কাব্যের বিষয় হইয়াছে। কবিতাটি মনোযোগ করিয়া পড়িলাম। পড়িলাম বটে, কিন্তু এই কবিতার তাৎপর্য্য বুঝি বুঝি করিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। নব্য বঙ্গকাব্যের এই টুকুই বাহার। নৈতিক উৎকর্ষ ইহাতে কোথায় কি আছে, টের পাইলাম না। কেবল দেখিলাম, রূপের জ্বলন্ত জ্যোতিঃ আর সেই খানে পতঙ্গের আত্ম উৎসর্গের উদ্যোগ। আর বুঝিলাম না ইহার কতকগুলি পদ। একস্থানে "চণ্ডালী" আর একস্থানে "চণ্ডালিনী"। ইহার একটি পুরুষবোধক, অন্যটি স্ত্রীত্বজ্ঞাপক, না দুটিই স্ত্রীবোধক? বুঝিতে পারি নাই। "বক্ষোচ্ছল" কি, ইহাও বুদ্ধিস্থ হইল না। এইরূপ শব্দ আরও দুই একটি আছে। "নারী" কবিতাটি ভাল লাগিল। ঊষা, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও প্রদোষ, জীবনের এই চারি অঙ্কে রমণী যে চারি মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হন, কবি তাহারই সংক্ষিপ্ত পট আঁকিয়া এই মন্ত্রে শেষ চরণে নমস্কার করিয়াছেন,—

"তাপসিনী! দিবসান্তে শ্রান্তশির চরণে তোমার
সঁপি' দিব কল্যাণি আমার।"

আমরাও জগদ্ধাত্রী জগজ্জননী রমণী মূর্ত্তিকে প্রাণের আবেগে এই মন্ত্রেই নমস্কার করিতে ভালবাসি।

"সারসত্যের আলোচনা।" প্রবন্ধের বিষয়টি দার্শনিক। বিজ্ঞ প্রবন্ধকার, দার্শনিক জটিল কথাগুলিকে সরল ভাষায় বুঝাইয়া, প্রকৃতই শক্তি ও গুণবত্তার পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধটির ভাষায় কলিকাতার কথিত ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ মাঝে মাঝে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহা আমাদের নিকট ভাল লাগিল না। প্রবন্ধের ভাষায় প্রাদেশিকতা আমরা সঙ্গত মনে করি না। কথিত ও লিখিত ভাষা কোন দেশে, কোন কালেও একরূপ হইতে পারে নাই। লেখ্য ভাষা,—গ্রন্থের ভাষা সর্ব্বত্র একবিধ; কিন্তু কথ্যভাষা পল্লীতে পল্লীতে পৃথক্।

"দিন রাত্রি।" প্রবন্ধ নূতন ভাবের নূতন জিনিস। আমরা উহা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি।

"মুক্তি"। এই মুক্তিই মাঘের বঙ্গদর্শনের বার আনা গ্রাস করিয়া রহিয়াছে। মুক্তিতত্ত্বে অনেকেই অনেক লিখিয়াছেন, অনেক কহিয়াছেন ও অনেক ভাবিয়াছেন, কিন্তু কেহই সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহার শেষ মীমাংসায় পহুঁছিতে পারেন নাই। বঙ্গদর্শনের এই মুক্তি প্রবন্ধ সম্বন্ধেও সেই কথা। কিন্তু তথাপি প্রবন্ধটি সুপাঠ্য। পড়িতে বুদ্ধির একটু ব্যায়াম হয়; ভাবিবার অনেক বিষয় ও কথা যুটে; এবং ঈদৃশ প্রবন্ধ পাঠে সময়েরও সদ্ব্যবহার হইল বলিয়াই মনে লয়।

"ধর্ম্মপ্রচার।" ফাল্গুনের বঙ্গদর্শনে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রবন্ধ। ইহা, আলোচনা সমিতিতে পঠিত হইয়াছিল। ধর্ম্ম আর প্রচার, এই দুটি শব্দের একত্র সমাবেশ দেখিলেই ব্রাহ্মসমাজ

ও খৃষ্টসমাজের কথা মনে পড়ে। প্রবন্ধকার ব্রাহ্মসমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই প্রবন্ধ গঠন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসম্প্রদায় এই প্রবন্ধ পাঠে উপকৃত হইবেন। অন্য সমাজের লোকেও ইহা পাঠ করিলে, অনেক ভাল কথা শুনিয়া প্রীতিলাভ করিবেন সন্দেহ নাই। "ধর্ম্মসমাজের দ্বারাতেই ধর্ম্মের যথার্থ বিপর্য্যয় দশা উপস্থিত হয়।" "দলবদ্ধ উৎসাহের দ্বারাতেও সে নিয়মের অন্যথা ঘটিতে পারে না।" 'দ্বারা' বাঙ্গালার তৃতীয়া বিভক্তি এবং তে সপ্তমীর চিহ্ন। উল্লিখিত দুইটি বাক্যেই দ্বারার পিছে তে লাগান হইয়াছে;—তৃতীয়ার সঙ্গে সপ্তমী যুটিয়া গিয়াছে। এই ডবল বিভক্তির সাব্বয়পদ নির্ব্বাচন বা পার্জিং কিরূপে করিতে হইবে, বুঝিলাম না। ইহা করণ না অধিকরণ?—এইরূপে করণাধিকরণ বিভক্তির একত্র সংযোগ ঘটিলে, কাহার প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে, বাঙ্গালাবৈয়াকরণ, তাহার মীমাংসা করিবেন। পুস্তকের ভাষায় এইরূপ প্রয়োগ আমরা এই প্রথম দেখিলাম।

"গণেশপূজা।" এই প্রবন্ধে গণেশপূজা যে খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর বহুপূর্ব্ব হইতে এ দেশে প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাই প্রমাণ করা হইয়াছে। এ সকল প্রবন্ধের সম্পর্কে বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই।

"মনুষ্যত্ব।" মনুষ্যত্ব প্রকৃতই সুপাঠ্য ও উপাদেয় প্রবন্ধ। আমরা এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। ঈদৃশ প্রবন্ধ সকলেরই পঠনীয়।

"হে বিপদ, এস" ও "বঙ্গ মঙ্গল।" এদুটি বঙ্গদর্শনের ফাল্গুনী বা বাসন্তী কবিতা। এ দুই কবিতার একটিতেও বসন্তের শোভা বা উচ্ছ্বাস নাই। কিন্তু "বঙ্গ মঙ্গলে" হোলীর একটু আভাস আছে। "বঙ্গমঙ্গল" 'খণ্ডকাব্য',—বিদ্রূপাত্মক কবিতা। লর্ড কার্জ্জন ও বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উহার বিষয়। সুতরাং, ইহাতে হোলীর

নবরও, বা পঞ্চরও, যে একটু আছে, ইহা না বলিয়া দিলেও পাঠক বুঝিবেন। "হে বিপদ, এস"। এই কবিতাটি নব্য বঙ্গের জ্যোৎস্না ও আঁধার মাখা কুয়াসাচ্ছন্ন কাব্য-কুঞ্জে অবশ্যই স্থান পাইতে পারিবে।

"নৌকাডুবি।" মাঘ ও ফাল্গুন দুই মাসের বঙ্গদর্শনেই আছে। নৌকাডুবির নৌকা ফাল্গুনেও ডোবে নাই। মাঘ ফাল্গুন নৌকা-ডুবির সময়ও নহে। চৈত্রের ভূর্ণড ও বৈশাখের ঝড়ে কি হইয়াছে, বলা যায় না। রকম দেখিয়া মনে লয়, নৌকা ডোবে ডোবে করিয়াও যেন ডুবিতেছে না। যাহা হউক, আজ হউক, কাল হউক, নৌকাডুবির নৌকা অবশ্যই একদিন ডুবিবে। আমরা আমাদের জাহাজ স্থির রাখিয়া, জালি বোটের রজ্জু ধরিয়া, নৌকাডুবির প্রতীক্ষায় রহিলাম। যেই ডুবিবে, অমনি আমরা উহার তরঙ্গে ভাসমান মানুষদিগকে যতদূর, পারা যায়, যত্ন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিব এবং ইহাতে যেসকল মণি রত্ন আছে, তাহারও উদ্ধার সাধনে যত্নবান্ হইব। মণি রত্ন বাছিতে যদি আবর্জ্জনা হাতে উঠে, ছি, ছি, থু থু বলিয়া, স্রোতের বস্তু আবার স্রোতে ভাসাইয়া দিব। আর মানুষ ধরিতে যাইয়া যদি অমানুষের গায়ে হাত পড়ে, অমনি হাত গুটাইয়া আনিয়া, ফিনাইল বা কারবলিক ওয়াটার দিয়া হাতের সংস্কার অথবা গোময় স্পর্শে উহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লইব। "নৌকাডুবির" মালিক আমাদিগকে যদি অভয় দেন, আর ধূমকেতুর ছোট মুখে, বড় মানুষের নৌকাডুবির বড় কথা লইয়া আলোচনা যদি, অন্য পাঁচ জনের চক্ষেও ধৃষ্টতার পরিচায়ক না হয়, তাহা হইলে আমরা আহ্লাদ সহকারে ইহা করিব। আর অন্যরূপ ব্যবস্থা হইলেও, আমরা নিরস্ত থাকিবার পাত্র নহি। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করিব। ধূমকেতুর ইহা আজন্ম-সিদ্ধ স্বভাব। স্বভাবের বিপর্য্যয় বিধান দেবতারও অসাধ্য।
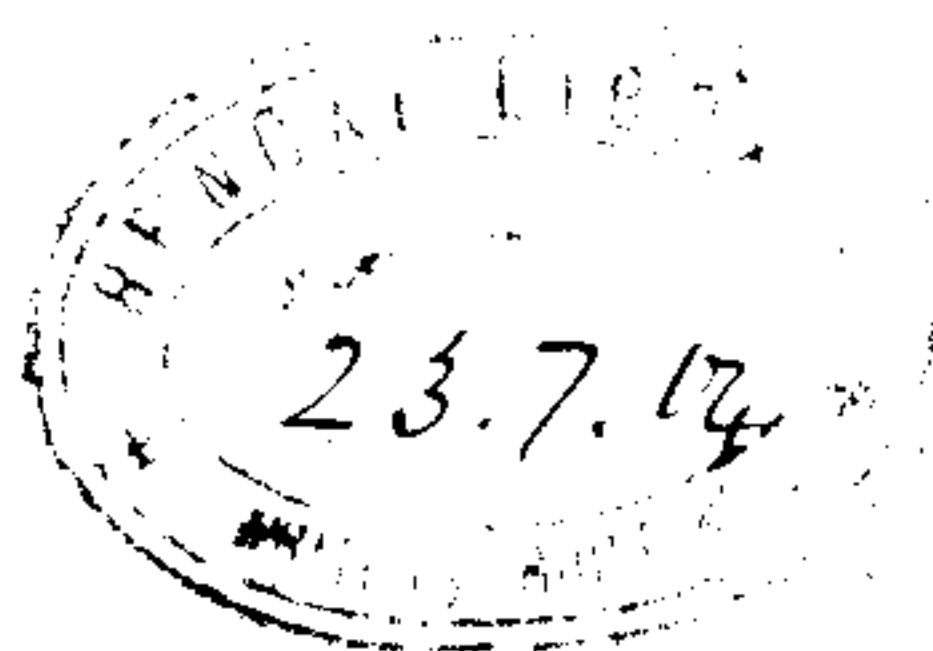
"উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ।"

প্রাচীন মিশর।
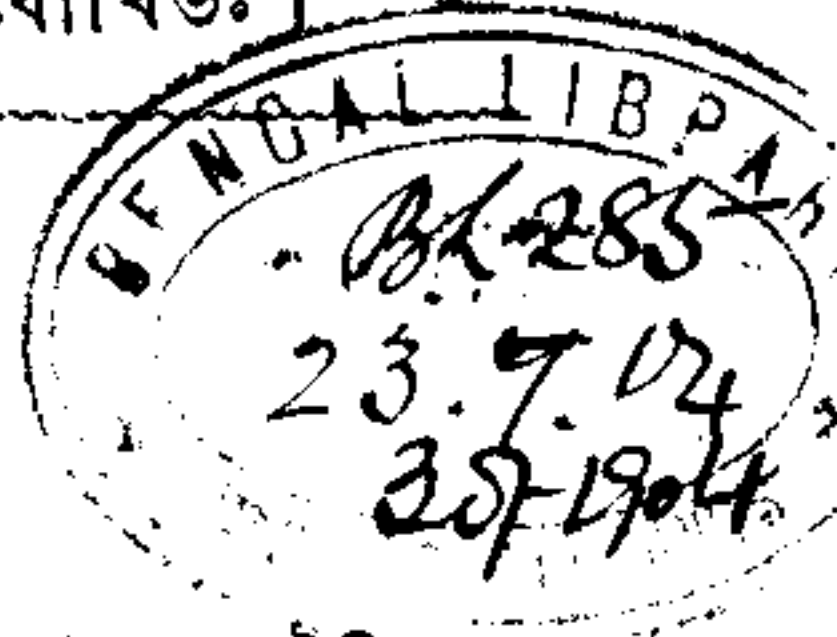
মিশর ও ইজিপ্ট একই দেশের দুটি নাম। আমরা যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরাতন রাজ্যকে মিশর নামে, সময় সময়, অশ্রুসিক্ত নয়নে স্মরণ করি, ইউরোপ সেই রাজ্যকেই ইজিপ্ট কহিয়া তাঁহার লেলিহান রসনার পরিতর্পণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের ন্যায় মিশরও মানবীয় সভ্যতার আদিস্থান অতি প্রাচীন দেশ। প্রাচীন হইলেও, ভারতবর্ষ যেমন আছে, মিশরও তেমন সশরীরে বর্ত্তমান আছে। মিশরকে, উদ্বেল সমুদ্রের প্লাবন-তরঙ্গ আজিও ভূপৃষ্ঠ হইতে ধুইয়া পুছিয়া লইয়া যায় নাই; অথবা কোন ভূকম্পের প্রলয়-আন্দোলনও উহাকে ভূগর্ভে নিহিত করিয়া ফেলে নাই। উহার কঙ্কাল-মূর্ত্তি, এখনও একদিকে বালুকা-সমুদ্র—সাহারার অনন্তবিস্তৃত প্রতপ্ত শরীরে অঙ্গ হেলাইয়া, আর এক দিকে লোহিত-সাগরের সলিলকণবাহি সুস্নিগ্ধ ফুৎকারে দগ্ধদেহের জ্বালা জুড়াইয়া, নীল-নদের সুনীল উত্তরীয় গলে দোলাইয়া, এবং আবেসেনিয়ার পাষাণ-বক্ষে পা রাখিয়া স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

মিশর আছে; কিন্তু মিশরের সে প্রাণ নাই। যে বাহু একদিন সসাগরা পৃথিবীর ভার বহনে স্পর্দ্ধা করিত, উহার সে বাহুযুগল ভগ্ন; যে পাদভরে একদিন বাসুকির ফণা বিদীর্ণ হইতে চাহিত, আজি সে পাদদ্বয় অসাড় ও অবসন্ন। উহার সে জগদুজ্জ্বল অঙ্গরাগ পুছিয়া গিয়াছে। সে গৌরবের আভরণ খসিয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ, সে প্রাচীন মিশর বা ইজিপ্ট অতীতের গভীর অন্ধকারে

অন্তর্হিত। মিশর এইক্ষণ স্মৃতির শ্মশান। পুরাতন স্মৃতির জলন্ত ইন্ধনে, রাবণের এক চিতা জ্বলিতেছে,—স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমির পাষাণচাপা বুকে, আর এক চিতা জ্বলিতেছে, আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তটে মিশরের উর্ব্বর বক্ষে।

প্রাচীন ভারতের সহিত প্রাচীন মিশরের অভ্যুত্থান, উন্নতি, জ্ঞান-গৌরব ও শক্তিসম্পদ্ ইত্যাদি নানা বিষয়ে অনেক সাদৃশ্য আছে। ভারতের আর্য্যসভ্যতা ও মিশরের মৈশরী সভ্যতা প্রায় যেন একই ছাঁচে ঢালা, একই শ্রেণীর পদার্থ। উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু পার্থক্য তাহা এ দুইয়ের বহিরঙ্গরাগে ও বাহ্য সাজসজ্জায়। এই সাদৃশ্যের প্রকৃত কারণ কি, তাহা অবধারণ করা দুঃসাধ্য।

ইউরোপ ও আমেরিকা এক্ষণ পার্থিব সভ্যতার আদর্শ স্থান। ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে আবার আমেরিকার সভ্যতা অপেক্ষাকৃত নূতন। আমেরিকা,যদিও আজ বিষয়-বিশেষে ইউরোপ-কেও পশ্চাতে ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমেরিকার যত কিছু সম্পদ্, যত কিছু গৌরব সমস্তই ইউরোপের প্রসাদাৎ। কিন্তু সেই ইউরোপের জ্ঞান-চক্ষু সর্ব্বপ্রথমে কে উন্মীলিত করিয়া দিল? আজিকার এই অতুল উন্নতির প্রথম সোপানে, কিরূপে, সে প্রথম পদার্পণের পথ পাইল? এবং তাহার অন্ধকারময় বন্যগহ্বরে কি ভাবে, আলোকের প্রথম-রেখা সঞ্চারিত হইল? এই সকল কথা জানিবার একমাত্র উপায় ইতিহাস। আমরা, প্রাচীন ইতিহাসের অস্পষ্ট আলোক-বর্ত্তিকা লইয়া, শত শত শতাব্দীর আবরণ ভেদ করিয়া যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে আমাদিগের হৃদয় ও মন বিস্ময়মিশ্র দুঃখ ও আনন্দে যুগপৎ অভিভূত হইয়া পড়ে। যে ভূভাগের পুরাতন নাম আর্য্যভূমি বা হিন্দুস্থান, আধুনিক আখ্যান ব্রিটিশভারত, পূর্ব্বতন অধিবাসীর নাম রামচন্দ্র ও বাসুদেব, ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির,

ব্যাস ও বাল্মীকি, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র, আর আধুনিক অধিবাসী ভামিনীভূষণ ও রমণীরঞ্জন, বিলাসচন্দ্র ও রতিবল্লভ, কুঞ্জবিহারী ও নটবর, একদিকে সেই আর্য্যনিবাস প্রাচীন ভারত এবং অন্য দিকে, যে দেশের মৃত গৌরবের সমাধিমন্দিরস্বরূপ পর্ব্বতোপম পিরামিড্ শ্রেণী এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, যে দেশ শত শত যুগ তুর্কির দাসত্ব করিয়া আজ দীনভাবে ইংরেজ ও ফরাশি প্রভৃতি যাঁহাকে সম্মুখে পাইতেছে, তাঁহারই চরণ তলে লুণ্ঠিত হইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে, সেই পদানত নির্ঘ্ণ্য মিশর। যখন আমরা দেখি যে, এই উভয় দেশই অতীতের অন্ধকারময় বক্ষে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া, সেই সময়ের অজ্ঞানান্ধ শিশু ইউরোপকে গুরুর ন্যায় শিক্ষা দান করিতেছে, তখন, ইউরোপ আর এতদুভয়ের অবস্থাগত বর্ত্তমান পার্থক্য দেখিয়া আমরা আপনা হইতেই অবসন্ন হইয়া পড়ি। বস্তুতঃ, যাহারা এইক্ষণ জাতি সমিতিতে নিম্ন আসন পাইবারও যোগ্য নহে, তাহারাই এক সময়ে, মানবীয় সভ্যতার আদিপ্রবর্ত্তক ছিল, এ কথা সহসা বিশ্বাস করিতেও সঙ্কোচ হয়। ইউরোপের আদি সভ্য স্থান গ্রীস। যখন, দেখা যায় যে, সেই গ্রীসের হোমর প্রভৃতি প্রধানকল্পের কবি, পিথাগোরাস্ ও প্লেটো প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর জ্ঞানগুরু এবং লাইকার গাসের ন্যায় ব্যবহার-বিদ্ও আপন আপন শিক্ষা পরিসমাপ্তির জন্য শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, বহুদিন মিশরে অবস্থান করিয়াছেন, যখন দেখা যায় যে, সময় সময়,গ্রীক ও রোমানগণ তাঁহাদিগের জাতীয় উৎসব সম্পর্কিত অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বিধি ব্যবস্থার জন্য মিশরের মুখপ্রেক্ষী হওয়া আবশ্যক জ্ঞান করিয়াছেন, মিশর যখন এক দিন, সর্ব্বাংশে ইউ-রোপের নবদ্বীপ বা গুরুস্থান রূপে গণ্য ও সম্মানিত ছিল, তখন, যতই কেন বিস্ময়কর হউক না, মিশরের প্রাচীন সভ্যতা বিষয়ে

মিশর ও ভারতবর্ষ এই দুই স্থানের মধ্যে কোথায় সর্ব্বাগ্রে সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল,—ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি কোন্ দেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে পুরাবিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ আছে। ভারত উপকূল হইতে, অতি প্রাচীন সময়ে, কোন এক সম্প্রদায় মিশরে যাইয়া, উপনিবেশ স্থাপন করেন, ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু, সেই অল্পসংখ্যক কএক ব্যক্তিই বৃহৎ একটা সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া, সমগ্র একটা জাতির অধিনায়ক হইতে পারিয়াছিলেন কি না, এইক্ষণ তাহা অবধারণ করা সহজ নহে।

কেহ কেহ অনুমান করেন, ভারতীয় আর্য্যগণ, হিমাদ্রি প্রদেশের উত্তরপশ্চিম প্রান্তস্থিত কোন স্থান হইতে, ক্রমে পূর্ব্বদক্ষিণগামী হইয়া, ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়েন। এইরূপ আবার মিশরের অধিনায়ক জাতিও আবেসেনিয়ার অন্তর্গত মিরো নামক স্থান হইতে নীলনদের তটে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। ইতিহাস ইহার অধিক আর কিছুই জানে না।

যদিও বিশ্বাসযোগ্য বিশদ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি প্রাচীন ভারতবাসী ও মিশরবাসীর আচার-ব্যবহার-গত ঘনিষ্ঠতা ও সৌসাদৃশ্য দেখিয়া, অনেকে এই উভয় জাতিকেই আদিতে এক জাতি বলিয়া অনুমান করেন। আমাদিগের অনুমান যে, ভারতীয় আর্য্য সভ্যতা যে কোন সূত্রেই হউক, প্রথমে মিশরে প্রবিষ্ট হইয়া মিশরের আবহাওয়ায় রঙ্, ও স্থান বিশেষে, রকম বদলাইয়া, ধীর পাদবিক্ষেপে গ্রীস ও রোমের পথে ইউরোপে প্রবেশ করিয়াছে; এবং এইরূপে ভারতের পুরাতন আর্য্যগৌরবই নবভাবে রূপান্তরিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান সভ্যতায় পরিণতি পাইয়াছে। এই হেতুই প্রাচীন মিশরের

পুরাতন কথা, আমাদিগের চক্ষে উপেক্ষার বস্তু নহে। এই সকল অনুমান সত্য হউক আর না হউক, এই উভয় জাতির অভ্যুত্থান ও পতন, উন্নতি ও অবনতি যে প্রায় একই সময়ে সংঘটিত হইয়াছে; এবং এই দুই জাতির আচার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে, ইহাদিগের অভ্যুত্থান ও পতনেও যে পরস্পর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কোন দেশের ইতিহাস বা কোন জাতির ইতিবৃত্ত ঘটিত কোন কথা বলিতে হইলে, অগ্রে উহার ভৌগলিক পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু মিশর সম্বন্ধে তাহা তেমন অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় নহে। কারণ, মিশরের পুরাতন নৈসর্গিক সংস্থান ও বর্ত্তমান অবস্থান প্রায় একই রূপ। প্রাচীন কালে যে নীলনদ মিশরের সর্ব্বস্ব, এখনও সেই নীলনদই তাহার সম্বল। পুরাতন কালে যে নদীমাতৃক 'ব' দ্বীপ তাহার সর্ব্বপ্রধান কৃষিক্ষেত্র, এখনও সেই 'ব' দ্বীপেই তাহার শস্যসম্পদ্। বস্তুতঃ, মিশরে নৈসর্গিক বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বর্ত্তমান মিশরের ভূ-বিবরণ এক্ষণ এদেশে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে পঠিত পাঠিত হয়। বিশেষতঃ, মৈশরীয় বিড়ম্বনার নিত্য নূতন কাহিনী দেশে বিদেশে সংবাদ পত্রে নিত্যপ্রকটিত হইতেছে, এই উপলক্ষেও, উহার নদী, হ্রদ, পর্ব্বত ও উপত্যকা প্রভৃতির কথা আলোচিত হইয়া থাকে। সুতরাং, মিশরের ভৌগলিক প্রাকৃত সংস্থান সম্পর্কে বলিবার নূতন তথ্য কিছুই নাই। কিন্তু উহার পুরাতন কালের মনুষ্যকৃত ব্যবহারিক অবস্থান সম্বন্ধে বলিবার ও শুনিবার অনেক কথা আছে, এস্থলে সংক্ষেপে তাহাই বিবৃত হইতেছে।

নীল নদ, সমগ্র মিশরের প্রায় ঠিক মধ্য দিয়া, দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে, ছয় শত মাইল পথ প্রবাহিত। মিশরের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, উদয়াচল ও অস্তাচলের ন্যায়, দুইটি পর্ব্বত শ্রেণী দক্ষিণ

হইতে উত্তর দিকে নীলনদের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত রহিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেই, নীলনদের তট হইতে পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত, প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধ দিনের পথ পরিমাণ ভূমি, স্থানে স্থানে ইহা অপেক্ষাও কম পরিসর স্থান সমতল। এই সমতল স্থানেই অসামান্য কীর্ত্তিশালী শক্তিমান্ প্রাচীন মৈশরগণ বাস করিতেন। তাঁহারা জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধনসম্পত্তি, শক্তিসামর্থ্য ও বিদ্যাবুদ্ধিতে তদানীন্তন পৃথিবীতে কিরূপ অদ্বিতীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা জড় বস্তুর অঙ্গে অজড়োচিত অনশ্বরতা ফলাইয়া, যে সকল কীর্ত্তি চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, শুধু সেইগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও, তাহারি অনেকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পুরাকালে মিশর তিনটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল,—উচ্চ মিশর, মধ্য মিশর এবং নিম্ন মিশর বা 'ব' দ্বীপ।

মিশরের উল্লিখিত স্বর্ণযুগে, সেই সুদিনে, কোন বিদেশী পর্য্যটক মিশরে পদার্পণ করিয়া, যেদিকে দৃষ্টিপাত করিত, সেই দিকেই, তাহার চক্ষু লাগিয়া থাকিত। জীবনে কোথাও কখনও যাহা দেখে নাই, মানবকীর্ত্তির সেই চরম উৎকর্ষ ও আদর্শ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার মনপ্রাণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িত। সকল প্রদেশের সকল প্রধান নগরই যেন সমগ্র দেশের রাজধানীর ন্যায় সমৃদ্ধ। পর্য্যটক যে কোন প্রধান নগরের সম্মুখীন হইত, উহার সাজ সজ্জা ও আড়ম্বর, শিল্প বাণিজ্যের হল হলা ও সমৃদ্ধ জনসমুদ্রের উদ্বেল তরঙ্গ দেখিয়া স্বতঃই তাহার মনে লইত, ইহাই বুঝি মিশরের রাজধানী। শুধু মিশর কেন, সে উহাকে সর্ব্বাংশেই সমগ্র ধরিত্রীর রাজধানী হইবার যোগ্য মনে করিয়া বিস্মিতভাবে মস্তক অবনত করিত।

মিশরের দক্ষিণাংশের নাম উচ্চ মিশর। প্রাচীনকালে এই অংশের সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধ প্রচলিত নাম ছিল থিবেইস্। থিবেইসের

সর্ব্বপ্রধান নগর থিবিস্। থিবিস্ নগরের নাম হইতেই সমস্ত প্রদেশের নাম থিবেইস্ হইয়াছিল। থিবিসের মত জনাকীর্ণ, বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ নগর পৃথিবীতে বড় বেশী ছিল কি না, সন্দেহ। এই নগরের প্রবেশদ্বার ছিল সংখ্যায় একশত। থিবিস্ নগরী, একশত দিকে একশত দ্বাররূপ নেত্র উন্মীলন করিয়া, * শতাক্ষী নাম্নী মহাশক্তির ন্যায় আগন্তুক মিত্র ও শত্রুকে নিরীক্ষণ করিত। মিত্রের জন্য শত দ্বারে স্বাগত সম্ভাষণের আনন্দময় প্রীতিকটাক্ষ উছলিয়া ছুটিত এবং অরি সম্মুখীন হইলে, প্রত্যেক দ্বারে ধনুর্ব্বাণধারী বর্ম্মমণ্ডিত রথী সহ দুই শত রথ ও অসিচর্ম্মধারী দশ হাজার পদাতি একসঙ্গে উপস্থিত হইয়া বীরনাদে পৃথিবী নিনাদিত করিয়া তুলিত। গ্রীসের অদ্বিতীয় কবি হোমার তাহার অমর কাব্যে থিবিসের শতদ্বারের গাথা গাইয়া উহার কীর্ত্তি চির অবিনশ্বর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

থিবিস্ নগরীর পরে নাম করিবার যোগ্য নগর থিবেইড্। থিবেইড্ পরবর্ত্তী সময়ে সেইড্ নামে পরিচিত হয়। পর্য্যটকেরা এই নগরের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছেন; এবং ভগ্নস্তূপের মধ্যে শিল্পের যে বিস্ময়কর নমুনা দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা বিস্মিতচিত্তে শত মুখে উহার প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। এই স্থানে বহুসংখ্যক মন্দির ও প্রাসাদের কঙ্কাল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মন্দিরগুলি শত শত স্তম্ভ ও বিবিধ প্রস্তর মূর্ত্তিতে মণ্ডিত ছিল। এই সকলের মধ্যে একটি প্রাসাদের শোভা, সৌন্দর্য্য ও আয়তনই বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। প্রাসাদ ত নয় ক্ষুদ্র রাজ্য। প্রাসাদের চারি পাশে চারিটি বারাণ্ডা। চারিটি বারাণ্ডার সম্মুখে চারিটি সরলরেখার ন্যায় সোজা পথ। এই পথ এতদীর্ঘ যে, উহার

* ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মান্ততঃ॥
চণ্ডী ৪০ অ। ৪৭ শ্লোক।

একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত ধূধূ করিতে থাকে, ভাল করিয়া দে-খিতে পাওয়া যায় না। এই চারিটি পথেরই উভয়পার্শ্ব বহুসংখ্যক sphinxes অর্থাৎ সিংহবদনা রমণীমূর্ত্তিতে সজ্জিত। মূর্ত্তি সমূহের নির্ম্মাণ-উপাদান, প্রস্তরগুলি যেমন দুর্লভ বস্তু, মূর্ত্তিগুলির আয়-তনও তেমনি বৃহৎ। বারাণ্ডা চারিটি এত উচ্চ যে, নিম্ন হইতে ঐ সকলের শীর্ষস্থানে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে, নেত্র নিপীড়িত হয়, দৃষ্টি আবিল ও আচ্ছন্ন হইয়া আইসে।

প্রাসাদের ঠিক মধ্যস্থলে উহার সদর-ঘর (Hall)। সদর-ঘরের ছাদ একশত বিংশতিটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্তম্ভসমূহের মধ্যে কতকগুলি ক্রমশঃ সূক্ষ্মাগ্র মিশরের সর্ব্বতপ্রসিদ্ধ (obelisk)। প্রাসাদের প্রসর অবয়বে চিত্রনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হই-য়াছিল। এই চিত্রের বিশেষ একটা মাহাত্ম্য এই যে, কত শত সহস্র যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, কালের অত্যাচারে প্রাসাদের পাষাণ-কঠোর পর্ব্বতদেহ হইতেও এখানে সেখানে,অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খসিয়া পড়ি-য়াছে, কিন্তু চিত্রের একটি রেখাও পুছিয়া যায় নাই। সাধারণতঃ ইহাই দেখা যায় যে, অঙ্গভঙ্গের পূর্ব্বেই অঙ্গরাগ বিবর্ণ ও মলিন হইয়া উঠে। কিন্তু এই প্রাসাদের চিত্রকার্য্যে,সদ্যচিত্রিত ছবির মত, বর্ণ সর্ব্বত্রই অবিকৃত ও উজ্জ্বল। বস্তুতঃ মৈশরী শিল্পিগণ তাহাদিগের সমস্ত শিল্পের অঙ্গেই এমন একটা চিরস্থায়িত্বের ভাব যোজনা করিয়া লইতে পারিত যে, পৃথিবীর অন্য কোথাও কেহ তাহা পারে নাই।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো (strabo) থিবেইসের বর্ণনায়, মেম্নন (Memnon) নামক মিশরীয় দেবতা বিশেষের একটা প্রতিমূর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং থিবেইসে যাইয়া স্বচক্ষে এই প্রতিমূর্ত্তির ভগ্নদশা দর্শন করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিটি যেমন আয়তনে প্রসর তেমনই উচ্চ। মূর্ত্তির উপর প্রভাতে প্রাতঃসূর্য্যের প্রথম কিরণপাত হইবা মাত্রই, উহা হইতে চীৎকারের মত একটা

পরিস্ফুট উচ্চ শব্দ উত্থিত হইত। নিদ্রাগত নগরবাসীর কর্ণে সূর্য্যোদয়ের সংবাদ ঘোষণা করিবার নিমিত্তই বুঝি বা মিশরবাসী এই কৌশল করিয়া রাখিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো স্বকর্ণে এই ধ্বনি শুনিয়াছেন।

মধ্য মিশরের আর এক নাম 'হপ্তনমিস্' (Heptanomis)। এই প্রদেশ সাতটি 'নমি' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। এই হেতুই ইহার এই হপ্তনমিস্ নাম রাখা হয়। মধ্য মিশরের রাজধানী মেম্ফিস্। মেম্ফিস্ নগর বিবিধ কারুকার্য্য-খচিত বিচিত্র প্রাসাদ-মালা এবং বহু প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরে অলঙ্কৃত। মেম্ফিসে "আপিস্" (Apis) দেবের প্রভাব বড় বেসী। সুতরাং এখানকার "আপিস্" দেবের মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ।

নীল নদের পশ্চিম তটে মেম্ফিস্; পূর্ব্বতটে, মিশরের ভুবন বিখ্যাত মহানগরী কায়রো। কায়রোনগরীর পুরাতন শোভা, সমৃদ্ধি ও শক্তিসামার্থ্যের বিষয়, বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা ঈদৃশ ক্ষুদ্র প্রস্তাবের পক্ষে অসাধ্য ও অসম্ভব। সুতরাং সে চেষ্টা না করিয়া এ স্থলে সংক্ষেপে কায়রোর একটি মাত্র পুরাতন সম্পদের কথাই উল্লেখ করিতেছি।

এই সম্পদ কায়রোর 'ক্যাসল' (Castle) বা রাজদুর্গ। কায়রোর ক্যাসল বা রাজদুর্গ মিশরের অত্যুৎকৃষ্ট বিস্ময়াবহ দৃশ্য নিবহের মধ্যে প্রথম শ্রেণীস্থ; সুতরাং বিশেষরূপে দর্শনীয় ও স্মরণীয়। এই অট্টালিকা একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর গঠিত। পাহাড়টি নগরের বহির্ভাগে উপকণ্ঠে অবস্থিত। দেখিলে মনে লয় পর্ব্বত, বিবিধ কারুনৈপুণ্যের অদ্বিতীয় আদর্শস্বরূপ মনোহর অট্টা-লিকাটিকে স্কন্ধে লইয়া, মহানগরী কায়রোর চরণ তলে উহা আদরের উপহাররূপে উৎসর্গ করিয়া দিবার নিমিত্তই যেন নগ-রীর দ্বারদেশে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান।

পর্ব্বতের বজ্রকঠোর পাষাণ দেহ এই অট্টালিকার ভিত্তি। ইহার প্রাচীর যেমন উচ্চ তেমনই দৃঢ়। এত দৃঢ় যে, প্রাচীরের গায়ে ঠেকিয়া তূর্ণডের বেগ-ভঙ্গ হয়, বজ্রের গতিও বুঝি বা ফিরিয়া যায়। অট্টালিকায় আরোহণার্থ সোপান-শ্রেণী পাহাড় খোদিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। অট্টালিকা যদিও পর্ব্বত শৃঙ্গে,—উচ্চ মেঘ-লোকে অবস্থিত, তথাপি, সোপান-শ্রেণীর গঠন-কৌশলে, উহাতে আরোহণ ও অবরোহণ এত দূর সহজসাধ্য যে, দুর্ব্বহভার পৃষ্ঠে লইয়াও অশ্ব ও উষ্ট্রগণ অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারিত।

এই রাজদুর্গ বা অট্টালিকার মধ্যস্থিত সর্ব্বপ্রধান আশ্চর্য্য বস্তু "জোজেফের কূপ।" কূপটি দোতালা। পর্ব্বতের উচ্চ শিখর হইতে, পাথর ভেদ করিয়া, গভীরতম পাতালে প্রবেশপূর্ব্বক এই কূপে জল উদ্ধার করা হইয়াছে। সমগ্র দেশে একটি মাত্র উৎস। সেই উৎ-সই এই বিচিত্র কূপের এক মাত্র অবলম্ব। উৎস পথে পাতাল-বাহিনী সুশীতলা ভোগবতীই যেন তাঁহার একটি ধারা, শক্তিমান্ মিশর সম্রাটের সেবাব্রতে নিযুক্ত করিয়া, এই কূপের গহ্বরে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

কূপের যে তালায় জল সঞ্চিত থাকিত, সেই স্থানে অবতরণের নিমিত্ত কূপের দুইতালার মধ্য দিয়া আট ফুট চৌড়া দুই শত বিংশ-তিটি সিঁড়ী নির্ম্মিত ছিল। সিঁড়ীগুলি এরূপ ভাবে গঠিত যে, নামি-বার সময়, অত নীচে অবতরণ করা হইতেছে, কাহারও এরূপ ধারণা হইত না। বলদদ্বারা চালিত চক্রযোগে, নিম্নতম কূপ হইতে জল উত্তোলিত হইয়া, একটা কৃত্রিম খালের পথে উপরতালার কূপে আনীত ও সঞ্চিত থাকিত; এবং তথা হইতে আবার ঐরূপ কৌশলে সলিলরাশি ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হইয়া, অসংখ্য pipes বা নলযোগে, কলের জলের ন্যায়, অট্টালিকার সর্ব্বত্র পরিচালিত হইত। কূপটি এত পুরাতন যে, কোন্ সময়ে, কোন্ রাজাধিরাজের অসাধারণ

ক্ষমতায় ইহা খোদিত হইয়াছিল, পুরাতন ইতিবৃত্তও সে অংশে অনভিজ্ঞ ও নীরব। ঐতিহাসিকেরা বলেন, মিশরের এই প্রদেশে প্রাচীন সময়ে, এমন আশ্চর্য্য যন্ত্র ছিল যে, সেই যন্ত্রযোগে, চক্র ও কপির বলে নীল নদের জল, অনায়াসে উচ্চতম পর্ব্বত শিখরে প্রেরিত হইতে পারিত। মিশরের এই প্রদেশে, পুরাতন শিল্পের আরও বহু আশ্চর্য্য নিদর্শন আছে। ধূমকেতুর পাঠক যদি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করেন, তবে বারান্তরে বলিব।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু।

কুমারসম্ভব।

দ্বিতীয় সর্গ।

(১৬)

শুনিয়ে তাঁদের হৃদয়হারিণী—
এ হেন যথার্থ স্তুতি,
কহিলা বিধাতা প্রসাদ-উন্মুখ
স্বর্গবাসিগণ প্রতি।

(১৭)

পুরাণ কবির চারি মুখ হ'তে
হ'ল কাব্য উচ্চারণ,
চারি অবয়বে * লভিল সাফল্য
যে শব্দ-প্রযোজন।

(১৮)

"যুগভুজ-বলে লভি স্বাধিকার
অবস্থিত স্বপ্রভাবে,

---

* শব্দের চারিঅবয়ব,—দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া ও জাতি।

অমিতবিক্রম অমর-সমাজ,
কুশলে আছত সবে।

(১৯)

কিন্তু একি হেরি!— কোথা তোমাদের
সে দিব্য প্রফুল্ল জ্যোতি?
হিমানী-পীড়িত তারকা যেমতি,
নিস্তেজ বদন-ভাতি!

(২০)

তেজোবিলোপনে লুপ্ত ইন্দ্রধনু,
বৃত্রাসুর বিনাশীর
একি সেই বজ্র?— হায়রে দেখায়
কেমন কুণ্ঠিত শির!

(২১)

অরি দুর্নিবার বরুণের সেই
করধৃত পাশ হেন,
মন্ত্রে হতবীর্য্য ফণীর মতন
দীনতা লভেছে কেন?

(২২)

কুবেরের অই গদাহীন বাহু
ভগ্নশাখ তরু প্রায়;—
মর্ম্ম শল্য সম পরাভব-ব্যথা
লক্ষণে যেন জানায়!

(২৩)

নির্ব্বাপিত দীপ্তি দণ্ডে মাটি খুঁড়ি,
অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ প্রায়,

লঘুতা আরোপ করিছে শমন
অমোঘ সে অস্ত্রে হায়!

(২৪)

প্রভা-অপচয়ে আদিত্য সকল
কেন বা শীতল এত?
যদৃচ্ছায় সবে হয় নিরীক্ষিত
চিত্র লিখিতের মত!

(২৫)

স্খলিত গতিতে মরুত সবার
বেগভঙ্গ, বোধ হয়;—
ঊর্দ্ধ আরোহণে সলিলের যথা
প্রবাহ নিরুদ্ধ রয়।

(২৬)

আবর্জ্জিত এবে শশীরেখাশোভী
সে দিব্য জটার ভার;
রুদ্রদেরো শির লক্ষণে প্রকাশে
বিনষ্ট সে হুহুঙ্কার!

(২৭)

সামান্য বিধান বিশেষ বিধানে
যথা, তেমতি কি সবে,
পূর্ব্বে স্থিতি লভি শ্রেষ্ঠ-রিপুবলে
বিচ্যুত গৌরব এবে?

(২৮)

কি চাহিছ বল, সবে মিলি আজি,
আমা হ'তে বৎসগণ,
লোক-সৃষ্টি মোর, তোমাদিগ হ'তে
সে সৃষ্টির সংরক্ষণ।"

(২৯)

যেমতি সুমন্দ সমীর-সঞ্চারে
পদ্মসর শোভা পায়,
তেমতি শোভিত সহস্রনয়নে
ইন্দ্র গুরুপানে চায়।

(৩০)

সহস্র-নয়ন হ'তে শ্রেষ্ঠতর,
ইন্দ্রের ত্রিনেত্র আঁখি,—
বাচস্পতি তবে কহে পদ্মাসনে
কৃতাঞ্জলি পুটে থাকি।—

ক্রমশঃ।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু

বিশ্বরূপে আমি।

এখনও সূর্য্য উদয় হইতে বিলম্ব আছে, প্রথমে দেখিলাম, ফুল ফুটিয়াছে, ফুলের গন্ধ ভিতরে কি জাগাইতেছে, ভাবিলাম তুমিই। কিন্তু কত রূপ তোমার? মনে হইল, পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া বড় সুন্দর হাসি হাসিয়া আমায় দেখিতে আসিয়াছ, সম্মুখে পীত পুষ্প রাশি রাশি ফুটিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তুমি নাই, আবার নিমেষ মধ্যে তুমিই। লাল রঙের শাটী পড়িয়া অর্দ্ধ বিকসিত হইয়া অর্দ্ধ ঘোমটা দিয়া আমায় দেখিতেছ। সবুজ জমিনের উপর লাল ঘোমটা বেশত দেখাইতেছে,—কত সাজিতে জান? সম্মুখে দেখি, লাল লাল ফুল ফুটিয়াছে। আবার কোথায় যাও? এই দেখি, নাই; এই দেখি আবার শুভ্র-বস্ত্রে সদ্গন্ধ মাখিয়া গন্ধ ছুটাইয়া বলিয়া দিতেছ, দেখ আমি আসিয়াছি, সম্মুখে দেখি অনেক সাদা ফুল কামিনী বৃক্ষে।

কখন দেখি সাজসজ্জা নাই নিরাভরণা, শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, চাহিয়া দেখি, তুলসী বৃক্ষ হেলিতেছে দুলিতেছে।

চক্ষু বুজিলাম, মনে হইল—তুমি ধীরে ধীরে আমার সহিত মিশিতেছ, যত প্রকার সাজ করিয়াছিলে, সমস্ত সাজের মূর্ত্তি আমার অঙ্গে। মনে হইল—পীত রক্ত পুষ্প আমাতেই ফুটিয়াছে। মনে হইল—ক্ষুদ্র দেহ যেন আকাশের মত ব্যাপক হইয়া গেল। সম্মুখে দাড়িম্ব বৃক্ষ বায়ুভরে হেলিয়া উঠিল, দুই একটি পাখী কি বলিয়া গেল। পাখী ডাকে আপন মনে, আমার কেন মনে হয়, তুমি কথা কহিতেছ। যখন আমায় তোমার স্বরূপে লইয়া যাও, তখন পশু পক্ষী শব্দ করিলে মনে হয়, এক অঙ্গ আর এক অঙ্গকে কি ইঙ্গিত করিল। ক্ষণেকের মধ্যে সব আমাতে যেন ফুটিয়া উঠে, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকে না। না থাকি যখন, তখন শুনি পাখী ডাকিতেছে, যেন তুমি কিছু বলিতেছ। কি বল তুমি, আমি ভাল করিয়া না বুঝিতে বুঝিতেই আবার অন্য কথা কও, অন্য শব্দ কর্ণে আইসে, কে তুমি শব্দময়ী, কে তুমি বর্ণত্রয়ময়ী, কি অপূর্ব্ব তুমি; শব্দ, বর্ণ, নাম, রূপ ধরিয়া বিশ্বরূপে সাজিয়াছ, আবার আমাকে তোমার সহিত মিশাইয়া দেখাইতেছ, দেখ দেখি তোমার আমার স্বরূপই এই বিশ্বরূপ। আমি সূর্য্যোপস্থান করিতেছি, সহসা সূর্য্য উঠিলেন, দেখিলাম, বড় সুন্দর, বড় জ্যোতিঃপূর্ণ। ভাবিলাম, এত তেজ ধরিয়া আসিলে আমি তোমায় ভাল করিয়া দেখিতে পারি না। দেখিলাম, আমার দেহ আবার আকাশের মত হইয়া গিয়াছে, আমার চক্ষে সেই সূর্য্য। যেন সূর্য্য আমার চক্ষু, হরি হরি! কে তুমি সূর্য্যরূপিণী? যেমন ক্ষুদ্র পক্ষীকে তাহার মাতা অনন্ত আকাশে উড়াইতে শিক্ষা দেয়, সেইরূপ আমাকে শত মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া শত শব্দে ডাকিয়া ডাকিয়া বিশ্বরূপে মিশাইতে শিক্ষা দেও, কে তুমি আমার?

মধ্যাহ্ন সূর্য্যোপস্থানের সময় আবার দেখিলাম আসিলে, কিন্তু একবার দেখা দিয়াই সূর্য্য মেঘের আড়ালে ডুবিলেন। মনে ভাবিলাম—বেশীক্ষণ থাক না কেন? আমার চক্ষুতে বল নাই বলিয়া? তুমি যাহা কর তাহাই সুন্দর। যখন বলি, মরুভূমির জল, সমুদ্রের জল, কূপের জল, আমায় শুদ্ধ কর, তখনও দেখি জল-রূপে তুমিই। যখন, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, বৃহস্পতি, ইন্দ্র বিশ্বেদেবাঃ, তখন দেখি, তুমি এত নাম ধরিয়াছ! যখন ডাকি, আয়াহি বরদে দেবি! তখন দেখি, দেহ যেন আকাশের মত হইতেছে, দেখি, আকাশের নাভিদেশে চতুর্ম্মুখ রক্তবর্ণ প্রজাপতি ব্রহ্মা সোঽহং হংসে আরোহণ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কখনও মনে হয়, এই আকাশ,—যতটুকু দৃষ্টি পথে আইসে, ততটুকুর উপরে আমি আরোহণ করিয়াছি, তাহাই সোঽহং হংস, তাহার উপরে আমার হৃদয়-দেশ, সেখানে নীলোৎপল-দল-প্রভ চতুর্ভুজ গরুড়ারূঢ় বিষ্ণু, দেখি ললাটদেশে অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিত ত্রিনেত্র ধর্ম্মবৃষভারূঢ় শম্ভু। আমি যেন সূর্য্যমণ্ডলের মত সর্ব্বত্র আলোকমালায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছি, নীল আকাশ যেন আলোকে ভরিয়া গিয়াছে, সেই আকাশে এক স্থানে ব্রহ্মা, তদুপরি বিষ্ণু, তদুপরি শম্ভু, লোহিত নীল শুভ্র তিন অংশে অনন্ত আকাশ বিভক্ত হইয়াছে। এই আকাশের চারিদিকে জ্যোতিঃ, আর ঐ তিন স্থানের তিন মূর্ত্তির কোলে কোলে একটি বালিকা, একটি যুবতী, একটি বৃদ্ধা। যখন বালিকামূর্ত্তি, তখন দেখি, সব ফুটিয়া উঠিল, বালিকা ফুল লইয়া খেলা করিতেছে, জগৎ এই মাত্র প্রকাশ হইল। আবার বালিকা বড় হইল, মধ্যাহ্নে যুবতী হইয়া তুমি সকলকে আহার দিতেছ। পরিধান পীতবস্ত্র, হস্তে বেদ, অঙ্গের জ্যোতিতে সূর্য্যমণ্ডল প্রকাশিত। আবার দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় পরিণত হইল, তুমি এখন বৃদ্ধা, পুত্র কন্যাকে ঘুম পাড়াইয়া আবার নূতন বেশভূষায় সাজিয়াছ, নীল শাটী কোটি কোটি রত্ন-

খচিত, চুমকি বসান,—বড় সুন্দর হাসি হাসিতেছ, হাসিতে জ্যোৎস্না, আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছ। আমি যদি কথনও তোমায় ভুলিয়া বিষণ্ণ হইয়া থাকি, অমনি তুমি কোনপ্রকার শব্দে সঙ্কেত করিয়া আমায় সজাগ কর, অমনি দেখি, নভোমণ্ডলে অঙ্গ ঢাকিয়া তুমি আমার পানে তাকাইয়া কি যেন বলিতেছ। আমি যদি মানুষের দোষ দেখি, তুমি অমনি আমাকে তোমার মত করিয়া দেখাইয়াদেও—কোন মানুষই, কোন জীবই, কোন বৃক্ষ প্রস্তরও ঘৃণার বস্তু নহে, দেখ ইহারা তোমার আমার অঙ্গমাত্র। নাভির অধোদেশ হইতে চরণ পর্য্যন্ত যাহারা, তাহারা যদি নাভির উর্দ্ধঅঙ্গ, কণ্ঠের ও উর্দ্ধঅঙ্গের কথা কহিতে চায়, চরণ যথন চক্ষুর কথা কয়, তথন হিংসা আইসেই, চক্ষুর তাহাতে ক্ষতি নাই, চক্ষু একবার চরণের প্রতি অবলোকন করে, চক্ষুর কৃপাদৃষ্টিতেও যদি চরণ শান্ত না হয়, চরণ যদি আরও অসন্তোষ প্রকাশ করে, চক্ষু তাহাতে আর ক্রোধ প্রকাশ করে না, উপেক্ষাইকরে। এইরূপ তোমার আমার উর্দ্ধঅঙ্গে যাহারা কণ্ঠ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্থানে রহিয়াছে, তাহারা আমাদের সর্ব্বদা নিকটে থাকে বলিয়া ইহাদের সহিত মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা উচ্চ চিন্তা উচ্চ ভাব লইয়াই থাকে, তাই ইহাদের সহিত মৈত্রী। কণ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত স্থানে যে সমস্ত হৃদয়বান্ অঙ্গ, কর্ম্ম করিয়া আমাদের তৃপ্তি সাধন করিতে চেষ্টা করে, কর্ম্মদ্বারা বিশ্বরূপের সন্তোষের জন্য চেষ্টা করে, তাহাদের উপর আমরা করুণা করি, কারণ তাহারা কর্ম্মকরিয়া যথন উপাসনার জন্য উর্দ্ধে আসিবে, উপরে আসন করিয়া বসিবে, তথন করুণা মৈত্রী হইয়া যাইবে। আর নাভি হইতে চরণপর্য্যন্ত স্থানে যে সমস্ত অঙ্গ, তাহারা যথন আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করে, যথন উচ্চ অঙ্গের অধীন হইয়া সমস্ত বিশ্বরূপের তৃপ্তির জন্য চলে, যথন উচ্চ পদবীর লোক দেথিয়া হিংসাদি করে না, সন্তুষ্ট-চিত্তে উপরের লোকের

অধীন হইয়া কার্য্যকরে, তখন হর্ষ হয়। তখন মুদিতার উদয় হয়। আর যখন নিম্নস্থানের অঙ্গগুলি বিদ্রোহী হইয়া উচ্চ অঙ্গের নিন্দা কুৎসা করিতে থাকে, তখন ইহাদের উপর উপেক্ষাই কর্ত্তব্য। বিশ্বরূপ আমরা, আমাদের অঙ্গেই জগতের জীব খেলা করে, কোথাও মৈত্রী, কোথাও করুণা, কোথাও মুদিতা, কোথাও উপেক্ষা। এইরূপে আমি সকলের সহিত ব্যবহার করি। তুমি শিক্ষা দিলে, আমি শিখিলাম,—আমি প্রণাম করিলাম, তুমিও করিলে উভয়ে হাসিলাম।

শ্রীরামানন্দ ভিক্ষু, এম, এ।

নীরবে।

১

নীরবে সখিরে! স'পেছি সকল,
হৃদয়-আসনে বসা'য়ে তাঁরে,
দেখে নাই কেহ সে পুণ্য-মূরতি,
সরমে ঢাকিয়া রেখেছি দূরে।

২

শুনিবে কি সখি! পবিত্র কাহিনী—
নীরব মধুর প্রণয়-গীতি?
হেরিবে কি সেথা বসতি কাহার?—
বুঝিবে কি সই! প্রেমের রীতি?

৩

সুখের লাগিয়া বাঁধিয়াছি গেহ,
নীরবে অতীব যতন করি',
নিরাশার বায় যদি ভেঙ্গেযায়,—
কাঁপি থর-থর একথা স্মরি'।

৪

আশার বিজলী হৃদয়ের কোণে,
হাসিয়া, হাসা'য়ে লুকায় ক্ষণে,
জীমূত-গর্জ্জনে আবার শিহরি,—
"গেল-গেল" বলি' অবশ প্রাণে।

৫

বলিনু স্বজনি! মরমের কথা
হৃদয়-কবাট উন্মুক্ত আজি,
হের অন্তঃপুরে সে পূত মুরতি—
পূজার্থ প্রফুল্ল কুসুমরাজি।

৬

সখিরে! যেদিন নয়ন-মুকুরে,
বিভাসিল সেই প্রেমের রবি,
ছুটিল ঝলকা শিরায় শিরায়—
আঁকিতাম তাহা হইলে কবি।

৭

কুঞ্চিত নয়নে হেরিয়াছি কত,
উচ্ছ্বাসে ফুলিয়া উঠিত বুক,
আপনা ভুলিয়া—সংসার ভুলিয়া,
ভুলিয়া যেতাম যতেক দুখ।

৮

চঞ্চলা চপলা খেলিছে হৃদয়ে,
চঞ্চল হইল পরাণ মোর,
প্রেম-পিপাসায় হ'ল কণ্ঠ রোধ
লুকা'ল কোথায় হৃদয়-চোর?

৯

জীবন-বেলায় নেহার স্বজনি!
সুখের জোয়ারে লেগেছে ভাঁটা,
রহিয়াছে হায়! বালুকার স্তরে,
শুধু সাদা রেখা—স্মৃতির কাটা!

১০

তুষানল সম দহিছে হৃদয়,
দিন দিন উহা হইছে খাক্,
মুখটী ফুটিয়া পারিনা বলিতে,
প্রেম-আশা তাই লুকানো থা'ক্।

শ্রীকামিনীকুমার দে রায়।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব।

(উপসংহার)

এ পর্য্যন্ত আমরা পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের সৌন্দর্য্যবিষয়ক মতের সমালোচনা করিয়াছি। আমরা যতদূর অবগত আছি প্রাচ্যদার্শনিকগণ সৌন্দর্য্যতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র বিষয় গণ্য করিয়া কখনও আলোচনা করেন নাই। তাই আমরা পাঠকবর্গকে প্রাচ্যদার্শনিক-দিগের সৌন্দর্য্যবিষয়ক মত উপহার দিতে পারিলাম না। প্রাচ্য ভূখণ্ডের সাহিত্য, অলঙ্কার ও ধর্ম্মশাস্ত্রে মাঝে মাঝে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আলোচনা দেখা যায়। ইতিহাসের সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিতে হইলে ইহাও বলিতে হয় যে, প্রাচ্যভূখণ্ডে শিল্প সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। শিল্পের সহিত সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এমন কি পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ শিল্পের বিশ্লেষণ দ্বারা সৌন্দর্য্যের মূলোপকরণ-নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহারা ইহাও বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই

যে, শিল্পে সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। তাঁহারা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়াইয়া জাগতিক সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে অনেক নিগূঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থে ভগবদ্ সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন নাই। পক্ষান্তরে ভারতীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র ভগবদ্‌সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছেন। ভগবান্ অনন্ত সৌন্দর্য্যের উৎস—বৈষ্ণবশাস্ত্রের ইহা প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু প্রাচ্যদর্শন জাগতিক সৌন্দর্য্য দর্শনশাস্ত্রের বিষয়ীভূত করে নাই। প্রাচ্যভূখণ্ড কলাবিদ্যাতে সমুন্নত ছিল, অথচ সেই স্থানে কলাবিদ্যার উন্নতিকল্পে কি সৌন্দর্য্যতত্ত্বের মূলনির্ণয়ে বিশেষ কোন চেষ্টা দেখা যায় না, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। প্রাচ্য পণ্ডিতগণ কেন জাগতিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বিচার করেন নাই, তাহা আমাদের এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। আমরা এ প্রবন্ধে আমাদের সৌন্দর্য্যবিষয়ক মত ব্যক্ত করিয়া, এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান সৌন্দর্য্যের কয়েকটি বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। এই কয়েকটি বিশেষত্ব দ্বারা সৌন্দর্য্যকে অন্যান্য পদার্থ হইতে পৃথক্ করা যায়। আমরা ইতিপূর্ব্বে সেই কয়েকটি বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ দার্শনিক কাণ্ট সর্ব্বপ্রথমে এই কয়েকটি বিশেষত্ব জগতে প্রচার করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান এ বিষয়ে তাঁহার নিকট ঋণী। বর্ত্তমান সময়ে মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত-গণ বিশ্লেষণ-প্রণালীর সাহায্যে সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন। কলাবিদ্যার সৌন্দর্য্য তাঁহাদের আদর্শ সৌন্দর্য্য। কলাবিদ্যার সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণ দ্বারা তাঁহারা সৌন্দর্য্যের মূলোপকরণ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে তাহাই সুন্দর, যাহাতে অল্লাধিক পরিমাণে কলাবিদ্যার সৌন্দর্য্যের উপকরণরাশি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই,—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সৌন্দর্য্যের প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারিয়াছেন কি না? আমাদের মত এই

যে, তাঁহারা পারেন নাই। তাঁহাদের গবেষণা দ্বারা সুন্দর বস্তুর উপকরণরাশি মাত্র নির্ণীত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সব উপকরণগুলি মূলতঃ কি তাহা তাঁহারা স্থির করিতে পারেন নাই। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্। জড় মূলতঃ কি এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলিলেই কি যথেষ্ট হয় যে, জড়ের ভিতর পয়ষট্টিটি মৌলিক পদার্থ আছে। মৌলিক পদার্থগুলি কোন সূক্ষ্ম পদার্থের প্রকাশ কি না ইহা স্থির করা আবশ্যক। পণ্ডিতগণ জড়তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যাইয়া, অনেক কল্পনা জল্পনার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহারা কোন সূক্ষ্ম পদার্থের গতি হইতে জড়ের উৎপত্তি হইয়াছে এরূপ অনুমান করেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের কারণানুসন্ধিৎসু হইয়া ইন্দ্রিয়াতীত জগতে উপনীত হইয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, সমস্ত বস্তুর মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, আমাদিগকে ইন্দ্রিয়াতীত জগতে উপস্থিত হইতে হইবেই হইবে।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ সৌন্দর্য্যতত্ত্বের মূলানুসন্ধান করিয়াছেন বটে, কিন্তু মূলনির্ণয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, পাঠকবর্গ ইতিপূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিষয়ে একটু স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিয়াছি। আমাদের চিন্তার সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল।

মনোবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা সৌন্দর্য্যের যে সব উপকরণ স্থির করিয়াছেন, তাহা আমাদের শিরোধার্য্য। মনোবিজ্ঞান প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকরণ (sensuous element) এর কথা বলে। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। মাংসপৈশিক বোধ (musculer sensation) একটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় বলিয়া গণ্য হইলে, আমাদের ইন্দ্রিয় ছয়টি। এই ছয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের উপকরণ পাইতেছি। চক্ষু ও কর্ণ এই প্রধান ইন্দ্রিয় দ্বয়ই আমাদিগকে সৌন্দর্য্যের উপকরণ লাভের

সহায়তা করে। অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের ইহাই মত যে, চক্ষু ও কর্ণ ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ সৌন্দর্য্য জ্ঞানলাভের সহায়তা করে না। আমাদের মত এই যে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও সৌন্দর্য্য জ্ঞানলাভে অল্পাধিক পরিমাণে সহায়তা করে। স্পর্শেন্দ্রিয় সৌন্দর্য্য জ্ঞানলাভের সাহায্যকারী এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এমন কি বর্ক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কোমলত্বই সৌন্দর্য্যের প্রধান উপকরণ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এমন যদি কোন বস্তু জগতে থাকে, যাহা দেখিতে সুন্দর, যাহার স্বর অতিশয় মধুর, যাহা স্পর্শে কোমল, যাহার গন্ধ মনোরম ও যাহা আস্বাদনে সুমিষ্ট—এরূপ বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভবপর হইলে, তাহা লোকের বড়ই চিত্তরঞ্জক হইত। আমাদের মত এই যে, যে বস্তুর সৌন্দর্য্য যত বেশী ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তাহা সেই পরিমাণে সুন্দর। এক্ষণ দেখা যাক্, প্রধান ইন্দ্রিয় দুইটি দ্বারা আমরা সৌন্দর্য্যের কি কি উপকরণ লাভ করি। দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ। সাধারণতঃ বর্ণের উপর সৌন্দর্য্যের অনেক নির্ভর করে। কিন্তু বর্ণ মূলতঃ কি পদার্থ? জড়-বিজ্ঞান বলিতেছে বর্ণ কোন মৌলিক পদার্থ নহে। সূর্য্য কিরণে সাতটি বর্ণ রহিয়াছে। এই সাতটি বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর বর্ণ ধারণের ক্ষমতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিফলিত হয়। স্থূলকথা এই যে, সূর্য্য কিরণ হইতেই আমাদের বর্ণ বোধ জন্মিতেছে। আবার বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করা যাক্ সূর্য্য কিরণ মূলতঃ কি পদার্থ? বিজ্ঞান বলিতেছে, ইহা ইথার নামক কোন সূক্ষ্মজড় পদার্থের গতি হইতে উৎপন্ন হইতেছে। ইথার ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থ। ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিজ্ঞান বিশেষ কিছুই বলিতে পারে না। ইথারের কার্য্য হইতে তাহার প্রকৃতি অনুমিত হইয়া থাকে। ইহার মূলতঃ যাহাই হউক না কেন, ইহা সূক্ষ্ম শক্তি হইতে উৎপন্ন হইতেছে এ বিষয়ে সংশয় নাই। গতি অথবা পরিবর্ত্তন, শক্তির

কার্য্য ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব ইথারের গতি কোন না কোন শক্তির কার্য্য হইতে অবশ্যই সম্পাদিত হইতেছে। আলোচনা দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, শক্তি কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ নহে। শক্তিজ্ঞান আমাদের অন্তর নিহিত শক্তিজ্ঞান হইতে সমুদ্ভুত হইতেছে। 'আমি করিতেছি' 'আমি করিতে পারি' এই সব প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতেই শক্তিজ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক হারবার্ট স্পেন্‌সার পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বলেন 'The force by which we ourselves produce changes, and which serves to symbolize the cause of changes in general, is the final Disclosure of our analysis." First Principles.

দার্শনিক মার্টিনো বলেন—"Our whole idea of Power is identical with that of will or deduced from it. That which, in virtue of the principle of *causality*, we recognize as *immanent* in nature, is homogeneous with the agency of which we are conscious in ourselves. Dynamic conception has either this meaning or no meaning." Modern Matrialism. অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে আমাদের ইচ্ছাশক্তির জ্ঞান হইতেই শক্তিজ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে। বহির্জগতে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহা মূলতঃ ইচ্ছাশক্তি। আমাদের অন্তরে ইচ্ছাশক্তি অচ্ছেদ্যরূপ সংযুক্ত, অতএব বহির্জগতের ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানময়ী শক্তি। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে :—

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জ্ঞানরূপেণ সংস্থিতা॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি প্রণালীর সাহায্যে ইহা প্রমাণিত হইতে পারে যে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দও প্রকৃতপক্ষে এক জ্ঞানময়ী শক্তির কার্য্য মাত্র। শব্দও মূলতঃ ইথার নামক সূক্ষ্ম পদার্থের গতি হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন। অতএব ইহা সুন্দররূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত উপকরণগুলিই এক ইচ্ছাময়ী শক্তির কার্য্য মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, গঠন (form) সৌন্দর্য্যের দ্বিতীয়োপকরণ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকরণগুলির সুচারু বিন্যাসের উপর সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সুচারু গঠন দ্বারা সুন্দর বস্তুর বহুত্বের একত্ব সম্পাদিত হয়। জর্ম্মাণ দার্শনিক হিগেল ইহাকেই 'Unity of the manifold' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। চিন্তা করিয়া দেখা যা'ক্ যে, এই গঠন মূলতঃ কি পদার্থ। কলাবিদ্যার পর্য্যালোচনা দ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে, প্রত্যেক শিল্পী শিল্পের বহির্গঠন প্রদান করিবার পূর্ব্বে একটি মানসী প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া থাকেন। এই মানসী প্রতি-মূর্ত্তির অনুরূপ বাহ্যিক মূর্ত্তি রচিত হয়। অতএব দেখা যায়, মানসী প্রতিমূর্ত্তিই গঠনের মূল সূত্র। বহির্জ্জগতের গঠন কিছুই আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আমাদের ইচ্ছার উপর বহির্জ্জ-গতের অস্তিত্ব অবস্থিত নহে। যেরূপ শিল্পীর মানসী মূর্ত্তিই বাহ্যিক আকৃতিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই বিশ্ব-শিল্পীর মানসী মূর্ত্তিসমূহ এই বিশ্বচরাচরের বাহ্যিক আকৃতিরূপে প্রকাশিত হইতেছে। অতএব বিশ্ব-শিল্পীর মানসী মূর্ত্তিই বস্তুর আকৃতি প্রদান করিতেছে। অন্য দিক্ দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় যে, এক জ্ঞানময়ী শক্তিই বিশ্বগঠনের মূল কারণ। গঠন শব্দের অর্থ—বহু-ত্বের মধ্যে একত্ব। আমাদের জ্ঞান বহুত্বের একত্ব স্থাপিত করি-তেছে। জ্ঞান ভিন্ন বহুত্বের মধ্যে একত্বের কোন অর্থ নাই।

বস্তর ভিন্ন ভিন্ন অংশের সংযোগের অর্থ—জ্ঞান দ্বারা সংযোগ। একখানি কাব্যের বিষয় চিন্তা করুন। কাব্যের বিভিন্ন উপকরণগুলি পূর্ব্বে অসংযুক্ত ছিল। কল্পনা-শক্তি (Productive Imagination) সূত্ররূপে সমস্ত অসংবদ্ধ উপকরণগুলিকে একত্র করিয়া সংযোজিত করিল। ফলে, একখানা কাব্য রচিত হইল। কাব্য রচনার মূলে জ্ঞান। যে ভাবেই চিন্তা করুন না কেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, গঠন শব্দের অর্থ—জ্ঞান দ্বারা গঠন। তৃতীয়তঃ পণ্ডিতগণ বলিয়াথাকেন যে, ভাবনা-সাহচর্য্যের নিয়ম (Law of Association of ideas) সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য-সম্পাদনে সহায়তা করিয়া থাকে। ইহাই মনোবিজ্ঞানের ভাষায় Associative element. ভাবনা-সাহচর্য্যের নিয়ম সৌন্দর্য্য সম্পাদনে মাত্র সহয়তা করিয়া থাকে; কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে সৌন্দর্য্যের কোন উপকরণ নহে।

তাই ইহা প্রমাণিত হইল যে, এক জ্ঞানময়ী শক্তির দ্বারা বিশ্ব-ভবনের সৌন্দর্য্য সম্পাদিত হইতেছে। সুন্দর বস্তুর উপকরণ ও গঠন সেই একই শক্তির কার্য্য মাত্র। সেই এক শক্তিই উপকরণ ও গঠনরূপে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা বিজ্ঞান-লব্ধ সত্যের দৃঢ় ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম যে, জগতের সৌন্দর্য্য ভগবদ্‌সৌন্দর্য্যের প্রকাশ মাত্র। কবি যথার্থই বলিয়াছেনঃ——

"তোমারি মধুর রূপে ভরেছে ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম,
পুলকিত মোহিত মন।"

আর একটি কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব। আমরা দেখিয়াছি যে, বস্তুর সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে গঠনের উপর নির্ভর করে। বস্তু খুব ছোট অথবা খুব বড় হইলেই সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হয় না। বস্তুর উপযুক্ত গঠনের উপর সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। বস্তুর বৃহত্ত

সৌন্দর্য্যজ্ঞানের বিরোধী। সুনীল আকাশ আমাদের মনে উচ্চতার ভাব (Emotion of sublimity) উদয় করিয়া দেয়। উচ্চতা (sublimity) ও সৌন্দর্য্য (beauty) দুইটি পৃথক্ ভাব বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। তরঙ্গায়িত অতল সমুদ্র ও অভ্রভেদী হিমালয় পাঠকবর্গের মনে উচ্চতার ভাব উদয় করিয়া দিতে পারে; কিন্তু ইহাদের বৃহত্ত্ব সৌন্দর্য্যবোধ জন্মাইবার পথে প্রতিবাদী। তাই মনে হয় যে, বস্তু সুন্দর হইতে হইলে তাহার উপযুক্ত গঠন থাকা চাই। ব্রহ্ম অনন্ত। ঋষিগণ তাঁহাকে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্মের অনন্তত্ব কি সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের বিরোধী নহে? সেই সর্ব্বকারণ অনাদিপুরুষ অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন! তাঁহার তুলনায় মানুষ—তুমি কত ক্ষুদ্র! তুমি যে পৃথিবীকে বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহাও তাঁহার তুলনায় এক বালুকণার সমানও নহে! কবি যথার্থই গাহিয়াছেনঃ——

"তোমার তুলনা, জগতে মিলে না,
তোমার তুলনা তুমি।"

মানব! তুমি পৃথিবীর বৃহত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিতে অক্ষম; সেই অনন্তদেবকে ধারণ করিবার শক্তি তোমার কোথায়? তোমার কি বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার সাধ যাইতেছে না? তুমি চিন্তা কর না বলিয়া মনে করিতেছ, অনন্তের উপাসনা করিতেছ। অনন্তের উপাসনা কথার কথা মাত্র। প্রকৃত পক্ষে সান্তেরই উপাসনা হয়। যে বলে অনন্তের উপাসনা হয়, সে অনন্ত কি তাহা কিছুই বুঝে নাই। ভগবান্ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া তাঁহার নাম ব্রহ্ম (বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম গীয়তে)। নরনারায়ণ অর্জ্জুন যখন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন, ভগবদ্কৃপায় যখন ভগবানের অনন্তরূপ তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইল, তখন তাঁহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল,—তিনি

ভগবানের অনন্ত তেজ ধারণ করিতে অক্ষম হইলেন। তিনি এই অনন্তরূপ ভগবানকে সংগোপন করিয়া মানুষী মূর্ত্তি ধারণ করিবার জন্য সানুনয়ে প্রার্থনা করিলেন।:——

"অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনোমে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥"

সার কথা এই যে, ব্রহ্মের অনন্তত্ব উপাসনার জিনিস নহে। এক্ষণ প্রশ্ন এই যে, ভগবানের অনন্তত্ব সৌন্দর্য্যজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া কি মানব ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে না? ঈশ্বরকে কি 'সুন্দরং' বলিয়া ধ্যান করিতে পারিবে না? জগতে সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের এক কণা প্রকাশিত আছে বলিয়াই জগৎ সুন্দর। তবে কি মানব সেই সুন্দর পুরুষের রূপ ধ্যান করিয়া জীবন কৃতার্থ করিতে সমর্থ হইবে না? মানব! ভয় নাই। ভগবান্ তোমাদের সমস্ত বৃত্তির তৃপ্তির জন্য বিধান করিয়াছেন। তোমাদিগকে সৌন্দর্য্য-পিপাসা দিয়াছেন, অথচ তাহা অপূর্ণ রাখিবেন, ইহাও কি সম্ভবপর? ভগবান্ আত্মারাম। তিনি তোমাদের সৌন্দর্য্য-পিপাসা তৃপ্তির জন্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপ ধারণ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত সৌন্দর্য্যের ঘনীভূত মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি দর্শন করিলে রোগ, শোক, তাপ দূরে পলায়ন করে। হৃদয়স্থ বাসনার গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্ব্বপ্রকার সংশয় নষ্ট হয়। সাধুমুখে শুনিয়াছি, সেই রূপ অতুলনীয়। বিল্বমঙ্গল সুকবি ছিলেন। তিনি ভগবদ্দর্শনের পূর্ব্বে কবিতায় ভগবানের রূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই রূপ দর্শন করিলেন পর, আর কিছুই বর্ণনা করিতে পারেন নাই। সে রূপের

ভাষা নাই—তুলনা নাই—বর্ণনাতীত। তিনি মাত্র ইহা বলিতে পারিলেন ঃ—

"মধুরং মধুরং বপোরস্য বিভো
র্মধুর মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥"

ভগবদ্ভক্ত সাধু ভগবানের রূপ দেখিয়া 'মধুর'—'সুন্দর' মাত্র বলিতে পারেন। সাধুগণ বলিয়া থাকেন, ভগবদ্দর্শন বোবার স্বপ্ন-দর্শনের ন্যায়। শাস্ত্রে আছে, 'ঈশ্বরো পরমো কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। শাস্ত্রে ইহাও আছে, 'কৃষ্ণস্ত স্বয়ং ভগবান্।' মানুষ না বুঝিতে পারিয়া ভগবানের মানুষী মূর্ত্তির অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় উক্ত হইয়াছে ঃ—

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমাজনন্তঃ মম ভূত মহেশ্বরম্॥'

৯ম অধ্যায়, ১১ শ্লোক।

মানব! তুমি যদি ভগবানের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে চাও, তবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা কর। যদি জীবন সার্থক করিতে চাও, তবে জগদ্ধিতকারী গোবিন্দের ভজনা কর। অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মাধুর্য্য যদি একত্র দর্শন করিতে চাও, তবে বৃন্দাবনবিহারীর শরণাপন্ন হও। গোবিন্দের রূপ দর্শন করিলে, পার্থিব রূপ আর তোমাকে মুগ্ধ করিতে পারিবে না। বাসনার গ্রন্থি ছিন্ন হইবে,—সমস্ত সংশয় দূরে যাইবে,—কুল পবিত্র হইবে,—জননী কৃতার্থ হইবেন।

শ্রীঅভয়কুমার গুহ, এম, এ, বি, এল্।

মাসিকে বিজ্ঞান।

অণবে নমঃ।

হনু, ভানু, কানু,—

সবি এক অণু।

নূতন বৎসরে, ধূমকেতুর কায়া ও কিম্মত দুই-ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। চন্দ্রের কলাপুষ্টিতে জগতের তুষ্টি। ধূমকেতুর কলেবর বৃদ্ধিতে তুষ্টি-পুষ্টি কাহারও হয় কি? অন্যের যেমনই হউক, আমি রাহু কিন্তু আহ্লাদে ডগমগ হই; আর তোমরা কেতু, তোমরাও সম্ভবতঃ আনন্দে ফণা বিস্তার করিয়া নৃত্য করিয়া থাক। বিশেষ সুখের কথা এই যে, কায়িক পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, উহার বৈষয়িক আড়ম্বরও বাড়িয়াছে। উহার কোন অঙ্গে পদ্যের ফুল মলয়ানিলে দুল খেলিতেছে, কোথাও কাব্যের ক্ষণিক জ্যোৎস্না উছলিয়া পড়িতেছে, কোন স্থানে কঠোর গদ্যের ঘর্ঘরনিনাদ জলভারাবনত নবীন মেঘের অনুকরণ করিতেছে। কোথাও মধুকরের মধু, কোথাও মৌমাছির হুল; কোথাও গাজনের ঢকা, কোথাও চড়কের পাকে ভাবের ঝুল। সে দিন, আশ্রিত বালক বা ভৃত্য,—"রমা" সহসা চুল আলুলাইয়া রমণী হইয়া দাঁড়াইল, এবং নয়ন-জলে প্রেমের তরঙ্গ তুলিয়া, ধূমকেতুতে উপন্যাসের দ্বার খুলিয়া দিল। "সৌন্দর্য্য-তত্ত্বে,"—দর্শনের একটি তত্ত্ব,—বিলেতী পিয়ানোর একটা স্বর-লহরী বাঙ্গালার একতারায় বাদিত হইতেছে। এখন দেখিতেছি, "প্রাচীন মিশর" ইতিহাসের জন্যও একটু পথ পরিষ্কার করিয়া লইল। বাকী কেবল বিজ্ঞান। ধূমকেতুর সেই অভাব পূর্ণ করা যায় কি না, এই অভিপ্রায়েই আমার অদ্যকার এই প্রয়াস।

ইউরোপ ও আমেরিকা পৃথিবীর কর্ত্তা। বিজ্ঞান তাহাদিগের সম্বল। জাপান প্রাচীন ভারতের মন্ত্র-শিষ্য। সে আজি উপগুরু ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান-মন্ত্র জপ করিতে শিখিয়া গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে এবং এক দিকে, নির্ভয়ে জারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, বাহু নাড়িয়া ঝঙ্কার দিতেছে, অন্য দিকে যেন আদিগুরু ভারতকেও শিষ্যত্বগ্রহণের নিমিত্ত অঙ্গুলিসঙ্কেতে আহ্বান করিয়া আপনার গৌরব বাড়াইয়া লইতেছে। পৃথিবীর এই আলোক-উজ্জ্বল বৈজ্ঞানিক যুগে বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালী অবৈজ্ঞানিক রহিয়া যাইবে!—ইহা কি সম্ভব?

বিজ্ঞান না হইলে অজ্ঞানের চক্ষু ফোটে না; বিজ্ঞের মন উঠে না; বক্তার জিহ্বায় আড় ভাঙ্গে না,—লেখকের লেখনী যমাট বাঁধে না; এবং ক্লান্ত ও শ্রান্ত শ্রোতা বা পাঠকেরও আরামে নয়ন মুদিয়া, একটু ঝিমুটি কাটিবার উপযুক্ত অবসর যুটে না।

অতএব বাঙ্গালী বিজ্ঞানে অনুরাগী ও মনোযোগী। কিন্তু বাঙ্গালীর এই অনুরাগ ও মনোযোগ পুকুরের পানার মত,—ব্যাপক তথাচ উপর ভাসা,—চঞ্চল ও টলটলায়মান। ইহা দোষের নহে। এক হিসাবে বরং ভালই। অবস্থা এরূপ না হইলে, এ দেশে বিজ্ঞানের বাজার, এত অল্প সময়ের মধ্যেই, এই পরিমাণ সস্তা হইতে পারিত না এবং প্রবন্ধের মধ্যে অক্‌সিজান, হাইড্রোজান, এটম্ বা ইলেক্‌ট্রিসিটির নাম করিয়া গুটিকএক শোনা-কথার বুকুনি ভরিয়া অথবা দুই একটি চলিত হেঁয়ালি চালাইয়া দিতে পারিলেই পাঠকসমাজে, "বিজ্ঞান—বিজ্ঞান" বলিয়া এমন একটা "সোর" পড়িবারও সুযোগ ঘটিত না।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠে প্রকৃত প্রস্তাবে উপকার প্রাপ্ত হইয়া পাঠকের মুখে প্রশংসার ধ্বনি উত্থিত হয়; আজিকালিকার বৈজ্ঞানিক বাহবা শুনিয়া, যদি কেহ এরূপ বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনি

নিতান্তই ভুল বুঝিয়াছেন। মাসিকপত্রে যে সকল বিজ্ঞান-প্রবন্ধ প্রকটিত হয়, কোন পাঠকই তাহা পাঠ করেন না। রস-প্রিয় বাঙ্গালীর রস-লিপ্সু মন, অমন নীরস হিজি-বিজি লইয়া মাথা ঘামাইতে যাইবে কেন? বাঙ্গালী বিজ্ঞানানুরাগী হইয়া থাকিলেও এই পরিমাণ বে-হিসাবী হয় নাই। বঙ্গে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের চর্চ্চা-হইতেছে। মাসিকপত্রে বিজ্ঞানের মাসিক-কৃত্য চলিতেছে। ইহার পরে কোন প্রকারে উহার একটা বৎসরান্ত হইয়া গেলেই বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক হইয়া উঠিবে; এবং জাপের মত অহঙ্কারে হুহুঙ্কার দিয়া, হয়ত, একদিন ইউরোপ প্রভৃতিরও প্রাণ চমকাইয়া দিবে! বঙ্গের পাঠক! মাসিক পত্রের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সম্মুখে রাখিয়া, ক্ষণকাল তন্দ্রাবেশে এইরূপ দিবাস্বপ্ন দেখিয়া লন এবং আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া, প্রবন্ধটিকে অপঠিত ও অস্পৃষ্ট অবস্থায় আপন আপন শিকায় তুলিয়া রাখেন।

বাঙ্গালায় মাসে মাসে বিজ্ঞান-তত্ত্বে গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ, লেখক-সমাজে এমন লোক খুব বেসী নাই। যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও প্রায় কেহই বাঙ্গালার ধার বড় একটা ধারেন না। যিনি বাঙ্গালার একটু খবর লন, তিনিও সাহস করিয়া বাঙ্গালার আশ্রয়ে বিজ্ঞান-প্রসঙ্গে পণ্ডশ্রম করিয়া তাঁহার মূল্যবান্ সময় ও শক্তির অপচয় করিতে ইচ্ছা করেন না। কারণ, বঙ্গে অবিমিশ্র বৈজ্ঞানিক পুস্তক, পুস্তিকা, কি মাসিক পত্রের পাঠক বা গ্রাহক যুটিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। অতএব চতুর বাঙ্গালী, নানাবিষয়-বিলসিতা, উপন্যাস-কাব্য-রস-প্লাবিতা মাসিক পত্রিকায় 'নাম কা ওয়াস্তে' বিজ্ঞানের ছিটা-গুলি ছুড়িয়াই বিজ্ঞানের কেল্লা দখল করিয়া লইতে উৎসুক! বিজ্ঞান লইয়া পরিশ্রম করিবেন কর্ম্ম-ক্ষেত্রের কর্ম্মীপুরুষ, আর উহার ফল ভোগ করিবে, ঘুমাইয়া ঘুমা-ইয়া খট্টারূঢ় খট্টাশ। বিনা মূলধনে বিজ্ঞানের বাণিজ্যে মহাজনী

করার অস্বাভাবিক দুরাকাঙ্খা হইতেই নব্য বঙ্গে বিজ্ঞানের এই নূতন হুজুগ !

যাহাহউক, বিজ্ঞান এক্ষণ বঙ্গীয় সাহিত্য পত্রের একটা অপরিহার্য্য উপকরণ বা আসবাব হইয়া পড়িয়াছে। হলুদ ব্যতীত ব্যঞ্জন, চুন ভিন্ন পান, চতুর্ম্মুখ বিহীন কবিরাজী, হালুয়াশূন্য হেকিমী এবং স্পিরিট্ ক্লোরফরম্ বা কার্ডোমান কম্পাউণ্ড ছাড়া ডাক্তারী মিক্চার যে কথা, বিজ্ঞান বিহীন মাসিক পত্রও আজি কালি প্রায় সেই কথা। শত বঙ্কিম ও কালীপ্রসন্নের গৎ বাজিলেও বিজ্ঞান-বর্জ্জিত মাসিক পত্র, মাসিক পত্র রূপেই গণ্য হইবার যোগ্য নহে।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে পাঠকেরও সুবিধা, লেখকেরও সুবিধা। পাঠকের সুবিধা, প্রায়শঃ উহা পড়িতে হয় না। যাঁহারা বিজ্ঞানে বিজ্ঞ, তাঁহারা পড়েন না, নিষ্প্রয়োজন বলিয়া ; যাঁহারা অনভিজ্ঞ, তাঁহারা পড়েন না, বিস্বাদ, বিরস ও অবুধ্য বুঝিয়া। কেহ যদি না পড়িল, তাহা হইলে লেখকের আর ভাবনা কি ? তিনি যাহা কলমে উঠিল, তাহাই লিখিয়া, বিজ্ঞানের মার্কা লাগাইয়া, প্রবন্ধটিকে বৈজ্ঞানিক ও আপনাকে “বিজ্ঞানতীর্থ”, “বিজ্ঞান-রত্ন”, বা “বিজ্ঞান-বারিধি” নামে অনায়াসে বাজারে পাস করিয়া দিতে পারেন। সুতরাং এইক্ষণ বঙ্গে বিজ্ঞানের “ব” না জানিয়াও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকার হওয়া যায়। সমালোচকেরও ইহাতে বড় আরাম। ‘প্রবন্ধটি বৈজ্ঞানিক, অতএব বেস হইয়াছে,’—এই বলিয়াই ব্যবসায়ী অবৈজ্ঞানিক সমালোচকও সরাসরিভাবে সমালোচনা করিয়া, বিনা বাধা বিপত্তিতে তরিয়া যাইতে সমর্থ হন। যাহাতে সকল দিকেই এমন সুবিধা, তাহাতে হস্তক্ষেপ, করাটা ধূমকেতুর অভিভাবকদিগের চক্ষে কোন অংশেও অপ্রীতিকর হইবে না।

পুরাণের সৃষ্টি ও কাব্যের সৃষ্টি এক জিনিস,—বিজ্ঞানের সৃষ্টি আর এক পদার্থ। পুরাণের সৃষ্টিতে যিনি ব্রহ্মা, বিজ্ঞানের সৃষ্টিতে

তাঁহারই নাম অণু। পুরাণ ও কাব্যের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব,—এই তিনই বিজ্ঞানের অণু বা পরমাণু। অতএব, আমি অদ্য বিজ্ঞানের এই অণু-রূপী ত্রিমূর্ত্তির আণবিক চরণে, "অণবে নমঃ"—বলিয়া নমস্কার করিয়া, ধূমকেতুর জন্য বিজ্ঞানের গৌরচন্দ্রিকায় তান ধরিলাম।

মানুষের সুখের পথে এক কণ্টক,—সমাজ; আর এক কণ্টক,—ধর্ম্ম। সুখের প্রধান এক অংশ শুকাইয়া যায় সমাজের অনুরোধ রক্ষায়, আর এক অংশ উড়িয়া যায় ধর্ম্মের মুখ চাওয়ায়। ইহার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই চালুনী-ছাকা সূক্ষ্ম সুখটুকুরও আবার অংশীদার অসংখ্য। এইরূপ করভারাক্রান্ত তস্ শূন্য তালুকের এক-আনি হিস্যার ষোল-আনি রকমে মাত্র আধ কড়ার মালিক হইয়া, এক্ষণকার সুখবিলাসী সখের প্রাণ কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। মানবীয় সুখের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ও সুখের পথে যে সকল কণ্টক আছে, সে সকল সমূলে উৎপাটন করাই, নব্য বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই জন্যই বিজ্ঞান,—অন্ততঃ যে বিজ্ঞান আমার মত উগ্র বৈজ্ঞানিকের উপাস্য,—সেই 'খাতিরনদারৎ' একগুঁয়ে বিজ্ঞান, অন্য সমস্ত ছাড়িয়া, প্রাণশূন্য জড় অণুর পায়েই সর্ব্বাগ্রে "অণবে নমঃ"—বলিয়া নমস্কার দিয়াছে।

পুরাণের প্রলাপ ও কাব্যের ক্রন্দন শুনিতে শুনিতে সাধারণতঃ লোকের এই একটা ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, সমস্ত দৃশ্য, কার্য্য ও ঘটনারই একটা কর্ত্তা থাকা আবশ্যক। তাহারা এই জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে,—আর মনে ভাবে,—এই জগতের অবশ্যই এক জন কর্ত্তা আছেন,—যে জগৎ-কর্ত্তার ইচ্ছা, অনুজ্ঞা বা কৃতিত্ববলেই বিশ্বজগতের বিকাশ, বিস্তৃতি, অবস্থিতি ও লয় সংঘটিত হয়। সেই কর্ত্তার নামই পরমাত্মা বা পরমেশ্বর। ইহাও তাহাদের সংস্কার যে, জগতের অভ্যন্তরে যেমন পরমাত্মারূপী এক জন কর্ত্তা আছেন, তেমন মানুষের মধ্যেও দেহের অতিরিক্ত আত্মা নামে এক-একটা

স্বতন্ত্র কর্ত্তা আছে। দেহ-পতি,—অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও সেই আত্মা-রূপী কর্ত্তা বর্ত্তমান থাকে। এই সংস্কার বশতঃই,—একটুকু এদিক-সেদিক নড়িতে চড়িতে হইলেই, এক দিকে জগৎকর্ত্তার ভয়ে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, অন্য দিকে পরকালের কথা মনে পড়ে। এই হেতুই করপুটে ত্রিসন্ধ্যা, প্রার্থনা বা তোষামোদের বিধান,—এই হেতুই শ্রাদ্ধশান্তির অমন আটা-পেটা ব্যবস্থা।

তোমরা ঈশ্বর মান, পরকাল স্বীকার কর; ঈশ্বরের প্রীতিসাধনার্থ দেব দেবীর পূজা কর ও দেহরূপ জড়ের কল ভাঙ্গিয়া গেলেও কলের কার্য্য,—আত্মা থাকিয়া যায়, ভাবিয়া শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যবস্থা করিয়া থাক এবং পরকালের চিন্তায় অধীর হইয়া সকল বিষয়েই অতি সাবধানে পা ফেলিয়া চল। ভাবিয়া দেখ, এই দুই সংস্কার বশতঃই পৃথিবীর সমস্ত সখের সুখ ও আমোদের ভোগ-রাগ মাটি হইয়া যায় কি না। চারিদিকের অশেষ লোভনীয় ভোগ্য সরাইয়া রাখিয়া, ব্যবস্থা-করা পথ্য খাইয়া জীবন ধারণ কর এবং যৌবনের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের মুখে সংযমের লাগাম লাগাইয়া কোণে বসিয়া হরিতকী চিবাও; কিন্তু জড়বিজ্ঞানের কঠোর অধ্যয়নে, আমার মত, যাঁহাদিগের দিব্যজ্ঞানের চক্ষু ফুটিয়াছে, তাঁহাদিগের কাছে এই কাল্পনিক কুয়াসা ক্ষণকালও তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। তাঁহাদিগের রাজ্যে ঈশ্বর সিংহাসনচ্যুত,—দেব দেবী নির্ব্বাসিত। যদি নমস্কারের রীতি রক্ষার্থ তাঁহারা কাহাকেও নমস্কার করা আবশ্যক মনে করেন, তাহা হইলে, "ত্বংহি অনাদি"—বলিয়া ঐ জড়অণুর পায়ই মাথা নোয়াইয়া থাকেন।

আমিও, তাহাদিগের অনুকরণে বঙ্গে বৈজ্ঞানিকের ডঙ্কা বাজাইবার নিমিত্ত সকল কণ্টক তুলিয়া ফেলিয়াছি। সর্ব্বপ্রথম অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছি—ঈশ্বর বা পরমাত্মাকে। আত্মা একটা ঘড়ির কলের কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সারতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া,

ঘড়িটি যাহাতে না টুটে—না ফাটে, অষ্টপ্রহর সেই দিকেই খেয়াল রাখিতে শিখিয়াছি। আমি অন্য দেবতার পূজা করি না! আমি দয়া-ধর্ম্মের কাল্পনিক ধ্যানে সময়ের অপচয় করি না। আমি ধ্যান করি,—সুখের ও সখের।

বিজ্ঞানের ব্যাকরণে কোথাও কর্ত্তৃকারক নাই। কর্ম্ম সর্ব্বত্রই একমাত্র করণ বা উপকরণের অধীন। উপাদান বা উপকরণের বিশেষ বিশেষ ভাবের সংযোগ ও বিয়োগেই বিশেষ বিশেষ প্রকৃতির সৃষ্টি ও লয়। সেই বিশেষ বিশেষ ভাবের সংযোগ ও বিয়োগেরও কারণ অন্ধ জড়ীয় শক্তি ও তেজ।

বাগানে ঐ যে যূঁই ফুলটি ফুটিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে,—ঐ যে গোলাপটি রূপে ঢল-ঢল করিয়া খল-খল হাসিয়া গলিয়া পড়িতেছে,—আর ঐ যে উহাদের কাছে-কাছে প্রজাপতির দল নানাবর্ণের পাখা বিস্তার করিয়া উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে,—কেহই উহাদিগকে ইচ্ছা করিয়া গড়ায় নাই, এবং কেহই উহাদিগকে ঐরূপে হাসাইয়া বা উড়াইয়া তামাসা দেখিতেছে না। উহারা সকলেই জগতের সার উপাদান,—জড় অণু পরমাণুর বিশেষ বিশেষ অবস্থার যৌগিক ফল। বিজ্ঞান অকাট্য প্রমাণ দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করিয়া লেঠা চুকাইয়া ফেলিয়াছে।

এ সকল ক্ষুদ্র জিনিসের ক্ষুদ্র কথা ছাড়িয়া দাও। শ্রীকৃষ্ণ যেমন গীতায়, আত্মা বা পরমাত্মার মাহাত্ম্যবর্ণনে "আদিত্যানামহং বিষ্ণু জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্। মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহংশশী॥"—ইত্যাদি শ্লোকযোগে প্রত্যেক শ্রেণীস্থ শ্রেষ্ঠদ্রব্যের নাম করিয়া কথা কহিয়াছেন; অণুর মাহাত্ম্য বর্ণনও সেই পদ্ধতিরই অনুসরণ করা হউক। জড়বস্তুর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ভানু বা সূর্য্য; জড়ীয় ইতর শ্রেণীস্থ প্রাণী বা কলের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কল রামাগণ বর্ণিত হয়; এবং জড়ীয় উচ্চশ্রেণীস্থ জীব-যন্ত্র বা মানুষের মধ্যে

স্বতন্ত্র কর্ত্তা আপ্যে কানু বা শ্রীকৃষ্ণ। ইঁহাদিগকে লইয়াই কথা
রূপী কর্ত্তা বর্ত্ত

সেদিক নড়ি অত্যদ্ভুত ও বৃহৎ জড়গোলক সূর্য্য আকাশে নিত্য উদিত ঝাঁপিয়া উদ্গত হইতেছে, উহাকে কেহ গড়াইয়া, একটা আলোকপিণ্ড বা বলের মত শূন্য-পথে ঘুরাইতেছে, এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই অলীক ও ভ্রমাত্মক। বস্তুতঃ উহাকে কেহ গড়ায় নাই,—কোন কর্ত্তার ঐচ্ছিক-শক্তি-বলে উহা গঠিত বা চালিত হইতেছে না। বিজ্ঞান শত পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্থির করিয়াছেন যে, উহা কতকগুলি অণুর সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ সকল অণু-পরমাণু ঘটনাচক্রে আবর্ত্তিত হইয়া ঐরূপ একটা বিশেষ প্রণালীতে গায়ে-গায়ে বজ্র-আটনিতে লাগিয়া দাঁড়াইলেই সূর্য্য হয় এবং বেদম ঘুরিতে আরম্ভ করে। বিজ্ঞান-যন্ত্রযোগে গগনবিহারী ভানুর তনু খুঁজিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, উহাতে জড় অণু ব্যতীত অন্য কোন কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

হনু সম্বন্ধেও ঐ কথা। কোন বৈজ্ঞানিক, সুগ্রীবের অনুচর হনুর দেখা পান নাই। পান নাই, ইহা সৌভাগ্য; হনুর সাক্ষাতে কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র লইয়া উপস্থিত হইলে, বন্য-বর্ব্বর অসভ্য হনু এক চপেটাঘাতেই হয়ত, তাহার অণুবীক্ষণ প্রভৃতির রেণু খসাইয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অন্যরূপ চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইত! যাহা হউক, বৈজ্ঞানিকেরা হনুকে না পাইয়া থাকিলেও, হনুজাতীয় ক্ষুদ্রজীবের দেহ অণুতে-অণুতে পৃথক করিয়া দেখিয়া, ইহা বুঝিয়াছেন যে, হনুর দেহ যত বড়ই হউক না কেন, উহাও ঐ হনুজাতীয় অণুরাশিরই এক বিশেষ পরিমাণ ও প্রণালীর একত্র সংযোগ। সেই পরিমাণ অণু সেই প্রণালীক্রমে গাঢ়সন্নিবিষ্ট হইলে, হনুরূপী এমন একটা চলন্ত যন্ত্র জন্মিতে পারে যে, উহা জন্মমাত্র লাল ফল মনে করিয়া সূর্য্য ধরিতে ধাবিত হইতে চাহে,

—এক লাফে সাগর ডিঙ্গাইয়া যায় এবং মাথায় পর্ব্বত ও বগলে সূর্য্যের দর্পণ লইয়া শূন্যপথে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়!

কানু বা শ্রীকৃষ্ণ মানুষের মধ্যে মানুষ। সেই কানুও মানবীয় অণুরই সমষ্টি। একই জাতীয় অণুরই একপ্রকার সংযোগে ফোটে শ্যাম,—আর একরকম সংযোগের ফল রাম। একরূপ বিন্যাসে তুমি—অন্যরূপ বিন্যাসে আমি। একটা মুটে বা মুর্দ্দারফরাসের তনু হইতে অণু খসাইলেও যেমন অণুনিবহেরই লীলাভিনয় পরিলক্ষিত হয়; নিষাদ-নিহত কানুর দেহ-বিশ্লেষণ করিলেও তেমনই আণবিক ক্রিয়া-কলাপেরই পরিচয় পাওয়া যাইত। সমস্ত ঘড়িই একজাতীয় কল ও উপাদান নিচয়ের একই রীতির সংযোগে উৎপন্ন। কিন্তু তথাপি উপকরণের প্রকার ও পরিমাণ-পার্থক্যে, একের নাম ওয়াচ,—অন্যের নাম টাইমপিস্ বা ক্লক। হনু, ভানু ও কানু বিভিন্ন কল হইলেও মূলে এক অণু। আমি এই হেতুই "হনু, ভানু ও কানু—সবি এক অণু"—বলিয়া প্রবন্ধের শিরোনামে "অণু" দেবতাকে নমস্কার করিয়া লইয়াছি।

আমি এতক্ষণ বিজ্ঞান ও অণুর নাম করিয়া, যে উদ্দেশ্যে এতগুলি পেচাল-পিটিয়া পাঠকের সময় নষ্ট করিলাম, তাহার সকল কথা এখনও বলা হয় নাই। বিজ্ঞান পরমাত্মা ও পরলোকের ভয়ও ভাঙ্গিয়া, ক্ষেত্রবিশেষে সুখের পথ কিরূপ নিষ্কণ্টক করিয়া আনিয়াছে, আপনারা অবশ্যই তাহা বুঝিয়াছেন। কিন্তু নব্য বিজ্ঞান, কর্ম্মভূমি হইতে কর্ত্তার কর্তৃত্ব খারিজ করিয়া এবং অণু, উপাদান বা উপকরণের জগৎবেড়-জালে, পৃথিবীর কর্ম্মরাশিকে ঘেরিয়া ফেলিয়া, অন্যদিকে যে মহান্ উপকারের সূত্রপাত করিয়াছে, আপনারা এখনও তাহা সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। সংক্ষেপে সেই কথাটি বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বিজ্ঞান-বিহিত সৃষ্টি-সূত্র আমার মত বৈজ্ঞানিক যে ভাবে

বুঝিয়াছে, সেই ভাবে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে,—কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ত্তার অস্তিত্ব অলীক ও অনাবশ্যক; এই সত্য সকলের হৃদয়ঙ্গম হইলে, দেশে কি যে একটা সুখের উৎস খুলিয়া যাইবে, তাহা ভাবিতেও মনপ্রাণ উথলিয়া উঠে! তাহা হইলে, কোন বিভাগে কোথাও কোন কর্ম্মের জন্য আর কোন কর্ত্তাকে গলদ্‌ঘর্ম্ম পরিশ্রম করিতে হইবে না। কারণ, উপকরণ বা উপাদান বস্তুগুলির যথারীতি সংযোগ ঘটিলে, কর্ম্ম আপনি হইয়া আসিবে। কোন প্রকার দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে না; চারি-অঙ্গপূর্ণ ভোগ আপনি আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইবে। সুখের অন্বেষণে টাটা-বাজি করিতে হইবে না;—সুখ বৃত্তিভোগী বন্দীর মত যথাসময়ে দ্বারে আসিয়া বন্দনা গাইবে। মানুষ এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক উন্নতির চরমে পহুঁছিলে, একবারেই সমস্ত শঙ্কট ঘুচিয়া যাইবে,—ছাত্রকে পড়িতে হইবে না; সুতরাং মাষ্টারকেও পড়াইতে হইবে না। অণু পরমাণুর আভ্যন্তরীণ জড়ীয় ক্রিয়ায় যার-যার ভাগের বিদ্যা আপনি আসিয়া তার-তার মন দখল করিয়া লইবে। হাকিমকে রায় লিখিয়া লিখিয়া অপক্ক মাথা অকালে পাকাইতে হইবে না; উকীলকেও শ্যামলা মাথায় দিয়া 'হয়'-কে 'নয়' বানাইবার নিমিত্ত চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া 'গজলের' গলায় গেঁহলা তুলিতে হইবে না। চিন্তাশীলের চিন্তা লাগিবে না; লেখকের লিখিয়া-লিখিয়া হৃষ্টপুষ্ট তনু ক্ষীণ এবং অমূল্য জীবন ক্ষয় করিতে হইবে না। লেখার উপাদান বা উপকরণ,—কালী, কলম ও কাগজ একত্র করিয়া দেরাজে ভরিয়া রাখিলেই প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ প্রস্তুত হইতে থাকিবে। বৌকেও রান্নাঘরে যাইয়া কান্নার হিল্লোলে সোহাগের জল আঁধারে ঢালিতে অথবা আগুনের জ্বালে সোনার অঙ্গ কালী করিতে হইবে না। তিনি চাল, দাল, নুণ, তেল, মাছ, তরকারি ইত্যাদি উপকরণ

নভেল পড়িবেন,—আর পাক আপনি প্রস্তুত হইয়া থাকিবে! কর্ত্তা ক্ষুধিত ও শ্রান্ত অবস্থায় যখন গৃহে আসিবেন, তখন তিনি আঙ্গুলদিয়া উনন দেখাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে বসিয়া থাকিবেন! উননের প্রদত্ত উপাদেয় ভোজ্যেই কর্ত্তার পূর্ণতৃপ্তি জন্মিবে! অন্য দেশের কথা বলিতেছি না,—বঙ্গের আনাচে-কাণাচে বিজ্ঞানের প্রেম যেরূপ জাগিয়া উঠিতেছে, বঙ্গে এইরূপ একটা শুভদিনের সূচনা সত্বর হইবে বলিয়াই আশা করি।

শ্রীমদ্‌বিজ্ঞানার্ণব ভট্টাচার্য্য—রাহু।

জীবনের সাধ।

এ যদি স্বপন মম, থা'ক এ স্বপন,
আমারে দিওনা কেহ ফিরে জাগরণ;
এ-যদি মায়ার খেলা—এই মায়া নিয়া
কাটে যেন আমার এ ক্ষণিক জীবন;
যদি এ প্রমত্ত নেশা, নিতান্ত অসার,
তবু এ জীবনব্যাপী শুধু এক সাধ,—
ছুটে না এ নেশা যেন কখনো আমার।
যদি এই তীব্র সুরা,—এ যদি গরল,
চাহিব না এ জীবনে অমিয় কখন,
দেও, প্রাণভরি' পিই অই হলাহল,—
ব্যর্থ জীবনের শুধু সাধনার ধন।
যদি কিছু প্রিয় থাকে এ জীবনে মোর,—
অই স্বপ্ন, অই খেলা, অই নেশা, আর
সর্ব্বগ্রাসী উন্মত্ততা অই মদিরার!

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

বান্ধব,—চৈত্র, ১৩১০। বর্ষ-বিদায়—ইহার আরম্ভটি অতি সুন্দর; পাঠক ভাবাবিষ্ট চিত্তে অগ্রসর হইতে ভালবাসিবেন। কিন্তু শেষটা যেন উজ্জ্বল প্রদীপ-শিখা ফুৎকারে নিবিয়া গিয়াছে! অত সুন্দর তৃপ্তি-প্রদ-স্থায়ীত্ব-সূচন আবাহনের পরে, অমন অকাল-বিসর্জ্জন সহৃদয় পাঠকের নিকট ভাল লাগিবে কি?

ভারতীয়-শিল্প—শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল। প্রবন্ধটিতে লেখকের প্রমাণ বিষয়ে যুক্তিতর্কের প্রামাণিক সিদ্ধান্ত অপেক্ষা "দোহাই"-দেওয়া এবং সত্যের আলোকে আপাত-অনুদ্ভাসিত সংস্কারের প্রতি একটু অনুরাগ দৃষ্ট হইলেও প্রবন্ধটি মন্দ হয় নাই। এসকল বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিজের দৃঢ়রূপে জানা থাকিলেও সাধারণের নিকট লিপিবদ্ধ করিয়া উপস্থিত করার সময়ে প্রচুর প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আবশ্যক। তাহাতে ফল অনেকটা স্থায়ী হয়। প্রাচীন ভারতের জাতীয়-গৌরব-স্মৃতি যদি বর্ত্তমান যুগে দেশের মুখোজ্জ্বলকারী কর্ম্ম-নিচয় দ্বারা পূজিত হয়, তবেই তাহা দেখিতে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়। লেখক ও পাঠকের শ্রম ও সময়-ব্যয় সার্থক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যে দেশ কেবল পূর্ব্ব-স্মৃতি মাত্র সম্বল করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে পর-পাদুকা-লেহনে প্রবৃত্ত হয়,—নিজের জীবন ধারণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির জন্য পর-প্রত্যাশী হয়, সে দেশের অধঃপতন সুনিশ্চয়। আমরা কায়-মনো-বাক্যে প্রার্থনা করি, আমাদের সুমতি হউক। আমরা দীর্ঘকালের জড়তা পরিত্যাগ করতঃ ভক্তির সহিত শক্তি মিশ্রিত করিয়া, লুপ্ত গরিমার পুনরুদ্ধার করিতে কায়-মনো-বাক্যে যত্ন-পরায়ণ হই।

দৈন্ত ও দীর্ঘশ্বাস—ছুইটি কবিতা। প্রথমটি নিতান্ত মন্দ হইয়াছিল না; কিন্তু আগা-গোড়া চৌদ্দ অক্ষরে লাইন পূর্ণ করিয়া, কবি হঠাৎ কেন মাঝখানে ষোল অক্ষরের একটা লাইন বসাইয়া ছন্দ-পতন করিলেন, তাহা আমরা বুঝিলাম না। লাইনটি এই—"ভাবি শুধু···শরণ"। এটা কি কবির ভুল-প্রমাদ—না সৎসাহস? "দীর্ঘশ্বাস" কবিতাটি পাঠ করিয়া আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছি,—কবিতার গুণে মুগ্ধ হইয়া নয়, অত দিনের খ্যাতনামা বান্ধব-পত্রের জন্য। এইরূপ কবিতা স্থানান্তরে দীর্ঘ নিশ্বাসের ঝড় তুলুক তাহাতে আপত্তি নাই,—কিন্তু বান্ধবপত্রের পৃষ্ঠ কলঙ্কিত করে, ইহাই বড় দুষ্য ও দুঃখের বিষয়। এইরূপ একটানা নাঁকিসুর শুনিয়া কাণ ঝালা-পালা হইয়া গিয়াছে,—একটু কিছু নূতনত্ব চাই। লেখক নাম লিখিয়াছেন—"শ্রীভুঃ—"। আমরাও মিল রাখিবার জন্যই কবিতাটি পড়িয়া, ইংরেজীতে "Pooh—Pooh!" বলিয়া ইতি দিলাম।

জানকীর অগ্নিপরীক্ষা—রামায়ণী আখ্যানভাগের এই অংশটুকু অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হইয়া খুব নির্ম্মল ও মধুর ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা সকলকেই ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহার সম্বন্ধে বিশেষ সমালোচনা অনাবশ্যক।

দার্শনিক মতের সমন্বয়—এ সকল প্রবন্ধ সাধারণের জন্য নয়,—বিশেষজ্ঞের নিকট উপাদেয় হইতে পারে। প্রবন্ধে পাণ্ডিত্যের বিশেষ কোন পরিচয় না থাকিলেও লেখকের উক্তবিষয়ে যে জ্ঞানের সীমা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ নয়, তাহা বেস অনুমিত হয়।

আদর্শ সংস্কারক দয়ানন্দ (২)—প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি। বর্ণনীয় বিষয়টি সংক্ষেপে প্রাঞ্জলভাষায় অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, ইহা আমরা স্বীকার করি।

নব্যভারত—বৈশাখ, ১৩১১। শ্রী—নববর্ষের মঙ্গল-আবাহনের সূচনা করিয়া সম্পাদক লিখিত এই "শ্রী" নববর্ষের নব্যভারতের প্রথম পৃষ্ঠা শোভিত করিতেছে। লেখকের উদারচিত্ততা ও মহান উদ্দেশ্যের আমরা শত মুখে প্রশংসা করি; কিন্তু তিনি যে ভাবে ও যে ভাষায় উহা ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা আমরা কিছুতেই প্রশংসা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। "শ্রী" এর আরম্ভ-টুকু অতি সুন্দর এবং মাঝে মাঝে ইহার দুই একটি লাইন যে সুন্দর ও সরস নয়, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু সমস্ত প্রবন্ধটি পাঠ করিলে উহাতে এত দোষাধিক্য পরিলক্ষিত হয় যে, "শ্রী" তখন ক্রমশঃ বিশ্রী হইয়া দাঁড়ায়। তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন,—"নিউটনের গভীর জ্ঞানের কথা পাঠে এক জন কৃষকের কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। রামায়ণ মহাভারত সহস্র সহস্র লোকে কত কত শতাব্দী ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছেন, কই কাহারও তেমন কোন পরিবর্ত্তন হয় না কেন?" নিউটনের আবিষ্কৃত তত্ত্ব কৃষক বুঝিতে পারে না, কাজেই রামায়ণের ও মহাভারতের কথায় দেশস্থ কাহারও তেমন উপকার হয় না বলিয়া যাহার বিশ্বাস, তাহাকে আমরা বঙ্কিম বাবু প্রণীত "লোক-রহস্যের" রামায়ণাভিজ্ঞ সাহেবটির সহিত সম্পর্ক-স্থাপন করিতে পরামর্শ দেই। রামায়ণ ও মহাভারত এ দেশের জাতীয় জীবনে কিরূপ অনন্যদেশ-সাধারণ প্রভা বিকীর্ণ করিয়াছে ও পতিতোন্মুখ প্রাসাদের দৃঢ় স্তম্ভের ন্যায় এখনও ধ্বংসের মুখ হইতে আমাদিগকে কেমন রক্ষা করিতেছে, তাহা দেবী বাবুর ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির উচ্চতর জ্ঞানালোকে এখনও উদ্ভাসিত হয় নাই জানিয়া, আমরা আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। প্রবন্ধটির অন্য একস্থানে লেখা আছে,—"কিন্তু ভাষা জাগিবে কিরূপে? এত হতাদর, এত নির্য্যাতন, এত উপেক্ষার মধ্যে ভাষা জাগিতে পারে কি?" কিন্তু দেবী বাবু জানিয়া শুনিয়া, নিজে বঙ্গভাষার উপর

সুলতান মামুদের দ্বাদশ বার আক্রমণের ন্যায় ক্রমাগত ১০।১২ খানা নভেল লিখিয়া, অযথা এরূপ অসাধারণ অত্যাচার করিলেন কেন? উপদেশ অপেক্ষা যে দৃষ্টান্ত অনেক গুণে ভাল! অন্য একস্থলে লিখা আছে,—"কেন না তুমি সে গোষ্ঠলীলার বালকগণের ন্যায় সাহিত্য-কানাইকে পবিত্রতায় সাজাইবার জন্য নিস্কাম-প্রেমব্রত গ্রহণ করিয়াছ।" এখন আমরা এই "সাহিত্য-কানাইকে" মস্যাধাররূপ কালিন্দী ছাড়িয়া, লেখনীরূপ বাঁশরী ফেলিয়া, অধুনা কামধেনুরূপ গ্রাহকবর্গের দোহন-কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করি।

সমাজ ও তাহার আদর্শ—শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু। প্রবন্ধটি এ মাসেও সমাপ্ত হয় নাই। তবে যতদূর পাঠ করা গেল, প্রবন্ধটি উপাদেয় ও সুখ-পাঠ্য হইয়াছে। বিষয়টি শক্ত, পড়িতে মাথার একটু ফস্‌ফরাস ক্ষয় হয়। আমরা ইহার সুখ-সমাপ্তি কামনা করিতেছি।

নববর্ষ—শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য; এটি কবিতা। বৈশাখে বর্ষারম্ভসূচক ধামা-ধড়া একটা কবিতা পত্রস্থ করিতেই হইবে, এমন চুক্তিতে বোধহয় কেহই সম্পাদকের কার্য্য করিতেছেন না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—এ সকল ধর্ম্মকথা সকলই সাগ্রহে পাঠ করিয়া থাকেন; ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুদিগের নিকট বস্তুতঃই ইহা উপাদেয় হইবে।

গোঁসাইজীর—ছুঁচ—প্রবন্ধটি সুপাঠ্য। মহাভারতী মহাশয়ের কলমে কায়দা আছে,—ভাষায় লালিত্য আছে; অতএব সামান্য বিষয়কে সাজাইয়া গুজাইয়া, দেশের ও দশের মনোরঞ্জন করিতেছেন। "গোঁসাইজীর ছুঁচের" ঘা যদি ব্যয়কুণ্ঠ ব্যক্তি মাত্রেরই মরমে লাগিয়া থাকে, তবেই তাঁহার শ্রম সার্থক হইয়াছে।

আঘাতে—একটি কবিতা। কবিতাটি বড়ই হৃদয়গ্রাহী হই-

য়াছে; "আষাঢ়ের" আঘাত বাস্তবিকই মরমে গিয়া লাগে। "আষাঢ়ের" গণ্ডী সঙ্কীর্ণ নহে—স্বর্গে মর্ত্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। লেখিকার পাকা হাত; সুতরাং ভাব জমিয়াছে ভাল।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী—"কঠ"—পদ্যানুবাদ,—শ্রীশশধর রায়। রয়েল আটপেজি পুস্তকে উপনিষদের ন্যায় নিতান্ত শুষ্ক বিষয়ের সুদীর্ঘ সপ্তপৃষ্ঠা-ব্যাপী "কাশীরামী" পদ্যানুবাদ পড়িতে গিয়া ধৈর্য্য-চ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। তথাপি রায় মহাশয়ের উদ্যমের প্রশংসা করি।

সাহিত্য—চৈত্র—১৩১০। সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী—পূর্ব্ববৎ; আমাদের নিকট বেস লাগে। কিন্তু মাঝে মাঝে দুইএক স্থানে যখন সঙ্কুরাম-ডায়েরী একটু বেসী হইয়া পড়ে, তখনই তেমন ভাল লাগিতে চায় না। তিনি যে সাহিত্য-সেবক তাহা আমরা সর্ব্বাংশে অনুমোদন করি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—এই কথামৃত একটু যেন খাপ-ছাড়া রকমে লিপিবদ্ধ, তাই একটু কেমন কেমন লাগে। পরমভক্ত রামকৃষ্ণ দেবের বিষয় জানিতে অনেকে আগ্রহ সহকারে অগ্রসর হইবেন সন্দেহ নাই। রিপুর উত্তেজনা—বোধহয় "বায়ুর" উত্তেজনায় লিখিত; একটু "হিমসাগরের" ব্যবস্থা করিলে মন্দ নয়। ইহাতে লেখকের বায়ুরোগ আরোগ্য হইতে পারে। শুধু পাগল সাজিলেই Hamlet হওয়া যায় না,—তাহাতে Method থাকা চাই।

সহযোগী সাহিত্য—সুরেশবাবুর "সহযোগী সাহিত্য"ও আমাদের নিকট বড়ই উপাদেয় বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু তাঁহার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি চিরকালই যে মতরজ্জমের * কার্য্য করিবেন, ইহাও আমাদের নিকট ভাল ঠেকায় না। আমরা তাহার স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত লেখা দেখিলে সুখী হইব।

মুসলমান শিক্ষাসমিতি—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। প্রবন্ধটি

* অনুবাদক।

অক্ষয়বাবুর ধীরতা ও সদ্বিবেচনার পরিচায়ক। তাঁহার সুচিন্তিত কথাগুলি মুসলমান ও অপরাপর সকল সমাজের পক্ষেই হিতকর।

রমণী—গল্পে নূতনত্ব নাই। কিন্তু কাটামে নূতনত্ব না থাকিলেও রাঙতার চমকে বেস জমাট ধরিয়াছে; লেখক ইচ্ছা করিলে ভাল গল্প-লেখক হইতে পারিবেন।

বঙ্গদর্শন—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১ ভারতীয়-জ্ঞানসাম্রাজ্য—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। বিষয়টি উপাদেয় নিঃসন্দেহ; কিন্তু মৈত্রেয় মহাশয় এ ক্ষেত্রে কথাগুলি ভাল করিয়া ফুটাইতে পারেন নাই। অনেক স্থলে এক কথারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। পাকা হাতেও এমন একটি সুন্দর বিষয় ফুটিয়া উঠিবে না, ইহা বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবন্ধটি বড়ই মনোরম ও উপাদেয় হইয়াছে। এটি একবার পাঠ করিবার জন্য সকলকেই আমরা অনুরোধ করি। এতাদৃশ প্রবন্ধ দেশের মঙ্গল সাধন করিবে। বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত পদাবলী—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত; গুপ্ত মহাশয় বহু পরিশ্রমে কতিপয় লুপ্ত দ্রব্যের উদ্ধার করিয়াছেন; সেজন্য তিনি সর্ব্বথা প্রশংসার্হ। কিন্তু উপযুক্ত নজির না দিয়া বলিলে, কাহার জিনিস কে নেয়, তাহা বুঝিব কি প্রকারে?

সাহিত্যপ্রসঙ্গ—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। মোটের উপর প্রবন্ধটি মন্দ হয় নাই। লোকে যতটুকু চায়, তাহা পায় কই?

মাধবী—কবিতা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। কবির বীণার ঝঙ্কারে রস নাই বলিলেও হয়। তবে হাত ঠিক হইয়া আসিলে, ইনি বাজাইতে পারিবেন, এমন আশা করা নেহাৎ অসঙ্গত নহে। মরমে জ্যৈষ্ঠের গরম আটকাইয়া যাওয়াতেই ভাবে গলিয়া কবি "মাধবীকে" পোষা তোতাপাখীটির প্রায় ডাকিয়াছেন; কাজেই সমালোচনার "কুলপী" অমাদিগকে উপহার দিতে হইতেছে।

ভারতীয়-দর্শনশাস্ত্র—লেখকের হাতে শক্তি আছে,—ভাষায় লা-

লিত্য আছে। ইনি শক্ত বিষয় সোজা কথায় বুঝাইতে পারেন বটে।

ভারতী—বৈশাখ, ১৩১১। ভারতীর "মাঙ্গলিক"টুকু বেস হইয়াছে; তবে নেহাৎ ছোট বলিয়া বাসনার যেন তৃপ্তিসাধন হয় না। "অনুতাপ" পাঠ করিলে, বাস্তবিকই অনুতাপের আগুনে বুক ধাঁ-ধাঁ জ্বলিয়া উঠে! এমন মৃদু-মধুর "অনুতাপ" পাঠে ইঙ্গ-বঙ্গের কেহ যদি অনুতপ্ত হন, তবে সেটাও মন্দের ভাল।

"নারায়ণী"—ইনি এবার চৌদ্দ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া পড়িয়াছেন; বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এমাসেও ইহার সমাপ্তি হইতে বহু দূরে আছেন বলিয়া মনে হয়; তাঁহার ভাষায় যে একটা মাধুর্য্য আছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। ক্রম-প্রকাশ্য উপন্যাস বা প্রবন্ধাদির ইতি না পড়িলে, সমালোচনা করা অবিধেয়।

"গীতার জ্ঞানযোগ"—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবন্ধটি বড়ই উপাদেয় হইয়াছে; ধর্ম্ম-পিপাসু সুধীবৃন্দ উহাতে বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয় পাইবেন। "আবেশ"—একটি কবিতা; কবিতাটি বেস জমিয়াছে। "আবেশ" পাঠে বাস্তবিকই ঘুমের আবেশ হয়। দেবকুমার বাবুর ভাষায় প্রাঞ্জলতার মাঝে কি যেন একটুকু অজ্ঞাত মাধুরী সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকে। "কুমারজীব"—জনৈক ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারকের জীবনী। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই আখ্যায়িকাটি পাঠ করিয়া, আমরা ততটা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। যাঁহারা গুপ্ত-রত্নের উদ্ধারসাধনে ব্রতী, তাঁহারা জগতের নমস্য; কিন্তু আধ-খেঁচরা কাজে, কি লেখক, কি পাঠক, কাহারও শ্রম সার্থক হয় না। ফল কথা, "কুমারজীব"-লেখকের শ্রম পণ্ড হইয়াছে বলিলেও হয়; যদি তিনি আর একটুকু কষ্ট স্বীকার করিতেন, তবে আমরাও যথেষ্ট প্রীত হইতাম,—তিনিও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া, সুখী হইতেন সন্দেহ নাই।

"লথ্যা"—একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা। ভট্টচার্য্য মহাশয়ের কবি-

তাটি যেন ভাঙ্গা-গড়া রকমের বলিয়া বোধ হইল; তাঁহার লেখনী যেন সম্যক্ বশে আসে নাই,—কাজেই বলগা-বিহীন ঘোটকের ন্যায় কখন উদ্দাম ছুটিয়াছে—আবার কখনও থম্‌কে-থমকে দাঁড় হইয়া গিয়াছে! মোটের উপর, কবিতাটি মানান-সই হইয়াছে।

"চীনপ্রবাসীর পত্রে" বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয় আছে; ইহার ভাষাটিও মোটের উপর মন্দ হয় নাই। "উর্ব্বশী ও তুকারাম"—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর ক্রম-প্রকাশ্য একখানি নাটক। এ মাসে বোধ হইল যেন ইহার একটি অঙ্ক শেষ হইয়া গিয়াছে; পঞ্চাঙ্ক পূর্ণ হইলেই সমালোচনা করা বিধেয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের "কালিকট্ট" প্রবন্ধটি মন্দ হয় নাই; ঐাতহাসিকগণ ইহাতে দু'একটা কথা যে নূতন না পাইবেন, এমন নহে। "প্রথম বসন্তে"—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের একখানি খণ্ড কবিতা। এই কবিতাটি এবারকার "ভারতীর" মুকুট-মণি। সরল ভাষায় এমন মধুর কবিতা আমরা অনেকদিন পাঠ করি নাই। শরৎ বাবুর লেখনীর যথেষ্ট শক্তি আছে,—তিনি মর্ত্তে স্বর্গ রচনা করিতে পারেন! "প্রথম বসন্তে" তিনি কল্পনার সাহায্যে "বিশ্ব-সখাকে" মর্ত্তে আনিয়া,—তাঁহারই বিশ্ব-রাজ্যের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখাইয়া, "পুষ্পময়" "শ্যামল পল্লবে" অঞ্জলি প্রদান করতঃ কৃতার্থ হইয়াছেন। এমন দক্ষ চিত্রকরের লেখনী হইতে অমিয়-সিঞ্চন অবশ্যম্ভাবী।

"শিলাদিত্য"—আখ্যানটি মন্দ হয় নাই; রূপকথার ছাঁচে-ঢালা প্রবন্ধগুলি শ্রুতিমধুর হয় বটে, কিন্তু সাহিত্য-জগতে ইহার স্থান অনেক নিম্নে। এ ছাড়া কতকগুলি "কল্‌কেতে" ক্রিয়াপদ—"লাগাবে," "কেটে গেল," "করতে হত," "কল্লেম," "বেড়াতেন" প্রভৃতি গড়াইয়া পড়ায়, ভাষা একটু হাল্কা হইয়া পড়িয়াছে। ফল কথা, এ প্রবন্ধটি "সখা ও সাথীর" উপযুক্ত—"ভারতীর" নয়।

দ্বিতীয় খণ্ড] আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩১১। [৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা।
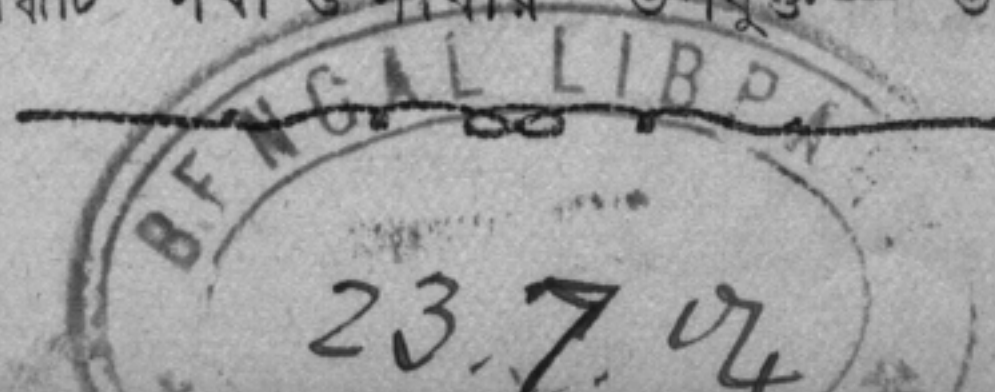
"উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ।

ধূমকেতু।

(মাসিকপত্র ও সমালোচনার সমালোচন)।

—:*:—

প্রভাত।

১
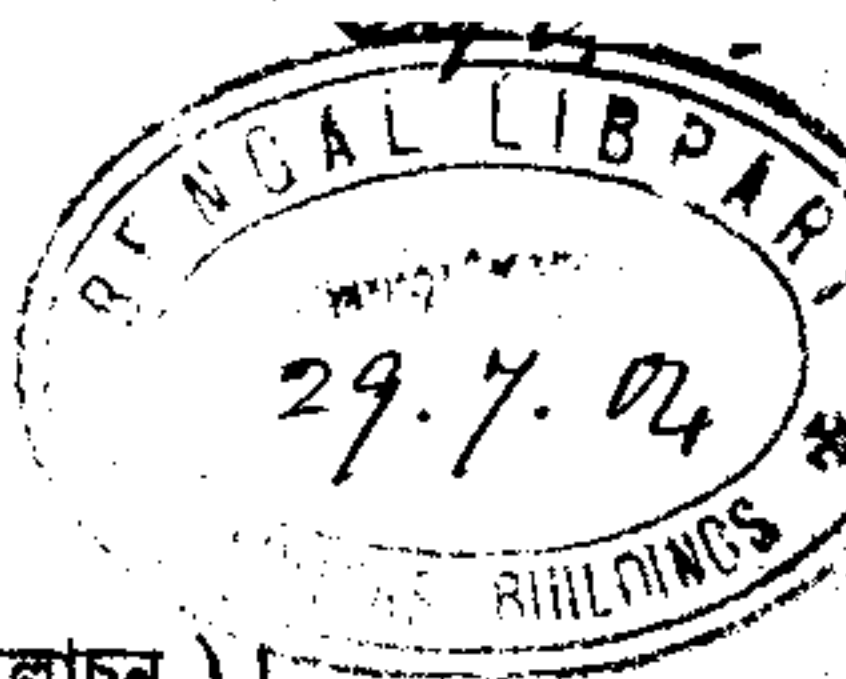
ঊষার ললাটে তরুণ তপন,
পূরব গগনে উদিল হাসি';
ধীরে মু'ছে গেল তিমির-বসন,
জড়তা মাখিল চেতনা রাশি।

২

মধুর সুতানে বিহগের দল,
জীবন্ত-পুলকে ধরিছে গান,—
যেন ঈশ-প্রেমে হ'য়ে মাতোয়ারা,
তুলিছে সোহাগে ললিত তান।

৩

সুগন্ধি শীতল প্রাতঃ সমীরণ,
মৃদুলে মধুর বহিয়া যায়,—
হৃদয়ে হৃদয়ে ঘরে ঘরে যেন
মহেশ-মহিমা বিতরে ত'ায়।

৪

স্নিগ্ধ-শুভ্র-হাসি সেফালী কামিনী,
খসিয়া পড়িছে অবনী-তলে,—
নীরবে তাহারা অর্পিছে অঞ্জলি,
বিভুর চরণে পূজার ছলে।

৫

এ শুভ-প্রভাতে জাগ্রত জগত,
অর্চ্চিছে আপন অভীষ্ট দেবে;
তুমি কেন সখা! সুষুপ্তির কোলে,
অচেতন হেন?—জাগিবে কবে?

শ্রীকামিনীকুমার দে রায়।

দেওয়ান ইসা খাঁ মসনদ আলি।

আজ যে মুসলমান মহাপুরুষের ইতিকথা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইলাম, একদিন ইনি এতদ্দেশের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। কিন্তু হায়! নির্ম্মম কাল-কীট তঁহার স্মৃতি-লেখা এমন ভাবেই নষ্ট করিয়াছে যে, সেই নষ্টোদ্ধারের কোন উপায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সকল প্রাচীন নজিরের বলে এই মহাত্মার জীবনীর অবতারণা করিলাম, তৎসমুদয় প্রায়শঃ কীট-দংষ্ট আবর্জ্জনা রাশি হইতে সংগৃহীত। কিন্তু সে সকল দলিল দস্তাবেজের অধিকাংশই দুষ্পাঠ্য হওয়ায়, প্রবন্ধটির আশানুরূপ অঙ্গপুষ্টি হয় নাই। তথাপি এই পুণ্য-কাহিনী বিবৃত করিতে যথাসম্ভব যত্ন নিয়াছি।

পূর্ব্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জিলার অবস্থান; উক্ত জিলার

অন্তর্গত হাজরাদি, হোসেনসাহি, নসিরুজিয়াল প্রভৃতি পরগণার অধিকাংশ স্থানই হয়বৎনগর-জঙ্গলবাড়ী নামে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মাত্র পঞ্চাশ বিঘা ভূমি মূল জঙ্গলবাড়ীর অন্তর্ভুক্ত এবং উহাই স্বনামখ্যাত দেওয়ান ইসা খাঁ মসনদ আলির পূর্ব্ব-পুরুষদিগের আদি বাসস্থান।

দেওয়ান কালিদাস সিংহ গজদানী উক্ত জঙ্গলবাড়ীর দেও-য়ান বংশের আদিপুরুষ। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন; প্রত্যহ এক একটী স্বর্ণ-গজ দান করিতেন বলিয়াই এই মহাত্মা "গজদানী" নামে পরিচিত। দেওয়ান কালিদাস গৌড়ের শাসন-কর্ত্তা বাহাদুর শাহার দেওয়ান ছিলেন; সেই সূত্রেই তাঁহার বংশধরগণ "দেওয়ান" বলিয়া অভিহিত হন। কালিদাস সিংহের আদি বাসস্থান অযোধ্যা প্রদেশে ছিল। বাহাদুর শাহা নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে, তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর জেলালউদ্দিন * গৌড়ের গদিতে বসেন। সিংহাসন প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে জেলালউদ্দিনও একটি শিশু পুত্র ও তিনটি কন্যা রাখিয়া অনন্ত-ধামে চলিয়া যান।

বাহাদুর শাহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই সৈয়দ ইব্রাহিমের সহিত জেলালের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়; এবং দ্বিতীয়া কন্যাকে ভারত-বিখ্যাত কালাপাহাড় বিবাহ করেন; মাত্র কনিষ্ঠা কন্যাই অনূঢ়া ছিলেন। সৈয়দ ইব্রাহিম এক জন ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন; পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও আস্থা ছিল। দেওয়ান কালিদাস সিংহ ইঁহার সহিত ধর্ম্মবিষয়ক তর্কে পরাভূত হইয়াই ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পর কালিদাস সিংহ "সোলেমান খাঁ" নাম গ্রহণ করতঃ জেলা-

---

* ইঁহার অপর নাম জৈনউদ্দিন—Marshman's History of Bengal.

নের কনিষ্ঠা কন্যার পানিগ্রহণ করেন। জেলালউদ্দিনের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই তাঁহার শিশু পুত্রটিও পরলোকগমন করে। এই সুযোগে দেওয়ান সোলেমান খাঁ গৌড়ের শূন্য সিংহাসন অধিকার করতঃ তদানীন্তন দিল্লীশ্বর আকবরের প্রীতি সম্পাদনার্থ বহুতর মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেন। বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও ত্রিবেণী পর্য্যন্ত ইঁহার অধিকার ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। দেওয়ান ইস্‌মাইল খাঁ ও দেওয়ান ইসা খাঁ নামক দুইটি পুত্র রাখিয়া দেওয়ান সোলেমান খাঁর মৃত্যু হয়। পুত্রদ্বয় ব্যতীত সায়েন্নেছা নাম্নী তাঁহার এক কন্যাও ছিল; বোগদাদের বাদশাহ খলিফা হারুণ ওল রসিদের জনৈক বংশধরের সহিত সায়েন্নেছার বিবাহ হয়। সুতরাং গৌড়ের সিংহাসন হইতে তিনি অনেকটা দূরে সরিয়া পড়েন।

দেওয়ান ইস্‌মাইল খাঁ গৌড়ের মস্‌নদে বসিয়া সম্রাট আকবরের প্রাপ্য নির্দ্ধারিত বার্ষিক কর বন্ধ করিয়া দেন; ইহার ফলে এক যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধেই দেওয়ান ইস্‌মাইল খাঁ নিহত হন। অতঃপর দেওয়ান ইসা খাঁই গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনিও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পন্থাবলম্বন করায়, সম্রাট আকবর তদীয় দক্ষ সেনাপতি সাহাবাজ খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সম্রাট-সেনানীর সহিত ইসা খাঁর যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইসা খাঁ পরাভূত হইয়া সপরিবারে চট্টগ্রামের দিকে পলাইয়া আসেন। *

চট্টগ্রাম হইতে ইসা খাঁ পূর্ব্বোক্ত জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানে উপস্থিত হন। স্থানটি গভীর অরণ্যময় ও বিবিধ হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি ছিল বলিয়াই ইহার নামকরণ হয়—"জঙ্গলবাড়ী"। দেওয়ান ইসা খাঁর আগমনের পূর্ব্বে উক্ত জঙ্গলময় স্থানে কোঁচগণ বসবাস করিতেছিল। কোঁচ-রাজ লক্ষণসিংহের বাড়ীর

* "আল্লামি" নামক পারসিক গ্রন্থের ১১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চিহ্নাদি অদ্যাপিও তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। উক্ত কোঁচ-রাজের বাড়ীর চারিদিকে দুইশত হস্ত প্রশস্ত একটি গাঙ্গিণা ও দক্ষিণদিকে ত্রিশ হস্ত প্রশস্ত একটি রাস্তা ছিল; বর্ত্তমান সময়েও সে সকলের জীর্ণ নিদর্শন রহিয়াছে। দেওয়ান ইসা খাঁ প্রথমতঃ সদলবলে উক্ত রাজবাটীতে প্রবেশ করেন; কোঁচ-রাজ লক্ষণসিংহ তাঁহার ভয়ে বাড়ীর পূর্ব্ব দিকের গাঙ্গিণাংশের সলিলাভ্যন্তরস্থ এক গোপনীয় ইষ্টকময় রাস্তা দিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন।

দেওয়ান ইসা খাঁ জঙ্গলবাড়ী অধিকার করিয়া ক্রমশঃ স্বীয় অধিকার বিস্তারে যত্নবান্ হন। ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী দেওয়ানবাগ ও হাজিগঞ্জে এবং ব্রহ্মপুত্র-তীরবর্ত্তী এগারসিন্ধু, সেরপুর-দশকাহনিয়া ও রাঙ্গামাটিতে তিনি এক একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইসা খাঁর এতাদৃশ স্বাধীন আধিপত্য বিস্তারের সংবাদ শ্রবণে তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে নেওয়ার জন্য সম্রাট আকবর তদীয় বিখ্যাত রাজপুত-সেনাপতি রাজা মানসিংহকে এ অঞ্চলে সসৈন্য প্রেরণ করেন। প্রথমতঃ রাজা মানসিংহ ঢাকার নিকটবর্ত্তী ডেমরা নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করেন; এবং উহার নিকটস্থ একস্থানে একটি দীর্ঘিকা খনন করতঃ তাহাতে বারতীর্থের জল নিক্ষেপ করিয়া "গঙ্গাসাগর" নাম প্রদান করেন। * উক্তস্থান অদ্যাপিও রাজার বাগ নামে পরিচিত। ঐ দীর্ঘিকার জলে আজ পর্য্যন্তও বারুণী এবং বাসন্তী অষ্টমী উপলক্ষে স্নান তর্পণাদি হইয়া থাকে এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে তদুপলক্ষে মেলা বসিয়া থাকে।

ডেমরায় শিবির সংস্থাপনের পর দেওয়ানবাগের দুর্গে ইসা খাঁ ও মানসিংহের মধ্যে একটি যুদ্ধ হয়। ইসা খাঁ সেই যুদ্ধে

---

* স্বর্ণগ্রামের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

পরাজিত হইয়া এগারসিন্দুর দুর্গে * আশ্রয় গ্রহণ করেন। মানসিংহও ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি সদলবলে ইসা খাঁর অনুসরণ করিয়া এগারসিন্ধুতে উপস্থিত হন।

ক্রমাগত তিন দিবস অবিরাম যুদ্ধের পর উভয় পক্ষের বহু সৈন্য নষ্ট হইয়া গেলে, ইসা খাঁ ও মানসিংহের মধ্যে একক‌যুদ্ধের প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাব ইসা খাঁ সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করতঃ এককযুদ্ধার্থ অশ্বারোহণে বহির্গত হন। কিন্তু সুচতুর রাজপুত-সেনানী যুদ্ধস্থলে স্বয়ং না গিয়া তদীয় জামাতাকে প্রেরণ করেন। জামাতাটি রণ-কুশল হইলেও বহুক্ষণ যুদ্ধের পর ইসা খাঁর সুশাণিত তরবারির আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। মোগল সম্রাটের সুবিখ্যাত রাজপুত-সেনাপতি নিহত হইল; এই বিবেচনায় ইসা খাঁর পক্ষ হইতে অবিরাম জয়ধ্বনি হইতে থাকে। কিন্তু রাজা মানসিংহ কালবিলম্ব না করিয়া, লগুড়াহত সর্পের ন্যায় সমরাঙ্গণে সমুপস্থিত হইলে, ইসাখাঁর চমক ভাঙ্গিল,—বুঝিলেন; রাজপুত-সেনানীর চাতুরীজালে তিনি সর্ব্বথা প্রবঞ্চিত হইয়াছেন! যাহা হউক, তথাপি তিনি পশ্চাদ্‌পদ হইলেন না; সমকক্ষ যোদ্ধ্‌যুগলের মধ্যে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ হইল,—বহুক্ষণ তাঁহারা স্ব স্ব রণ-কৌশল প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সূর্য্যাস্তের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে সিদ্ধহস্ত সমর-পটু ইসা খাঁর তরবারির আঘাতে মোগল-সেনাপতি অমিতবল রাজা মানসিংহের হস্তস্থ তলোয়ারখানা ভগ্ন হইয়া গেল! ইসা খাঁ তৎক্ষণাৎ অপর একখানা তরবারি কোষ হইতে বাহির করিয়া মানসিংহকে অর্পণ

* এই স্থানটি ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমার এলাকাধীন ব্রহ্মপুত্র-তীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ মঠখোলা নামক স্থানের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এগারসিন্ধু দুর্গের ভগ্নাবশেষ বা কোন চিহ্নাদি এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মানসিংহ তৎপ্রদত্ত তলোয়ার গ্রহণ না করিয়া, অবিলম্বে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। ইহাতে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ইসা খাঁ বুঝিয়া লইলেন যে, রাজপুতগণের ধমনীতে যতক্ষণ শোণিত-প্রবাহ বহিতে থাকে, ততক্ষণ তাহারা অপরের অস্ত্রে যুদ্ধ করাটা অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকে। দেওয়ান ইসা খাঁ আরও বুঝিলেন, মল্লযুদ্ধ করাই মানসিংহের আন্তরিক অভিপ্রায়। অতএব দেওয়ান সাহেব তন্মুহূর্ত্তে অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করতঃ মল্লযুদ্ধের জন্য সম্যক্ প্রস্তুত হইলেন।

ইসা খাঁর হৃদয়নিহিত অমিতবলের অগ্নি পরীক্ষা হইল! মানসিংহ বুঝিলেন, এই মুসলমান মহাপুরুষ সর্ব্বতোভাবে সম্মানের পাত্র। সুতরাং তিনি যুদ্ধ করিতে বিরত রহিলেন এবং তাঁহার কর গ্রহণ করতঃ সখ্যতার অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। দুইটি প্রতিকূল-শক্তির অভাবনীয় সুখ-সম্মিলনে পূর্ব্ববঙ্গে আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিল! উভয় পক্ষের শিবির হইতেই মঙ্গলবাদ্য গভীর আরাবে বাজিয়া রজনীর তন্দ্রাময়ী প্রাথমিক নিস্তব্ধতা ভগ্ন করতঃ জগতের কাণে কাণে বলিয়া দিল—"আজ এক শুভ দিন ;—পূর্ব্ববঙ্গের গৌরবস্থল দেওয়ান ইসা খাঁর সহিত মোগল সেনানী রাজা মানসিংহ সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন!"

রাজা মানসিংহ বন্ধুবর ইসা খাঁর অরণ্যময় রাজ্যে কিছু দিন অবস্থানের পর দিল্লী যাইতে উদ্যত হইলেন। বিদায়ের কাল সমাগত হইলে, রাজ-মহিষী ইসা খাঁকে তাঁহাদের সহিত দিল্লীতে গমন করণার্থ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন; যেহেতু সম্রাট আকবরের এরূপ আদেশ ছিল,—"দুর্দ্দান্ত ইসা খাঁকে বন্দী করিয়া আনিতে না পারিলে মানসিংহের শিরচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী"। *

সুতরাং রাজমহিষী দেওয়ান ইসা খাঁকে বিনীতভাবে বলিলেন— "মহাশয়! আপনার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির নিকট অনুরোধ করিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি না; আপনি হয়ত জানেন না, সম্রাটের আদেশ—আপনাকে দিল্লীতে না লইয়া গেলে, আমার স্বামীর ছিন্নমুণ্ড বাদশাহের দর্শনীয় হইবে! অতএব যদি বন্ধু-স্ত্রীর বৈধব্য-যন্ত্রণা দেখা আপনার অভিপ্রেত না হয়, তবে আপনাকে দিল্লী যাইবার জন্য আমি অনুরোধ করিতে পারি।" মিত্র-পত্নীর সকরুণ বাক্যে হৃদয়বান্ ইসা খাঁর হৃদয়-তন্ত্রীতে বিষম আঘাত লাগিল! সুতরাং তিনি বন্ধু ও তৎপত্নীর সহিত দিল্লীতে যাইতে সম্মত হইলেন। দেওয়ান সাহেব সম্রাট-সমীপে সমুপস্থিত হইলে, দিল্লীশ্বর আকবর বাদশাহ তাঁহাকে অন্যায়রূপে কারারুদ্ধ করিলেন। *

বন্দী দেওয়ান ইসা খাঁ রাজা মানসিংহ ও রাজসহোদরা সম্রাট-সীমন্তিনী দ্বারা স্বীয় বংশমর্য্যাদা ইত্যাদি সম্রাটের নিকট জ্ঞাপন করতঃ কারামুক্ত হইলেন। সম্রাট প্রধান সেনাপতির নিকট ইসা খাঁর সাহসিকতা ও সহৃদয়তার বিবরণ আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করতঃ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে স্বীয় মস্‌নদের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া, সম্মান-সূচক "মস্‌নদ আলি" উপাধি, বাইশ পরগণার †

* আকবর-নামা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

† বাইশ পরগণা যথা,—আটিয়া, কাগমারি, বরবাজু, সেরপুর, জোয়ানসাহি, আলাপসিংহ, জফরসাহি, নসিরুজিয়াল, খালিয়াজুড়ি, গঙ্গামণ্ডল, পাইট্‌কারা, স্বর্ণগ্রাম, বরদাখাত ও বরদাখাতমন্‌রা, হোসেনসাহি, ভাওয়াল, মহেশ্বরদি, কাটারাব, কুড়িখাই, জোয়ারহোসেনপুর, সিংহধা, দরজিবাজু ও হাজরাদি। এই বাইশ পরগণা পরগণে মসরতসাহির তপ্পা বলিয়া সম্রাটের

নিষ্কর আধিপত্য, এবং চারি গাজি, চারি মজ্‌লিশ ও চারি আসাহেব—অর্থাৎ দ্বাদশ অমাত্য প্রদান করিয়া প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করতঃ বাঙ্গালার শাসনকার্য্যের ভার দিয়া এতদ্দেশে প্রেরণ করেন। *

অতঃপর দেওয়ান ইসা খাঁ মস্‌নদ আলি দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া পুনঃ জঙ্গলবাড়ীতে উপনীত হন। তাঁহার অমাত্যগণের মধ্যে আসাহেবগণ শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত তরপ প্রভৃতি স্থানে স্ব স্ব বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লন; মজলিশগণ খালিয়াজুড়ি ও নসিরুজিয়াল পরগণায় বসবাস করিতে থাকেন; এবং গাজিগণ ভাওয়াল ও সেরপুর পরগণা গ্রহণে তত্তৎস্থানে স্ব স্ব আবাসভূমি নির্দ্দিষ্ট করেন। ভাওয়াল ও সেরপুর পরগণায় অদ্যাপিও গাজিদের বংশধরগণ সামান্য গৃহস্থরূপে বর্ত্তমান আছেন, এবং নসিরুজিয়াল পরগণার অন্তর্গত পাঁচকাহনিয়া-ফতেপুর গ্রামে অদ্যাপিও মজলিশদিগের বংশধরগণ বসবাস করিতেছেন। রোয়াইল গ্রামে প্রসিদ্ধ মজ্‌লিশ জালালের বাড়ীর ভগ্ন অট্টালিকা ও বিবিধ কারুকার্য্য সমন্বিত স্ফটিকস্তম্ভাদি অদ্যাপিও এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করিতেছে।

অমাত্যগণের মধ্যে চারিটি পরগণা বিভাগ করিয়া দিয়া, অবশিষ্ট অষ্টাদশটি পরগণার আধিপত্য লইয়াই দেওয়ান ইসা খাঁ মস্‌নদ আলি সাহেব সন্তুষ্ট রহিলেন। ইনি স্বীয় মস্‌তাত ভগ্নীকে—অর্থাৎ সৈয়দ ইব্রাহিমের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দুইটি পুত্র ও পত্নী বর্ত্তমান রাখিয়া পরিণত বয়সেই দেওয়ান ইসা খাঁ মস্‌নদ আলির লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে।

শ্রীকামিনীকুমার দে রায়।

---

* [illegible] নামক প্রাবন্ধিক [illegible] দ্রষ্টব্য।

গোলাপ।

পুষ্প সৃষ্টির অতুল সম্পদ। রূপ, রস, ও গন্ধ—প্রীতি, ভক্তি ও পবিত্রতা যেন এক অঙ্গে মিশিয়া কাননের কোলে পুষ্পরূপে বিকশিত হইয়াছে। প্রাণারাধ্য জগজ্জীবন জগদীশ্বরের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে, পুষ্প তাহার উপকরণ। বর-বর্ণিনী শুভ-দৃষ্টির পরে বরের সংবর্দ্ধনা করিবেন, পুষ্পই বরমাল্য ও বরণ-ডালার একমাত্র আভরণ। ধর্ম্ম-পিপাসু ধর্ম্ম-কথা শুনিবেন, করে পুষ্পধারণই তাঁহার তদানীন্তন অন্তঃশুচি সংবিধানের প্রধানতম সাধন। এহেন পুষ্প-জগতে গোলাপ এক্ষণ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কি সৌন্দর্য্যে, কি সৌরভে ইহা সকলের নিকটই আদরণীয়। আমাদিগের এত আদরের যূঁই, বেলী ও চামেলীকে সাহেবেরা ভালবাসেন না। আবার বিলেতী ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা, কি কারণে বিলেতী সমাজে এত অধিক আদর প্রাপ্ত হয়, আমরাও তাহা বুঝি না। গ্রাণ্ডিফ্লোরা ভাল নহে, ইহা বলা আমাদিগের ইচ্ছা নয়; তবে উহার অত্যধিক আদর দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিলাতে উহার এক একটি ফুল সময়ে পাঁচ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে! যাহা হউক, ফুল সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন মত হইলেও গোলাপকে সকলেই প্রায় তুল্যভাবে দেখিয়া আসিতেছেন।

ইংরেজেরা গোলাপকে "Green of beauty" বা সৌন্দর্য্যের রাণী বলিয়া অভ্যর্থনা করেন। মুসলমান-সমাজে গোলাপের সিংহাসন উচ্চতম বেহেস্তেরও এক গ্রাম উর্দ্ধে অবস্থিত। গোলাপ ভারতের নিজস্ব সম্পদ নহে; যেহেতু হিন্দুর প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য প্রভৃতির মধ্যে কোথাও গোলাপের উল্লেখ দেখা

যায় না। গোলাপ যদি ভারতের বস্তু হইত, তাহা হইলে, কজ্জল-নয়না অপ্সরার নীলাক্ষির ন্যায় ভ্রমরকৃষ্ণা, গন্ধহীনা অপরাজিতা, অপরাজিতা হইতে পারিত না,—গোলাপই অপরাজিতা নামে নমস্কৃত ও শক্তিধর শাক্তের ইষ্টপূজার সামগ্রী রূপে সংবর্দ্ধিত হইত, এবং তাহা হইলে, মন্দার বা "মান্দার" ফুলের পরিবর্ত্তে গোলাপই ইন্দ্রের নন্দন-কাননে পারিজাত রূপে পূজা পাইত। গোলাপ ভারতের হউক, আর নাই হউক, ভারতের হিন্দুও এখন গোলাপের প্রশংসায় উন্মুক্ত-প্রাণ ও স্বতঃপ্রবৃত্ত শত-জিহ্ব। গোলাপ বিলাসের বিলোল-বিভবে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় ঢল-ঢল বলিয়াও, হিন্দুর প্রাণ সম্ভবতঃ উহাকে ফুল-রাজ্যের সীতা-সরোজিনী নামে নমস্কার করিতে চাহিবে না; কিন্তু তাহা না চাহিলেও, সে যে উহাকে ভারতের মোগলাই রাণী জগজ্জ্যোতিঃ নুরজাহান নামে প্রীতির সহিত অভিহিত করিতে প্রস্তুত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কথিত আছে, মুসলমানদের রাজত্ব কালে পারস্য দেশ হইতে গোলাপ সর্ব্বপ্রথম ভারতে আনীত হয়। কোন্ সময়ে,—কোন্ বাদশাহের রাজত্ব কালে উহা আনীত হইয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা এক প্রকার অসম্ভব। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময়ে যে, এদেশে গোলাপ ছিল, তাহা বোধ হয় একরূপ স্থির নিশ্চিত কথা। শুনা যায়, জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষী নুরজাহানই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে গোলাপী আতরের সৃষ্টি করেন।

গোলাপ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। উদ্যানজাত গোলাপ (Garden Rose) এবং বন্য গোলাপ (Wild Rose)। অনেকের বিশ্বাস, বন্য গোলাপের গাছে কখনও ফুল হয় না; গোলাপ সম্বন্ধে প্রকৃতির স্বভাবজাত সৌন্দর্য্যের অক্ষয়

তাহারাও যেন উদ্যানপালের নগণ্য কোদালি ও ক্ষুরপাইর কাছে ক্ষীণশক্তি ও হীনসম্বল। কিন্তু একথা ঠিক নহে; বন্য গোলাপ শ্রেণীতেও অনেক সুদৃশ্য ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। শোভা ও স্বভাব-মাধুর্য্যে বনলতার কাছেও সময় সময় উদ্যান-লতার পরাজয় ঘটে। শকুন্তলারূপিণী বন-যূথিকার সৌরভ-মাধুরীদ্বারা দুষ্মন্তের ন্যায় রাজাধিরাজও সময় সময় উদ্যান-সম্পদে বীতস্পৃহ হইয়া থাকেন। যাহা হউক, এই প্রবন্ধে আমরা উদ্যানজাত গোলাপের বিষয়ই আলোচনা করিব।

গোলাপ গাছের আকৃতি অনুসারে গোলাপকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—দীর্ঘ (Standard Rose), ছোট বা খর্ব্ব (Dwarfs), এবং গোলাপ-লতা বা লতানে (Climbing) গোলাপ।

স্যর জোসেফ্ হুকার (Sir Joseph Hooker) সমগ্র ব্রিটীশ দ্বীপের গোলাপকে সাতটি বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। বন্য গোলাপও তৎকৃত শ্রেণী-বিভাগের অন্তর্গত। যে যে জাতীয় গোলাপ বিশেষ পরিচিত, আমরা উহাদের নাম নিম্নে দিলাম।

(১) রোজা সেন্টিফোলিয়া (Rosa Centifolia)বা বাঁধা কপি জাতীয় গোলাপ। কথিত আছে, ককেসস্ পর্ব্বতের নিকট-বর্ত্তী স্থান ইহার আদি বাসভূমি।

(২) রোজা গেলিকা (Rosa Gallica) বা ফরাসী দেশীয় গোলাপ। ইউরোপের দক্ষিণাংশে এই গোলাপ প্রথম উৎপন্ন হয়।

(৩) বার্‌বন (Burbon) জাতীয় গোলাপ। এই গোলাপ ফ্রেঞ্চ গোলাপ ও রোজ সেন্টিফোলিয়া জাতীয় গোলা-পের মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। এই গোলাপ সর্ব্বপ্রথম "বার্‌বন্" দ্বীপে উৎপন্ন হয়।

(৪) রোজা পলিয়েন্‌থা (Rosa Polyantha) বা জাপান দেশীয় গোলাপ।

(৫) রোজা ডেমাছ্‌সিনা (Rosa Damas Cena) বা পাটনাই গোলাপ। গাজিপুরে ইহার চাষ হইয়া থাকে।

(৬) চায়না রোজ (Chiana Rose) বা চীনদেশীয় গোলাপ।

যে সকল জাতীয় গোলাপের কথা বলা হইল, তাহাদের পরস্পর সংমিশ্রণে আরও বহুশ্রেণীর গোলাপ উৎপন্ন হইয়াছে। সংমিশ্রণে যে সকল জাতীয় গোলাপ উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে হাইব্রীড্‌ পারপিচুয়েল্‌ (Hybrid Perpetual) জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কোন্‌ সময়ে ইহা প্রথম প্রচলিত হয়, তাহা ঠিক করিবার উপায় নাই। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে প্রিন্সেস্‌ হেলেন (Princesse Halene) নামক হাইব্রীড্‌ পার্‌পিচুয়েল গোলাপ প্রচলিত হয়। ইহার পূর্ব্বে এই শ্রেণীর কোন গোলাপের বিষয় আদৌ জানা যায় নাই। এই শ্রেণীর গোলাপের প্রাধান্যের কারণ যে, এই গোলাপ তুষারবর্ষী শীতেও সঙ্কুচিত হয় না, নিদাঘের দারুণ উত্তাপেও শুকাইয়া যায় না। ইহার প্রাণের ভিতর সর্ব্বদাই যেন বসন্তের আনন্দোচ্ছ্বাস ! সুতরাং এই শ্রেণীর গোলাপ গাছে শীত গ্রীষ্ম উভয় সময়ই ফুল ফুটিয়া থাকে। এদেশে টি (Tea) এবং নয়সেটি (Noisette) জাতীয় গোলাপও বিশেষরূপে পরিচিত। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে পারসন্ (Person) নামক একজন ইংরেজ সর্ব্বপ্রথম টি জাতীয় গোলাপ উৎপন্ন করেন।

নয়সেটি জাতীয় গোলাপের বিশেষত্ব এই যে, উহার এক-গুচ্ছে অনেক ফুল হয়। গাছের পাতা গাঢ় হরিৎ বা সবুজ বর্ণের এবং গাছগুলি উচ্চ ও হুকের মত কাঁটায় মণ্ডিত। কণ্টক-

শয্যায় সবুজ আস্তরণ পাতিয়া, নয়সেটি গোলাপগণ প্রাণে-প্রাণে-গাঁথা আজন্ম সখির ন্যায় গুচ্ছে গুচ্ছে হাসিতে থাকে। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে ফিলিপ্ নয়সেটি (Phillip Noisette) নিজের নামানুসারে গোলাপ উৎপন্ন করিয়া আমেরিকা হইতে তদীয় ভ্রাতা লুই নয়সেটির (Louis Noisette) নিকট প্রেরণ করেন।

বর্ত্তমান সময়ে পীত, হরিৎ, শ্বেত, রক্ত, নীল, কমলা, পিঙ্গল, নীলাভ রক্ত, রক্তাভ শ্বেত প্রভৃতি বিবিধ রঙ্গের গোলাপ দেখিতে পাওয়া যায়; গোলাপের এই উন্নতির মূল ইংলণ্ড ও ফ্রান্স। বর্ণ বিষয়ে গোলাপের বিশেষ উন্নতি হইলেও সুগন্ধ সম্বন্ধে ইহার বিশেষ কোন উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রতি বৎসর অনেক নূতন নামের গোলাপ উৎপন্ন হইতেছে। উহাদের অধিকাংশই অপকৃষ্ট শ্রেণীর। শতকরা দশটি ভাল গোলাপ উৎপন্ন হয় কি না সন্দেহের বিষয়। একমাত্র ফ্রান্সেই প্রতি বৎসর ৫০। ৬০ রকমের গোলাপ উৎপন্ন হইতেছে। ইংলণ্ডে এত অধিকসংখ্যক গোলাপ উৎপন্ন না হইলেও যাহা হয়, তন্মধ্যে ভাল গোলাপের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী। ইংলণ্ডের মধ্যে "ডিভনসায়ার" ও "ওয়াল্থাম" গোলাপের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ "ডিভনিয়েনসিস্" (Devoniensis) গোলাপ "ডিভনসায়ারে" সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন হয়। বিউটি অব্ ওয়ালথাম (Beauty of Waltham), ষ্টার অব্ ওয়ালথাম (Star of Waltham) প্রভৃতি গোলাপ ওয়াল্থামের পরিচায়ক।

যাহারা গোলাপ সম্বন্ধে বিশেষ খবর রাখেন না, হলুদ রঙ্গের গোলাপের মধ্যে একমাত্র মার্সেল নীল (Marchal Niel) তাহাদের নিকট বিশেষ পরিচিত। বাস্তবিক মার্সেল নীল হলুদ রঙ্গের গোলাপের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। রূপ

অথ্ গোল্ড (Cloth of Gold), ইছাবেলা গ্রে (Isabella Gray) এবং জেন্ হার্ডি (Jane Hardy) প্রভৃতিও উচ্চ শ্রেণীর হলুদ-গোলাপ। ১৮২৪ খৃঃ অব্দে পার্কস্ সাহেব (Parkes) সর্ব্বপ্রথম হলুদ-গোলাপ উৎপন্ন করেন।

ব্লু বা নীল রঙ্গের গোলাপকে কেহ কেহ কবির কল্পনা বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিন্তু যাহারা বর্দ্ধমানের মহারাজার গোলাপের বাগান দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবেন না। একখানা সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে, সাদা গোলাপের কলম তুঁতের জল সিঞ্চনে বর্দ্ধিত করিলে, তাহাতে নীলরঙ্গের গোলাপ হইয়া থাকে। কিন্তু এ বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে পারি না।

কমলারঙ্গের গোলাপের মধ্যে রিচার্ডসন (W. H. Richardson) সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইহার গাছ যেমন সবল, ফুলও তেমন বেশী হইয়া থাকে। ভারডিফ্লোরা (Verdiflora) বা গ্রীণ রোজের নাম অনেক গোলাপ-ব্যবসায়ীর কেটেলগে দেখা যায়। যাহাদের গোলাপের সখ আছে, তাহারা এই গ্রীণ-রঙ্গের গোলাপ কিনিবার জন্য ব্যস্ত হন। কিন্তু এই ফুলের সুগন্ধ বা সৌন্দর্য্য কিছুই নাই। ফুলগুলি কতিপয় সবুজরঙ্গের পত্রের সমষ্টি মাত্র।

এত বিভিন্ন নামের গোলাপ হইয়াছে যে, একমাত্র মল্লিকা (Chrysanthemum) ভিন্ন কোন ফুলই সংখ্যায় গোলাপের সমীপস্থ হইতে পারে না। সাহারাণপুর গবর্ণমেণ্ট বোটানিক্যেল গার্ডেনের (Government Botanical Garden) গোলাপ গাছের বিবরণীতে পাঁচশতের উপর গোলাপের নাম দৃষ্ট হয়! এত অধিকসংখ্যক গোলাপ হইতে ভাল গোলাপ নির্ব্বাচন করাও কষ্টকর। আমরা অন্যূন পঞ্চাশ রকমের গোলাপ পরীক্ষ-

করিয়া দেখিয়াছি। সেই পরীক্ষিত গোলাপের কএকটির সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

গোলাপের মধ্যে পলনেরন্ (Paul Neron) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উক্ত ফুলের ব্যাস ৬ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইতে দেখিয়াছি। দুঃখের বিষয়, এমন সুন্দর ফুলে গন্ধ নাই বলিলেও চলে। আমাদের কোন বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহার বাগানে ৬ইঞ্চি ব্যাসের একটি কেপ্‌টেইন ক্রিছ্‌টি (Captain Cristy) ফুটিয়াছিল; কিন্তু পল্‌নেরন্ হইতে বড় গোলাপ আমরা এপর্য্যন্ত দেখি নাই।

লা ফ্রান্স (La France) একটি প্রথম শ্রেণীর গোলাপ; উহারও ফুলও ৫ইঞ্চি ব্যাসের হইতে দেখিয়াছি। উহার রং যেমন সুন্দর, গন্ধও তেমন মধুর। বৎসরের সকল সময়ই এই ফুল ফুটিয়া থাকে। ইহার সুরূপ ও সুগন্ধের ভাণ্ডার বারমাসই পরিপূর্ণ রহে।

হার মেজেষ্টি (Her Majesty) গোলাপের পাপড়িগুলি অন্যান্য গোলাপ হইতে একটু পুরু,—ফুলগুলিও দীর্ঘকাল স্থায়ী; ইহাতে গন্ধ মাত্রই নাই এবং বৎসরে ৬। ৭টির বেশী ফুল উহাতে জন্মে না। সাহেব মহলে ইহার বেস আদর আছে। Her Maejsty বলিলে যে, রাজরাজেশ্বরীর মর্ত্ত্য-সিংহাসনারূঢ়া দিব্য প্রতিভার কথা মনে পড়ে; যাঁহার যশঃ-সৌরভে পৃথিবী প্লাবিত,—বোধ হয় স্বর্গলোকও আজি সুরভিত, তাঁহারই নামে নামাঙ্কিত পুষ্প সৌরভ-শূন্য! ইহা আমাদের নিকট ভাল লাগে নাই। নাম-নির্ব্বাচক বাহ্যিক আড়ম্বরেই মুগ্ধ,—অন্তর্মাধুরীতে একেবারেই দৃষ্টিহীন।

ডিভনিয়েন্‌সিস্ (Devoniensis) ফুলগুলির গন্ধও অতি মধুর; ফুলও অজস্র ফুটিয়া থাকে। ইহার রং রক্তাভ;

বোঁটাগুলি দীর্ঘ হওয়ায় বেস সুন্দর দেখায়। ইহার কঁচি পাতাগুলি অন্যান্য গোলাপের পাতা হইতে অনেকটা বিভিন্ন। ব্লেক্ প্রিন্স (Black Prince) গাঢ় লালরঙ্গের ফুল,—গন্ধও বেস মধুর। এই জাতীয় ফুল অতি কম ফোটে। ককেট্ ডি ব্লাসের (Coquette de Blush) ফুল বরফের মত সাদা, মাঝে মাঝে রক্ত চন্দনের বিন্দুর মত বিন্দু-বিন্দু চিত্র। এই ফুলগুলি দেখিতে বড়ই মনোরম। দেখিলে মনে হয়, যেন কণ্টকিত গোলাপতরু আপন ফুল-সম্পদে রক্তচন্দন ছিটাইয়া, প্রকৃতির পায় অঞ্জলি দিবার নিমিত্ত রোমাঞ্চদেহে দণ্ডায়মান রহিয়াছে! অগষ্টা ভিক্টোরিয়ার (Augusta Victoria) ফুলগুলি তেমন বড় হয় না; কিন্তু ইহা গন্ধ ও রঙের জন্য সবিশেষ সমাদৃত।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পরীক্ষিত সকল গোলাপের বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, বহুবিধ নূতন নামের গোলাপ বাহির হইলেও, এখনও পুরাতন নামের গোলাপগুলি গোলাপের গর্ব্বস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। যাহারা নূতন নামের গোলাপ দেখিয়া, পুরাতনগুলিকে অবজ্ঞা করিবেন, তাহারা নিশ্চয়ই প্রতারিত হইবেন। গোলাপ ফুলকুলে সৌন্দর্য্যের রাণী। গোলাপ-কুলে আবার আমাদিগের সেই বস্‌রা ও সিরাজীই এখনও সৌরভ-সম্পদে রাজরাজেশ্বরী।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

কুমার সম্ভব।

দ্বিতীয় সর্গ।

(৩১)

"রিপু-বিমর্দ্দিত প্রভুত্ব মোদের,
সত্য ক'লে, ভগবন্ !—
কেন না জানিছ, আবিষ্ট ত তুমি
প্রতিজনে অনুক্ষণ ?

(৩২)

তব দত্ত বরে দৃপ্ত মহাসুর,
'তারকা' আখ্যান যার ;—
লোক-নিপীড়নে, ধূমকেতু সম,
যেন অভ্যুত্থান তার।

(৩৩)

কেলি-সরোবরে, ফোটে যাহে পদ্ম,
মাত্র ততটুকু কর
চালে ভয়ে ভয়ে, সে তারক-পুরে
দীপ্তিহীন দিবাকর।

(৩৪)

সসম্ভ্রমে শশী ষোড়শ কলায়,
নিত্য সেবে তারকেরে ;
হর-চূড়ামণি— লেখাটি কেবল,
দানব দিয়াছে ছেড়ে।

(৩৫)

ফুল- পরিমল- চৌর্য্য-দণ্ড-ভয়ে
বায়ু না বাগানে যায়,

তালবৃন্তাধিক প্রবাহে না বহে
তার পাশে আশঙ্কায়।

(৩৬)

করি' পরিহার পর্য্যায়-সেবন,
উদ্যান-পালের মত,
উপাসনা তার করে ছয় ঋতু
কুসুম-চয়নে রত!

(৩৭)

তার উপহার- যোগ্য রত্নচয়
আপনি সরিত-পতি,
যাবত প্রস্ফুট, জল অভ্যন্তরে
যতনে রাখেন অতি।

(৩৮)

শিরে মণি-শিখা বাসুকী প্রভৃতি
ভুজঙ্গ নিশিতে আসি',
নির্ব্বাণ বিহীন দীপ-স্তম্ভ প্রায়,
সেবয়ে চৌদিকে বসি'।

(৩৯)

ইন্দ্রও তাহার প্রসাদ-ভিখারী,—
তোষেন সতত তারে,
কল্প-পাদপের কুসুম-ভূষণ
পাঠা'য়ে দূতের করে।

(৪০)

এহেন প্রকারে পুজিত, তবু সে
পীড়িছে ভুবনত্রয়;—
প্রতি অপকারে দমিত দুর্জ্জন,—
উপকারে কভু নয়।

(৪১)

সকরুণ করে সুর-বালাগণ
ছিঁড়িত পল্লব যার,
সে নন্দন-তরু বুঝেছে তাঁহ'তে
ছেদ-পাত কি প্রকার!

(৪২)

চামর নিচয়, সুরবন্দিনীর
তিতিয়া নয়ন-জলে,
শ্বাস সম বাতে করয়ে বীজন
তারক প্রসুপ্ত হ'লে।

(৪৩)

সূর্য্য-অশ্ব-খুরে কিণাঙ্কিত যত
সুমেরুর শৃঙ্গচয়,
উপাড়ি' রচিল,— বিহার-পর্ব্বত
নিজালয়ে সে দুর্জ্জয়।

(৪৪)

মন্দাকিনী মাঝে রয়েছে কেবল,
দিগ্‌গজ-আবিল জল;—
স্বর্ণ-কমলের, হ'য়েছে সম্প্রতি,
তারি বাপি বাসস্থল।

(৪৫)

দুর্গম দুর্লঙ্ঘ্য বিমানের পথ,
আক্রমণ-ভয়ে তার,
ধরা-দরশন- প্রীতি দেবগণ
ভুঞ্জিতে না পায় আর।

(৪৬)

যাজ্ঞিক-প্রদত্ত হবিঃ যজ্ঞস্থলে
কেড়ে লয় সে মায়াবী
বহ্নি-মুখ হ'তে, সাক্ষাতে মোদের,—
নেহারি, নীরবে ভাবি।

(৪৭)

হরেছে তারক, চিরকালার্জ্জিত
দেহ-বদ্ধ যশঃ প্রায়,
সুরেন্দ্রের সেই ঘোটক রতন—
সমুচ্চ উচ্চৈঃশ্রবায়।

ক্রমশঃ

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু।

সহযোগী সাহিত্য।

(জাপানের কথা।)

ইতিমধ্যে "নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রে শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান মিঃ ডব্‌-লিউ, এইচ, লি মহোদয় জাপান সম্বন্ধে কএকটি নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন; ধূমকেতুর পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য আমরা তৎসমুদয়ের সারমর্ম্ম দিতে প্রয়াসী হইলাম।

জাপান দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বপ্রধান দ্বীপটির বিশেষ কোন একটা নাম নাই; জাপানীরা উহাকে "হণ্ডো" (Hondo) বা প্রধান দ্বীপ (Main Island) বলিয়া থাকে। উত্তরাংশের দ্বীপটি

(যেস্থানে এইনস্ জাতি বসবাস করে) হক্কেইডো (Hokkaido) নামে পরিচিত। কিন্তু এই দ্বীপের অধিবাসী এইনস্‌গণ আপনাদিগকে ইয়েজো (Yezo) বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ উক্ত উত্তরাংশের দ্বীপটিকে "ইয়েজো" নামেই অভিহিত করিয়া থাকেন। এদিকে আবার কিউরাইল ও সাগালিয়ান দ্বীপদ্বয়ের অধিবাসিগণ আপনাদিগকে "ইয়েজো" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

দক্ষিণাংশের দ্বীপগুলির মধ্যে কিউসিউ ও সিককোর নামই উল্লেখযোগ্য; নাগাসেকি উক্ত কিউসিউরই একটি প্রধান নগর। জাপানের রাজধানী এখন আর " জেডো" নামে অভিহিত হয় না; ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় মিকাডো বা জাপ-সম্রাট জেডোতে অবস্থান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন; সেই সময় হইতে সম্রাট ইহাকে "টোকিয়ো" নামে পরিবর্ত্তিত করেন। জাপানী ভাষায় "টোকিয়া" শব্দের অর্থ—পূর্ব্ব রাজধানী। জাপ-সম্রাটের পূর্ব্বতন রাজধানী "কিয়োটো" "সেইকিয়ো" নামে পরিবর্ত্তিত হয়; "সেইকিয়ো" শব্দের অর্থ—পশ্চিম রাজধানী; কিন্তু এক্ষণ উহাকে আর সেই নামে ডাকা হয় না। জাপানী ভাষায় "কিয়ো" শব্দের অর্থ—রাজধানী;—চীনা ভাষায় তাহা "কিন্" বা "কিং"। "পিকিং", "নানকিং" প্রভৃতি শব্দই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

"জাপান" শব্দটি জাপানীদের নিজস্ব নহে—বিশেষতঃ এই নামে জাপানীগণ আপন দেশকে অভিহিত করিতে নিতান্ত নারাজ; তাহারা উহাকে 'নিপ্পন' বা "নিবন" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। অনেক সময় জাপানীরা ইহাকে "ডেই নিপ্পন" বা " গ্রেট্ নিপ্পন " বলিয়া থাকে। " জাপানকে " ফরাসীগণ "জাপন",—আমেরিকাবাসিগণ "জাপ-আন"—এবং কোরিয়ার

অধিবাসীরা "ঝিপেন" বা "পূর্ব্বভূমি" বলিয়া থাকে। "ঝিপেন" শব্দের অর্থ,—যেস্থান হইতে সূর্য্য উদয় হয়।

ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে ১২৯৫ খৃঃ অব্দে ভেনেসিয়ার খ্যাতনামা পর্য্যটক মার্কোপলো এই "জাপান" নামটি সর্ব্বপ্রথম ইউরোপে প্রচার করেন। মার্কোপলো আদৌ জাপানে গমন করেন নাই,—মাত্র কোরিয়া ও চীনদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তৎসংগৃহীত তথ্যাদি পাঠে এইটুকু জানা যায় যে, কোরিয়ার দেড় হাজার মাইল দূরে সমুদ্রের গর্ভে একখণ্ড ভূমি তিনি তখন দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই সমুদ্র গর্ভস্থ ভূখণ্ডের অধিবাসিগণ শ্বেতকায়, সুসভ্য, এবং স্বাধীন-তন্ত্র শাসনাধীন ছিলেন বলিয়া মার্কোপলো বলিয়া গিয়াছেন। তিনি নাকি বিশ্বস্তসূত্রেই জানিয়াছিলেন যে, উক্ত দ্বীপবাসিগণ পৌত্তলিক ছিল, এবং তাহারা প্রচুর স্বর্ণের অধিকারী ছিল। কিন্তু বাস্তবিক জাপান পূর্ব্বে এতটা সমৃদ্ধিশালী ছিল না; বোধহয় চীনবাসিগণ কৌতুক করণার্থই ভেনেসিয়ার পর্য্যটকের নিকট এতাদৃশ ভিত্তিহীন গল্প বলিয়াছিল; নতুবা হয়ত, তাহারা কলম্বসের সেই স্বর্ণ-দ্বীপের (Golden Island) প্রসঙ্গই উত্থাপিত. করিয়াছিল। আমেরিকার অবিষ্কার করিয়া ফিরিবার পথে কলম্বস উক্ত স্বর্ণ-দ্বীপটি আবিস্কৃত করেন বলিয়া প্রকাশ। মার্কো পলো উপরোক্ত দ্বীপবাসিগণের সম্পর্কে আরও কতিপয় কৌতুহলোদ্দীপক গল্পের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—ঐ দ্বীপবাসীরা কোন শত্রুকে বন্দী করিলে, যদি বন্দীকৃত শত্রু উপযুক্ত পরিমাণ টাকা কড়ি প্রদানে মুক্তিলাভ করিতে অপারগ হয়, তবে তাহাকে বধ করিয়া, তন্মাংস তাহারা সাগ্রহে ভক্ষণ করিয়া থাকে! ইহা ১২৯০ খৃঃ অব্দের কথা,—যখন জাপানীরা সগান্-সগণ (Shoguns) কর্ত্তৃক শাসিত হইত এবং খাঁটিরূপে

বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। পর্য্যটক প্রবর বলেন, জাপানীরা এই কু-অভ্যাস চীনাদের নিকট হইতে শিক্ষা করে। কিন্তু ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, পুরাতন ব্রিটেনের ড্রুইডদিগের নরহত্যার ন্যায় ইহাও একটি জনশ্রুতি বা কৌতুকাবহ গল্প মাত্র। জাপানীরাও ইহার সত্যতা স্বীকার করিতে পারিতেছেন না; এমন অলৌকিক আচরণ সুসভ্য জাপানীদের আদিপুরুষদিগের পক্ষে আদৌ অসম্ভব, এ কথা তাঁহারা বুক ফুলাইয়া বলিয়া থাকেন। বিশেষতঃ এই জনশ্রুতির সত্যতা নির্দ্ধারণ করিবার পক্ষে কোন বিশিষ্ট প্রমাণও নাই।

পণ্ডিতগণ বলেন,—"নিপ্পন বা নিপন" "ঝিপেন বা সিপেনের" অপভ্রংশ মাত্র; আমরাও সর্ব্বথা এই মতের অনুমোদন করিতেছি। মিঃ লি বলিয়াছেন যে, জাপানীরা জাপ-সম্রাটকে "মিকাডো" নামে অভিহিত করেন না; তাহারা তাঁহাকে "টেনো" অর্থাৎ স্বর্গ-চ্যুত বা দেবতার বিশিষ্ট অংশ, এই আখ্যাই দিয়া থাকেন। ইংরেজী ভাষায় "মিকাডো" শব্দের খাঁটি অনুবাদ করিলে, উহার অর্থ হয়,—"স্বর্গের শিশু" বা "ধর্ম্মের উচ্চদ্বার"। বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, তুরস্কের শাসন-কর্ত্তাকে "ছাব্লাইম পোর্টি" (Sublime Porte) বা স্বর্গের দ্বার বলা হয়; ইহার অর্থও "মিকাডো" শব্দের অর্থের অনুরূপ।

জাপানের জলবায়ু ইংলণ্ডের জলবায়ুর ন্যায়। তবে উহার পশ্চিমাংশের আব-হাওয়া অপেক্ষাকৃত শীতল; শীতকালে সে অংশে কুড়ি ফিট্ পুরু হইয়া বরফ পড়িয়া থাকে। কিন্তু দক্ষিণ উপকূলের জলবায়ু অনেকটা গরম। যদি কোন বাঙ্গালী জাপান যাইতে ইচ্ছা করেন, তবে যেন গরম পোষাক সঙ্গে লইয়া যাত্রা করেন; নতুবা তাঁহাকে নিশ্চয়ই বিপন্ন হইতে হইবে। এসিয়া মাইনর, পেলিস্তান, স্পেন্ প্রভৃতি স্থান যে লেটিটিউডের (Lati-

tude) অন্তর্গত, জাপানও সেই লেটিটিউডের মধ্যে অবস্থিত। বিশেষতঃ ফিলিফাইন দ্বীপপুঞ্জ হইতে পূর্ব্বদিক দিয়া, যে এক উষ্ণ সামুদ্রিক প্রবাহ প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করতঃ ভেঙ্কো-য়েভার ও উত্তর আমেরিকার উপকূলের দিকে প্রবাহিত হই-য়াছে, জাপান উহার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। কামস্কাটকা হইতে উত্তরপূর্ব্বদিক দিয়া, যে শীতল বায়ু বহিয়া থাকে, উহাই জাপা-নের ঠাণ্ডা আব-হাওয়ার মূলীভূত কারণ। এপ্রিল মাসের শেষভাগই জাপান-যাত্রার উপযুক্ত সময়। যদি কোন ব্যক্তি মার্চ্চ মাসের শেষভাগে ভারতবর্ষ হইতে রওনা হন, তবে হংকঙ্কে কএকদিন অবস্থানের পর, ইচ্ছা করিলে, তিনি পিকিন সহরটি সন্দর্শন করিয়াও জাপান যাইবার সুযোগ পাইতে পারেন। মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগেই জাপানে দারুণ শীত পড়ে ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এমন কি, সিঙ্গাপুর গেলেই শীতের প্রাখর্য্য সম্যক অনুভূত হয়।

মোটের উপর, জাপান পর্ব্বতময় দেশ। দক্ষিণাংশটি গভীর অরণ্যময় গিরিমালা সমন্বিত হওয়ায় বেস সুন্দর দেখায়। যদিও তাহা পর্ব্বতময়, তথাপি স্থানে স্থানে ভারতের ন্যায় রমণীয় সম-তল ভূমিও রহিয়াছে। জাপানের উত্তরাংশে বহুতর উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী আকাশ ভেদ করিয়া রহিয়াছে; দেখিলেই মনে হয়, যেন গুণ-গরিমা-সমন্বিত সুসভ্য জাপানে স্বর্গের সোপান বিরাজ-মান!—জাপান যেন দেবদেবীগণের লীলা-ক্ষেত্র!

জাপানের উদ্যানজাত পুষ্পাদি জগদ্বিখ্যাত। জাপ-রমণীকুল যখন পুষ্পাভরণে সুসজ্জিত হইয়া বহির্ভ্রমণে বহির্গত হন, তখন মনে হয়, যেন মেনকা, উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ নন্দন-কাননে বেড়াইতেছেন! সমতল ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে ধান্যও উৎপন্ন হইয়া থাকে; জাপানে ভাল চা-পাতাও জন্মিয়া থাকে।

এখানকার "চেরীব্লছম" বৃক্ষ সাতিশয় চিত্তবিনোদক। শীতকালে এই বৃক্ষের পাতাগুলি ঝরিয়া গিয়া, নব বসন্ত সমাগমে যখন নবীন পল্লবোদ্গম হয়, তখন উহার কমনীয়া শোভা, যিনি প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তিনি একথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। রক্তাভ-নবকিসলয়-বিমণ্ডিত "চেরিব্লছম" বৃক্ষগুলিকে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিলে, মনে হয়, যেন প্রকৃতিদেবী বড় বড় ফুলের ঝাড়গুলি বুকে লইয়া, ঋতুরাজের আবাহন করিতেছেন!

জাপানের পার্ব্বত্য প্রদেশে হরিণ ও ভল্লুক প্রভৃতি বন্য জন্তুর অসদ্ভাব নাই। জাপানের ঘোটক অবয়বে ক্ষুদ্র হইলেও বেস শক্তিশালী; তথায় মেষ নাই বলিলেও হয়,—ছাগাদি কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। টৌকিয়োর "ইউনো পার্কে" একটি চিড়িয়াখানা আছে; এখানকার প্রদর্শনীতে মেষ, ছাগ, এবং অস্মদ্দেশীয় ঘোটক ও কুকুরাদি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এমন কি, জাপানী ভাষায় "মেষ" শব্দের কোন প্রতিশব্দই নাই। তদ্ধেতু বাইবেল গ্রন্থ জাপানী ভাষায় অনূদিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় রহিয়াছে।

যদিও জাপানীরা খর্ব্বকায়, তথাপি তাহারা খুব বলশালী ও কষ্ট-সহিষ্ণু; বর্ত্তমান রুষ-জাপান যুদ্ধ হইতেই একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। জাপানীরা বলে,—নিত্য নিয়মিত রূপে সাদা-সিদে রকমের নিরামিষ আহারই তাহাদের শক্তির মূলকারণ। জাপানীরা "জিউ-জিট্সু" নামক একপ্রকার কুস্তি করিয়া থাকে; এই ব্যায়ামও তাহাদের বল-সঞ্চারের অন্যতম কারণ। চীনাদের স্বাস্থ্য হইতে জাপানীদের স্বাস্থ্য খুব ভাল।

আমিষাহার বা অন্যবিধ আহার দ্বারা জাপনীদিগকে দীর্ঘকায় করা যায় কি না, এসম্বন্ধে ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে এক কমিশন

বসিয়াছিল; কিন্তু কমিশন পরিশেষে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, জাপানীরা শক্তি-সামর্থ্যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা যথেষ্ট সমুন্নত; অতএব খর্ব্বকায় হওয়াতে কিছুই আসিয়া যায় না। জাপানীরা প্রচুর পরিমাণে জলপান করে এবং প্রত্যহ অবগাহন করিয়া থাকে। জাপানে বাতরোগ নাই বলিলেও হয়; খুব সম্ভবতঃ সমধিক নিরামিষাহারই ইহার মূল কারণ। জাপানীরা গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া স্নান করে; হিম জলেও কদাচিৎ স্নান করিতে দেখা যায়।

জাপানীরা প্রধানতঃ অন্নাহারই করিয়া থাকে; ভাত ও শাক-শব্জীই তাহাদের প্রধান আহার্য্য। এবিষয়ে বাঙ্গালীর সহিত তাহাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। জাপানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শাক্-শব্জী ও ফলাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে; দামও খুব সস্তা। অনেকানেক মুটে-মজুর কাঁচা শশা ইত্যাদি ভক্ষণ করিয়াই দিনপাত করিয়া থাকে। গো-দুগ্ধ তাহারা আদৌ পান করেনা; তবে আজ কাল ক্বচিৎ ক্বচিৎ দুগ্ধপায়ী জাপানীও দৃষ্ট হয়। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রুচিও যথেষ্ট মার্জ্জিত হইয়াছে ও হইবে। তথায় গো-রক্ষার নিয়ম নাই; মহিষাদি দ্বারা কর্ষণ-কার্য্য সম্পাদিত হয়। দুগ্ধ বিনাই তাহারা চা-পান করিতে অভ্যস্ত। তাহারা "বিয়ার" (Beer) মদ্য পান করে বটে, কিন্তু অত্যধিক মাত্রায় নহে। জাপানীরা বেস মিতাহারী ও মিতাচারী। যদিও বিদেশী সুগন্ধি দ্রব্যাদি তথায় অহরহ আমদানী হইয়া থাকে, তথাপি তাহারা তৎসমুদয়ের কোন খবরই রাখে না। সর্ব্বদা তাহারা স্বদেশজাত চুরুটের ধূম্রপান করিয়া থাকে। জাপানের স্বদেশ-প্রীতি জগদ্বিখ্যাত। খোলা ময়দানে পায়-চারি করিতে তাহারা বড়ই ভালবাসে। শ্বাস-ক্রিয়ার ব্যায়ামে তাহার সবিশেষ মনোযোগী; তাহারা বলে যে, ইহাতে

হৃদ্‌পিণ্ডে ও ফুস্‌ফুসে বেশ বলের সঞ্চার হয়। স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি ইহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে বলিয়াই, মাত্র ত্রিশটি বৎসরের ভিতরে এতটুকু উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে।

শ্রীঃ—

আবেগ।

১

শান্ত হ'ল কৃপালোকে তাপিত হৃদয় ;
দয়ার লহর,
বারেক উধাও মনে পিয়া,
সরস হইল শুষ্ক হিয়া,—
দেখা দিল নয়নে নির্ঝর ;
কাঁদিল সে প্রভু-পদ-তলে,—
জাগ্রত পরাণ,—
করুণার লাগি',—পাইল করুণা দান।

২

করুণায় মিটিল না প্রাণের তিয়াস ;—
কি চাহে আবার ?
কোথায় সেই অমিয় রাশি,—
জীবন-মরুতে যাহা পশি',
ছুটাইবে আনন্দের ধার ?
পশিতে পরাণ বেয়াকুল,
প্রেমের সে সরে,—
সে সুখ-আশায়, মন উধাও বিহরে।

৩

চলিল হৃদয়, যেথা আমার জগত,—
মধুর মধুর!
এগো সেই অমৃতের লোক,—
যেথা নাহি জরা নাহি শোক,
মরণের অবসাদ-সুর;—
বহে সদা শান্তি-মন্দাকিনী;
প্রীতির মন্দার,
বিতরে সৌরভ রাশি, খুলিয়া ভাণ্ডার।

৪

হাসিছে মাধবী-লতা, পূর্ণিমার নিশি,—
প্রেমের চাঁদনি;
অই আধ-ফোটা ফুলকুল,
পাদপ সনে খেলিছে দুল,
কাণে কাণে কহিছে কি জানি!
প্রাণসখার রূপ-মাধুরী,
এ জগত-ময়
নেহারি, পরম সুখে ভাসিছে হৃদয়।

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু।

ফুল।

(গল্প)।

১

"ও ফুল! আজ বেড়া'তে যাবি না?—যা'স তো আয়।"—
এই ক'টি কথা বলিতে বলিতে ফুটনোন্মুখ ফুলের মত সুন্দর

একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা, পাঁচ বৎসরের একটি স্বর্ণের শিশু-মেয়ের কচি হাত খানি ধরিয়া, মৃণালিনীদের দরদালানের পার্শ্বস্থ রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। কিন্তু কেহই তাহার কথার জবাব দিল না; বালিকা আবার ডাকিল,—না, আবার ডাকিল;—এক দুই তিন—অনেকবার ডাকিল। তখন ভিতর বাড়ী হইতে একটা শব্দ হইল—"যাইরে ফুল!—যাই"। ক্ষণকাল পরে আবার শব্দ হইল—"মা! তুমি কিন্তু আমায় ডেকো' না; আমি গোল-দীঘির বাগানে বেড়া'তে যাব এখন।"

মাতা গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন; বোধ হয় সেই স্বর-লহরী তাঁহার কর্ণে পঁহুচিয়াছিল না। নতুবা ঝাঁ-ঝাঁ রৌদ্রে এমন একটি ননীর পুতুল কে স্বেচ্ছায় গলাইতে চায়? সুতরাং বিনা বাধা বিপত্তিতে অপর একটি দশমবর্ষীয়া চাঁদপানা মেয়ে তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া পূর্ব্বোক্তা বালিকাটির নাগাল ধরিল। হাসির নীরব সম্ভাষণ অদল-বদল করিয়া, তাহারা পায়-পায় গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। সাগরঝি পিছন হইতে ডাকিল—"মিনু—ও মিনু"; মিনু যেন এ জগতে নাই। সাগর বাড়ীতে ফিরিয়া গেল।

জ্যৈষ্ঠ মাস। সহরতো দূরের কথা,—মফঃস্বলের পল্লীগুলিও তখন গরমের জ্বালায় বেদম ছট-ফট করিয়া থাকে। সূর্য্যের কিরণ-প্রাখর্য্য যেন তখন দশগুণ বাড়িয়া যায়! বেঁয়ারা বাতাসের ঝট্কায় যেন জ্বলন্ত আগুনের টুকরাগুলি আকাশ হইতে অবিরাম ছুটিয়া আসে! ফল কথা, সংসারটা যেন তখন এক জ্বালাময়ী চিতায় পরিণত হয়! দিনের দশটা হইতে নাগাদ পাঁচটা পর্য্যন্ত ঘরের বাহির হওয়া বিড়ম্বনা বিশেষ; রৌদ্রের সেই রুদ্রমূর্ত্তি বাস্তবিকই ভয়ঙ্করী! নির্ম্মম নিদাঘের দারুণ দাপটে সজীবতার চিহ্নগুলি যেন তখন ক্ষণকালের নিমিত্ত

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড হইতে মুছিয়া যায়; শব্দায়মান জীবজগতে যেন নীরবতায় একটা অস্বাভাবিক আভরণ আপনা হইতেই ছড়াইয়া পড়ে; কিছুরই তেমন কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

তথাপি সূর্য্যঠাকুর ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি উগ্র ময়ুখমালা অজস্র ছড়াইয়া আপন কার্য্য হাসিল করিতেই থাকেন; ইঁহার ক্লান্তি নাই,—বিশ্রাম নাই; দৈনন্দিন কার্য্য-সম্পাদনে ইনি চিরাত্যন্ত। এমন কর্ম্মনিষ্ঠ কে কয়টি দেখিয়াছ? প্রাতঃকালে পূর্ব্বাকাশের এক কোণে উঁকি দিয়া, ইনি নিদ্রিতা জগতীকে সোনার স্বপন দেখাইয়া প্রবুদ্ধ করেন,—জড়তায় চেতনারাশি মাখিয়া দেন। ইঁহারই প্রসাদে স্নিগ্ধ প্রাতঃসমীরণ সোনালী কিরণের ভেঁজাল দিয়া, সুপ্ত সংসারের মুখে সঞ্জীবনী-সুধা ছিটাইয়া দেয়; শ্রান্ত সংসার আবার নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া নবোদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। কিন্তু আমাদের ঠাকুরজী যে একজন পাকা বহুরূপী, তাহা বুঝে কয় জন? মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রবির রূপ-বিকার সংঘটিত হয়! প্রাতে যেমনটি নিরীক্ষণ করিয়া, হর্ষোৎফুল্লহৃদয়ে ইঁহাকে আবাহন করিয়া থাক, মধ্যাহ্নে তেমনটি দেখিতে পাও কি?—তবে এই রূপ-মোহে প্রতারিত হও কেন? একমনে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাও,—দারুণ সংসারের দিকে একটিবারও তাকাইও না; তবেই মর্ম্মস্থল আর ঝালা-পালা হইবে না।

রৌদ্র এখন অনেকটা নরম হইয়া পড়িয়াছে। ঠাকুরজী সংসারটাকে হাড়ে-হাড়ে পুড়িয়া, শ্রমাধিক্য নিবন্ধন যেন অবশ অঙ্গে পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন;—আর তেমন তেজোপ্রাখর্য্য নাই। দিবাশেষে সংসারটা যেন আবার গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। যে পাখীটি এতক্ষণ পাতার আড়ালে বসিয়া নিঝুমে ঝুমিতেছিল, সেটি এখন ক্ষুধার জ্বালায় অবশ

ডানায় কুলায়পানে উধাও ছুটিয়াছে ; যে ভ্রমরটি দু'পুরে রৌদ্রের জ্বালায় লোক-লোচনের অন্তরালে গা-ঢাকা দিয়াছিল, সেটি এখন মধুহীন শুষ্কফুলে পড়িয়া লুট-পুট কাঁদিতেছে ; যে প্রজাপতিটি এতক্ষণ পত্রচ্ছায়ার নিরিবিলি বসিয়াছিল, সেটি এখন ডানা এলাইয়া বৈকালিক স্নিগ্ধসমীরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে ; যে নব্যা বঙ্গ-বধূটি এতক্ষণ গৃহকোণে বসিয়া, অর্দ্ধনীমিলিতনেত্রে নাটক নভেলের আদ্যকৃত্য করিতেছিলেন, সেটি এখন হাঁফ ছাড়িয়া বারান্দায় নামিয়াছেন। রৌদ্র পড়িয়াছে।

জাঁহাবাজ জৈষ্ঠের পরাণ-ফাটা গরমে, হাওয়া-খাওয়াটা শুধু সহরবাসীদের কেন, আজ কাল পল্লীবাসীদেরও একটা ছোট-খাট-রকমের অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং অভ্যাসের খাতিরে বালিকা দু'টী গোলদীঘির বাগানে বেড়াইতে গিয়াছে। গিয়াছে—যা'ক্ ; গোলদীঘির বাঁধানো ঘাটলায় গিয়া তারা বসুক ; ফুলের স্নিগ্ধ হাওয়ায় সেই ফুল দু'টির মরমের গরম একটু ছাড়ুক,—তার পর আমরা একবার এখানে আসিব। এতক্ষণ বালিকা দু'টির পরিচয় না দেওয়ায়, গল্পটি একটু খাপ-ছাড়া হয় নাই কি ? ভরসা আছে, পাঠক পাঠিকাগণ এই বেঁয়ারা লেখকের বেজায় বেয়াদবীটুকু মাপ করিবেন।

২

হরিনারায়ণপুর একখানি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। তথায় বহুতর বিজ্ঞ ভদ্রলোক বসবাস করিয়া থাকেন। গ্রামে একটি জমিদার বাড়ীও আছে ; জমিদার ৺ কালাচাদ বাবু অনেক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকগমন করেন। সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারিণী তদীয় দুহিতা—শ্রীমতী মৃণালিনী। মৃণালিনীর ডাক-নাম মিনু। মিনুর বয়ঃক্রম যখন পাঁচবৎসর তখন তাহার পিতৃ-বিয়োগ হয় ; সুতরাং পিতার কথা তাহার ভালরূপ

মনে নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের গণ্ডী যতই ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, মিনুর ভালবাসা ও সোহাগ, মা, সাগরঝি, অনিলমাধব ও বোসদের বাড়ীর সরযূর উপর ততই কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল। সরযূর সহিত মৃণালিনীর "ফুল" পাতান ছিল। কিন্তু সাগরঝির উপরই মিনুর আবদারের মাত্রাটা বেশী ছিল।

কালাচাঁদ বাবু একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ছিলেন; সনাতন হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও আস্থা ছিল; স্নান-তর্পণ, সন্ধ্যা-আহ্নিক, দেবার্চ্চন ইত্যাদি তদীয় নিত্যকর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল; ফল কথা, তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। হিন্দুত্বের ভাঁজটা তাঁহার ভিতর অত্যধিক মাত্রায় থাকায়, আজ কালের হাল-চালের ছেলেদের উপর তিনি সর্ব্বদাই খড়্গহস্ত ছিলেন। ইংরেজী পড়িলেই ছেলেগুলি বেদম বখাটে হয়, —ধর্ম্মে আস্থাহীন হয়,—দেবদেবীর অবমাননা করে,—লঘুগুরু বিবেচনা করে না,—অখাদ্য খায়,—বিদেশী চালে চলে,—বিদেশী বুলি বলে,—বিদেশী খাওয়া খায়,—বিদেশীর মত চায়, —মোটের উপর, তাহারা আগা-গোড়া বিদেশী ছাঁচেই ঢালা হয়, ইহাই তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। সেজন্যই তিনি ইদানীন্তন চাপরাস-ওয়ালা ছেলেদের উপর হাড়ে-হাড়ে চটা ছিলেন। আগাল-পাছাল বর্ণমালা-বিভূষিত বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞের দলকে, "অকাল-কুষ্মাণ্ড অহম্মুখের দল" ব্যতীত, আপ্যায়িত করিবার আর কোন ভাষা তাঁহার অভিধানে ছিল না। সমবয়স্ক গ্রাম্য গোষ্ঠীপতিদিগের মজ্‌লিশে বসিলে, তিনি তর্জ্জনী তাড়াইয়া সগর্ব্বে সর্ব্বদা বলিতেন,—"আমার মিনু আইবর থা'ক, তবু ভাল; প্রাণ থাকিতে আমি উলুবনে মুক্তা ছাড়াইতে পারিব না; দেখুন্ না, আমি শীঘ্রই মিনুকে পাত্রস্থা করিতেছি"।

কিন্তু বিধাতা যেন তাঁহার কথায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন।

নির্ম্মম কাল যেন অলক্ষ্য ফুৎকারে একটি প্রদীপ্ত প্রদীপ-শিখা নিবাইয়া দিল! বহুতর কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া কালাচাঁদ বাবু অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। অতুল ঐশ্বর্য্য, অগণিত দাসদাসী, সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী, সোনার পালঙ্ক, স্ত্রীকন্যা, আত্মীয়স্বজন সকলই পড়িয়া রহিল,—কিছুই তাঁহার অনুগমন করিল না; কিছুতেই শমনের সেই পরওয়ানা খারিজ হইল না; চক্ষের পলকে জোড় করিয়া যেন নিষ্ঠুর কাল একটি জীবনের যবনিকা ফেলিয়া দিল; কেহই জানিল না,—জানিতে অবসরটুকুও পাইল না। কালাচাঁদ বাবু মনে করিয়াছিলেন, অষ্টমবর্ষে মিনুকে পাত্রস্থা করিয় গৌরীদানের ফলভাগী হইবেন; কিন্তু কালচক্র নিমেষে ঘুরিয়া গেল! মানুষ ভাবে এক,—হয় আর।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কালাচাঁদ বাবু সেকালের লোক ছিলেন। সুতরাং হালের চাল-চলনটাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার দেরাজ তুরুঙ্গুলি তন্ন তন্ন তল্লাস করিয়াও একশিশি এসেন্স বা এমনিতর কোন সুগন্ধি সামগ্রী মিলিত না; আর আজ কাল যে, ঘরের কোণায়-খাচায় এমন বহুতর পুষ্পসার বিরাজ করিতেছেন, একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু কালাচাঁদ বাবুর বাড়ীতে তেমনটি হওয়ার যো ছিল না। তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন,—ব্যয়কুণ্ঠ বা বে-হিসাবী ছিলেন না। সাত্ত্বিক দান-দক্ষিণায়ও তাঁহার সমধিক শ্রদ্ধা ছিল; কত অন্ধ-আঁতুর, কত কন্যাদায়গ্রস্ত, কত গরীব-দুঃখী, কত পিতৃমাতৃহীন অনাথ, তাঁহার করুণায় বাঁচিয়া গিয়াছে, তাহার অবধি নাই। অনিল মাধবও একটী অনাথ বালক। পিতৃমাতৃহীন অনিল ছেলেবেলা হইতেই কালাচাঁদ বাবুর বাড়ীতে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। সে ছেলেটি আসিয়াছিল, এখন আঠার বৎসরের যুবক হইয়াছে।

কালাচাঁদ বাবু অনিলকে পুত্রের ন্যায় আদর যত্ন করিতেন। অনিলমাধবও অপুত্রক কালাচাঁদ বাবুর পুত্রের স্থানটুকু দখল করিয়া লইয়াছিল। যদিও ইংরেজী পড়ার উপর তিনি যথেষ্ট বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, তথাপি অনিলের বেলায় সেটী বজায় রাখিতে পারেন নাই। স্নেহশীলা গিন্নীর সুপরামর্শে অনিলের আবদার রক্ষার্থ বাধ্য হইয়াই তাহাকে গ্রামান্তরের উচ্চ ইংরেজী-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইতে হইয়াছিল; তথাপি অনিলের উপর তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অসদ্ভাব ঘটিয়াছিল না। অনিল প্রত্যহ হরিনারায়ণপুর হইতে সেই বিদ্যালয়ে গিয়া পাঠাভ্যাস করিত। তাহার মত দীন হীনের অদৃষ্টে যে, বিধাতাপুরুষ এমন একটি সুযোগের বিধান করিয়াছিলেন, সেই জন্যই সে যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিল। কালাচাঁদ বাবুর মৃত্যুকালে অনিলমাধব সবে মাত্র পঞ্চম শ্রেণীতে প্রমোসন্ পাইয়াছিল; সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। এবার সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ দিয়াছে। আজ কালাচাঁদ বাবু ইহজগতে নাই; নতুবা কতই সুখী হইতেন! তাই বলিতেছিলাম, সময় কাহারও হাত-ধরা নহে; সে অবিরাম গতিতে চলিয়া যাইতেছে। কোন্ ফুলটি ফুটিতে-ফুটিতে ফুটিতে পারিল না,—কাহার হৃদয়ের কাল দাগগুলি মুছিতে গিয়াও মুছিল না,—কাহার নয়নের জল-টুকু শুকাইতে-শুকাইতে শুকাইল না,—কাহার আশাটি মিটে-মিটে মিটিল না—সেদিকে সে একটিবারও তাকায় না,—সে আপন মনে উধাও চলিয়া যায়।

কালাচাঁদ বাবুর লোকান্তরপ্রাপ্তির পর অনিলমাধব তাঁহার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া গেল না; যেহেতু স্নেহময়ী গিন্নীও তাহাকে পুত্রতুল্য স্নেহ মমতা করিতেন। অমিয়-স্বভাব

অনিলের "আপন" ছিল। অবকাশ সময়ে সে এবাড়ী সে বাড়ীতে মেয়ে-মহলে বসিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রামায়ণ মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিত, আর মালা-হস্তা প্রাচীনাগণ তদ্গতচিত্তে সে সকল পুণ্যকাহিনী শ্রবণ করিতেন; তাঁহারা অনিলকে প্রাণের সহিত স্নেহ মমতা করিতেন। অনিল সে গ্রামের বৌ-ঝিদের একমাত্র কেরাণী ছিল,—একমাত্র হরকরা ছিল; বৌ-ঝিদের ডাকের সমুদয় চিঠিই অনিলের হাত দিয়া যাইত। গ্রামে কাহারও বাড়ীতে একটু কিছু খুঁটি-নাটি হইলে, সর্ব্বাগ্রে অনিলের তলব পড়িত; সেও অগৌণে গায়-খাটিয়া আত্মপর-নির্ব্বিশেষে সকলের কাজ করিয়া দিত। এই সহৃদয় অনাথ বালকের কোমল হৃদয়ে স্বার্থের একটু আঁচরও ছিল না। কালাচাঁদ বাবুর স্ত্রী যে, তাহার প্রতি সাতিশয় সুপ্রসন্না ছিলেন, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; ইহা শুধু গিন্নীর স্বভাব-সুলভ সদ্‌-গুণাবলীর অভিব্যক্তি নহে,—অনিলের মিষ্ট স্বভাবটিও ইহার অনুকূলে ছিল; সুতরাং তিনি এতটা "আপন" হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুশীল অনিল গিন্নীকে 'মা' বলিয়া প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইত এবং মিনুকে সহোদরার ন্যায় স্নেহ করিত। এমন ভাবে সুদীর্ঘ তিনটা বৎসর মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল,—কেহ কোন লক্ষ্য করিতে পারিল না।

যে জন জগতের একজন ছিল, আজ সে নাই। তাহার অণু-পরমাণুটি পর্য্যন্ত নিদারুণ কালের ভীম ফুৎকারে দূরে—অতিদূরে বিস্মৃতির সাগরে চিরতরে নিমজ্জিত হইয়াছে! কালাচাঁদ বাবুও একদিন ছিলেন,—একদিন জগতে তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি হইত; কিন্তু নিমক-হারা সংসার তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে;—কি স্বার্থপরতা! এসংসারে নিত্য নূতনের

সংসারটা অনন্তের দিকে উধাও ছুটিয়াছে। কালাচাঁদ বাবু অনেকদিন, সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। স্বার্থপর সংসার যদিও তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে,—তথাপি একটি হৃদয় তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই; স্মৃতি-শিখায় সে হৃদয় খানি অহর্নিশ পুড়িয়া খাক্ হইতেছে। প্রতি পূজা পার্ব্বণেই গিন্নীর চক্ষের কোণে কএক ফোটা তপ্তজল জমাট ধরিয়া যাইত,—একলাটি বসিলেই হৃদয়ের অন্তঃপুর হইতে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া পড়িত। যাহা হউক, গিন্নী এক্ষণ কর্ম্মের জগৎ-বেড়-জালে অনেকটা বাঁধা পড়িয়াছেন; আসর প্রসার অনেকটা খাট করিয়াছেন। এখন তাঁহার শুধু এক চিন্তা—মিনুর বিবাহ। বরের অন্বেষণে অনেক স্থানেই ঘটক-চুড়ামণিগণ প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু কেহই কোন সৎপাত্রের সন্ধান আনিতে পারেন নাই। মিনুর মায়ের ঐকান্তিক ইচ্ছা মিনুকে শীঘ্রই বিবাহ দিবেন,—এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অনিলকেও বিবাহ করাইয়া একটি বউ ঘরে আনিবেন। পাড়াপরশীরা বলিত,—"বর তো ঘরেই আছে; এক ঢিলেই দু'টিপাখী মার না কেন?" মিনুর মা জবাব করিতেন না।

৩

পাঠকপাঠিকাগণ! দয়া করিয়া চলুন এখন একটিবার গোলদীঘির বাগানে বেড়াইয়া আসি। এতক্ষণে গরমটা ধা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। যে সূর্য্যঠাকুর দু'পুর বেলায় বাতাসের গায় আগুন মাখিয়া ছড়াইতেছিলেন, এক্ষণে সেই অগ্নিগোলকটি সিন্দুরের থালার মত আকাশের একধারে প্রায় ডুবু-ডুবু; তাপ-দগ্ধ হাওয়াটা যেন গোলদীঘির হিমজলে অবগাহন করতঃ সুগন্ধি-সম্ভার মাখিয়া, ফুলবাবুটি সাজিবার নিমিত্ত বাগানের দিকে সুর-সুর চলিয়াছে; পথে কোথাও

পাতা তুলিয়া ফুলটি দেখিয়া লইতেছে,—কোথাও ফুটন্ত গোলাপটি ইতস্ততঃ দোলাইতেছে,—কোথাও রঙ্গন ফুলের থোবাটি লইয়া, আপনি মৃদুলে দুল খেলিতেছে,—আবার কোথাও ফুলের কাণে কাণে যেন কি কথা কহিয়া বেমালুম ছুটিয়াছে।

সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। তখনও গোলদীঘির ঘাটলায় সেই দুইটি বালিকা বসিয়া; আর পাঁচ বৎসরের সেই চাঁদপানা মেয়েটি নিকটস্থ পাতাবাহারের রঙ্গিল পাতাগুলি ছোট হাতের কঁচি অঙ্গুলি দিয়া মাড়াইতেছিল। বয়স্থা বালিকাটি ডাকিল—"পারি! আয়; ওদিকে যা'স্‌নে,—শেয়াল ধরবে"। শিশু মেয়েটি ভয়ে জড়সর হইয়া, ঝাপ্‌টাইয়া দিদির কোলে আসিয়া পড়িল; মনে হইল, একটি জীবন্ত ফুলের তাড়া যেন সান্ধ্য সমীরণে কে ছুড়িয়া মারিল! দশমবর্ষীয়া বালিকাটি দুইহাতে তালি বাজাইয়া বলিয়া উঠিল,—"তাই-তাই-তাই ভয় নাই—তাই-তাই-তাই ভয় নাই"।

শিশু মেয়েটির নাম পারিজাত। বয়স্থা মেয়েটি উহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী—নাম সরযূবালা। অপরটি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত কালাচাঁদ বাবুর কন্যা—মৃণালিনী। যখন শিশু মেয়েটি পাতাবাহারের তলায় খেলিতেছিল, তখন বড় দুইটি মেয়েতে ঘাটলায় বসিয়া অনেক কথাই হইয়াছিল। সে সমুদয় অবান্তর কথার অবতারণা করিয়া, আমরা পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে বাসনা করি না; বিশেষতঃ তৎসমুদয় শুনিবার সুযোগও আমাদের ভাগ্যে ততটা ঘটে নাই। তবে আমরা যে কএকটি কথা শুনিয়াছিলাম, তাহাই এখানে বিবৃত করিলাম। সরযূ বলিল—"না ফুল! এখন বাড়ী যেতে হয়,—সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে"।

মিনু।—খানিক বোসনা ফুল! এখনি যাবে—সবে মাত্র ছ'টা বাজ্‌লো।

সরযূ।—পারির খাবার সময় হয়েছে এখন; ধাড়ী মা গেলে পর মা আমায় মন্দ বোল্‌বেন।

এই ক'টি কথা বলিয়াই সরযূ পারিজাতের হাতখানি ধরিয়া উঠিল। মিনু বাধা দিয়া বলিল—"মা ফুল! তুমি বসো; পারি কাঁদ্‌বে না,—আমি তার খাবার এনে দিচ্ছি এখন"। এই বলিয়া মিনু ছুটিয়া গিয়া, দুইটি ফুটন্ত লাল গোলাপ ও গাছতলা হইতে দুইটি পাকা আঁব কুড়াইয়া আনিয়া পারিজাতের সম্মুখে ধরিল। স্বর্গের সেই শিশুটি ঢল-ঢল গোলাপে আপনার কুসুম-কোমল মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিয়া, লাল-টুক্‌টুকে একটি আঁব বাঁহাতে পাকড়াইয়া সরযূর কাছে ছুটিয়া গেল। আঁবটি ও ফুলটি দেখাইয়া, আধ-আধ মধুরস্বরে বলিল,—"সলো, আমালে ফু' দেছে"।

সরযূ বলিল,—"তা' বেস করেছে; তুমি ব'সে খেলো এখন"। অমনি মেয়েটি ছুটিয়া গিয়া সেই পাতাবাহারের তলায় খেলায় নিমগ্ন হইল।

মিনু তখনও দাঁড়াইয়াই রহিয়াছে। সরযূ বলিল,—"তা' ফুল! দাঁড়িয়ে র'লে যে,—বসোনা"। অমনি কতকগুলি বেলা আর যূঁই সরযূর চোকে-মুখে ঝপাট্‌ করিয়া আসিয়া পড়িল।

"আহা! একি ফুল! আমায় কাণা কোরলে যে,"—এই বলিয়া সরযূ তার ভাসা-ভাসা চক্ষু দুইটি বস্ত্রাঞ্চলে সাপটিয়া ধরিল। মিনু থত-মত খাইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল,—কিছুই বলিতে পারিল না,—যেন কত অপরাধই করিয়াছে। বস্ত্রাঞ্চলে রগড়াইতে রগড়াইতে সরযূর নীল চক্ষু লাল হইল। ক্ষণেক পর মিটি-মিটি চক্ষে চাহিয়া, সরযূ বলিল,—"অমন কোরেই ফুল! ফুল ছুড়তে হয়?—ফুলের ঘায় আমার চোক দু'টা যেন উল্‌টে যাবার যো হয়েছিল!"

মিনু।—আমায় মাপ করো ফুল! আমার ঘাট হয়েছে।

তোমার গায়ে যে ফুলের আঁচরটিও সয় না, একথা আমি জানতুম্ না। আমায় মাপ করো।

সরযূ।—তা' ফুল! কোরবে কি; সকল তো আর সমান নয়। আগে বাঁধা-বাঁধিটা হ'য়ে যাক্, তারপর দেখ্‌বো এখন। তখন অনিলে আমার সোনার ফুলটি দোল খেলাবে। ফুলের ঘায় আমার 'ফুল' উছ্‌কে পড়বে।

মিনু কিছুই বুঝিল না; মাথাটি নাড়িয়া বলিল,—'তা' বেস্‌তো"।

সরযূ খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরে মিনুর চিবুকখানি ধরিয়া বলিল,—"ফুলরে! এখনও ভাল আছিস্; কিন্তু ভাই! প্রেমের আগুনের যে ঝাঁঝ, কখন প্রাণের গায় ফোস্কা পড়ে, তার ঠিকানা নাই। এখন আমি সেটা বেস বুঝি।"

মিনু "হা-বা-না" কিছুই বলিল না,—কিছুই সে বুঝিল না,—মৃণ্ময়ী প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় ঘাটলার আঁবগাছ হইতে একটা বেহায়া পাখী বলিয়া উঠিল,—"উহু-উহু"। পাখীটার প্রাণে যেন সরযূর দুঃখে বিষম লাগিয়াছিল; তাই মনের আবেগে মুহুর্ম্মুহু বলিতে লাগিল,—"উহু-উহু"। সেই মর্ম্মভেদী শব্দটা শীতল সান্ধ্য সমীরণে ইতস্ততঃ হেলিয়া দুলিয়া যেন সরযূর মরমে প্রবেশ করিল। আর মরমের ঘাত-প্রতিঘাত গুলি যেন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতে লাগিল। বিরহ-বদ্ধ ঝটিকা বাতাসে সেই কুসুমিত বুকখানি যেন ক্ষণে ক্ষণে ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

আজ চারিবৎসর সরযূর বিবাহ হইয়াছে। এই চারিবৎসরের ভিতর মাত্র চারিটিবার সরযূ স্বামী-গৃহে গিয়াছিল; এই চারিবারের মধ্যে সবে মাত্র দুইটিবার সরযূর ভাগ্যে স্বামী-

দুইটি আলাপ করিবারও সময় পায় নাই। বাসনা অন্তরে নিরন্তর উঁকি-ঝুঁকি দিলেও, মুখফুটিয়া তাহা বলিতে পারিতেছেনা, বাঙ্গালীর মেয়ের এতটা দুঃসাহস প্রায়শঃ হয় না। তাই তুষের আগুন বুকে চাপিয়া, কি যেন একটা অন্তর্দাহী জ্বালায় রাতদিন জ্বলিয়া মরিতেছে,—বলিবার লোক নাই। হাতের পাঁচ একমাত্র মৃণালিনী—তার "ফুল"। কিন্তু মিনু একটি ফুটন্ত হাসির ডালা,—যেন এ জগতের নয়;—ভুলে আসিয়াছে,আবার চলিয়া যাইবে। সুতরাং পাপ-সংসারের মায়া-খেলায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতে পারে নাই। তাই ছুটিয়া যায়,—ছুটিয়া আসে,—হাসে—গায়—বেড়ায়। কাহারও প্রাণের জ্বালায় তাহার হৃদয় জ্বলেনা—কাহারও মরমের বেদনা সে বুঝেনা,—কাহারও চক্ষের জলে সে ভিজেনা। এমন একটা বে-রসিক মেয়ে যার হাতের সম্বল, সে প্রাণের কথা কহিতে গিয়াও কহেনা,—হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে গিয়া, আরও দ্বিগুণ জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। অতএব সরযূ মিনুর কাছে মন খুলিয়া কথা বলিতে চায় না,—আপনি গুম্‌রে-গুম্‌রে অজস্র কাঁদিয়া মরে।

এতক্ষণ সরযূ চুপ্‌টি করিয়া বসিয়াছিল,—এখন উঠিয়া দাঁড়াইল। টল-টল চক্ষে ভার গলায় বলিল,—"না রে ফুল! বাড়ী যাব এখন; কাল্‌কে আর বেড়া'তে আস্‌বো না ফুল!—কাল্ ষষ্ঠীপূজা।" কি যেন কি ভাবিতে ভাবিতে,—গোলাপের পাপড়িটি নখ-চন্দ্রে মাড়াইতে মাড়াইতে,—উদাস প্রাণে শিশু মেয়েটি লইয়া সরযূ চলিতে লাগিল। মিনুও তাহার পিছন ধরিল।

৪

আজ অরণ্যষষ্ঠী। ইহার অপর নাম—জামাই-ষষ্ঠী। এই ষষ্ঠীপূজার সময় বাঙ্গালার শ্বশুরবাড়ীগুলি যেন আমোদের আড্ডায়

উঠিতে থাকে। শাশুড়ীদের কাজের একটা বেজায় মরসুম্‌ পড়িয়া যায়; গুছাইয়া গুছাইয়া তাঁহারা জামাতার্চ্চনের জন্য মণ্ডা-মিঠাই তৈয়ার করিতে থাকেন। আজ বঙ্গের ঘরে ঘরে জামাতার্চ্চনের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। গৃহিণীরা বাঁশের করুল, করঞ্জা, তালের পাখা, লেবু, আম্রফল প্রভৃতি পূজোপকরণের যোগাড় করিতেছেন। জামাইবাবুদিগকে শ্বশ্রূঠাকুরাণীরা পূর্ব্বোক্ত উপচারে অর্চ্চন করতঃ তালবৃন্ত দ্বারা বাতাস দিয়া,—"ষা'ট্‌ ষা'ট্‌" বলিয়া মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন। সে পাড়ার বোস-বাড়ীর সরযূর মাতাও খুব ব্যতিব্যস্ত; বাড়ীতে নূতন জামাই আসিয়াছেন। সুতরাং তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন,—শ্বাস ফেলিবার অবসরটুকুও নাই। সরযূ কিন্তু সরমে আধ-টুকু হইয়া গিয়াছে; সে যেন সেই বাড়ীতে নাই;—সেই বাড়ী হইতে তাহার অস্তিত্ব যেন লোপ পাইয়াছে। সরযূর স্বামী শ্রীমান্‌ শরচ্চন্দ্র ষষ্ঠীপূজা উপলক্ষে শ্বশুরালয়ে আগমন করিয়াছেন; সুতরাং সরযূ লজ্জায় গৃহকোণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহার কচি বুকের ভিতর যেন আশা-নিরাশার একটা তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে! হৃদয়ে উদ্দাম বাসনা,—জাগ্রত আশা; তথাপি সরমের চিক্কণ আভরণে মুখখানি ঢাকিয়া গিয়াছে; ললাটস্থ প্রণয়-রাজটীকার আসে-পাশে স্বেদবিন্দুগুলি মুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছে। আর এক একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত হৃদয়ের গুরুভার যেন বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইতেছে!

শরচ্চন্দ্র গত বৎসর অনারে বি এ পাস দিয়া এবার প্রেসি-ডেন্‌সী কলেজ হইতে এম্‌ এ দিতেছেন। নিতান্ত গরীবের ছেলে হইলেও, তাহার বরাতখানা মোটের উপর মন্দ নহে। অধ্যবসায়ে তিনি দ্বিতীয় রবার্ট ক্রস; ছেলে হইলে এমনটিই হওয়া চাই। দেশের বিদ্যোৎসাহী গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের করুণার উপর

নির্ভর করিয়া, শরচ্চন্দ্র ক্রমে তিন তিনটা পরীক্ষায় পাস দিয়াছেন; এখন এম এ পরীক্ষাটায় পাস দিতে না পারিলে, সে সম্মানটুকু বজায় থাকে কই? তাই তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ীতে আসিয়াছিলেন; শ্বশ্রূঠাকুরাণীর উপরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, মাত্র দুইটি দিনের জন্য শরৎবাবুকে ষষ্ঠীপূজা উপলক্ষে হরিনারায়ণপুর আসিতে হইয়াছে। শরৎবাবু এই প্রথমবার শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছেন। বেসী দিন এখানে থাকা তাহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব; কারণ এদেশের প্রচলিত নিয়মানুসারে জামাতার প্রথমবার শ্বশুরালয়ে আসিয়া, ত্রিরাত্রির বেসী অবস্থান নিসিদ্ধ। বিশেষতঃ কলেজের ছুটিও ফুরাইয়া আসিয়াছে,—পরীক্ষারও মাত্র ছয়টি মাস বাকী রহিয়াছে। এই সময়ের মধ্যেই তাহাকে এম্ এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে। তার উপর, ইংরেজী সাহিত্যে এম্ এ পাস করিতে হইলে যে, কি হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহই বুঝিতে সক্ষম নহে। তাই তিনি এটে-পুটে লাগিয়াছেন,—একবার হদ্দ-মুদ্দ করিয়া তবে ছাড়িবেন। দুইটি দিনের জন্য শ্বশুরালয়ে আসিতেও বেকনস্, ইমার্সন্, সেক্‌পীয়র, মিল্‌টন্, আর্ণোল্ড, ও ড্রাইডেন্ প্রভৃতির বহুতর কেতাব গাঁটুরী বাঁধিয়া আনিয়াছেন; দুইদিনের জন্যও তাহার শেয়ান্তি নাই। বিশেষতঃ অবিরাম পড়িতে পড়িতে তাহার মেজাজটা এমনিতর ভাবে গঠিত হইয়াছিল যে, শয়নকালে বুকে পুস্তক না রাখিলে, তাহার আদৌ ঘুম পাইত না। শরচ্চন্দ্র সর্ব্বদা পুস্তকের গাদায় পড়িয়া থাকিতেই ভাল বাসিতেন; আর কিছুতেই তাহার মন তেমন মাতিত না। আমোদ প্রমোদ, রঙ তামাসা, হাসিকান্নায় তাহার হৃদয়খানি দ্রবীভূত হইত না।

ছোট্ট ভাইবোন দুইটি এবং বৃদ্ধ পিতা মাতার উপরও তাহার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। যে কতটুকু বিষয় সম্পত্তি ছিল, তদ্দ্বারাই কোন প্রকারে পরিবার প্রতিপালন হইত। সুতরাং বাড়ীর ভাবনা তাহাকে বড় একটা ভাবিতে হইত না; তাহার একমাত্র ভাবনা ছিল,—পাঠ—আর পাস।

জীবনটা ঠিক না করিয়া বিবাহ করিবেন না, এ ধারণাও শরৎবাবুর হৃদয়ে ছেলেবেলা হইতেই বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু পিতামাতার আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হইয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে হইয়াছিল; সে আজ চারি বৎসরের কথা। তখন তিনি এফ্ এ পড়িতেন। "নিয়তি কেন বাধ্যতে?"

কিন্তু শরৎ বাবু বিবাহিত হইয়াও অবিবাহিত! পঠন-লিপ্সা তাহার এতই প্রবলা ছিল যে, গৃহস্থা যুবতী স্ত্রীর প্রতি দৃক্পাতও করিতেন না। বাড়ীটা আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যা'ক,—কিম্বা কেহ চক্ষের জলে সিক্ত উপাদানে সারাটা রাত কাটাইয়া দে'ক্, ভ্রমেও এসকল বিষয়ে তিনি মুখ তুলিয়া চাহিতেন না। তিনি বিবাহ করিয়াছেন কি না, একথা সমপাঠিরা জিজ্ঞাসা করিলে, অনেক সময় "না" কথাটাই মুখ হইতে গড়াইয়া বাহির হইত!

কিন্তু তখন ছিল একদিন, আর এখন একদিন। তখন সরযূ কঁচি খোকীটি ছিল, এখন সে পূর্ণা যুবতী; তখন সে সংসারের ধার ধারিত না—আগাগোড়া বুঝিত না,—হাসিত—খেলিত—খাইত—বেড়াইত, আর এখন তাহার দেহখানি যৌবন-জোয়ারে টলটলায়মান!—প্রাণে কি যেন একটা বাসনা সর্ব্বদাই উঁকিঝুঁকি মারিতেছে! এখন কি আর এসকলে কুলায়? এখন শত সেক্ষপীয়র, মিল্টন্, টেনিসন্, ইমার্সন্, ও ড্রাইডেন্ সরযূর রূপের আগুনে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইতে পারে! তবে শরৎ

নহে। এমন কিম্পুরুষ দ্বিতীয়টি মিলিয়া উঠা ভার। সরযূর ঢল-ঢল রূপরাশি,—টল-টল ললিত-লাবণ্য তিনি দেখিয়াও দেখিতেন না। ভবানী-পাঠকের দুষ্কর ব্রহ্মচর্য্যের বিদ্যালয়ে সমুচিত শিক্ষা পাইলেও, একজন এবিষয়ে চক্ষুহীন হইতে পারে না! আর শরৎ বাবু বিলাসিতার রঙ্গমঞ্চ বঙ্গদেশটার বুকে বাস করিয়াও এসকল বিষয়ে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন—সম্পূর্ণ উদাসীন!

৫

যাহা হউক, হরিনারায়ণপুরের বোস-বাড়ীতে নিরাপদে ষষ্ঠী-পূজা সমাপন হইয়া গেল। পাড়াপরসী প্রৌঢ়া ও মেয়েরা দলে দলে আসিয়া "নূতন জামাই" দেখিয়া গেল। দুরন্ত ছেলের দলের পালায় পড়িয়া শরৎ বাবুর অনেক সময় বৃথা ব্যয়িত হইয়া গেল। শ্বশুরবাড়ী আসিলে, এমনিতর একটা হেঁকচ-পেঁকচে পড়িতে হয়, একথা পূর্ব্বে জানিলে, শরৎ বাবুর ন্যায় একটি পুস্তক-পতঙ্গ কখনই এই আগুনে ঝাঁপ দিতেন না। এখন ভাবিয়া দেখিলেন, কাজটা ভাল হয় নাই। মেয়েদের দলে সরযূর " ফুল "—মৃণালিনীও আসিয়াছিল। সে একছুর তার "ফুলের" কাছে গিয়া, দু'চারটি ভাঙ্গা-গড়া কথা পাড়িয়া স্থানটুকু দখল করিয়া বসিল। সরযূ চক্ষে একটি টিপ কাটিয়া, মুচ্‌কি-হাসি হাসিয়া, 'ফুলের' পিঠে একটি ছোট-খাট-রকমের কীল দিয়া বলিল,—"কখন এলি ফুল?" মিনু কিছুই বলিতে পারিল না,—ফুক্‌রে হাসিয়া ফেলিল। সরযূ আর একটি কীল পুরস্কার দিল।

পাড়ার ছেলেদের দলে আমাদের সেই অনিলমাধবও আসিয়াছিল। বখাটে ছেলের দলে না মিশিয়া, সে শরৎবাবুর সঙ্গে, কোথায় কি পড়িবে, তৎসম্পর্কে আলাপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতঃ পরিচয় করিয়া লইল। এমন বাঁদরের দলেও একটি মানুষের

হাঁফ ছাড়িয়া প্রাণে বাঁচিলেন। হৃদয় খুলিয়া অনিলমাধবের সহিত অনেক আলাপ করিয়া লইলেন। শরৎবাবুর সঙ্গে কলিকাতা গিয়া, অনিলও এফ্. এ পড়িবে, একথা একমত পাকা হইয়া গেল; অপেক্ষা রহিল,—কর্ত্রীর অনুমতির! শরৎ বাবু আজ হঠাৎ একটা অবান্তর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অনিল বাবু! আপনি কি বিবাহিত?" অনিল উত্তর করিল,—"আজ্ঞে না; শীঘ্র বিবাহ করিবারও বাসনা নাই।" এতদিনে শরতের একটি অন্তরঙ্গ জুটিল।

ষষ্ঠীর সন্ধ্যা সমাগত হইল। দেখিতে দেখিতে রাত্র দশটা বাজিয়া গেল। অভুক্ত "জামাইবাবুর" আহারের ডাক পড়িল। আহারান্তে শরৎবাবু বাহিরবাড়ীর বৈঠকখানায় বসিয়া "মেকলে" পড়িতেছিলেন; এমন সময় চাঁপাদাসী আসিয়া ডাকিল,—"ওগো জামাই বাবু, শোবে এসো; আর ব'সে থাক্‌তে পাচ্ছি না ভাই! চোক দু'টা যেন জড়িয়ে আস্‌ছে।" পুস্তক হস্তে শরচ্চন্দ্র চাঁপার পিছন ধরিয়া, ভিতর বাড়ীর এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন; বাহিরের দিক হইতে দ্বারটা আটকিয়া গেল।

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শরচ্চন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন,—পালঙ্কের এক-পার্শ্বে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা একটি সৌন্দর্য্যের রাণী বসিয়া। শরৎ বাবু কি কথা বলিতে গিয়াও বলিতে পারিলেন না,—চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই সৌন্দর্য্য-প্রতিমাটি উঠিয়া আসিয়া, শরতের শ্রীচরণে টিপ করিয়া, একটি প্রণাম করিল। শরৎ নিস্তব্ধ। এমন সময় রজনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া, শরতের প্রশান্ত হৃদয়খানি আলোড়িত করিয়া, সদর রাস্তা দিয়া, এক ব্যক্তি গাহিয়া গেল,—

"যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা,

ভালবেসে যদি সুখ পাওহে সখা,
পায়ে ধরি ভালবেসোনা ॥"

আজ শরচ্চন্দ্র বাঁধা পড়িলেন,—ড্রাইডেন্, ইমার্সন্, টেনিসন্ সেই রূপ-তরঙ্গে ডুবিয়া গেল! সংসারটা যেন মাথার উপর একবার ঘুরিয়া গেল! শরৎ সরযূর হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, —"তুমি কি তবে সরযূ?—তোমার এ রূপরাশি?—তবে ড্রাই-ডেনের ও টেনিসনের কাল্পনিক ভালবাসার কাহিনী পাঠ করিয়া আর মরি কেন? সরযূ! আমায় মাপ কর।"

সরযূ।—ছিছি, অমনটি বোল্‌বেন না; আমি আপনার দাসী —চরণ-সেবিকা,—আমার অপরাধ লইবেন না।"

এতদিনে বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল,—শরতের একটা পাপ-গ্রহ কাটিয়া গেল। শরতের মরুময় জীবনে একটি শান্তির উৎস এতদিনে ফুটিয়া উঠিল; আজ শরতের চক্ষে জগৎ সম্পূর্ণ নূতন বোধ হইল।

আর অনিলমাধব?—সে একজন ভাগ্যবান্ পুরুষ। ঢাক-ঢোল বাজাইয়া মহাসমারোহে মিনুর সহিত অনিলের শুভ বিবাহ হইয়া গেল। মিনুর মা বুদ্ধি চালাইয়া বাঁধাঘর বাঁধিয়া রাখিলেন। সরযূ ও মিনুর "ফুল" সম্বন্ধটিও আজীবন রহিয়া গেল। আমরাও উপসংহারে বলিয়া লইলাম,—"ফুল"।

শ্রীকামিনীকুমার দে রায়।

তুমি।

ঊষার অমল-স্নিগ্ধ মলয়-সমীরে,
তোমার মধুর স্মৃতি ভেসে আসে মনে;

তব মুক্ত-স্বর-সুধা করায় স্মরণ ;
সন্ধ্যার মলিন ছায়ে, তব বিষাদের
শান্ত-স্নেহ মূর্ত্তিখানি মনে উঠে জাগি' ;
সান্ধ্যাকাশ পড়ে যবে শুভ্র বিন্দু ভালে,
মঙ্গল-মূরতি ধরি' আরতি-আবেশে
ভক্তের বিমুগ্ধ নেত্রে উঠ উদ্ভাসিয়া ;
জানিনা কিরূপে তব ও ক্ষুদ্র মূরতি,
বিরাট বিশ্বের বাহ্য প্রকৃতির মাঝে,
মিশিয়া ধরিছে নিত্য সাকার মূরতি,
অন্তরের অনুরূপ—স্মৃতির আরাধ্য ;
একি এ বিচিত্র মায়া,—তীব্র অভিশাপ !—
এত কাছে,—তবু তুমি আশাতীত দূরে !
জীব-ভ্রান্তি,—মোহমায়া নারি কাটিবারে ।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ।

ইউরোপে সংস্কৃত সাহিত্য প্রচার ।

সভ্যতার আলোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যে সময় প্রথম মানুষ অজ্ঞানান্ধকারের রাজ্য অতিক্রম করিয়া, ক্রমশঃ জ্ঞান-মার্গে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময় হইতেই ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানাপ্রকার আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। কিরূপে ভাষার উৎপত্তি হইল, ভাষা ও ভাবের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহার প্রকৃতি কিরূপ, একমাত্র মানুষী শক্তিই ভাষা বিশেষ সৃষ্টির সম্পর্কে যথেষ্ট কিনা ইত্যাদি নানা প্রশ্নই প্রাচীন মনীষিবর্গের চিন্তাশক্তি

আলোড়িত করিয়াছে। বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচীন গ্রীস ও আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার পণ্ডিতগণের মধ্যে ভাষা-তত্ত্ব সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী বিবিধ মত চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহই সুমিমাংসায় পহুঁছিতে পারেন নাই। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত-বর্গের অনেকই একদেশ-দর্শী ছিলেন; সুতরাং তুলনায় নানা ভাষা পর্য্যালোচনা করিয়া, কেহই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে সমর্থ হন নাই। কেবল উপযুক্ত পর্য্যালোচনার অভাবেই যে, ইঁহারা অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা নহে; অনেকে আবার নানারূপ অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াও সত্যপথ-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। বাইবেল গ্রন্থে যাঁহাদের একটু অধিক বিশ্বাস ছিল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই দৃঢ় ধারণা ছিল যে, হিব্রু ভাষাই পৃথিবীর আদিম ভাষা; যেহেতু এডাম ও ইভ্ এই ভাষা-য়ই কথা কহিয়া গিয়াছেন। হিব্রু ভাষা হইতেই পৃথিবীর অপরাপর ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহারা যথেষ্ট যত্নও করিয়া গিয়াছেন। বহুতর প্রকাণ্ড গ্রন্থ তাঁহাদের জীবনব্যাপী পণ্ড শ্রমের দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত স্বরূপ আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ইউরোপে সংস্কৃত সাহিত্য প্রচার হওয়ার পরই প্রকৃত প্রস্তাবে ভাষা-বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়। এই ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নূতন নূতন সিদ্ধান্ত সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক রাজ্যেও একটা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ভূ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত যেমন ভূগর্ভস্থ স্তরসমূহের পর্য্যালোচনা দ্বারা পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ ও আদিম অবস্থা নির্ণয়ে সমর্থ হন, প্রাণীতত্ত্ববিদ্ যেমন সাইবিরিয়ার বরফ-প্রোথিত কঙ্কালরাশির সম্যক পর্য্যালোচনা করতঃ অনেক অজ্ঞাত জীবজাতির আকৃতি-প্রকৃতি নির্দ্ধারণে সক্ষম হন, ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতও তদ্রূপ প্রাচীন ভাষা সমূহ পর্য্যালোচনা

করিয়া, সে সমস্ত ভাষা যাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহাদের মানসিক অবস্থা, সামাজিক আচার ব্যবহার ও উন্নতি ইত্যাদির পরিমাণ নির্ণয় করিতে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হন। সংস্কৃত, গ্রীক্, ও লাটিন,—এই তিনটি প্রাচীন সাহিত্যের ক্রম-তুলনা হইতেই এই অপূর্ব্ব ভাষা-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। কিরূপে ইউরোপে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচার হয়, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য্যশালিনী—ভারতবর্ষ স্বর্ণগর্ভা ইত্যাদি বিবিধ বিশ্বাস অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইউরোপে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু পার্থিব বিভব ব্যতীত ভারতভূমি যে, অতুল সাহিত্য-সম্পদেরও অধিকারিণী ছিল, একথা পূর্ব্বকালে ইউরোপে একরূপ অজ্ঞাত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহাবীর আলেক্জাণ্ডারের ভারতাগমন, এবং চন্দ্রগুপ্তের সভায় তদীয় পারিষদ্ মেগাস্থিনিসের বসতি প্রভৃতি দ্বারাই ইউরোপীয়েরা ভারত সম্বন্ধে প্রভূত প্রকৃত তথ্য জানিতে সমর্থ হন। মেগাস্থিনিস্ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণাবস্থায় বর্ত্তমান থাকিলে, হয়ত সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রীকদিগের মতামত অনেক পরিমাণে জানা যাইতে পারিত। কিন্তু সে পুস্তকখানির অধিকাংশ বিলুপ্ত হওয়ায়, শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে নহে, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধেও বহু পরিমাণে ক্ষতির কারণ হইয়াছে।

সুবিখ্যাত খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক সেণ্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার ১৫৪২ খৃঃ অব্দে এদেশে আগমন করেন। কথিত আছে যে, বিদেশী ভাষা শিক্ষার সম্বন্ধে তাঁহার দৈবী শক্তি ছিল। কিন্তু এদেশে ধর্ম্মপ্রচার কালে তিনি সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষা করিয়াছিলেন কি না, তদ্বিষয়ের নিশ্চিত বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না; তবে তাঁহার

ভারতাগমনের অব্যবহিত পরেই পর্তুগীজাধিকৃত গোয়া নগরীর মিশনারীদিগের মধ্যে যে, সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ হয়, একথার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মিশনারীগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত শিক্ষা করতঃ, হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থাদি সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করা সুকঠিন। সুতরাং তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন।

১৬০৬ খৃঃ অব্দে বরার্ট ডি নবিলি (Robert de Nobili) নামধেয় সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব একব্যক্তি এদেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ আগমন করেন। তিনি মাদুরা প্রভৃতি সহরের দেশীয় খ্রীষ্টানবর্গের অবস্থা পর্য্যালোচনা দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, এদেশে যাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহাদের প্রায় সকলেই নীচবংশোদ্ভব ও অশিক্ষিত। তিনি আরও বুঝিতে পারিলেন যে, এদেশীয় শিক্ষিত ও ব্রাহ্মণাদি উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ সহসা ইউরোপীয় মিশনারীদিগের সহিত মেশা-মেশি করিতে চাহেন না। বহু চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন যে, এদেশে কোন বৈদেশিক ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে, অন্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া হইলেও অগ্রে এদেশের ভাষা শিক্ষা করিতেই হইবে। তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল যে, এদেশীয় ভাষা-জ্ঞানের অসদ্ভাবই তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র পরিপন্থী। সুতরাং তিনি সর্ব্বাগ্রে এদেশের ভাষা শিক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বহু বৎসরের অধ্যবসায়ের ফলে, তিনি তামিল, তেলেগু, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন। যখন বুঝিলেন যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদিগের সহিত কোন তর্ক উপস্থিত হইলে, তিনি অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় তর্ক বিতর্ক করিতে সম্যক্ সমর্থ, তখন ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণের ন্যায়

বেশ-ভূষা ধারণ করিয়া এবং উপবীত গ্রহণ করতঃ প্রকাশ্যে সভাসমিতিতে যোগদান করিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে, খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধেও তিনি হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত নিয়মাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এরূপ ব্যবহারে চারিদিক হইতেই তাঁহার প্রতি উৎপাত আরম্ভ হইল। একদিকে, ব্রাহ্মণবর্গ তাঁহাদের ধর্ম্মের অবমাননা করিতেছে বলিয়া, তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, অন্যদিকে তদীয় সমশ্রেণীস্থ মিশনারীগণও তাঁহার এতাদৃশ অদ্ভুত ব্যবহারে তৎপ্রতি নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। বিবিধ বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও নিজ উদ্দেশ্য সংসাধনে তিনি অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি শেষ বয়সে অন্ধ হন এবং এদেশেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বিস্তৃত জীবনী অতীব আশ্চর্য্যজনক ও শিক্ষার স্থল। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার এতটা বুৎপত্তিই জন্মিয়াছিল যে, তিনি মনুসংহিতা, পুরাণ, অপস্তম্ভ সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত তর্ক করিতে সমর্থ ছিলেন এবং নিজকে একটি নূতন বেদের প্রচারক বলিয়া প্রকাশ করিতে সাহসী হন। এদেশের ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতির সম্বন্ধে বিবিধ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া, তিনি রোমনগরীতে প্রেরণ করিতেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার এসমস্ত বিবরণ পাঠ করিয়াও ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সংস্কৃতের ন্যায় একটি প্রাচীন সাহিত্যের সহিত পরিচিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে কুতূহলের উদ্রেক হইয়াছিল না।

অতঃপর জেছুইট্ মিশনারীগণের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই সংস্কৃত শিক্ষার স্রোতঃ ক্রমশঃ পাশ্চাত্য জগতে বহিতে আরম্ভ করে। মিশনারীদিগের মধ্যে পিয়ার কালমিতি (Pere

Calmethe) নামক একব্যক্তি এসময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি বেদ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ও বেদোক্ত ধর্ম্ম এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি একখানি পত্রে এবিষয়ে একটি কথা লিখিয়াও গিয়াছেন। *

মিশনারীদের মধ্যে যদিও অনেকে সংস্কৃত সাহিত্যে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তথাপি তাঁহাদের দ্বারা ভাষা-বিজ্ঞানের কিঞ্চিন্মাত্রও সহায়তা হয় নাই। ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে তাঁহারা সংস্কৃত শিখিতেন এবং হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মপ্রচারের অনুকূলে যে সকল কথা পাওয়া যাইত, কেবল তৎসমুদয়ই সংগ্রহ করিতেন। কণ্টকে কণ্টকোদ্ধারই তাঁহাদের ব্যবসা ছিল; সুতরাং বহুকাল সংস্কৃত চর্চ্চা করিয়াও গ্রীক ও লাটিনের সহিত সংস্কৃতের যে একটি অচ্ছেদ্য বন্ধন রহিয়াছে, তৎসংস্থাপনে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

মহাত্মা স্যর উইলিয়ম জোন্স যেদিন প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করিয়া এদেশে আগমন করেন, সেটি এদেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাবান্ পুরুষ ছিলেন; এবং বাল্যকাল হইতেই বিদেশীয় বিবিধ ভাষা শিক্ষার্থে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এদেশে তাঁহার শুভাগমনের পর ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে তৎকর্ত্তৃক কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করি-

---

* পত্রের বঙ্গানুবাদ,—"বেদপাঠে আমরা সম্যক্ বুঝিয়াছি যে, বেদোক্ত সত্যগুলি পৌত্তলিকতার সম্পূর্ণ বিরোধী। ঈশ্বরের একত্ব, তাঁহার গুণাবলী ও পাপপুণ্যের ফলাফলের বর্ণনা আমরা এখন বেদে পাইতেছি। কিন্তু এসকল বালুকারাশিতে স্বর্ণ রেণুর ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।"

রাই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইউরোপ-পূজ্য গ্রীক ও লাটিন ভাষার সহিত সংস্কৃতের অতি নিকট সম্বন্ধ। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া, তিনি কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট নাটক সমূহ ইংরেজী ভাষায় অনূদিত করিয়া ইংলণ্ডে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সংস্কৃতের প্রতি এতটাই অনুরক্ত ছিলেন যে, গ্রীক ও লাটিনের উপরেও ইহাকে স্থান দিতে ইনি কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা ভাবিতেন না। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর অপরিজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং গ্রীক, লাটিন ও সংস্কৃত একই ভাষা হইতে উৎপন্ন, এবং সংস্কৃত সাহিত্য পৃথিবীর একটি অমূল্য সম্পদ ইত্যাদি সারসত্য যখন তিনি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন ইউরোপীয় ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌দিগের দৃষ্টি ক্রমশঃ ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট হইতে আরব্ধ হইল। স্যর উইলিয়ম্ জোন্সের সংস্কৃত গ্রন্থাবলী প্রচারে একদিকে যেমন ইহার প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অন্যদিকে ইহার আবার বহুতর শত্রু হইয়াও দাঁড়াইল। অসভ্য পরাধীন এসিয়াবাসী হিন্দুজাতির ভাষা,জগৎ-পূজ্য গ্রীক ও লাটিন ভাষার সমস্থান অধিকার করিবে, ইহা অনেকের পক্ষে অসহ্য হইয়া দাঁড়াইল। যাহারা সংস্কৃত ভাষার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন, তাহাদিগের মধ্যে স্কটলণ্ডের পণ্ডিত প্রবর (?) ডুগাল্ড ষ্টুয়ার্টের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি যেরূপ ভাবে সংস্কৃত ভাষাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বিকৃত-মস্তিষ্ক ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। তিনি প্রচার করিয়া বসিলেন যে, সংস্কৃত বলিয়া একটা ভাষা কোন সময়েই পৃথিবীতে ছিল না; পরন্তু মিশনারীগণ ও ইউরোপীয়ান-দিগকে ঠকাইবার নিমিত্ত জুয়াচোর ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক গ্রীক ও লাটিন ভাষার অনুকরণে এই অপূর্ব্ব ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।

ইউরোপীয়ানদের মধ্যে অনেকেই আপনাপন বাহাদুরী দেখাইবার জন্য এই আন্দোলন করিতেছিলেন।

বলা বাহুল্য যে, ডুগাল্ড ষ্টুয়ার্টের উত্তপ্ত মস্তিষ্কের এতাদৃশ প্রলাপবাক্য যথাসময়ে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। অপ্রতিহতভাবে ইউরোপে সংস্কৃত সাহিত্যের স্রোতঃ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। ইংলণ্ডে যে কার্য্যের সূচনা হইল, জর্ম্মাণদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা তাহার সমাপ্তি হইল। স্যর উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি যবনিকা উত্তোলন করতঃ পৃথিবীর এক নূতন সাহিত্যরাজ্য ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতবর্গকে দর্শাইয়া দিলেন বটে, তথাপি তাঁহারা তাহা হইতে উপযুক্ত পরিমাণে রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া, ভাষা-বিজ্ঞানকে নূতন সম্পদের অধিকারী করিতে সমর্থ হইলেন না। শুধু তাহাই নয়, ভাষাতত্ত্ববিদ্ বলিয়া, ইউরোপে যাঁহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, তন্মধ্যে কেহই প্রকৃত প্রস্তাবে ভাষা-বিজ্ঞানের প্রণেতার আসন দাবী করিতে পারেন নাই। যাঁহার দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তিনি জর্ম্মণির একজন মহাকবি, নাম—ফ্রেড্রিক শ্লেগেল (Fradrich Schlegel)।

স্থূলদৃষ্টিতে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও, ইহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হওয়ার কিছুই নাই। কারণ যে মহিয়সী কল্পনা শক্তির সাহায্যে কবি নূতন স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিয়া, পাঠকের মানসচক্ষে প্রতিভাত করিতে সমর্থ হন, ভিন্নভাবে প্রয়োজিত হইলে, তাহাই আবার জড়-জগতের নিগূঢ় সত্য ধারণার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। ফ্রেড্রিক শ্লেগেল ১৮০৮ খৃঃ অব্দে "The Language and Wisdom of the Indians" নামক একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন, এবং উহাই প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাষা-বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তি স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ভারতবর্ষ, পারস্য, গ্রীস, ইতালি, জর্ম্মণি,

স্লাভোনিক প্রভৃতি দেশের ভাষা সকল একই পরিবারভুক্ত,—একই মায়ের গর্ভজাত, এরূপ সত্য শ্লেগেলই সর্ব্বপ্রথম অবিসংবাদিতরূপে প্রচার করেন।

শ্লেগেলের পর বপ্, গ্রীস প্রভৃতি জর্ম্মাণ পণ্ডিতবর্গের দ্বারা ভাষা-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের আলোচনাও অনেকটা বৃদ্ধি পায়। ইংলণ্ডস্থ সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে উইলসন্, মনিয়ার উইলিয়ম্‌স ও মোক্ষমুলর প্রভৃতি মনীষিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা বিদেশী হইয়াও সংস্কৃতের উন্নতিকল্পে যাদৃশ শ্রম ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসার্হ। গ্রীক্ ও লাটিন ভাষার আলোচনা দ্বারা ইংলণ্ডে যেরূপ নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃতের চর্চ্চা দ্বারাও ইংলণ্ডের সাহিত্য-জগতে তাদৃশ একটা যুগান্তর উপস্থিত হইবে বলিয়া, পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমুলর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই বাক্য কতদূর সত্য হইবে, তাহা বলা যায় না; তবে একথা ঠিক যে, গ্রীক্ ও লাটিন ভাষা ইউরোপে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সংস্কৃতের তাদৃশ প্রভাব বিস্তার হওয়ার পক্ষে বহুতর অন্তরায় আছে। সংস্কৃত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর ভাষা,—ইহা যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ্ কিম্বা বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর ভাষা নহে। ইহা সত্ত্বগুণসম্পন্ন; সুতরাং দেবভাষা বলিয়া পরিচিত। সংসার-সুখ-নিরত ধর্ম্মরাজ্যের অতি উচ্চস্তরে অবস্থিত ঋষিবর্গের দ্বারা ইহা সৃষ্ট ও পুষ্ট। ঐশ্বর্য্য-মত্ত ইউরোপীয়ানদিগের মদ্য-মাংস-প্রপীড়িত মস্তিষ্ক যে, ইহার মাহাত্ম্য সম্যক্ বুঝিতে পারিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে যেরূপ অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তাঁহারা যত্ন নিতেছেন এবং বিলুপ্ত প্রাচীন সংস্কৃত

গ্রন্থাবলীর উদ্ধার সাধনে যাদৃশ অর্থব্যয় ও শ্রম করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহারা সবিশেষ ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দে বি, এ।

যেওনা।

তখনো ডোবেনি তারা, ক্ষীণ জ্যোছনার,
ম্লান আলো-রেখা ঢাকা ছিল চারিধার।
তখনো গাছের শাখে যত পাখীগুলি,
করিতে আছিল সুখে কত ঝিলিবিলি।
মর্ম্মরিত তানখানি বিপিন-বীণার,
ব'লেছিল বাকী নাই নিশি পোহাবার।
সুরভি কুসুমগুলি ফুটিয়া ফুটিয়া,
উষারাণী-আশা-পথ আছিল চাহিয়া।
যেতে হ'বে বহুদূরে ;—কণ্ঠ জড়াইয়া
প্রিয়া কিন্তু মায়াপাশে আমারে বাঁধিয়া,
নিশ্চিন্ত নীরবে ছিল ;—আছিল বিশ্বাস,
কাটিতে নারিব আমি এ মোহের ফাঁশ।
সরলা বালিকা আহা ! ভেবেছিল মনে,
অই তার বাহু দু'টি এ মর্ত্ত্য ভবনে
চিরবন্দী রেখে দিবে ;—বাহু সরাইয়া,
বিহগের গানে যবে উঠিনু জাগিয়া,
উষার বন্দনা-তানে,—সহসা প্রেয়সী
চাহিল নয়ন মেলি' ;—"তবে আমি আসি ?"
বিদায় মাগিনু কাছে ; করিয়া করুণা,
বলিল একটি কথা—"যেওনা—যেওনা !"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

উপাধি—না ব্যাধি ?

আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ও নিত্য নব আবিষ্কারে পরিপুষ্ট ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে বহুবিধ ব্যাধির কথা লিখিত আছে। উহাদের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় ও তাহা দূরীকরণার্থ, বহু পূর্ব্বকাল হইতেই, মহা-মহা মনীষিগণ আপনাদের মস্তিষ্ক-সাহায্যে ও জীবন-ব্যাপী পরিশ্রমে রক্তমাংসের দেহধারী মানব জাতির অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। আমরা নিঃসন্দেহরূপে তাঁহাদের নিকট এজন্য ঋণী। অনেকেই জানেন যে, এখন কাল ও স্থান-মাহাত্ম্যে অনেক নূতন রোগের আবির্ভাব হইয়াছে ও হইতেছে ; এবং উহাদের প্রশমন হেতু ব্যবস্থাও সাধামত নূতন আবিষ্কৃত হইতেছে। শারীরিক রোগের দুঃখ ও বিভীষিকা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ন্যূনাধিকরূপে অবগত আছেন। কিন্তু অদ্যকার প্রবন্ধে আমরা যে ব্যাধির কথা উল্লেখ করিব, তাহা দেশীয় কিংবা বিদেশীয় কোন শারীর-নিদানের রোগ-তালিকাভুক্ত হইতে পারে কিনা, তাহা আমরা জানিনা। কিন্তু ইহা যে, শারীরিক ব্যাধির ন্যায়ই অনেক পরিমাণে সর্ব্বনাশকর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্থূলদৃষ্টি বিশিষ্ট সাধারণের চক্ষে ইহা উপেক্ষার বিষয় হইলেও, দেশের ও সমাজের মঙ্গলেচ্ছু সুধী ব্যক্তিগণের মানস-চক্ষে উহা শারীরিক রোগের ন্যায়ই দুঃখপ্রদ ও আশঙ্কাজনক ; আমরা ঐ ব্যাধি-টির নাম ও লক্ষণ সহকারে বঙ্গীয় বিদ্বজ্জন-সমাজে উপস্থিত হইতেছি ; তাঁহারা ইহার কোন প্রতিকার আছে কিনা, এবং থাকিলে, কি প্রণালীতে উহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক, তাহা নির্ণয় করুন।

আমাদের বক্তব্য ব্যাধিটির নাম—উপাধি-বিকার। প্রথম প্রশ্ন বিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়দিগের নিকটে ; বলি, আপনারা এই

রোগের নাম শুনিয়াছেন কি ? আপনাদের শাস্ত্র ত্রিকালজ্ঞ ঋষিপ্রণীত। সুতরাং যাহা ছিল, আছে ও হইবে, তৎসমস্তেরই নিদান উহাতে আছে। নূতন মূর্ত্তিতে,—নূতন রোগরূপে ওলাউঠা যখন এদেশে প্রথম আতঙ্কের ডঙ্কা বাজাইল, আপনারা মৃদু মৃদু হাসিয়া মাথাটি নাড়িয়া বলিলেন—"এ আর নূতন কিসে ?—এ যে আমাদিগের চিরকালের চেনা, পুরাতন পরিচিতা,—শমনের প্রিয় পরিচারিকা দূতী।" এই বলিয়া বিসূচিকার তালিকায় উহার নাম লিখিয়া রাখিলেন। প্লেগ আসিল,—অমনি আপনাদিগের আয়ুর্ব্বেদ তাহার রেজেষ্টারী খুলিয়া উহাকে বায়ু, পিত্ত, কফের পুরাতন চক্রব্যূহেরই অন্যতর মহারথী বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। অতএব, এরোগও আপনাদিগের কাছে নূতন বলিয়া গণ্য হইবে না, ইহা নিশ্চিত কথা। লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, আপনারা ইহাকে ত্রিদোষজ উন্মাদরোগের অন্তর্ভূক্ত করিয়া লইবেন। উন্মাদরোগ অনেক প্রকারের,—ক্রোধোন্মাদ, মদোন্মাদ, ভাবোন্মাদ, প্রেমোন্মাদ ইত্যাদি কত কি আছে। উপাধিবিকার কোন্ উন্মাদ, যাঁহাদের নাড়ীজ্ঞান আছে, তাঁহারাই তাহা ঠিক করিয়া লইবেন।

এদেশে এখন উৎকট পীড়া হইলে, বিশেষতঃ রোগের তরুণ অবস্থায়, শুধু কবিরাজের মুখ চাহিয়া কেহই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সর্ব্বপ্রথম ডাক্তারেরই ডাক পড়ে; পর্য্যায়ক্রমে এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ ডাক্তারদিগের ব্যবস্থা লওয়া হয়। তাই জিজ্ঞাসা করি, বহুদর্শী ডাক্তার মহাশয় ইহাকে কি পীড়া বলিবেন ? আপনাদের নিদান বা প্যাথলজী (Pathology) মনুষ্যকৃত ; উহাতে নূতনের প্রবেশাধিকার আছে। আপনারা কি ইহাকে আপনাদের প্যাথলজি বহির্ভূত নূতন রোগ বলিবেন ?—না Convulsion বা হিষ্টিরিয়া বিশেষ বলিয়া পুরা-

তন লিখেই রাখিবেন ? কিন্তু বলুন দেখি, ইহা কি চিকিৎসা-সাধ্য,—না দুশ্চিকিৎস্য ?

অন্য প্রণালীতে এই ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধ ও চিকিৎসা না থাকিলেও, হোমিওপ্যাথ মহাশয়ের তহবিলে অবশ্যই ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ থাকা সম্ভবপর। একজন অতি সহজে রাগান্বিত হয়, হোমিওপ্যাথ তাহার এই রাগ-রোগে ঔষধ-প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত ! কেহ একটু বেসী হাসে বা সহজে কাঁদে, হোমিওপ্যাথির ফার্‌মাকোপিয়ায় এ হাসি ও কান্নার উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে ! এসমস্ত রোগের ঔষধ আছে, উপাধি-বিকারের ঔষধ নাই,—একথা কদাপি বিশ্বাসযোগ্য নহে। হেকিমীর কবাব, কোরমা ও হালোয়ার কার্য্যক্ষেত্রেও এ রোগের বিকাশ না ঘটিয়াছে, এমন অনুমান করা অন্যায়। হেকিম সাহেব সম্ভবতঃ এ রোগের উদ্যম অবস্থাকে "দেওয়ানা" ও Re-action বা প্রতিক্রিয়ার অবস্থাকে "দেউলিয়া" নামে নির্দ্দেশ করিবেন।

এসকল কথা থাকুক। প্রকৃত অবস্থার দূষিত পরিবর্ত্তনই বিকার; এবং আজ কাল অনেক স্থানেই উপাধি সহসা বিকারে পরিণত হয় বলিয়াই আমাদের এই আলোচনা। সকল বিষয়েরই দুইটা দিক্ আছে। ভালদিকে দৃষ্টিপাত করিলে, উপাধির দুই একটি উপকারিতাও যে, একেবারে উপলব্ধি করিতে না পারা যায়, তাহা নয়। কিন্তু সুস্থ শরীরের প্রফুল্ল কান্তি-দর্শনে প্রীতি প্রকাশ অপেক্ষা, আসন্ন দশাগ্রস্ত রোগীর চিন্তাই প্রথমে করা কর্ত্তব্য, এই বিবেচনায় আমরা আপাততঃ উহার ভাল দিক্ দেখাইতে ক্ষান্ত রহিলাম। আমরা ক্রমশঃ উহা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইব।

সদুদ্দেশ্যে সমাজের সুধীনেতৃগণ, অথবা শাসন-সংরক্ষণ-কর্ম্ম-নিযুক্ত বিজ্ঞ রাজপুরুষগণ দেশে যখন কোন শুভ কার্য্যের আয়-

ষ্ঠান করেন, তখন অনুষ্ঠানকারী ফলদাতৃগণ হইতে ফল-প্রার্থী ও গৃহীতা পর্য্যন্ত সকলের ভিতরই একটা সাধারণ সারল্য ও সাধুতার সুবাস ছড়ান রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন থাকিলে, এই ভাব ক্রমে সংস্কৃত হইয়া, উন্নতির পথে যায় এবং ক্রমশঃ দেশের সুখ-শান্তি বর্দ্ধিত করে ; অন্যথা উহাতে নানা রূপ কৃত্রিমতা ঢুকিয়া, ফলদাতা ও ফল-গৃহীতা উভয়ের মধ্যেই একটা নিন্দনীয় ব্যবসায়ের সূত্রপাত করিয়া দেয়, এবং দেশও ক্রমশঃ অধঃপাতে যাইতে আরম্ভ করে।

ওলাউঠা প্রভৃতির ন্যায় উপাধি-বিকারেরও তিনটি অবস্থা। প্রথম সংক্রমণ, তৎপর বিকাশ এবং সর্ব্বশেষে প্রতিক্রিয়ার অবস্থা। প্রেমে Court-ship বা পূর্ব্বরাগের উপাসনার যে ভাব বা লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, উপাধি-বিকারের সংক্রমণ অবস্থায়ও প্রায় তাহাই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। প্রথম শ্যামরূপ দর্শন, তৎপর সেই শ্যামচাঁদের অধরনিঃসৃত বংশীরব শ্রবণ এবং ইহার পরেই পূর্ব্বরাগের উন্মাদ-উচ্ছ্বাস। এ ক্ষেত্রেও দরবার-গৃহে উপাধিধারী সজ্জিত পুতুলবৎ সেই নূতন ঢঙের পোষাক পরিচ্ছদ, গর্ব্বিত শিরস্ত্রাণের সেই মলয়-দোলায়িত উচ্ছ্রিত পালকগুচ্ছ, কটিদেশ শোভার্থবিলম্বিত সেই মহার্ঘ কোষ-নিবদ্ধ অসি, তাঁহার সেই অগ্রগণ্য আসন ও “পান-আতর” গ্রহণ সময়ের সেই অগ্রগণ্য আদর, প্রথমতঃ এই সকল আবসাবেই উপাধি-প্রেমিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অতঃপর উপাধিপ্রাপ্তির যশঃ-বংশী শ্রবণে প্রাণ একবারে আকুল হইয়া উঠে। ইহাই এই রোগের সংক্রমণ-হেতু। উপাধি-বিকারের সংক্রমণ ঘটিলেই মানুষ একে আর হইয়া যায়। রাধার মন আর গৃহকার্য্যে বসিতে চাহে না ; সে তখন হলুদ বাটিতে আঙ্গুল পেষণ করে,—মুড়ি ভাজিতে খৈ ভাজিয়া ফেলে,—মাছ কুটিতে ছেলের গলায় বঁটি ভেজায় !

উপাধি-সংক্রমণের এমনি ভয়াবহ অবস্থা ঘটে! ব্যাধির বিকাশ ঘটিলে, অর্থাৎ রুগ্ন-ধাতু ব্যক্তি উপাধিগ্রস্ত হইলে, তখন যে অবস্থা ঘটে, তাহা আরও ভয়াবহ। তখন তাহার মাথা ঘুরিয়া যায়,—চক্ষের দৃষ্টি আবিল হয়,—সরল গ্রীবা দুর্ব্বহ উপাধির বোঝায় বাঁকাইয়া যায়,—পা আকাশে আঘাত করিয়া চলে,—এবং তাহার তর্জ্জন, গর্জ্জন ও নিনাদে প্রতিবেশীর প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে! প্রতিক্রিয়া বা শেষ অবস্থা আবার তেমনি শোচনীয়। তখন নহবৎ-খানার রোসন-চৌকী থামিয়া যায়; পুরুষানুক্রমি বন্দনা-গায়কের কণ্ঠরোধ হয়; আসবাবও একটির পর একটি খসিয়া পড়ে; বিলাস-গৃহের আলোক নিবিয়া যায়; প্রাসাদে চামচিকা বাস করে! সে তখন অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া, নির্জ্জনে বসিয়া পদাবলীতে তান ধরিয়া চিত্তের ভার লঘু করিতে চেষ্টা করে। আর মনের আবেগ সামলাইতে না পারিয়া, বলিয়া ফেলে:—

"সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল॥"

উপাধি-বিকারের সংক্রমণ অবস্থার তিনটি মুখ্য লক্ষণ; গৌণ লক্ষণ একটি। এই রোগে সংক্রামিত সকলের মধ্যেই অবশ্য তিনটি লক্ষণ একবারে একসঙ্গে প্রকাশ পায় না। যাহার পায়, তাহার অবস্থা অবশ্যই বিশেষভাবে শোচনীয় হইয়া পড়ে।

ইহার প্রথম লক্ষণ,—দেশের যেসকল জাতীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে রাজপুরুষদিগের সংশ্রব নাই, তাহাতে যোগদান করিলে, রাজপুরুষদের কোপে পড়িয়া পাছে অভীপ্সিত হারাইতে হয়, এই কল্পনায় অতি সতর্কতার সহিত তাহা হইতে দূরে থাকা। শুধু দূরে থাকিয়াই সকলের তৃপ্তি হয় না। কেহ

কেহ ইসপের গল্পের (Æsop's Fable) সেই লুব্ধ শৃগালের মত, "Grapes are sour"—আঙ্গুর বড় টক, এইভাবে উক্ত সম্মানের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি একবারে অকর্ম্মা ঢেঁকি নহেন, তিনি উহার বিরুদ্ধাচরণে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, রাজপুরুষগণের "বাহাবা" পাইতে সমুৎসুক হইয়া উঠেন।

দ্বিতীয়তঃ সাহেব মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া, যে কোন শ্বেতাঙ্গ পুরুষকে ষোড়শোপচারে পূজা করতঃ, সাহেবমহলে সুনাম অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় অহোরাত্র উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত থাকা।

তৃতীয়তঃ সর্ব্বস্বান্ত হইবার উদ্যোগ হইলেও, বহ্নি-মুখ পতঙ্গের ন্যায় আকাঙ্ক্ষিত অনলে সর্ব্বাগ্রে ঝাঁপ দিবার জন্য সই-সুপারিসের বিপুল আয়োজন এবং অনিশ্চিত উপাধি লাভের আশায় রাজপুরুষদের শ্রীচরণে, কখনও অযাচিত ভাবে স্বেচ্ছায়, কখনও বা রোষ-কষায়িত-লোচন-প্রভাবে দায়ে ঠেকিয়া, ঘরের সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দেওয়ার জন্য উৎকট আগ্রহ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাঁহারা এতাদৃশ পূজার ফলদাতা, তাঁহারা সকল সময়েই ঘৃণাত্মক বিদ্রূপের লুকানো হাসি হাসিয়া সহিষ্ণুতার শেষ সীমা পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া লন, এবং এই সকল ফল-প্রার্থী অন্ধ ভক্তের অন্তিম-বিকার-সম্বলিত প্রাণপণ পূজা পাইবার পূর্ব্বে প্রায়শঃ ফলদান করেন না; এমন কি, কোন কোন সময়ে উহাদের প্রাণ-বল-শোষক উচ্চাকাঙ্ক্ষার মরু-জীবন আশা-মরীচিকাতেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়! যাহা হউক, এই কয়টি উপসর্গই সংক্রমণ অবস্থার প্রধান লক্ষণ। ইহার গৌণ লক্ষণ এই যে, উপাধি-কামনার গন্ধ বাহিরে একটু প্রকাশ হইবা মাত্রই গবর্ণমেণ্ট ও সাহেব-সুবার নিকট হইতে অজস্র চাঁদার খাতা

হাজির হয়। সুতরাং মান যা'ক্ বা থা'ক্—উদর পূরুক বা না পূরুক, বঁধুর মন খুসী করিতেই হইবে! কুল রাখা যাউক, আর না যাউক,—শ্যাম রাখিতেই হইবে!

যাঁহারা অমর-কীর্ত্তি রাখিয়া সংসারে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের অঙ্গে অথবা নামে উপাধির কোন বিচিত্র পোষাক অথবা উহার দ্ব্যক্ষর, চতুরক্ষর বা ষষ্ঠাক্ষরের মোহনমালা পড়াইলে বিন্দুমাত্র তাহাদের শোভা বৃদ্ধি হয় না। সামান্য উন্নত মানবের শোভন ও আকাঙ্ক্ষিত এই সামান্য উপাধি-বিশেষণ তাঁহাদের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। সেক্সপীয়র তাঁহার অমর ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন:—

"To gild the refined gold, to paint the lily,
To throw a perfume on the violet,
To smooth the ice, or add another hue
Unto the rainbow, or with taper-light
To seek the beauteous eye of heaven to garnish:
Is wasteful and ridiculous excess."

স্বর্গগত ব্রীটিশ-রাজ-মন্ত্রী গ্লেড্‌ষ্টোন অসংখ্য লোককে লর্ড, বেরণ ইত্যাদি উপাধিতে ইঙ্গিতে ভূষিত করিতে সমর্থ হইয়াও এতাদৃশ চতুরক্ষর-মন্ত্রে নিজে দীক্ষিত হইতে বারংবার উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার সম্মান কোন অংশে লঘু হইয়াছিল—না বরং তাঁহার চরিত্রের মহিমা আরও উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়াছিল? প্রয়োজন হইলে, এমন অনেক সভ্য-জগদ্বিশ্রুত ব্যক্তির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। জগতের চিরপূজনীয় কর্ম্মরাশি সম্পাদন করিয়া, যাঁহারা মানবজাতির অশেষ কল্যাণ-সাধন করিয়া গিয়াছেন, উপাধি তাঁহাদের আভরণ নহে,—তাঁহারাই উপাধির আভরণ; তাঁহাদিগের নামটিও অপরের শ্লাঘনীয় উপাধি। শত "কাব্যরত্ন" ও শত "কাব্যবিশারদ"

উপাধি একদিকে, আর কালিদাস ও সেক্ষপীয়র প্রভৃতি নাম একদিকে। বাঙ্গালার কালিদাস বা সেক্ষপীয়র হইতে পারা, অতি লম্বা-চৌড়া "কবি" উপাধি অপেক্ষাও শত সহস্র গুণে গৌরববহ। তাঁহাদের গরীয়ান্ নামের সহিত চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ যাহাই কেন না একবার প্রীতিসম্পর্কে সন্নিহিত হইয়াছে, তাহারই নাম বিশেষণের উজ্জ্বল মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া, কোথাও পূজনীয়, কোথাও স্মরণীয়, কোথাও বা সুখ-স্মৃতি-আবাহন-সূচক অমরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইতিহাস কিম্বা জীবন-চরিত এ কথার সাক্ষ্য দান করিবে। জন্‌সনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া, বস্‌ওয়েলের নাম অমর হইয়া রহিয়াছে; এণ্ড্‌ মার্‌ভেল নিজে সুকবি হইলেও, মিল্‌টনের সংশ্রবে না আসিলে, তাঁহার নাম জন-সমাজে এত বেসী পরিচিত হইত কিনা সন্দেহস্থল; অগাষ্ট কোম্‌টের প্রীতি ও ভালবাসার পাত্রী বলিয়া ক্লোটিল্‌ডির নাম এখনও পণ্ডিতগণের মুখে প্রীতির সহিত উচ্চারিত হয়; পেরিক্লিসের সংশ্রবে আসিয়া, এস্‌পাসিয়ার নামও ইতিহাসে গ্রথিত রহিয়াছে। নিউটনের "ডায়েমণ্ড" নামক কুকুর, এবং প্রতাপসিংহের "চৈতক" নামক অশ্বের কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। সেক্ষপীয়রের এভন-তীরস্থ বাটী এখনও পবিত্র দেব-মন্দিররূপে পূজা পাইয়া থাকে; দেশ বিদেশ হইতে অসংখ্য যাত্রী তথায় প্রতি বৎসর গমন করেন এবং এতদুপলক্ষে তথায় একটি রেল-পথও গিয়াছে; কবির স্বহস্ত-রোপিত বিবেচনায় সেই বাটীস্থ একটি বৃক্ষের ত্বক কিম্বা শাখা পবিত্র বস্তু জ্ঞানে সাদরে অনেকেই সঙ্গে লইয়া আইসেন। স্যর ওয়াল্টার স্কটের লেখনী-প্রভাবে স্কট্‌লণ্ডের পর্ব্বতমালা এবং তড়াগাদিও যেন অমরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এমন কি, এই সকল মহাপুরুষেরা নিন্দা-

ছলেও যাহাকে দু'একটা কথা কহিয়াছেন, তিনিও ভীষ্মের সংশ্রবে শিখণ্ডীর ন্যায় স্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন!

এই সকল লোকোত্তর পুরুষদিগের কথা সতন্ত্র। উপাধির অক্ষর ভিন্নও তাঁহাদের নাম চির অক্ষয় ও অনশ্বর। কিন্তু সমাজে এমন অনেক সুকৃতী সুজন আছেন, যাঁহাদের পক্ষে উপাধি অনাবশ্যক নহে। উপাধি তাঁহাদিগের পক্ষে শোভা,— তাঁহারাও উপাধির শোভা। তবে উপাধি কাহাদের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক নয়—এবং কি প্রণালীতেই বা উহা সৌষ্ঠব-সম্পন্ন ও হিতকর হয়, ইহাই এইক্ষণ বিবেচ্য। নিষ্কাম-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া, বিশ্বপ্রেমে নিজের সুখ-শান্তি মিশাইয়া দিতে পৃথিবীর অনেকেই অসমর্থ। যাঁহারা তাহা পারিয়াছেন, তাঁহারা মানব দেহে দেবতা,—এই পৃথিবীতে তাঁহাদের সংখ্যা অতি বিরল। কিন্তু যাঁহারা লোক-হিত-ব্রতে জনসাধারণ হইতে একটু উচ্চে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট পরোপকার-জনিত আত্মপ্রাসাদ চিত্তের অপার সুখ-জনক হইলেও, লৌকিক যশঃ ও সম্মান তাঁহাদিগের নিকট উপেক্ষার বস্তু নহে। সমাজের পক্ষে তাঁহাদের গুণরাজি ও পরার্থা প্রীতির উপযুক্ত পুরস্কার লাভ, এবং তাঁহাদিগকে সাদরে সম্মান-সূচক উপাধিতে চিহ্নিত করিয়া, সাধারণ হইতে উচ্চ আসন প্রদান ও তাঁহাদের উহা গ্রহণ,—কোনটিই অনাবশ্যক নয়। তাঁহাদিগকে এইরূপে উৎসাহ প্রদান, কৃতজ্ঞতার দিক দিয়া বিচার করিলেও, ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে উপাধি বিতরণে ও গ্রহণে অনেক সময় আমরা উল্লিখিত সুদৃশ্যটি দেখিতে পাই না।

ভাষা ভাবেরই আজ্ঞানুবর্ত্তিনী। ভাব আছে বলিয়াই, সম্মানের ভাষা সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে; নতুবা ঐ সকল অক্ষ-

ন্নিক আরাবের মূল্য কি ? দিবসকে “রাত্রি” বলিয়া চীৎকার করিলেও, প্রকৃত বিষয়টির পরিবর্ত্তন হয় না ; সুতরাং তাহার কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয় না। উপাধি-বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি উপাধির জন্য এতটা ব্যস্ত হয় কেন ?—না, তাহাতে সম্মান ও একটুকু প্রভুত্ব আছে বলিয়া ? কিন্তু উহাতে সম্মান ও প্রভুত্ব থাকিবার মূলে যে, একটা গুরুতর কথা রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা দেখেন না, অথবা উপেক্ষা করেন। সুঁদীকে “ গোলাপ ” উপাধি দাও,—শত ঢাক ঢোল বাজাইয়া, শত সমারোহে এই উপাধি গ্রহণ করিলেও, সুঁদী গোলাপ হইবে না। কাণাকে “পদ্মলোচন” বলিয়া, সহস্রকণ্ঠে আহ্বান কর, কাণার অন্ধ চক্ষে কথনও আলো ফুটিবেনা ; কাফ্রিকে “ কামদেব ” বলিয়া শত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর, কিছুতেই “ কাফ্রির কামদেবত্বে ” রতির মন ভিজিবেনা। তবে কেন যে, লোকে গুণের দিকে না চাহিয়া নামের জন্য উন্মত্ত হয়,—নিধিকে পায় ঠেলিয়া, শুধু ব্যাধির বোঝা বহিবার লালসায় মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া, ‘হয়’কে ‘নয়’ ও ‘নয়’কে ‘হয়’ করিবার নিমিত্ত বিকারপ্রাপ্ত রোগীর মত আস্ফালন করে, তাহা বুঝিয়া উঠা সুকঠিন। শুধু নামে কি করিয়া চিত্তের তৃপ্তি হইবে, তাহা বস্তুতঃই আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

আমাদের দেশে ধনী হইলেই বড় লোক হওয়া যায় ; কিন্তু ইউরোপে বড়লোক নাম তত সুলভ নহে। তাহাদের অভিধানে গ্রেটম্যান্ (Great man) বা ওয়েলথীম্যান্ (Wealthy man) দুইটি ভিন্ন শব্দ এবং তাহার প্রয়োগ স্থলও ভিন্ন। সে দেশের লোকে অলফ্রেড্ দি গ্রেট্ (Alfred the Great) বলে, কিন্তু রথস্ চাইল্ড দি গ্রেট্ (Rothes Child the Great) বলে না। বলা বাহুল্য যে, এই নীচ ও

অশোভন প্রথা, আমাদের আধুনিক ইঙ্গ-বঙ্গ-ভাবাপন্ন অস্বাভাবিক বিকাশে দেশে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপে অর্থের সম্মান ও প্রভাব খুব বেসী, এবং ইউরোপে লোকে এ জিনিসটাকে এত ভালবাসে যে, অভাব না থাকিলে আমাদের অপেক্ষা হেয় ও কষ্টকর উপায়েও অর্থার্জ্জন করিতে তাহারা ঐকান্তিক আগ্রহ দেখায়;—সেখানে ভোগেই শুধু সুখ আছে বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু এসকল থাকা সত্বেও সেখানে শিক্ষা ও প্রতিভার সম্মান আর্থিক সম্মানের গৌরব অপেক্ষা অনেকগুণে বেসী, এবং সেজন্যই এখনও "গ্রেট্‌ম্যান্‌ ওয়েল্‌দিম্যান্‌" শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার রহিয়াছে। আর আমরা উহাদের চরিত্রের কুৎসিত ভাগের অনুকরণ করতঃ, আমাদের সনাতন নিষ্কাম ধর্ম্মের সোপান-স্বরূপ,সাংসারিক ধর্ম্মে বৈরাগ্যের মধুর মিশ্রণটুকু একবারে বিস্মৃত হইয়া, কুসীদজীবের প্রাণ পাইয়াছি; এবং পক্ষান্তরে প্রতিভা ও শিক্ষার তেমন আদর করিতে শিখি নাই। সুতরাং ধনী লোককেই আমরা বড়-লোক বা ধর্ম্মাবতার জ্ঞানে পূজা করিয়া কৃতার্থ হই।

যে স্থলে পরার্থা প্রীতি, প্রতিভা, দেশানুরাগ ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি কারণে উপাধির পুষ্পবৃষ্টি হওয়া সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় সে স্থলে আমরা অধিকাংশ সময়ই কি দেখিতে পাই?—না, নিঃসহায় গরীবের নিষ্পেষণে উৎপন্ন বা জাল-জুয়াচুরি দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে অথবা "ঋনং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এই চার্ব্বাক সূত্রানুসারে বন্ধকী বা রেহানী তমকসুকে স্বাক্ষর-যোগে সংগৃহীত টাকায় রাজপুরুষদের তৈলাক্ত মস্তকে ঘৃতের অজস্র ধারা বর্ষণ দ্বারা উপাধির সুদূর সম্ভাবনা ঘটাইবার প্রাণপণ চেষ্টা! এতদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিদ্রালস-নয়নে কোন দোষ লক্ষিত না হইলেও, উহা যে পরিশেষে মাঠের চাষার নিকট অত্যন্ত পীড়া-

দায়ক হইয়া পড়ে, এবং দেশের অনেক সমৃদ্ধ সন্তান তুরঙ্গ বেচিয়া করঙ্গ-করে কাঙ্গালের খাতায় নাম লেখাইয়া, অধঃ-পাতের পথে গড়াইয়া পড়েন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সামাজিক প্রহসন-লেখক শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসু মহাশয় এই উপাধি-ব্যাধির প্রশমনের নিমিত্ত একবার একটি মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাহাতে যদিও সংসারের অনেক গাণিকা, বাঁশীমোহন, কিম্বা ফিস্ সাহেব বাহ্যিক আকার প্রকারটা অনেক পরিমাণে বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছেন, তথাপি জিনিসটা মূলে অনেক স্থলে সেইরূপই রহিয়া গিয়াছে। এখন রেঙ্কিন প্রভৃতি পোষাক-নির্ম্মাতার প্রসাদে, ভাল সাহেবী পোষাক হয়; রাজধানীতে থাকিয়া, "খাচ্ছি-দিচ্ছি" বলিতে শিখিয়া, টোন (tone) বদ্‌লান হয়; ষ্টুপিড্ ডেম্‌ড্ (Stupid damned) বলিয়া, ইংরেজীতে অভিজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিবার সুবিধাটুকু করিয়া লওয়া হয়; এবং ধামা-ধড়া অর্থ-গৃধ্র নীচাশয় কতগুলি সংবাদপত্রের সম্পাদককে অর্থ-সাহায্যে হস্তগত করতঃ সংবাদপত্রে খোস্‌নাম বাহির করা হয়; সুতরাং দেশী গাণিকা বিলাতী-আস্তরণের ভিতরে সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের ন্যায় এক বিচিত্র নূতনরূপে বিরাজ করেন; এবং এখনকার বাঁশী মোহনও চুরুট খায়, চেন ঝুলায়, একটুকু সাহেবী কায়দায় চলে; কাজেই মোসাহেব বাঙ্গালী বাঁশীমোহন অপেক্ষা এই পোষাক-পরিচ্ছদে সংস্কৃত বাঁশীমোহনকে অন্যরূপ দেখায়। কিন্তু জিনিসটা যে, প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ববৎই থাকে,—তবকমোড়া হইলেও কুষ্মাণ্ড যে কুষ্মাণ্ডই রহিয়া যায়, তাহাতে আর ভুল নাই। আমাদের বিবেচনায় এই সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক।

ইহাদিগকে উপর-উপর দেখিলে একটু ধাঁ-ধাঁ লাগিলে

পারে; কিন্তু ভিতরে,—"তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।" উপাধি-বিকারগ্রস্ত রোগী অনেকরূপ প্রলাপ বকে; কেহ বলে—"আমি 'রাজা' হ'ব"; কেহ বলে—"আমি 'রায় বাহাদুর' হ'ব"; আবার কেহ বলে—"আমায় 'মহারাজ' উপাধি দাও"; আবার কেহ বা যুক্তকরে প্রার্থনা করে,—"হা! গবর্ণমেন্ট! তুমি শুধু আমায় 'কুমার' উপাধিটুকু দাও"। আবার যাহারা একটু বেশী রকমের নিরেট, তাহারা জোড়-জবরেই "কুমার" উপাধি চালাইয়া লন। হা কুইন্স্ বার্থ ডে!—হা ফার্ষ্ট জানুয়ারী! তোমরা কত লোককেই অনিদ্র রাখ; কত লোকই তোমাদের প্রতীক্ষায় দিন গনণা করে এবং তোমাদের সময় উপস্থিত হইলে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, পোষ্ট-পিয়ন বা হর-করার পথপানে তাকাইয়া থাকে!

একতা ও শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতিরই প্রকৃত মঙ্গল নাই। আমাদের এ দুই এরই অভাব। তথাপি এবারকার বঙ্গবিভাগ উপলক্ষিত প্রস্তাবে আমরা জাতীয় জীবনের শুভ অরুণ-ছটা দেখিতে পাইয়া, প্রাণে অনেকটা নূতন বল পাইয়াছি বটে। এই চেতনা ক্রমশঃ সুষুপ্তির দিকে না যাইয়া, জাগরণের দিকে গেলেই প্রকৃত মঙ্গল। আমাদের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী জাতির সর্ব্বাগ্রে "চাই না" কথাটির ব্যবহারই বিশেষরূপে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। তুমি তোমার মনোহর বিপণিখানি সাজাইয়া বসিয়াছ, আমি তোমার ওসব কিছুই চাই না; তুমি উপাধির চাকচিক্য-মণ্ডিত শূন্য-কুম্ভ লইয়া আমাদের সার শোষণ করিবার জন্য বাজারে দোকান পাতিয়া বসিয়াছ, আমরা ওসব চাই না। "চাইনা" বলিলে কেহ কিছু করিতে পারে না। উহাতে দেবতাও রুষ্ট হইতে পারেন না—মানুষও কিছু বলিতে পারে না। আমাদের শ্রম-চক্র হইতে বিদেশীয়দের যে পরিমাণ

খাদ্য যোগাই, তাহার এক চতুর্থাংশ যদি এ দেশের কল্যাণে দেই, তাহা হইলেও দেশটা বাঁচিয়া যায়। কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একস্থলে অতি সুন্দররূপে লিখিয়াছেন,—"ইংরেজ বাঁট-ওয়ালারা বাঁটে হাতে না দিলে, আমাদের দেশীয় কামধেনুগণ কিছুতেই দুগ্ধ দিতে চায় না।" অসংখ্য অর্থব্যয় করিয়া গবর্ণমেণ্টের চাঁদায় খাতায় কামধেনু নাম লেখাইয়া, ঘরে "টাইটেল" বা ভিক্ষার ঝুলি আনিবার সার্থকতা কি? রাজা ইচ্ছা করিলে, দেশের অনেক মঙ্গল সাধন করিতে পারেন; কিন্তু আমাদেরও তো একটা শক্তি ও কর্ত্তব্য আছে?

উপসংহারে আমরা ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, শাসন-নীতির সদয় অংশটুকু আমাদিগকে শান্তি দান করুক এবং উহার অনুদার ও উপেক্ষার অংশটুকু আমাদিগকে অন্তর্দৃষ্টি দান এবং আমাদের অযোগ্যতা উল্লেখ করতঃ, ক্রম-নিন্দাবর্ষণজনিত অভিমানের সাহায্যে জাতীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের বীজ অঙ্কুরিত করিতে সহায়তা করুক; অনন্য-প্যায়িতা আমাদের স্বপদে ভর করিতে শিক্ষা দেউক।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

একখানি ছবি।

নিভৃত নিকুঞ্জে আজি কোন্ অভিলাষে—
কেন গো চম্পক-করে কুসুম চয়ন?
বলনা কাহারে দেবি! পরাইতে সাধ
মনোরমা প্রকৃতির ফুল আভরণ?
স্খলিত কুন্তল-দাম, আবৃত কপোল,
শোভিয়াছে মেঘাবৃত চন্দ্রকলা প্রায়;

নিথর অধরে ফু'টে রক্ত শতদল,
সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিয়া গিছে কুসুম-বন্যায়!
বিদ্যুৎ-বিক্ষেপী সেই চঞ্চল নয়ন
স্থির এবে,—স্থির যথা নক্ষত্র সুন্দর।
কৈশোর-কলিকা যেন যৌবন-উষার
হেরিছে বিস্মিত নেত্রে তরুণ ভাস্কর।
তোমারি সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ অন্ধ এ নয়ন,
খুলিয়াছে মমতার ক্ষুদ্র আবরণ;
বিশ্ব সৌন্দর্য্যের মাঝে ভাসিছে সতত
তোমারি প্রসন্ন মুখ, শান্তি-প্রস্রবণ;
বিহগের কলকণ্ঠে, ফুলের সুবাসে,
ক্ষীরধারা তটিনীর স্রোতঃময়ী স্নেহে,
শ্যামা বল্লরীর নব কুসুম-উচ্ছ্বাসে,
আসিছে তোমার কথা সমীর-প্রবাহে;
ইন্দু-প্রতিবিম্ব মত তরঙ্গ মালায়—
শত চিত্রে * * * * শোভিছে আমায়।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু রঞ্জন ঘোষ।

আদর্শ।

এই সাগরাম্বরা ধরিত্রী, ক্ষীণপ্রাণ কীটানুকীট হইতে জ্ঞানোজ্জ্বল মনুষ্য পর্য্যন্ত অনন্ত প্রকারের অনন্তকোটী জীবের আবাসভূমি, কর্ম্মক্ষেত্র ও প্রধান শিক্ষাস্থান। জীবনিবাস জড়-পিণ্ড ধরিত্রী নিতান্ত হীন অবস্থা হইতে ক্রমে উন্নতির উর্দ্ধতর স্তরে আরোহণ করিয়া, এক্ষণ অতুল সম্পদে নিত্য বিলসিত ও অপার শোভা সামর্থ্যের ক্রীড়াভূমি হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে,

শিক্ষাই এই উন্নতির মূলমন্ত্র। এক সময়ে যে স্থিরচঞ্চলা রুদ্র-প্রসবিনী বিদ্যুল্লতা হৃদয়ের দ্রবীভূত বহ্নি দ্বারা পার্থিব জীবজাতির প্রাণ হনন ব্যতীত আর কোন বিশেষ কার্য্যে নিয়োজিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই, এই শিক্ষা-মাহাত্ম্যেই সেই বিদ্যুল্লতা আজি একদিকে মানুষের ও এই বিশ্বজগতের প্রাণশক্তিরূপে সম্মানিত এবং অন্যদিকে আজ্ঞাধীনা দাসীর ন্যায় অবনত মস্তকে অবস্থা বিশেষে মানুষের সেবাব্রতে নিযুক্ত হইতেছে। শুধু পার্থিব উন্নতি নহে, পারলৌকিক উন্নতি সম্বন্ধেও এই কথা। এই পৃথিবীতে শিক্ষাতেই আত্মোন্নতির সূচনা এবং পরলোকে তাহার চরম বিকাশ। সুতরাং যে শিক্ষা পার্থিব এবং পারলৌকিক উভয়বিধ উন্নতির মূল, তাহার আদর্শ মহৎ, সৎ ও অতি উচ্চ অঙ্গের হওয়া যে একান্ত আবশ্যক, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শিক্ষার পথ প্রধানতঃ দুই প্রকার। একটি মানবীয় মনোভাবের বহিঃ-প্রবাহ—ভাষার পরিস্ফুট সজীব ধারা; এবং অন্যটি মানবীয় চরিত্রের বহিঃ-প্রকট নীরব প্রতিকৃতি—আদর্শ। ভাষা তাহার পরিস্ফুট সজীব ধারায় আমাদিগকে মহৎ ও সাধু হইতে শিক্ষা দেয়; কিন্তু আদর্শ ঐ মহত্ত্ব ও সাধুত্বের প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি রূপে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহার মোহিনী ও আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে আমাদিগকে তাহারই দিকে টানিয়া লয়। সুতরাং ভাষা অপেক্ষাও আদর্শ অধিকতর শক্তিসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার্য্য।

মানুষ শুধু পুস্তক পাঠ করিয়া, কিংবা কথা কি উপদেশ শুনিয়াই শিক্ষা লাভ করে না। প্রত্যেকেই দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত পদার্থ সমূহের অবলোকন ও আলোচনা দ্বারা ন্যূনাধিক পরিমাণে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর শিক্ষা-প্রবৃত্তি মনুষ্য-হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যাবজ্জীবনের জন্য বদ্ধমূল হইয়া

থাকে। মনুষ্যের প্রাথমিক জীবনে চক্ষু ও কর্ণ জ্ঞানার্জ্জনের অন্যতম প্রধান দ্বার। সুতরাং শিশু বালকবালিকাগণ চক্ষে যাহা দেখে এবং কর্ণে যাহা শুনে, অজ্ঞাতসারে স্বভাবের প্রণোদনায় তাহারই অনুকরণ করে। এই হেতুই সুশিক্ষার জন্য পারিবারিক আদর্শ সর্ব্বপ্রথমে মানুষের অনুকরণীয় ও গ্রহণীয়। নিম্নবিদ্যালয়ে কিংবা উচ্চবিদ্যালয়ে যত সুন্দর শিক্ষা প্রণালীই প্রবর্ত্তিত থাকুক না কেন, আমাদের স্ত্রীপুরুষগণের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দররূপে গঠন করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথম পারিবারিক আদর্শকেই অধিকতর ক্ষমতাশালী ও উপযোগী করিয়া লওয়া আবশ্যক। আদর্শস্থানীয় পারিবারিক জীবন সমাজের এক একটি অত্যুজ্জ্বল চিত্র এবং উহাই জাতীয় জীবনের বীজ। ইহা যেমন সাধারণ ভাবে জাতিগত জীবনে, তেমনই বিশেষভাবে ব্যক্তিগত জীবনে উন্নতির পথপ্রদর্শক এবং চরিত্রবলের ও প্রস্ফুট মানসিক উপাদানের অদ্বিতীয় আশ্রয়। আমাদের জাতীয় জীবন সূতিকাগৃহে অঙ্কুরিত হয়। বস্তুতঃ পারিবারিক জীবনকেই বিশ্বব্যাপী বিশ্বপ্রেমিকতা ও লোকহিতৈষীতার উৎপত্তিস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পণ্ডিতপ্রবর প্রথিতনামা মিঃ এড্মণ্ড বার্ক (Edmund Burke) একস্থলে বলিয়াছেন যে,—"To love the little platoon we belong to in society, is the germs of all public affections."—অর্থাৎ সমাজের যে ক্ষুদ্র অঙ্গে আমরা অবস্থিত, সেই অঙ্গের প্রতি প্রীতিই সমগ্র সমাজ সম্বন্ধে ব্যাপক প্রেমের মূলসূত্র। সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি বা সমবেদনা পারিবারিক আদর্শরূপ কেন্দ্র হইতে অনন্তবিস্তৃত বৃত্ত-সীমা পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে। যদিও প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষীতা কিংবা বিশ্বপ্রেমিকতা প্রথমতঃ পারিবারিক জীবনের আদর্শ হইতেই উৎপন্ন হয়

তবু উহার কার্য্যক্ষেত্র চিরদিনের জন্য উহাতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে না।

শিশু সন্তানগণ স্বস্ব পিতা মাতার প্রাত্যহিক জীবনে তাঁহাদের যেরূপ চরিত্র, শিক্ষা, দয়া, দাক্ষিণ্য ও আত্মনির্ভরতা প্রভৃতির উদাহরণ দেখিতে পায়, তাহারই অনুকরণ করতঃ শিক্ষা লাভ করে এবং এরূপভাবে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, সহজে উহা তাহাদের হৃদয় হইতে উন্মূলিত হয় না। প্রথিতনামা যশস্বী ফাউয়েল বাক্‌স্‌টন্ (Fowell Buxton) যখন কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চপদাধিরূঢ় ছিলেন, তখন তিনি তাঁহার মাতার নিকট লিখিয়াছিলেন যে,—"I constantly feel, especially in action and exertions for others, the effects of principles early implanted by you in my mind."—অর্থাৎ আমি স্বকীয় কার্য্যাবলী ও পরোপকারব্রতে যতটুকু যত্ন ও পরিশ্রম করি, তাহা আপনার নিকট হইতে শৈশবকালে যে সদুপদেশ গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই ফল। লর্ড ল্যাঙ্গ্‌ডেইল্ (Lord Langdale) তাঁহার মাতারই স্নেহ-মধুর উপদেশে ও সদাদর্শে জীবনে যথেষ্ট যশঃ ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন যে,—"If the whole world were put into one scale, and my mother into the other, the world would kick the beam."—অর্থাৎ যদি সমগ্র পৃথিবী মানদণ্ডের একভাগে এবং আমার স্নেহময়ী জননী অপরভাগে স্থাপিত হইতেন, তবে সমস্ত পৃথিবী ওজনে লঘুতর বলিয়া পরিগণিত হইত।

মানুষ ইহকালে ও পরকালে তাহাদের কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের আদর্শে আমাদের বর্ত্তমান জীবন গঠিত এবং আমাদের এই বর্ত্তমান জীবনের

আদর্শেই আবার ভবিষ্য জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক মনুষ্যই অনন্ত অতীতের প্রস্ফুট ফল এবং ভবিষ্য জীবনের অপরিস্ফুট প্ররোহ বা অজ্ঞাত পরিণাম-বীজস্বরূপ। মানুষ মরিলে, তাহার দেহ ধূলি, কর্দ্দমে অথবা বিবিধ ভৌতিক পদার্থে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু তাহার কৃতকর্ম্ম সকল অনন্ত কালের জন্য জীবন্ত প্রতিকৃতিরূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া, মানব জাতিকে শিক্ষা দান করে। আমরা যখন যে কোন কাজ করি, কিংবা যে কোন কথা বলি, তাহার প্রত্যেকটির মধ্যেই এমন একটু বিশেষ শক্তি নিহিত থাকে যে, সেই শক্তি শুধু আমাদের ভবিষ্য জীবনে কেন, আমাদের সমাজের উপরও আধিপত্য বিস্তার করিয়া আদর্শের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষানুসারে সমাজকে গঠন করিয়া লয়। আলো যেমন নিম্ন হইতে নিম্নতর গুহায়, কিংবা উচ্চ হইতে উচ্চতর পর্ব্বত-শিখরে প্রজ্জলিত হইলেও, উভয় স্থানেই সমভাবে কিরণ বিকীর্ণ করিয়া, উভয় স্থানকেই আলোকিত করে, সদাদর্শও তেমনই ধনী, দরিদ্র, সভ্য, অসভ্য, ভদ্র, অভদ্র সকলকেই সমভাবে ও নীরবে শিক্ষা দিয়া থাকে। কিবা গভীর অরণ্য, কিবা পল্লীবাসী দরিদ্রের পর্ণকুটীর, কিবা সুবিস্তৃত সমৃদ্ধিশালী-নগরবাসী ধনীর ভোগ-বিলাস-সামগ্রী-পরিপূর্ণ সুরম্য অট্টালিকা, ইহার সকল স্থান হইতেই সাধু ও মহৎব্যক্তির উৎপত্তি সম্ভবপর। অতি সামান্য কারখানা যেমন ব্যক্তিবিশেষের অধিনায়কতায় একদিকে সুন্দররূপে শ্রমশীলতা, কর্ম্ম-নিপুণতা, বিজ্ঞান ও নীতি শিক্ষা দিতে সমর্থ হয়, তেমন আবার অন্যদিকে ব্যক্তিবিশেষের অসারতায় অলসতা কিংবা দুশ্চরিত্রতাও শিক্ষা দিতে পারে। সুতরাং সাধুতা কি শঠতা, উদারতা কি সঙ্কীর্ণ-হৃদয়তা, শ্রমশীলতা কি অলসতা বা কার্য্যবিমুখতা, সকলই ব্যক্তিগত জীবনের উপর নির্ভর করে।

মহাজন-সুলভ সংস্বভাবের আদর্শ পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারিগণের একটি অতি মূল্যবান্ ও অতুল সম্পদ। ইহা ধর্ম্ম-জীবনে যেমন অতি বিচক্ষণ শিক্ষক, কর্ম্ম-জীবনেও তেমন বিশদ পথ-প্রদর্শক; যেমন পাপেরও অতি কঠোর শাসক, অনুতাপ ও আত্মগ্লানিতে তেমনই প্রাণে শীতল শান্তিবিধায়ক।

চরিত্র গঠন করিবার জন্যই সর্ব্বপ্রথম আদর্শের প্রয়োজন। আমরা যে সমাজে বাসকরি, তাহারই স্বভাব, রীতি, নীতি ও আচার-ব্যবহার প্রভৃতি অতি অলক্ষিতভাবে অনুকরণ করিয়া, নিজ নিজ জীবন গঠন করিয়া থাকি। প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম এই যে, কোনও দুইটি জিনিস একসময়ে একস্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারেনা। সুতরাং সৎ ও অসৎ আদর্শের একটি অন্যটিকে পরাস্ত করিয়া, নিজের আধিপত্য বিস্তার করিবেই করিবে। এই জন্যই জীবনের নিত্য সহচর, প্রাণের অন্তরঙ্গ সঙ্গী নির্ব্বাচনে সকলেরই সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য। দেখিয়া শিক্ষাই মানুষের স্বভাব। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়াই অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। শিশুর অনুকরণে কাপট্য নাই, উহা সহজেই ধরা পড়ে। এই অনুকরণ-প্রবৃত্তি যৌবনে আরও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তখন হৃদয়ে এমন একটা প্রবল চৌম্বক-আকর্ষণী বা ভীষ্মের বিশ্ব-শোষিণী পিপাসার সঞ্চার হয় যে, যুবক পার্শ্ববর্ত্তী সহচরদিগের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রভৃতি শত রসনায় শোষণ না করিয়া পারে না। অতএব যেরূপ লোকের সঙ্গে সর্ব্বদা জীবনযাপন করিতে হইবে, তাহাদিগের মধ্য হইতে অতি গভীর মনোযোগ ও সতর্কতার সহিত সেই সমাজের অনুরূপ আদর্শ বাছিয়া লওয়া আবশ্যক। মিসেস্ এইজ্‌ওয়ার্থ্ (Mrs. Edgeworth) বলিয়া গিয়াছেন যে,—

"No company or good company"—অর্থাৎ সৎসঙ্গী না পাইলে, একাকী থাকিবে। ইহা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান সূত্র ছিল। উর্দ্দুতে একটি কথা আছে,—"তন্‌হাই বেহেতর্ হায় ছহবতে বদ্‌ছে"—অর্থাৎ মন্দ সংসর্গ অপেক্ষা একা থাকাও ভাল। কথাটা বস্তুতই বড় সারগর্ভ ও উপাদেয়।

যে সকল মহাপুরুষ সাধুতা এবং সচ্চরিত্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া, জগতে অনন্ত ও অক্ষরকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, আমরা যদি তাঁহাদের মত জগতে যশস্বী হইতে এবং অনন্তকোটী মানবের শিক্ষকরূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া, অনন্তকাল জীবিত রহিতে ইচ্ছাকরি, তবে তাঁহাদের সদুপদেশ-পূর্ণ ও বিবিধ-বিচিত্র-ঘটনা-সম্বলিত জীবনচরিত আদর্শরূপে গ্রহণ করতঃ, আমাদের গন্তব্য পথ অবধারণ করা উচিত। সুপরিচিত সৈন্যাধ্যক্ষ লওলা (Loyola) প্যাম্পিলুনার অবরোধ সময়ে পাদমূলে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, যখন নিতান্ত বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন, তখন সেই নিদারুণ যন্ত্রণায় একটুকু মানসিক শান্তি লাভের আশায় একখানি পুস্তক পড়িতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহাকে "Lives of the Saints" নামক একখানি পুস্তক প্রদান করা হইয়াছিল। এই পুস্তক পড়িয়া অবধি তাঁহার মানসিক বৃত্তির এতটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল যে, তিনি তৎপরে যাবজ্জীবন ধর্ম্মযাজকের কার্য্য করিয়াই মানব-লীলা সাঙ্গ করিয়াছিলেন। ফ্রান্সিস্ হর্‌নারের (Francis Horner) বিবিধ ঘটনাপূর্ণ আত্ম-কাহিনী পাঠ করিলে জানা যায় যে, তিনি মহাপুরুষদিগের সদুপদেশ-পূর্ণ-গ্রন্থ আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াই জীবনে সমধিক উন্নত হইয়াছিলেন।

উল্লিখিত আদর্শ গ্রহণ করিয়া, জীবন-বর্ত্মে অগ্রসর হইতে হইলে প্রাণে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির একান্ত প্রয়োজন। প্রফুল্লতা

মানব-হৃদয়ে স্থিতিস্থাপকতা গুণ ও প্রভূত বলবত্তার সঞ্চার করে, নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকার হইতে আত্মাকে আলোকে আনয়ন করে, এবং আশার স্নিগ্ধ আবরণে প্রাণকে আবরিয়া রাখে। সার্ জন্ সিঙ্ক্লেয়ার (Sir John Sinclair) এবিষয়ে আদর্শস্থানীয়। তিনি প্রসন্নতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের বলে ইউরোপে নানা প্রকার মহৎকার্য্য সংসাধন করিয়াগিয়াছেন।

অতএব যদি আত্মার উন্নতি, সমাজের উন্নতি, ও জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন করতঃ জগতের কল্যাণ সাধন করিতে চাও, তবে আদর্শস্থানীয় পারিবারিক জীবন গঠন করিয়া, ধীর ও অটলভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। দেখিবে, মঙ্গলময় বিশ্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বরের করুণা-বলে তোমরা অনন্তকাল এই বিশ্ব-সংসারে তাঁহারই স্নেহামৃত পান করতঃ অক্ষয় অমর হইয়া থাকিবে এবং মানবদেহেই দেবত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

প্রাচীন মিশর।

আগ্রার তাজ, চীনের প্রাচীর, বেবিলোনের উদ্যান, সাইপ্রাসের পিত্তলমূর্ত্তি, টেমস্ নদীর সুড়ঙ্গ প্রভৃতি পৃথিবীর যে সাতটি অত্যাশ্চর্য্য অতুল কীর্ত্তির কথা কথিত আছে, মিশর বা ইজিপ্টের "পিরামিড"ও (Pyramid) ঐ সাতেরই অন্যতর।

মিশরে ছোট ও বড় অসংখ্য পিরামিড আছে। যে অর্থে আমাদিগের কলিকাতাকে (City of palaces) অর্থাৎ প্রাসাদ-নগরী বলিয়া আদর করা হয়, সেই অর্থে মিশরকেও পিরামিডের দেশ বলিয়া সম্মান করা যাইতে পারে।

একদিকে, সাহারার ভীষণ মরু আতঙ্কের ডঙ্কা বাজাইয়া, ধূ ধূ দূর নীল অম্বরের সহিত আপনার কঙ্কর-ধূসর দেহের আবিল আলিঙ্গনে সুনীল দিগঙ্গনাকে ধূমল বসনে সাজাইতেছে; অন্য দিকে, লোহিত সাগর, যোজেফের বিপন্ন অথচ ঈশ্বরানুগৃহীত বংশধরদিগের প্রতি "ফেরেও" উপাধিধারী পুরাতন মিশর সম্রাটের অমানুষিক অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়া, এখনও যেন, আপনার বুক চিড়িয়া, স্বকীয় কুক্ষিনিহিত মেষকুলের পশ্চাদ্ধাবিত বৃকের ন্যায় পলায়নপর ইজ্‌রেলদিগের অনুসরণকারী সানুচর ফেরেওর পাপ-কঙ্কাল প্রদর্শনের নিমিত্ত আস্ফালন করিতেছে।* আবার ভূমধ্য সাগর, অহোরাত্র কীর্ত্তিমান্ ইউরোপের বিজয়-গাথা গাইয়া-গাইয়া, তরঙ্গঘাতে উত্তর উপকুল ভাগকে জাগরিত রাখিয়াছে। মহাবেগে প্রবাহিত নীল নদ লোকভয়ঙ্কর আবর্ত্ত-নিনাদে দক্ষিণদিক্ মুখরিত রাখিয়া যেন স্বাস্থ্য, সুখ ও সম্পদের রাজকীয় ভেট করে লইয়া, মিশরের বক্ষস্থলে নৃত্যোল্লাসে নিয়ত ডগ-মগ ও ঢল-ঢল রহিয়াছে। মিশর, এই সকল পারিপার্শ্বিক ও সেবকে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, কণ্ঠে পিরামিডের পাষাণকণ্ঠী দোলাইয়া, এক একবার তাহার জ্বালাদগ্ধ

---

* কথিত আছে,—ফেরেওর অত্যাচারে প্রপীড়িত ইজ্‌রেলগণ, ভগবদিচ্ছায় মিশরত্যাগে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া লোহিত সাগর তীরে উপস্থিত হইলে, লোহিত সাগর দ্বিধা বিভক্ত হইয়া, তাহাদিগের জন্য হাঁটিয়া পার হইবার পথ খুলিয়া দিয়াছিল। তাহারা দুইদিকে সলিল-প্রাচীরে সুরক্ষিত থাকিয়া অনায়াসে পদব্রজেই সমুদ্রের পরপার চলিয়া গেল। ফেরেওর অনুচরবর্গসহ ইজ্‌রেলদিগের অনুসরণে পদব্রজে ঐ ঐন্দ্রজালিক পথে গমন করিতেছিলেন, সহসা দ্বিধা বিভক্ত সলিল-প্রাচীর এক হইয়া তাহাদিগকে সাগর-বক্ষে নিহিত করিয়া ফেলিল।

প্রাচীন ইতিহাসের আবৃত্তি করিতেছে,—আর এখনও যেন, এক একবার প্রাচীন গৌরবের ভাবে স্ফীত হইয়া, তাহার বিস্তৃত পিরামিড মালার বিরাট মধ্যমণিটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। এই মধ্যমণি স্বরূপ পিরামিড টিই পৃথিবীর সপ্তকীর্ত্তির এক কীর্ত্তি।

মিশরের দেশব্যাপী পিরামিড শ্রেণীর মধ্যে, মধ্য-মিশরের রাজধানী, নীলনদের পশ্চিম তটবর্ত্তী মেম্ফিস্ নগরের পার্শ্বস্থিত তিনটি পিরামিডই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই তিনটির মধ্যে আবার যেটির আয়তন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং নির্ম্মাণ-কৌশলে ও কারু-নৈপুণ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেইটিই মিশরীয় পিরামিড মালার মধ্যমণি-রূপে সর্ব্বত্র সম্মানিত।

মিশরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পিরামিড সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, পিরামিড প্রসঙ্গে সাধারণ ভাবে কিছু বলিয়া লওয়া আবশ্যক। পিরামিডগুলি সাধারণতঃ করী-শুণ্ডাকৃতি ও প্রসর-ভিত্তি; ঊর্দ্ধভাগ করী-শুণ্ডের ন্যায় ক্রমশঃ সূক্ষ্মভাবাপন্ন অত্যুচ্চ প্রস্তর-স্তম্ভ। যে সকল স্তম্ভের অভ্যন্তর ভাগ ফাঁপা এবং কোঠা ও হল ইত্যাদিতে পরিণত, সেইগুলিই পিরামিড নামে অভিহিত। কিন্তু যেগুলির অভ্যন্তর ফাঁপা নহে, আগা-গোড়া নিরন্ধ্র প্রস্তর মাত্র, আকৃতিও পিরামিডের তুলনায় ক্ষুদ্রতর, সেগুলির নাম 'অবিলিস্ক' (Obelisk)। অবিলিস্কের সংখ্যা পিরামিড অপেক্ষাও বেশী। সকল অবিলিস্কের আয়তন ও আকৃতি একবিধ নহে। মধ্য-মিশরে প্রাচীন কালে অসংখ্য অবিলিস্ক ছিল; এখনও অনেক আছে। অবিলিস্কগুলি খোলা চতুষ্কোণ-চত্বরের আভরণ স্বরূপ বিন্যস্ত রহিত। অবিলিস্কেরও ভিত্তি-প্রসর চতুষ্কোণ এবং শীর্ষদেশ বিন্দুবৎ সূক্ষ্ম। এগুলিও হস্তী-শুণ্ডের ন্যায় ক্রমশঃ সরু।

মিশরের দক্ষিণ প্রান্তে "সাইনি" প্রদেশে প্রস্তরের খনি আছে। মিশরীয় শিল্পিগণ খনির মধ্যে বসিয়া যার-পর-নাই দৃঢ় প্রস্তর কাটিয়া অবিলিস্ক প্রস্তুত করিত। কোনটি উচ্চতায় শতহস্ত পরিমিত, কোন কোনটি ততোধিক; কোন কোনটি উচ্চতায় শতহস্তের কমও হইত। যে আকারে অবিলিস্ক কাটা যাইত, সেই আকরে এখনও অৰ্দ্ধ-পরিসমাপ্ত অবিলিস্কের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। আকরের ভিতরে অবিলিস্ক প্রস্তুত হইলে, আকর হইতে উহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাহিত হইত। পৰ্ব্বত-বহনের ঈদৃশী শক্তি ছিল, এক রামায়ণ-বর্ণিত হনুমানের, আর ছিল মিশরীয় পুরাতন শিল্প-কৌশলের। এক্ষণকার কোন এঞ্জিন বা যন্ত্রের পক্ষে ঈদৃশ ভারবহন অসম্ভব কথা। মিশরীয়গণ আশ্চর্য্য কৌশলে খনির ভিতর দিয়া খাল কাটিয়া নীলনদের প্রবাহের সহিত ঐ খালের মুখ মিলাইয়া দিত। বর্ষাগমে খালের পথে খনিতে জলপ্রবেশ করিলে, তাহারা ভার-সহ বিচিত্র ভেলক নির্ম্মাণ করিয়া ঐ ভেলকের উপরে অবিলিস্করূপী পাষাণ-স্তম্ভ বসাইয়া দিত। মিশরে অসংখ্য খাল আছে। সুতরাং জলপথে ঐ ভেলক-গুলিকে যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানেই লইয়া যাওয়া চলিত।

মিশর রোম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে, রোমের সম্রাট্ এক শত কুড়ি হস্ত উচ্চ দুইটি অবিলিস্ক মিশর হইতে রোমে লইয়া গিয়াছিলেন। মিশরে একটি অবিলিস্ক দেড় শত হস্ত উচ্চ ও ঐ দেড় শত হাতের অনুপাতে প্রসর ছিল। কথিত আছে, এই অবিলিস্কের কর্ত্তন-কর্ম্মে কুড়ি হাজার লোক খাটিয়া ছিল। ইহার মত উচ্চ অবিলিস্ক আর একটিও ছিল না। রোম-সম্রাট্ কেইয়াস সিজর (Caius Ceaser) এটিকেও রোমে লইয়া যান। মিশরীয় এই সূক্ষ্মাগ্র কৃত্রিম মৈনাকটিকে বহন করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র একখানি জাহাজ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ঐরূপ

অদ্ভুত-গঠন ও বিচিত্র মূর্ত্তির জাহাজ আর কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই।

পিরামিডের তুলনায় এই সকল অবিলিস্ক কিছুই নহে। মেম্ফিসের যে পিরামিড্‌টি পৃথ্বি-প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল ও কারিকরি, এইক্ষণকার শিল্পীজগতের বুদ্ধি ও শক্তির অগম্য। এই পিরামিড্‌টি একটা পাহাড়ের উপর গঠিত। ইহার ভিত্তি সমচতুষ্কোণ। নিম্ন হইতে ইহার অগ্রভাগ একটি সূক্ষ্ম বিন্দুবৎ পরিলক্ষিত হইলেও, এই বিন্দু জ্যামিতির বিন্দু নহে;—একখানি সুগঠিত প্রসর চত্বর। এই চত্বর ১০।১২টা বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের সম্মিলনে নির্ম্মিত এবং ইহার প্রত্যেক পার্শ্ব ছয় গজ বা বার হাত পরিমিত দীর্ঘ। চত্বরটি উর্দ্ধতম মেঘলোকে অবস্থিত। মিশরে মেঘবৃষ্টি ছিল না। তাহা থাকিলে, উহাকে লোকে সজলদ দামিনী ও অশনির বিলাস-আসন বলিয়া অভিবাদন করিত।

গণ্ডশৈলের ন্যায় প্রকাণ্ড ও বিস্তৃত প্রস্তর বা প্রত্যস্ত-পর্ব্বত সকল অদ্ভূত শিল্পনৈপুণ্যে পরস্পর যোজিত হইয়া এই পিরামিড্ গঠিত হইয়াছিল। এই প্রস্তর-উপকরণের ক্ষুদ্রতমটিও প্রায় বিংশতি হস্ত পরিমিত দীর্ঘ ও তদনুরূপ বিস্তৃত।

মিশরীয় ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে অন্যের অবোধ্য এক প্রকার সাঙ্কেতিক অক্ষর প্রচলিত ছিল। ঐ অক্ষরযোগে তাঁহারা ধর্ম্মের রহস্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এগুলি অক্ষর নহে; কতকগুলি পশু পক্ষীর মূর্ত্তি বা ছবি। পিরামিডের প্রস্তরগুলিতে ঐ ছবির অক্ষরে (Heiroglyphic) বিবিধ লেখা খোদিত ছিল।

পিরামিডের প্রত্যেক পার্শ্ব প্রায় পাঁচ শত বত্রিশ হাত দীর্ঘ ও তদনুরূপ উচ্চ। কথিত আছে যে, এক লক্ষ লোক [illegible]

এই পিরামিডের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। লক্ষ লোক তিন মাস কাল কাজ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, তাহারা বিশ্রামার্থ বিদায় প্রাপ্ত হইত এবং অন্য আর এক লক্ষ লোক তিন মাসের জন্য পিরামিডের কর্ম্মে নিযুক্ত হইত। এইরূপে ত্রিশ বৎসরকাল ব্যাপী অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। আরব ও ইথিওপিয়ার আকরে প্রস্তর খনন-কার্য্যে দশ বৎসর যায় এবং নির্ম্মাণ-কর্ম্মে বিশ বৎসর লাগে। এই পর্ব্বত নির্ম্মাণে যে পর্ব্বতোপম অর্থরাশি উড়িয়া গিয়াছিল, ঐতিহাসিকেরা তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু কর্ম্মকারদিগের ভাগ্যে শুধু পলাণ্ডু ও রসুনের জন্য যে ব্যয় পড়িয়াছিল, পিরামিডের অঙ্গে এক স্থানে মৈশরীয় সাঙ্কেতিক অক্ষরে তাহা লিখিত আছে। শুধু পলাণ্ডু ও রসুনের খরচ পাঁচ লক্ষ করাশি রৌপ্য মুদ্রা! পাঠক! ইহা দ্বারাই ব্যয়ের একটা আনুমানিক পরিমাণ অবধারণ করিয়া লইবেন।

এই বিরাট পিরামিডের মধ্যে কোঠা ও কামরার সংখ্যা এত বেসী যে, তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। মাঝের কোঠার ঠিক মধ্যস্থলে ভিত্তির সহিত দৃঢ় নিবদ্ধ একখণ্ড প্রস্তরের অঙ্গে দুই হাত গভীর ও চৌড়া এবং চারি হাতের কিঞ্চিৎ অধিক দীর্ঘ একটি কবর খোদিত রহিয়াছে। কিন্তু উহাতে শবস্থাপনার কোনই লক্ষণ বা চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। প্রাচীন মিশরীয়গণ জ্যোতিস্তত্ত্বে কিরূপ প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন ও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, এই পিরামিড তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পিরামিডের চারিটি পার্শ্ব, ভূমণ্ডলের চারিটি গণিতিক বিভাগের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এমনভাবে বিন্যস্ত যে, উহা দ্বারা ঐ স্থানের প্রকৃত (Meridian) বা মধ্যন্দিন রেখা অনায়াসেই অবধারিত হইতে

আমাদিগের আগ্রার তাজে ও মিশরের পিরামিডে একাংশে বিশেষ একটা সাম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। যেমন সাম্য, তেমন আবার সেই সাম্যেই বিসদৃশ বৈষম্য। যমুনার তটে আগ্রার তাজ; আর নীল নদের তট-প্রদেশে মিশরের পিরামিড্। তাজ যমুনা-তটে ধ্যানপরায়ণা রাজরাণীর ন্যায় আসীনা রহিয়া রূপের ছটায় দিগ্বলয় উদ্ভাসিত করিতেছে ও রূপমুগ্ধ দর্শকের মনপ্রাণ কাড়িয়া লইতেছে। দর্শক তাজের নির্ম্মল কান্তিতে ভারতীয় শিল্পসৌন্দর্য্যের চরম আদর্শ দেখিতে পাইয়া, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িতেছেন। আর মিশরের পিরামিড কিরীটের গায় মেঘলোক ভেদ করিয়া, পাষাণময় বিরাটদেহে লুপ্ত দানবের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে! যে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাহারই মাথা ঘুরিয়া যাইতেছে,—সেই উহার বৈজ্ঞানিক গঠন-প্রণালী দেখিয়া ও উহার অঙ্গখোদিত চিত্র-অক্ষরে মৈশর ধর্ম্মের বিবিধ রহস্য ও পুরাবৃত্তের নানা কথা পাঠ করিয়া বিস্ময়ে নয়ন বিস্ফারিত করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু।

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

বান্ধব।—বৈশাখ ১৩১১। "জয় জগদীশ হরে"—ভক্তি-আপ্লুত হৃদয়ে সাধুভাষায় লিখিত। নববর্ষের প্রথমে ভগবানের নাম-গান অনেকের নিকটেই ভাল লাগিবার কথা। ভক্ত হৃদয়েরতো কথাই নাই।

"দার্শনিক মতের সমন্বয়"—শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য। আমরা এই প্রবন্ধটি পড়িয়া প্রীত হইয়াছি; বুদ্ধের নির্ব্বাণ-তত্ত্বের মূলে যে স্বতঃই নিত্য আত্মার অস্তিত্ব-স্বীকার রহিয়াছে, এবং বুদ্ধের ঐ শূন্যবাদ যে হিন্দুদর্শনেরই মুক্তাবস্থা, তাহা তিনি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়াছেন; বুদ্ধ যে কেন ইহা সাধারণ্যে অন্যরূপে বুঝাইয়াছেন, তাহার কারণ তিনি যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট অভ্রান্ত বোধ না হইলেও নিতান্ত যুক্তিশূন্য বলিয়া বোধ হইল না।

"জাপান সম্বন্ধে কএকটি কথা"—(১ম প্রস্তাব) বিশেষ কিছু নূতনত্ব দেখিলাম না। এসব কথা অনেক মাসিক সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে অনেকবার ইতঃপূর্ব্বে বাহির হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমাদের এই জড়ভরত দেশে এই সকল মনুষ্যত্ব-উদ্দীপক কাহিনীর যতই প্রচার হয়, ততই ভাল।

"যৌবন-সঙ্গীত"—শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণতীর্থ। ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় কবিতার পর-রাষ্ট্র বিভাগে কেন হস্ত দিতে গেলেন, বুঝি না। ব্যাকরণের কাকর-মিশ্রিত মটর-কড়াই চর্ব্বণের কর্কশ শব্দ তাঁহার কবিতায়ও যেন প্রবেশ-পথ পাইয়াছে। তবে কএকটি কবিত্বপূর্ণ শব্দ যে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও যেন 'জবরদস্তি' ক্রমে হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। লেখকের পাণ্ডিত্যও আছে, প্রাণে আকুলতাও আছে। কিন্তু প্রকাশ করিবার জন্য ক্ষেত্রটি নির্ব্বাচন করিতে ভুল হইয়াছে।

"ডাকাতি"— পদ্য) শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা। কবিতাটির একস্থলে অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিলাম না; যথা—"আনমনে দেখেছিনু ভুলে ভুলে"। এখন "ভুলে-ভুলে" দেখাটা কেমন, তাহা আমরা ঠিক বুঝিলাম না। এইটা কি যাদুকর কবি রবীন্দ্রনাথের স্থূল অনুকরণ?—না, কবিতাটিকে এই একরূপ

ভাঙ্গা-ভাঙ্গা মিষ্টকথা লাগাইয়া ভাব-বিহ্বল করিবার ব্যর্থ প্রয়াস? মনোরঞ্জন বাবুর উপর "ডাকাতি" হইয়াছে, ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি আবার বান্ধবের পাঠক পাঠিকাদের উপর এই কবিতাটি লিখিয়া "ডাকাতি" করিলেন কেন? আর পূজনীয় বৃদ্ধ সম্পাদকই বা কেন তাহাতে সহায়তা করিলেন? আমরা কিছু বলি, আর না বলি অনেকেই কিন্তু এ "ডাকাতি" উপলক্ষে পুলিশ ডাকিতে চাহিবে!

"একটি প্রশ্ন"—এটি এবারের বান্ধবের শিরোমণি প্রবন্ধ। বাঙ্গলাতে এ রকমের প্রবন্ধ আজ কাল অতি অল্পই বাহির হয়। এমন কি, স্থানে স্থানে ইহা ভাব ও ভাষার মাধুর্য্যে এত সুন্দর হইয়াছে যে, শ্রদ্ধেয় লেখকের বারংবার প্রশংসা করিয়াও আমরা অতৃপ্ত রহিতেছি।

"লীলা"—ক্ষুদ্র উপন্যাস—শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী দত্ত। "লীলার" প্রতি ছত্র প্রতি অক্ষর বাঙ্গলার জানা-শুনা কতকগুলি নভেল হইতে একেবারে নকল! সুপারিসের জোড়ে পত্রিকায় উঠিতে পারে বটে, কিন্তু পত্রিকায় স্থান পাইবার উপযুক্ত বস্তু উহাতে কিছুই নাই। তবে লেখিকার উদ্যমের আমরা প্রশংসা করি, এবং গল্পটিও সুরুচির পরিচায়ক বটে।

"চাতক ও চকোর"—প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। ভাবুক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ জন সাধারণ হইতে অনেক বস্তুই কত বিভিন্নরূপে দেখেন! ইহার সকল স্থানই মধুর,—কিন্তু শেষের অংশটুকু মধুরতর।

"ছায়াদর্শন"—পূর্ব্ববৎ। ইহার শেষে লিখা আছে,—আগামী বারে ইহা অপেক্ষাও রোমাঞ্চকর ঘটনা প্রকাশিত হইবে। এক্ষণ আগামীবার কি বৎসরের শেষ—না মাসের শেষ? ইহা ত বান্ধবের অনিয়ম প্রচারে কিছুই বলা যায় না।

ভারতী।—আষাঢ় ১৩১১। "জ্বালামুখী"—কবিতা। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। কবিতাটি আমাদের নিকট ভাল লাগিল; প্রাণের আবেগ ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে।

"আমার কাচ-নির্ম্মাণ শিক্ষা"—শ্রীনীলকণ্ঠ ওয়াগ্‌লে। ভারতীতে বাঙ্গলায় ভাষান্তরিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। লেখকের কাচ-নির্ম্মাণ শিক্ষার অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতা প্রশংসনীয় বটে। দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়।

"মহর্ষির জন্মোৎসব"—এই প্রবন্ধটি পূজনীয় শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে তদীয় পুত্র সুপ্রতিষ্ঠিত কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত এবং আহুত আত্মীয় ও সুহৃদ্‌ মণ্ডলীর নিকট পঠিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের দেশের আদর্শ চরিত্রবান্‌ পুরুষ। তাঁহার চরিত্রবল ও ধর্ম্ম-প্রাণতার জন্য তিনি আমাদের ভক্তি-ভাজন। প্রবন্ধটি সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে; আমরা পড়িয়া প্রীত হইয়াছি।

"বদরী-নারায়ণে সূর্য্যোদয়"—(পদ্য) শ্রীবরদাচরণ মিত্র। বরদা বাবুর সুকবি বলিয়া প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু তিনি উল্লিখিত এই কবিতাটিতে উৎকট শব্দের এমনি অবতারণা করিয়াছেন যে, তাঁহার "বদরী-নারায়ণে সূর্য্যোদয়" দেখিতে বঙ্গদেশের এক প্রান্তে বসিয়াও আমাদের ঘাম ছুটিয়া গিয়াছে!

"বেদান্ত"—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় যথাসম্ভব সরল ভাষায় দুর্ভেদ্য বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে দুই একটি কথা লিখিয়াছেন। সাধারণের পক্ষে এইরূপ সরল ভাষায় সর্ব্বদর্শন-শিরোমণি বেদান্ত সম্বন্ধে এইরূপ দুই একটি কথা জানিবার সুবিধা পাওয়া মঙ্গলের বিষয়।

"নারায়ণী"—এখনও সমাপ্ত হয় নাই। এত টানিয়া বুনিলে সূতা টিকে কিনা সন্দেহ!

"ভাষার ইঙ্গিত"—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই প্রবন্ধে বাঙ্গলা ভাষার সংস্করণ সম্বন্ধে রবীন্দ্র বাবু তাঁহার সনাতন মতের পোষকতা করিয়াছেন। তাঁহার মতে—"সংস্কৃত ভাষার যোগ ব্যতীত বাংলার ভদ্রতা রক্ষা হয় না এবং বাংলা তাহার অনেক শোভা ও সফলতা হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু তবুও সংস্কৃত বাংলার অঙ্গ নহে, তাহা তাহার আবরণ,—তাহার লজ্জা রক্ষা,—তাহার দৈন্য গোপন,—তাহার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনের বাহ্য উপায়। অতএব, মানুষের বস্ত্র-বিজ্ঞান ও শরীর-বিজ্ঞান যেমন একই কথা নহে, তেমনি বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণ এবং নিজ বাংলার ব্যাকরণ এক নহে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এই সামান্য কথাটাও প্রকাশ করিতে প্রচুর পরিমাণে বীররসের প্রয়োজন হয়।" তাঁহার এই প্রবন্ধ ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ গৃহে সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে পঠিত হইলে, শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় যাহা বলিয়া এই স্বেচ্ছাচারী সংস্কারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। আমরা তাঁহার কথাগুলি উঠাইয়া দিলাম। "রবি বাবু খুঁটি-নাটি করিয়া যে সকল তুচ্ছ কথা হইতে সুনিপুণ শিল্পীর ন্যায় নানারূপ সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন, সে সকল কথাকে ভাষার বুদ্বুদ বলিয়া গণ্য করা যায়; তাহারা নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন আকারে বিরাজিত; সেগুলি কখনও ব্যাকরণ-লিখিত ভাষায় স্থান পাইবার যোগ্য নহে,—সংস্কৃতের রামায়ণ মহাভারতাদি পুস্তকেও ধ্বন্যাত্মক শব্দের দৃষ্টান্ত অতি বিরল; সুতরাং এই সকল কথা লইয়া প্রবন্ধকার যে আলোচনা করি-

লেন, তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি ও কবিত্ব প্রকাশ পাইলেও তাহাদের দ্বারা লিখিত বঙ্গভাষার বিশেষ কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, এরূপ আশা করা যায় না।" লিখিত ভাষা ও কল্পিত ভাষার ভিতর চিরকালই পার্থক্য চলিয়া আসিতেছে। আমরা সংস্কৃত নাটক ভিন্ন অন্য কোন সংস্কৃত পুস্তকেই প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার দেখি না এবং তাহাও অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের বা ঐরূপ শিক্ষিত পুরুষদের মুখেই বেশী শুনিতে পাই। বাঙ্গলায়ও আমরা নাটকে কিম্বা নভেলে অথবা কথাবার্ত্তার সময় উহার ব্যবহার স্বচ্ছন্দে অনুমোদন করিতে পারি। কিন্তু এই সকল "ভাষার বদ্বুদ"গুলিকে ব্যাকরণের অঙ্গীভূত করিয়া, সাধু ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাদিতে ব্যবহার করিলে একটু দূষ্য হইয়া পড়ে। রবীন্দ্র বাবু প্রতিষ্ঠিত কবি, আমরাও তাঁহাকে ভক্তি করি ও ভালবাসি। কিন্তু দলে বহুলোক আছে বলিয়াই তিনি যে, দল জুটাইয়া বঙ্গভাষার উপর এরূপ ডাকাতি করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে আমরা কিছুতেই সায় দিতে পারি না। এই প্রবন্ধটি অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "বাঙ্গলা ভাষায় ব্যাকরণ" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি রবীন্দ্রবাবুর "ভাষার ইঙ্গিতের" প্রশংসা ও পোষকতা করিয়া স্তাবকের প্রাণে লিখিত। কিন্তু গোড়াতেই তিনি একটু ভুল করিয়াছেন। দীনেশবাবু বাঙ্গলা ভাষায় ব্যাকরণ ও তাহার পরিচালন সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবুর মতের সঙ্গে এমন হর-গৌরী আত্মা হইয়াও "বাঙ্গলা" শব্দটা কেন "বাংলা", "বাঙ্গালী" শব্দ "বাংআলী" ও "বঙ্গ" কেন "বংঅ" লিখিলেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—"ধনী ব্যক্তির সুসজ্জিত গৃহের পরিষ্কার ফরাসে ধূলি-মাখা পা লইয়া কোন ইতর ব্যক্তি প্রবেশ করিলে, সভ্যগণ যেরূপ বিরক্ত ও বিস্মিত

হন, অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত চলিত বাঙ্গলা ভাষার কোনরূপ প্রশ্রয় দেখিলে, তেমনই চমৎকৃত ও বিরক্ত হইয়া উঠেন ; এক্ষেত্রে কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংস্কৃত ব্যাকরণের সাপক্ষতা করিতে যাওয়া নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছিল"। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংস্কৃত ব্যাকরণের "সাপক্ষতা" করিতে যাওয়া নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছিল কেন? তাহাকে কি সেখানে দলে মিশিয়া,—মাথা ঝাঁকিয়া সায় দিবার জন্যই নেওয়া হইয়াছিল? নিজের মনোমত কথা হয় নাই বলিয়াই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কথাটি "অপ্রাসঙ্গিক"!—আর তিনি "সুরে সুর" মিশাইয়াছেন বলিয়াই প্রাসঙ্গিক! আর একটি প্রশ্ন—তিনি "সাপক্ষতা" শব্দটা কোন শাস্ত্রানুসারে ব্যবহার করিলেন? দীনেশ বাবু বঙ্গভাষা লিখিতে লিখিতে কেশের স্বচ্ছলতা নষ্ট করিয়াছেন, তথাপি দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার লেখায় এই সকল সামান্য ভুলগুলি পরিলক্ষিত হয়। "সপক্ষতা" বলিলে দোষ ছিল কি? তিনি মাঝে মাঝে পাণিনির নামোল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার "পানিনি" বর্ণ-বিন্যাস দৃষ্টে মনে হয় যে, এ পর্য্যন্ত 'পাণিনি' তাঁহার দৃষ্টিপথে কখনও আসে নাই। যাহা জানিনা—যাহা কখনও অধ্যয়ন করিবার সুবিধা কিংবা শক্তি হয় নাই, তাহার সম্বন্ধে বড়-বড় কথা বলিতে যাওয়া নিতান্ত দূষ্য। "সাপক্ষতা", "পন্থা" ইত্যাদি শব্দেই তাঁহার যে, পাণিনির সহিত সদ্ভাব নাই, তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়। ভাল করিতে যাইয়া, অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়াটা ঠিক নহে। দীনেশ বাবু এই প্রবন্ধের শেষ প্যারার পূর্ব্বের প্যারায় লিখিয়াছেন,—" * * * * * সেই চলিত কথার মধ্যে একটা জ্ঞান থাকে,—তাহা যদি সাধু ভাষার

এখন হয়ত, সাত লক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কিংবা হিন্দুরমণী আছেন, যাঁহারা "জান" শব্দটি বুঝিবেন না। এখানে "প্রাণ" লিখিলে দোষ কি হইত? "জান" শব্দ সাধারণতঃ মুসলমান গাড়োয়ানরাই বেসী ব্যবহার করিয়া থাকে। দীনেশ বাবুর ভাষায় তাঁহার প্রবন্ধের সমালোচনা করিলে, আমাদিগকে বলিতে হয়,—আমরা তাঁহার এই প্রবন্ধটি 'মোলাহেজা' করিলাম। ইহার মধ্যে বড় 'জবর এলেম' আছে। বাঙ্গলা ভাষা লিখিতে দীনেশ বাবুর খুব 'কুদ্রৎ'। বাঙ্গলা ভাষা পরিচালনে তিনি যে মত 'জাহির' করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিতে কাহারও 'মুরাদে' কুলাইবে না। আর বাঙ্গলাটাকি এইরূপ "বৈষ্ণবের" খিচুড়ী না করিলে প্রাণের আবেগ ব্যক্ত হয় না বলিয়া, তাহারা যে চীৎকার করেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, এইরূপ "খিচুড়ী শূন্য" রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পুস্তকে প্রাণের আবেগ কিছুই প্রকাশ পায় নাই! আর বাঙ্গলাতেও বিদ্যাসাগর মহাশয়, অক্ষয় দত্ত, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কিংবা বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের লেখায় প্রাণের আবেগ কিছুই প্রকাশ পায় না! এ নূতন তত্ত্ব বটে। সংসারে চালাইলে সবই চলে, তাহা মানি; ধর্ম্ম-অধর্ম্ম সকলই সংসারে চলিয়াছে ও চলিবে,—তথাপি সংসার পাপের একটা গোপন আশ্রয় দেয়। ধর্ম্মের বিশুদ্ধি বাহিরে নির্দ্দ্বন্দ্বীই থাকে। ভাষা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। গুপ্তভাবে তুমি যাহা ইচ্ছা চালাও, কিন্তু প্রকাশ্যে তাহার একটা বিশুদ্ধি থাকা চাই,—যাহা সর্ব্বজন সমাদৃত হইতে কোনরূপ বিঘ্ন পায় না, এবং যাহা স্থায়ী থাকিয়া দেশের ও জাতির উপকার করে।

"শূন্যবাদ"—শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংস্কৃত ও পালি ভাষায় পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে; তাঁহার লিখিত এই সারবান দার্শনিক প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা

অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। বৌদ্ধ দর্শনের দুরধিগম্য তত্ত্ব,—বুদ্ধের শূন্যবাদ, তিনি যথাসাধ্য সরলভাবে ও সরল ভাষায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যদি ধারাবাহিকরূপে এই সব তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সাধারণে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই।

"সাময়িক কথা"—শ্রীমতী সরলা দেবী। বিষয়গুলি আলোচনার উপযুক্ত। লেখাতেও বেশ যুক্তি ও মাধুর্য্য আছে। আমরা সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সাহিত্য।—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১। "সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী" —এবারের ডায়েরী আমাদের নিকট খুব ভাল লাগিল। লেখকের সূক্ষ্ম-দৃষ্টি, সৌন্দর্য্য-বোধ, বিকারশূন্য প্রশান্ত চিন্তা সকলই বিশেষ প্রশংসনীয়। লেখক এখন স্বর্গগত; তাঁহার যশোরাশি নিশ্চয়ই তাঁহাকে পূজ্য করিবে।

"ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি"—শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের ইতিহাস কোটী কোটী মানব-শোণিতে লিখিত। উহার ভৈরব রব এখনও যেন পাতাল-বদ্ধ দৈত্যের ভীষণ অস্ফুট ধ্বনির ন্যায় ইতিহাস-পাঠের সময় শ্রুত হয়! বাঙ্গালী অদৃষ্ট-চক্রে পড়িয়া কিরূপে আপনার জঘন্য ও নিষ্ঠুর হস্ত নিমজ্জিত করিয়া কলঙ্কিত করিয়াছিল, তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়ের বিষয়। ইহা তাহার কীর্ত্তি নয়,—অকীর্ত্তি। লেখকের লেখা চিত্তাকর্ষক বটে।

"জীব ও জাতি"—শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল। প্রবন্ধটির প্রথমাংশ পড়িলে বোধ হয় যে, এনাটমি বা শরীর-বিজ্ঞান যেন রূপকের আবরণ পড়িয়া প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু দার্জ্জিলিঙ্গের রেল-পথের ন্যায় ইহা হঠাৎ ঘুরিয়া জাতীয় জীবনের কএকটি

মাঙ্গল্য কথা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। তাঁবের এই ভাবান্তর অবলম্বন বা Turning-point আমাদের নিকট মন্দ লাগে নাই। জাপান সম্বন্ধে উদ্দীপনার কণ্ঠে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও আমাদের নিকট ভালই লাগিয়াছে। কিন্তু লেখক প্রবন্ধের শেষ দিক দিয়া লিখিয়াছেন,—"তখন ব্যাকরণ, সাহিত্য, ষড়দর্শনাদি মহীরুহের শ্যামল-পত্র-চর্ব্বণে পটুতা দেখাইতে পারিলেই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ হইত";—ইহা আমাদের ভাল লাগিল না। ভারতীয় জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ পৃথিবীর মনিষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত। শাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত প্রভৃতির জ্ঞানকে মহীরুহের "শ্যামল-পত্র-চর্ব্বণের" সহিত উপমা করিয়া, তাহার জ্ঞানও যে এদিকে শ্যামল-পত্রভুক্‌দের অপেক্ষা অধিক নয়, তাহারই পরিচয় দিয়াছেন।

"যেহেতু ও সেহেতু"—আমরা কিয়দংশ উল্লেখ করিয়া সমালোচনা করিতেছি। "দীনু সরকারের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সংসারের ঘটনাবলীর সচরাচর একটা কারণ থাকে; কোন ঘটনার একটার অধিক কারণও থাকে, এবং কোনটার বিশেষ কারণ আপাততঃ থাকে না; কিন্তু পরে প্রকাশ পায়। যেহেতু বিবাহ করিলে প্রায়ই পুত্রকন্যা জন্মিয়া থাকে, অতএব দীনুর পিতার ভাগ্যে দীনু জন্মিয়াছিল। এবং সেহেতু দীনুর মাতার পুত্রসাধ মিটিয়াছিল। অতএব স্ত্রীর আহ্লাদ দেখিয়া দীনুও অপর্য্যাপ্ত পারিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। যেহেতু মাতৃস্নেহ হইতে গাঢ় স্নেহ জগতে বিরল, অতএব দীনু আদরে বাড়িয়া 'বুদ্ধিতে খাট' হইয়াছিল। দীনু দেখিতে অতি সুশ্রী, কিন্তু তাহার পিতা মাতা কেহই সুশ্রী ছিল না। ইহার কারণ আপাততঃ কিছুই বুঝা যাইবে না, কিন্তু পরে প্রকাশ পাইবে। দীনুর পিতার, দীনুর মাতার ও স্বয়ং দীনু সরকারের এবং পাড়াপাড়া

প্রভৃতির যুক্ত অদৃষ্টক্রমে দীনুর পিতার হঠাৎ কাল হইয়া গেল। যেহেতু স্বামী মানব-লীলা সংবরণ করিলে স্ত্রী বিধবা হইতে বাধ্য, সেহেতু দীনুর মাতা বিধবা হইল। সামান্য মাত্র সংস্থান রাখিয়া দীনুর পিতা ভবধাম হইতে স্বর্গধামে গিয়াছিলেন। অতএব দীর্ঘ সপ্তদশবৎসর ধরিয়া অনাথা বিধবাকে দীনুর ভরণ-পোষণ ও অধ্যয়নের নিমিত্ত ভিক্ষা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছিল। দীনু বিদ্যালয়ের দ্বিতীয়শ্রেণী পর্য্যন্ত উর্দ্ধগতি অবলম্বন করিয়া, দ্বাবিংশতি বৎসর বয়সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। গতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সকলে বলিল,—'দীনু, লেখা পড়া ছাড়িয়া দাও'। অতএব দীনু সকলের পরামর্শ গ্রহণ করিল। দীনুকে সকলই ভালবাসিত। যেহেতু অতি বৃদ্ধ হইলে বাঁচে না, সেহেতু দীনুর মাতা মরিয়া গেল। দীনুর মাতা মৃত্যুকালে দীনুকে দীনুরই হাতে সঁপিয়া গেল, যেহেতু আর কেহ ছিল না।" আমরা বলিতেছি,— যেহেতু সমাজপতি মহাশয় "সাহিত্য" সম্পাদন করেন, সেহেতু তাঁহার পত্রিকা লেখা দ্বারা পূর্ণ করা দরকার। এবং যে হেতু তাঁহার প্রবন্ধ মনোনীত করা বিষয়ে দিন দিন মস্তিষ্কের হীন-বলতা প্রকাশ পাইতেছে, সেহেতু কতগুলি উন্মাদ লেখক "সাহিত্যে" নিয়মিত লেখক জুটিয়াছে! এবং যেহেতু সেই সকল উন্মাদ সাহিত্যিক নামধারীদিগের, সমালোচনার কশাঘাত না খাইলে, পরিণামে উন্মত্ততা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাগলদের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিরূপিত স্থানে যাইবার আশঙ্কা আছে, সেহেতু সাধু উদ্দেশ্যে আমাদিগকে পূর্ব্বাহ্নেই সাবধান করা হইতেছে। দ্বিতীয় প্যারায় আছে,—"অতএব স্ত্রীর আহ্লাদ দেখিয়া পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন"। এবং যেহেতু এই স্ত্রী কখনই দীনুর হইতে পারে না, সেহেতু আমরা ইহাকে "দীনুর বাবার স্ত্রী" বলিয়া বুঝিতে বাধ্য হইয়াছি। এবং যেহেতু সমাজে যাকে

"বাবার স্ত্রী" বলিয়া ডাকে না, সেহেতু বঙ্গসাহিত্যে একটা কিছু করিয়া যশঃ-লাভে উদ্যত এই অর্ব্বাচীন লেখকের প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। এবং যেহেতু লেখক নাম প্রকাশ করেন নাই, সেহেতু শব্দভেদী শুভ-বাক্যে আমরা তাহার চৈতন্য-সম্পাদন করিতে চেষ্টা পাইতেছি।

"ভারতে পাশ্চাত্য বণিক্"—শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীপ্রসন্ন বাবু পরিচিত ইতিহাস-লেখক। তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিতে বেস দক্ষতা আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার কোন অসদ্ভাব দেখিলাম না।

"জ্যৈষ্ঠের পল্লী"—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়। দীনেন্দ্রবাবু ইহাতে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ চিত্রনৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। বলিতে কি, আমরা এরূপ স্বভাব-চিত্র বঙ্গভাষায় খুব কমই দেখিয়াছি। দীনেন্দ্রবাবুর লেখনী সার্থক।

"সহযোগী-সাহিত্য"—অতি উপাদেয়। জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ।

"মাসিক সাহিত্য সমালোচনা"—বেস চলিতেছে।

"উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ।"

সৌন্দর্য্য।

রাখ মোরে জড়াইয়া অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে,
হে মম অন্তর-লক্ষ্মী—অন্তর-বাসিনি!
অমলিন মুখচ্ছবি, অনন্ত নিখিলে,
রেখো মধুরতারূপে, মধুর-হাসিনি!
কণক-অঞ্চল তব, সমীর চঞ্চল
উড়া'য়ে বরাঙ্গ-শোভা দেখা'বে যখন,
অপসারি' কামনার মেঘ-আবরণ,
অয়ি শোভাময়ি! তুমি শোভিও তখন,—
প্রসন্ন শারদাকাশে, জ্যোছ্‌নালোক-হারে,
চির শ্যাম বসন্তের শ্যামল শোভায়,
বরষার জলধারে, হেমন্ত-শিশিরে,
নিদাঘের বিশ্বোজ্জ্বল কিরণ-মালায়;
হেরি' সে পবিত্রছবি রূপ-মুগ্ধ কবি,
বিফল প্রয়াসে চা'বে আঁকিতে ও ছবি!

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

কি লিখিব ?

"কি লিখি, কি লিখি, ভয়ে ভয়ে লিখি ;
নহিলে শুনিতে এ বীণাঝঙ্কার।"

কি কুক্ষণে পুরোহিত ঠাকুর শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া, হাতে এক টুকরা খড়ি তুলিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন,—"লিখ" ; কি কুক্ষণেই ধূলির উপর "ক" এর আঁক দিয়াছিলাম ; সেই যে লিখিবার একটা ভয়াবহ হুকুম জারি হইয়া রহিয়াছে, কত যুগযুগান্ত অতীত হইয়া গেল, কিছুতেই আর সে হুকুমের ডাক-হাঁক থামিল না ! প্রথম হুকুম গুরুমহাশয়ের। পাঠশালার সেই বেত্র-শাণায়িত, নেত্র-রাঙ্গায়িত, কর্ণমর্দ্দন-সংবর্দ্ধিত কড়া হুকুম,—সেই "লেখ্—লেখ্—লেখ্" শব্দ এখনও মনে জাগিলে প্রাণ চমকিয়া উঠে ! পাঠশালা পার হইয়া স্কুলে,—স্কুল পার হইয়া কলেজে গেলাম। যেখানে গেলাম, সেখানেই ঐ হুকুম, শিবের পশ্চাৎ ধাবিত বরলব্ধ বৃকাসুরের ন্যায় পিছে পিছে যাইয়া উপস্থিত হইল ;—হাকিম নড়িল, হুকুম নড়িল না। এক্ষণ স্কুল কলেজের ত্রিসীমায়ও পাদক্ষেপ করি না ; তথাপি সে হুকুম পশ্চাতে লাগাই রহিয়াছে ! তবে এক্ষণকার হুকুমের নাম হুকুম নহে,—অনুরোধ। ইহা শিষ্টতা ও বিনয়ের ভাষায় গিল্টি-করা একটু নূতন ঢঙের জিনিস হইলেও, মূলে সেই হুকুম নয়ত আর কি ?

আপনারা বলিতেছেন,—"লিখুন"। আমিও ভাবিতেছি,—লিখিব। কিন্তু লিখিব কি ?—লিখিবার কথা আছে কি ?

লিখিবার আয়োজন ও সাজসজ্জা যথেষ্টই আছে। নানা রকমের দোয়াত,—শ্বেত, পীত, রক্ত ও নীল প্রভৃতি নানাবর্ণের কালি,
[illegible] নিব ও [illegible] এবং প্রথম শ্রেণীর বিলেতী পালিশ

কাগজ ইত্যাদি লিখিবার সমস্ত উপকরণ একত্র করিয়া, টেবিল সাজাইয়া মনোহারি দোকানের ধরণে বসিয়া আছি। কৈ লেখা হইতেছে কি? দিবসে দশবার চ্যায়াররূপ বিলেতী যোগাসনে আসীন হইয়া, ছারপোকার দংশনে দৃক্‌পাত না করিয়া, ধ্যানস্তিমিত-চিত্তে বীণাপাণির চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি; তথাপি আমার ভাবের বীণায় একটি গৎও বাজিতেছে না। কাগজ যে সাদা, সেই সাদাই রহিয়া যাইতেছে; কাগজের শ্বেতাঙ্গে একটিও কালির আঁচড় পড়িতেছে না।

এই সকল উপকরণের সংযোগ ও সন্নিবেশে যদি লেখা হইয়া যাইত, সে একটা বেস কথা ছিল। তাহা হইলে, আদালতে দাঁড়াইয়া শপথ করিয়া নির্ভয়ে বলিতে পারিতাম,—"আমি ইহা লিখি নাই।" মানহানির ফরিয়াদি প্রাণপণ করিয়াও আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ ফুটাইতে পারিত না। Sedetion বা রাজ-দ্রোহিতার ধুয়া ধরিয়া, কোন সরকারী লালপাগড়ি আমার পানে তাকাইয়া চক্ষু রাঙাইতে সমর্থ হইত না। দিতে হয়, আমার যশের নাগরা, লাভের পশরা "ধূমকেতুর" গলায়ই দড়ী দিত; আমি অনায়াসে ফাঁকে পা ফেলিয়া, ভাল মানুষটির মত একপাশে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতাম এবং আবশ্যক হইলে, "ধূমকেতুর" পরিবর্ত্তে কোন রাহুর আশ্রয় লইয়া চন্দ্র সূর্য্যের উপর ঝাল ঝাড়িতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এসকল ভৌতিক উপকরণে,—আধিদৈবিক উপায়ে লেখার কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না, ইহাই দুঃখের বিষয়। বিনা লেখকে, শুধু উপকরণের সম্মিলনে, লেখা হইতে পারিলে, কাহাকেও এতটা বেগ পাইতে হইত না, এবং আমার মত কলমবাজ নকলনবীশেরও লিখিয়া-লিখিয়া মাথা ঘামাইতে হইত না।

রূপ ঘোটক, শকট ও এঞ্জিনের উপর একটা সওয়ার বা চালকের আবশ্যক। সে সওয়ার বা চালক—মন। সে মনকেও আবার "বায়ুভূত নিরাশ্রয়" গোছের একটা "হাওয়াই" জিনিস হইলে চলিবে না,—হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকট হইয়া, স্পষ্ট দৃশ্যমান স্থূল দেহে বারদিয়া, ভাবের চুপড়ী সম্মুখে লইয়া বসিতে হইবে। মনটা যদি হয় একটু নাম-করা, তাহা হইলে ত আর কথাই নাই। তাহা না হইলেও, ভাবের চুপড়ী পুষ্ট থাকিলে, একরকম লেখার কর্ম্ম চলিয়া যাইতে পারে।

লিখন-উপকরণ অনায়াসেই সংগৃহীত হয়; এবং সেগুলিকে যেখানে ইচ্ছা রাখ, সেখানেই থাকে। কিন্তু মনের লাগ পাওয়া সহজ নহে। সে কখনও ঊর্দ্ধগগনে,—চন্দ্রলোকে বা সূর্য্য-মণ্ডলে; কখনও অধঃপাতের পথে,—রসাতলে; কখনও জলে; কখনও স্থলে। কখনও রজত-কাঞ্চন-ক্বণিত পোদ্দারের গদিতে ঘূর্ণায়মান; কখনও সুখ-মরীচিকার নির্জ্জল সরোবরে ঝম্ফপ্রদা-নার্থে প্রয়াসপর ও যত্নবান্। কখনও সে মোহিনীর ফুলবাগানে, কখনও বিলাসিনীর কুসুম-কুঞ্জে। কখনও রান্নাঘরের কানাচে; কখনও ময়রার দোকানে রসগোল্লার হাঁড়ির ধারে। বস্তুতঃ মনের সন্ধান পাওয়া বড়ই কঠিন। বহু আয়াসে মনকে ধরিতে পারিলেও, সে চির চঞ্চলকে একস্থানে স্থিরভাবে বসাইয়া রাখা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। এক "ধূমকেতুর" উদয় হইতে আর এক "ধূমকেতুর" উদয় পর্য্যন্ত, গলদঘর্ম্ম পরিশ্রম করিলাম, মনকে খাটি করিয়া ঘরে বসাইতে পারিলাম না। লিখিব কিরূপে?—লিখিবে কে? দোয়াতের কালি শুকাইল,—তৃষার্ত্ত নিপ্ মুখ মেলিয়া হা করিয়া রহিল,—কাগজ ধূলিবালির সংসর্গে দলিল-জালিয়াতের আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিল, তথাপি আমার একটি অক্ষরও লেখা হইল না।

সময় সময়, বহু সাধ্যসাধনার পরে, কখনও যশো-মধুর প্রলোভন সম্মুখে ধরিয়া, মনকে ক্ষণকালের তরে ঘরে টানিয়া আনিয়া বসাইয়াছি, কিন্তু তখন হয় ত ভাবের চুপড়ী খুঁজিয়া পাই নাই; অথবা পাইলেও উহাতে হাত দিয়া দেখিয়াছি, চুপড়ী খালি;—আর নয় ত অন্যের চর্ব্বিত পঁচা মালে পরিপূর্ণ! মন এই সুযোগ পাইয়া আবার ডানা লাগাইয়া উড়িয়া গিয়াছে। তাই বলি, লিখিব কি ?—লেখা হইবে কিরূপে ?

সাধনার বলে মনটাকে পটাইতে পারিলে, লিখিবার বিষয়ের অবশ্যই অভাব নাই,—বিষয় অনন্ত। বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি, কতই কি রহিয়াছে। আমার ক্ষীণ মূলধনের ক্ষুদ্র কারখানায়, সময় বিশেষে, দুই চারিটি নূতন ভাবেরও স্ফুরণ না হয়, এমন নহে। কিন্তু তাহা হইলেই, লেখা হইতে পারে কি ?

বক্তার সুখ শ্রোতায় শুনিলে,—লেখকের সুখ পাঠকে পড়িলে, ততোধিক সুখ শুনিয়া বা পড়িয়া কোন ব্যক্তি উপকৃত ও প্রীত হইলে। বস্তুতঃ লোকে পড়িলেই লেখার সার্থকতা। অবাধ্য মনকে বাধ্য করিয়া যেন দর্শন ও বিজ্ঞান লইয়া ব্যায়াম করিলাম; প্রাণান্ত ব্যায়ামের ফলস্বরূপ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকটিত হইল। কিন্তু সে ছাই-ভস্ম কেহ পড়িল না। দর্শনে কাহারও দৃষ্টি মার্জ্জিত হইল না। বিজ্ঞানে কাহারও জ্ঞানের তহবিল পুষ্ট হইল না। এমন অবস্থায়, সেই তত্ত্বে আয়ুক্ষয় করিয়া পুণ্য হইবে কি ?

সাহিত্যের এক প্রধান অঙ্গ,—কাব্য, নাটক ও উপন্যাস। কাব্য, নাটক ও উপন্যাসে দেখিতে পাই,—প্রেমেরই একচেটিয়া অধিকার। বঙ্গের বর্ত্তমান কাব্য, নাটক ও উপন্যাস পাঠ

করিলে, মনে লয়, ইহ খলু মানব-জীবনে নরনারীর পরস্পর প্রেম করা ভিন্ন যেন আর কোন কর্ম্ম বা আর কোন কর্ত্তব্য নাই। নায়ক-নায়িকারা কখনও অপোগণ্ড শৈশবে, কখনও যৌবনের স্ফুরন্ত প্রারম্ভে প্রেমের গাঁজায় দম দিয়া একবারে বিভোর হইয়া পড়েন ; এবং সমস্ত জীবন ভরিয়া, অর্থাৎ কাব্য, নাটক বা উপন্যাসের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত, শুধু ঐ প্রেমের নামেই হাসেন, কাঁদেন, নাচেন, অথবা ধূলায় গড়াগড়ি দিতে থাকেন। বেসী বাড়াবাড়ি হইলে, কখন কখন বুকে ছুরি দিয়া, বিয়োগান্ত বা করুণ-পরিণামীয় দৃশ্য দেখাইয়া শেষ পরিচ্ছেদের উপসংহার করেন। প্রেম ভিন্ন, তাঁহারা অন্য যাহা কিছু করেন, বা করিতে বাধ্য হন, তৎসমস্তই ঐ প্রেমের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান। বঙ্গীয় সাহিত্য-কুঞ্জ প্রেমিক-প্রেমিকার গুঞ্জরবে গুলজার! কিন্তু সে একঘেয়ে প্রেম, এখন পঁচিয়া-গলিয়া বিস্বাদ হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি প্রেমের পুট-পাকে জারিত না হইলে, কোন পাঠকই কাব্য-উপন্যাসাদি পাতে লইতে চাহেন না। তাই বলিতেছি, আমি আবার এ বিষয়ে কি লিখিব? পূরাদমের এই ঘোর নেশায় আমি আবার একটা নূতন টান চড়াইয়া কি লাভ করিব?

প্রেম এমনই পদার্থ যে, উহার একটু আঁচ গায়ে লাগিলে, বৃদ্ধ বাল্মীকির ধ্রুপদের বীণাও বাঁশীর সুরে খেয়ালে তান ধরিতে ভালবাসে। আমাদের চঞ্চলা লেখনী আর সে আবেগে স্থির রহিবে কিরূপে? ভাবের লেখনী প্রেমাবেগে আকুল হইলে, আর কোন বাধা বিঘ্ন না মানিয়া ক্ষিপ্তের মত ছুটিতে চাহে। পাঠকেরাও প্রেমের সুর শুনিলে, দুই হাতে তালি বাজাইয়া "এন্‌কোর" দিতে আরম্ভ করেন ; সুতরাং ভারতের মত কবির লেখনী-মুখে বিদ্যাসুন্দরের বিহাররূপ গলৎ নির্গত

হয়, এবং হীরা মেলেনীর হাত-নাড়া ও ঝঙ্কারে কাব্য-কুঞ্জ আলোড়িত হইয়া উঠে ; এবং মাইকেলের ন্যায় ইংরেজী-নবীশ আধুনিক বড় কবিও চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে আদিরসের গরদা ক্লেদ ছিটাইয়া আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন! হিল্লোল তথন, প্রেমের চিরপরিচিত খাত,—রাম-জানকী, নল-দময়ন্তী, সত্যবান্ ও সাবিত্রীর প্রদর্শিত পুরাতন পথ ডিঙ্গাইয়া কোথায় যাইয়া ঠেকে ! প্রেমের কণ্ঠে সতীত্বের স্যমন্তক লোভনীয় বস্তু হইলেও, প্রেমে প্রাচীন কালের শুধু সেই উপাস্য-উপাসিকার ভাব নবা-নব্যার তরুণ নয়নে তেমন প্রীতিকর নহে। এখনকার প্রেমে সেই গাম্ভীর্য্যের পরিবর্ত্তে একটু চটুল-চাপল্য, একটু নূতন রঙ্গ ও একটু ঢলাঢলি-গলাগলি ইয়ারকির ঢঙ, অধিকতর আদরণীয়। সুতরাং প্রেমের এই আধুনিক তরল উচ্ছ্বাসে স্বাধীনভাবে লেখনী চালাইয়া সীতা সাবিত্রীর দেশে, অজ্ঞাতসারে অনেকেই যেন হেলেনা ও ক্লিওপেট্রার জন্য পথ খুলিয়া দিতেছেন। আরও বাড়াবাড়ির প্রয়োজন আছে কি ?

স্বর্গগত বঙ্কিম নূতন ছাঁচে-ঢালা প্রেমের ছবি দুই একটি রাখিয়া গিয়াছেন ; বঙ্কিম কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমের শক্তি সর্ব্বত্র সুলভ নহে। বঙ্কিমের এই ছবি—শৈবলিনী ও কুন্দ-নন্দিনী। প্রেমের নিভৃত কুঞ্জে তত্ত্ব লইলে, অনেক শৈবলিনীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে। অনেক শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের প্রজাপতি-নির্দ্দিষ্ট স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় উপেক্ষা করিয়া, প্রতাপের তাপে প্রাণ জুড়াইবার নিমিত্ত কুল-পিঞ্জরের বাহিরে আসিয়া, অন্ধকারে অকূলের তরঙ্গে মনের সাধে সাঁতার দিতে ভালবাসে। কিন্তু বঙ্কিমের শৈবলিনী প্রতাপের মত প্রেমিককে প্রাণ দিয়া-ছিল বলিয়াই কুল-পিঞ্জর ভাঙ্গিতে বসিয়াও, ফিরিয়া আবার কূলে ঠাঁই পাইয়াছিল,—পতি-গৃহে আদরিণী গৃহিণীরূপে পূজিত

হইয়াছিল। শৈবলিনী অনেক আছে,—প্রতাপ একটি বই দুইটি কোথাও মিলে কি? প্রতাপের মত ভোগ-রাগ-বর্জ্জিত প্রাণ-দক্ষিণ প্রেমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারে কয় জন?

আমি যদি প্রেমের উচ্ছ্বাসে নূতন তরঙ্গ ফলাইবার দুরাশায়, নব্য পাঠকের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্যে, কোন শৈবলিনীর প্রেম-সঙ্গীতে তান ধরিতে যাইয়া প্রতাপ গড়াইতে অসমর্থ হই,—দেবতা গড়াইতে ভূত বানাইয়া বইসি! আমার অবোধ শৈবলিনী যদি প্রতাপে প্রাণ না দিয়া, সর্ব্বত্র-সুলভ কোন রমণী-রঞ্জন বা মদনমোহনে মন বাঁধিয়া ফেলে;—আর আমার প্রেমোন্মাদিনী লেখনী যদি প্রেম নামক সেই "পাপ-কথা" লইয়া উধাও ধাবিত হয়, তবেই ত প্রমাদ! তাহা হইলে, এদেশের বাবুয়ানি-ধরণের রসিক পাঠকেরা আমার এ মাল লুফিয়া লইবেন সত্য; কিন্তু অন্য দিকে সুরুচি, "ছি ছি—থুথু" বলিয়া, নাক বাঁকাইবেন; কুল-কামিনী সম্মার্জ্জনী করে ধরিবেন; সমালোচক সরোষে অশনি আকর্ষণ করিবেন এবং কঠোর সামাজিকও ঈদৃশ লেখনী ও লেখার অগ্নিপরীক্ষা করিতে বলিবেন!

প্রাচীন রীতির হরিতকী-ভোজী নিরামিষ প্রেমের গ্রাহক, পাঠক বা ভোক্তা এখন নাই। সুতরাং উহা লিখিয়া-লিখিয়া চর্ব্বিত-চর্ব্বণের সাধও এখনকার রঙদার হেণ্ডেল ও স্বর্ণ-শিখ লেখনীর মনে জাগিতে পারে না। এদিকেও বাধা—ওদিকেও বিপত্তি। প্রেমে প্রতাপ সৃষ্টির শক্তি নাই,—ওদিকে "আই-আই ছি ছি" ধ্বনিরও ভয় আছে। অতএব বলুন দেখি, কাব্য-সাহিত্যের আশ্রয়ে কি লিখিব? বিধি যদি সুদিন দেন, এদেশের কাব্য-সাহিত্য, প্রেম ভিন্নও যে মানব জীবনের অন্য করণীয় আছে, ইহা যখন সম্যক্ বুঝিতে সমর্থ হইবে, লেখনী যখন অন্য

শিখিয়া লইবে; এবং পাঠক যখন বর্ত্তমান প্রেমের অসার সরবতে বীতস্পৃহ হইয়া, খনি খুঁড়িয়া মণি তুলিতে অভ্যস্ত হইবেন,—যদি লিখিতে হয় ও লিখিবার মত লিখিতে পারি, তাহা হইলে, তখন লিখিব। সকল লেখা, সমস্ত সাহিত্যিক সম্পদের সার সম্বল সত্য। সত্য যে সাহিত্যের লক্ষ্য নহে, সত্যের সহিত যাহার সম্পর্ক নাই, সে সাহিত্য পিশাচের ভোগা—সে লেখা নরকের উদ্গার! সে সাহিত্য সাহিত্য নহে,—পণ্য-বিলাস বা নটীবৃত্তি। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য, সাহিত্যে সত্যসেবা, লেখনীযোগে সত্যের উপাসনা, যার-পর-নাই দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। বিপন্ন বঙ্গে এক্ষণ, ইহাতে ভীষ্মের প্রাণবল, নেপোলিয়নের বীরত্ব ও সক্রেটিসের সাহস প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

মানব-জগতে ধর্ম্ম সকলের বড়। ধর্ম্ম বিষয়ে লিখিতে হইলে, লিখিবার কথা অনন্ত ও অফুরন্ত। কিন্তু ধর্ম্ম ও সত্য যেন একই বস্তুর দুইটি নাম; ধর্ম্ম ও সত্য সর্ব্বতোভাবে অভেদাত্ম—একই পদার্থ। আমি ধর্ম্ম বলিয়া যাহা বুঝিয়াছি, আমি যাহা প্রাণে অভ্রান্ত সত্যরূপে অনুভব করিয়াছি, যদি আমার সেই ধর্ম্ম আমাকে চির পরিচিত অন্ধকূপে, বাঁধান তড়াগে, বা বদ্ধহ্রদে আবদ্ধ রহিতে না দেয়, আমি যদি আপনাদের ঐ গির্জ্জা, মসজিদ্ মন্দির বা মঠের গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া, চকোরের আকুলতায় ঊর্দ্ধগগনে উড়িয়া চাঁদের জ্যোৎস্নায় তনু ভাসাইয়া দেই, অথবা যদি পূর্ব্ব সুকৃতিবলে, জগদেক মহাসত্ত্বা ও মহাসত্যে প্রকৃত আস্থাবান্ হইয়া, আমি কথনও ভাবাবেশে "ভাই" বলিয়া ঘৃণ্য চণ্ডাল বা অস্পৃশ্য যবনকেও অবাধে আলিঙ্গন দিয়া কৃতার্থ হইতে চাহি,—কিংবা বিশ্বরূপের সেই রূপসাগরের কণিকা বা বিন্দু, ঐ তরু, লতা, পাতা ও ফুলের গায় দেখিতে পাইয়া, সাশ্রুনেত্রে আত্মহারার মত নমস্কার করি, তাহা হইলেই ত বিপত্তি! একদিকে

আপনাদের গির্জ্জা গর্জ্জিয়া উঠিয়া, "Heathen" বলিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইবে, অন্যদিকে মস্‌জিদ্ কাফের মান করিয়া চোখ রাঙাইবে, মন্দির নয়ন মুদিয়া পৌত্তলিক সিদ্ধান্ত করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিবে এবং মঠ আমাকে জাতিভ্রষ্ট ধর্ম্মচ্যুত অপদার্থ বুঝিয়া "দূর-দূর" করিয়া তাড়াইয়া দিবে। প্রাণে অনুভূত সত্যের অনুরোধে, সরল চিত্তে লেখনী চালনা করিলেও যদি তাহার পরিণাম এই হয়, তাহা হইলে আর লিখিয়া প্রয়োজন কি?

সমাজনীতি, রাজনীতি, স্বার্থনীতি ও পরার্থনীতি, যে কোন নীতি লইয়াই কথা হউক না কেন, নীতি-জগতের প্রাণের কথার মূল অবলম্বন ঐ সত্য। সত্য উপেক্ষিত বা পরিত্যক্ত হইলে, কোন নীতিই আর নীতিরূপে সম্মানিত হইতে পারেনা। কিন্তু আপনারা একবার সকল দিক চিন্তা করিয়া বলুন দেখি, কি সামাজিক প্রসঙ্গ, কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, কোন তত্ত্বেই সত্য কহিয়া পার পাইবার উপায় আছে কি না।

যে দেশে চোর অনায়াসে সাধুর গলায় দড়ী দিতে সমর্থ হয়,—চোরকে চোর বলিবার সাধ্য নাই; যেথানে ঠাকুরের আসনে কুকুর বসিয়া অবাধে ঠাকুরালি করিতে সক্ষম হয়, এবং অন্য দশ ঠাকুর, পিতৃ-মাতৃ-দায়, কন্যাদায়, ঋণদায় অথবা অন্য কোনরূপ অকথ্য বা অপ্রকাশ্য দায়ে ঠেকিয়া, জানিয়া, শুনিয়া ও বুঝিয়া সেই কুকুরের পায়েই পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে বাধ্য হয়,—সেদেশে কুকুরকে লগুড় দেখাইলেই প্রমাদ, আইনের ফাঁস অমনি আপন গলায় জড়াইবে! সামাজিক গণও মনের আনন্দে সেই ফাঁসের ডুরি ধরিয়া, আরও আটিয়া বাঁধিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইতে থাকিবেন। যেথানে ভাক্তের নাম ভক্ত, ভণ্ড বা ষণ্ডের নাম সন্ন্যাসী; যেথানে দেব-নিবাসে দানবের বাহাদুরি, দেবতার পরিণাম ধূলায় গড়াগড়ি; যে দেশে

পণ্যবিলাসিনী রাজপ্রাসাদে সংবর্দ্ধিতা, সতী কুটীরবাসিনী কাঙ্গালিনীরূপে চির অবহেলিতা, অথচ মুখ ফুটিয়া একটি কথা বলিবার যো নাই; বলিলে, লোকে বলিবে—অপরিণামদর্শী গোঁয়ারগোবিন্দ মূর্খ। তামসিকেরা চারিদিকে তালি বাজাইয়া হোলী গাইবে; অন্যদিকে মানহানির নামে প্রাণহানির যোগাড় হইতে থাকিবে!

যেখানে সমাজ নাই, অথবা সমাজ-শক্তি নাই, উদার প্রাণের সরল সত্য সেখানে বিকাইবে কেন? সত্যের অনুসরণ করিতে গেলে, একদিকে মানহানি, আর একদিকে প্রাণহানি; এ সকলের হাতে অব্যাহত রহিতে পারিলেও নিস্তার নাই; তৃতীয় দিকে দেশের যত টিকী ও নামাবলী দল বাঁধিয়া, তাঁহাদের আজন্ম-পুঁজি থট্টপুরাণের পাতা খুলিয়া আমায় একঘরে, এবং ঘরে ক্ষৌরকার ও যাজকের প্রবেশ নিষেধ করিবেন এবং আমার নারায়ণসেবার প্রসাদ পঁচাইয়া আমাকে জব্দ করিতে চাহিবেন।

যে দেশে সত্যের আদর বা গুণের সম্মান নাই, যে দেশের সাহিত্যে একদিকে প্রেমের বিড়ম্বনা, অন্যদিকে জগদারাধ্য সত্যের লাঞ্ছনা; যেখানে যেপথে পা বাড়াইতে ইচ্ছা হইবে, সেই পথেই কণ্টকের ভয়, সর্পের আতঙ্ক, সে দেশের প্রাণ-শোষক, চিত্তসঙ্কোচক মারাত্মক আবহাওয়ায় বাস করিয়া লিখিবার আকাঙ্ক্ষায় কর-কণ্ডূয়নগ্রস্ত হওয়া বস্তুতঃই বিড়ম্বনার কথা। তাই ভাবিতেছি, কিরূপে অনুরোধ রক্ষা করিব?—কি লিখিব? এই হেতুই আরম্ভেও আমার যে কথা, উপসংহারেও সেই কথা;—

"কি লিখি, কি লিখি,　　ভয়ে ভয়ে লিখি,
নহিলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার।"

শ্রীঃ—

আমি ও সে।

বেলা-ভূমে আমি ক্ষুদ্র কণা সিকতার,
প্রশান্ত সাগর সে গো অকুল অতল ;
অনন্ত আকাশ প্রায়, অধিকার তাঁর,
আমি তা'র একজন প্রজা নিঃসম্বল ;
সে হয় পরমাদর্শ পুরুষপ্রধান,
আমি তাঁর ছায়াখানি, ক্ষুদ্র আয়তন ;
ভাবের ভাণ্ডার সে যে,—স্তূপীকৃত জ্ঞান,
আমি অতি মূঢ়মতি, হীন অভাজন ;
অভ্রভেদী অচল সে, কোমল-কঠিন,
তারি গায়, আমি সূক্ষ্ম তুষারের কণা ;
জগত জুড়িয়া সে যে, আছে নিশিদিন,
চর্ম্ম-চক্ষে আমি তাঁর স্বরূপ দেখিনা ;
সে যে গো বিশ্বের সখা, করুণা-নিদান,
আমি তাঁর—সে আমার, প্রাণে-প্রাণে প্রাণ।

শ্রীকামিনীকুমার দে রায়।

প্রাচীন মিশর।

হিন্দু ভাবুক তাজদর্শনে রামের প্রমোদবন ও সেই প্রমোদ-বনস্থিত বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত রাম-জানকীর বিহার-ভুবনের কাল্পনিক স্মৃতি শতবার মনে জাগাইয়া এক একবার যেমন আত্মহারা হইতেছেন, তেমনই আবার উহার ঐ বরাঙ্গে শ্মশানের গন্ধ পাইয়া, বিষাদ-গাম্ভীর্য্যে মস্তক অবনত করিতেছেন।

মিশরের ভাবুকও তাঁহাদের পুরাতন গৌরবের প্রতিভূরূপী পিরামিডের পানে তাকাইয়া যেমন এক একবার উহার বিচিত্র শিল্প-নৈপুণ্য, বিপুল আয়তন ও সর্ব্বগ্রাসী কালের প্রতি ভ্রূভঙ্গি-শূন্য নির্ভীকভাব দর্শনে, আত্মগৌরবে স্ফীত হইতেছেন, তেমনই আবার উহার নির্ম্মাণকারী মিশরাধিরাজের কার্য্য-কলাপ ও শেষ পরিণাম স্মরণ করিয়া, ঘৃণায় ও বিষাদে মুখ ফিরাইয়া লইতেছেন। তাজ, রূপবৈভবে অমন ভুবনমোহন হইয়াও, যে সমাধি,—পিরামিড, বজ্রসার শক্তিসম্পদে অমন ত্রিকালজয়ী হইয়াও, সেই বিষাদ-স্মৃতির উদ্দীপক শূন্যগর্ভ সমাধি! এই অংশে উভয়েই এক। কিন্তু এই সাম্যে যে বৈষম্যটুকু আছে, তাহাই এক্ষণ বলিব।

ভারত সম্রাট্ সাজেহান, প্রিয়তমা মহিষী মমতাজ বেগমের অন্তিম শয়নকক্ষরূপে, বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে, এই অদ্বিতীয় অট্টালিকা গঠন করেন। বাদশাহের অভিপ্রায় অনুসারে রাজ্ঞী মমতাজ এই স্থানেই সমাধিস্থা হইয়াছিলেন। তাজের ক্রোড়স্থ সমাধিমঞ্চে, এখনও অনেক দর্শক, ভারত-রাজমহিষীর নাম স্মরণ করিয়া, সসম্ভ্রমে পুষ্পবিকীরণ ও পুষ্পমালায় উহা সজ্জিত করিয়া প্রীতি অনুভব করেন। মিশরীয় পিরামিডের অদৃষ্টে এ সম্মানলাভ ঘটে নাই। তাজের তরল সৌন্দর্য্যে শ্মশানের গাম্ভীর্য্য ও সমাধির নিস্তব্ধতা আছে, পিরামিডের নীরব গাম্ভীর্য্যে শ্মশানের সেই শোভা, সমাধির সেই বিষাদ-সৌন্দর্য্যের আভা পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। দর্শক উহার প্রস্তরময় রাজকীয় শবাধার শূন্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন, এবং মানুষের আশা, ভরসা ও মনুষ্যকৃত কর্ম্মের অকিঞ্চিৎকারিতা ও অসারতায় শত ধিক্কার দিয়া, বিষণ্ণ বদন ও অবসন্ন প্রাণে ফিরিয়া আইসেন।

যে ফেরেও বা মিশর-রাজ আত্মসমাধি-মন্দির গঠনকল্পে পিরামিডের বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন, যাঁহার আত্ম-গৌরব ও ব্যক্তিগত যশোলালসার চরণে নিষ্পেষিত প্রজার অর্থরাশি ও লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীর প্রাণ অকালে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল, সে প্রজাপীড়ক নিষ্ঠুর সম্রাট্ তাঁহার অত সাধের পিরামিডে অন্তিমশয্যা পাতিতে সমর্থ হন নাই। তিনি আপন দেহের আয়তনে প্রস্তর-কবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কবর যেন এখনও মুখ মেলিয়া, সেই রাজকীয় শবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে; কিন্তু শব সেস্থানে আনীত হয় নাই। সমগ্র সাম্রাজ্য যাঁহার অধিকারে ছিল, হায়! নিয়তির অপ্রতিহত অমোঘ বিধানে, সেই সম্রাটের দেহও অবশেষে তাঁহারই আত্মকৃত পিরামিডে, সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত স্থানেও অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই!—সমগ্র দেশ, সমস্ত প্রকৃতিবর্গ, তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী দুঃসহ অত্যাচারে উৎপীড়িত ও ধনে প্রাণে বিধ্বস্ত হইয়া এতদূর ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়াছিল যে, পাছে ক্ষিপ্ত জনতা পিরামিডের সমাধি হইতে শব তুলিয়া আনিয়া, মনের ক্রোধে ও আক্রোশে রাজদেহের কোনরূপ অবমাননা করে, এই ভয়ে ফেরেওর মৃত্যুর পর, তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহার শব কোন নিভৃত নির্জ্জন স্থানে বনজঙ্গলের অজ্ঞাত অন্ধকারে চোরের ন্যায় সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। পিরামিড আজিও উহার শূন্যগর্ভ শবাধার দেখাইয়া, লোকপীড়ক নৃপতির অখণ্ড প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও স্বার্থপরায়ণা প্রজাপীড়নী নীতির শেষ পরিণাম কি, পৃথ্বীবাসীকে যেন, তাহাই ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত অটল ও অচল সাক্ষীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে!

মধ্যমিশরের আর একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য,—Labyrin th বা

ধাঁধাঁখানা। ধাঁধাঁখানা "আর্‌সিনো" নামক নগরের সন্নিকটে অব-স্থিত। আর্‌সিনোর আর এক নাম—"Town of Crocodiles", অর্থাৎ কুম্ভীরনগরী। ধাঁধাঁখানা একটি প্রাসাদ নহে,—অতি বৃহৎ বারটি প্রাসাদের একত্র সমাবেশে ধাঁধাঁখানার নির্ম্মাণ! বারটি বিরাট দরবার-গৃহ বা হলের চারিদিকে বড় বড় পনর শত কুঠরী, উচ্চ উচ্চ চাতাল সমন্বিত হইয়া, এরূপ ভাবে বিন্যস্ত আছে যে, ইহার ভিতরে প্রবেশ করিলে, অপরিচিত বা নবাগত দর্শক, কোন দিক দিয়াই আর বাহিরে আসিবার পথপ্রাপ্ত হন না। এই হেতুই ইহার নাম ধাঁধাঁখানা।

ধাঁধাঁখানার মৃত্তিকার উপরে, লোক-চক্ষুর গোচরে, যেন মালার ন্যায় লহরে লহরে পনর শত কোঠা দ্বাদশটি হলকে ঘেরিয়া রহিয়াছে; মৃত্তিকার নিম্নেও আবার তেমনই পনরশত কোঠা পাতালবাসীর চক্ষে ধাঁধাঁ লাগাইবার নিমিত্তই যেন বিরাজিত আছে। এই ভূগর্ভস্থ কুঠরীগুলির মধ্যে কতকগুলি রাজাদিগের সমাধি ও কতকগুলি মৃত কুম্ভীরের পবিত্র কঙ্কাল রক্ষণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ও নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রাচীন মিশরের এক প্রদেশে কুম্ভীর দেবতারূপে পূজা পাইত। এই হেতুই কুম্ভীর-কঙ্কালের এতদূর সম্মান। দেখিতে বিস্ময়াবহ দৃশ্য হইলেও, এসকলের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় এক্ষণকার লোকের বিবেচনায় নিতান্তই অসার ও অকিঞ্চিৎকর।

মিশরের প্রাচীন ভূপতিবর্গ যে কেবলই এইরূপ অসঙ্গত যশোলালসা হেতু, রাজ-ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া, আত্মগৌরব-দ্যোতক, অথচ রাজ্যের পক্ষে যার-পর-নাই অকিঞ্চিৎকর কর্ম্মেই অজস্র অর্থব্যয় করিতেন, এমন নহে। তাঁহারা মাঝে মাঝে দুই একটি সর্ব্বজনহিতকর ও যথার্থ যশস্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অতুল কীর্ত্তিও রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এই অংশে যাহা করিয়া-

ছেন, তাহা পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে, কোনও কালে কল্পিত বা অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই শ্রেণীর একটি বৃহৎ অনুষ্ঠানের কথা এই স্থানে উল্লেখ করিব। সে অনুষ্ঠান—"মরিস্ হ্রদ"।

হ্রদ বলিলে স্বভাবতঃই মানুষের কৃতিত্বের কথা আইসে না। নদী, হ্রদ ও সমুদ্র প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবেই প্রাকৃতিক জলাশয়। কিন্তু 'মরিস্' হ্রদ হইলেও, প্রাকৃতিক পদার্থ নহে,—মানুষের খনিত। মনুষ্যকৃত বটে, কিন্তু ইহা আয়তনে একটি ছোট-খাট সমুদ্র বিশেষ! এই হেতুই পুষ্করিণী, বাপী বা দীর্ঘিকা ইত্যাদি নামে ইহার নামকরণ হয় নাই,—ইহা একবারে হ্রদ নামে সংবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার পরিধির পরিমাণ প্রায় পাঁচ শত চল্লিশ মাইল, এবং গভীরতা দুইশত হাত। এত বড় জলাশয় পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে খনিত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

নীল নদ মিশরের সর্ব্বস্ব। ধন বল, সম্পদ্ বল, শক্তি বল, মিশরের গৌরব করিবার উপলক্ষ যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তেরই মূল নিদান, এই নীল নদের বার্ষিক প্লাবন। প্লাবনে উর্ব্বর পলল প্রবাহিত ও ভূমি শস্যশালিনী হয়। কৃষি-সর্ব্বস্ব মিশরের ভাণ্ডারে এইরূপে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ঘটে। মিশরে বৃষ্টি প্রায়শঃ হয় না। মিশরের কোন কোন স্থানে বৃষ্টি একটা অত্যদ্ভুত নৈসর্গিক ঘটনারূপে গণ্য ছিল। বৃষ্টি হয় না, কিন্তু বর্ষার প্লাবন খুবই হইয়া থাকে। মিশরের দক্ষিণস্থিত ইথিওপিয়া বা আবেসেনিয়ার পর্ব্বতে বর্ষা সমাগমে মুষলধারায় অজস্র বারিবর্ষণ হয়। সেই জল-নির্গমের একমাত্র উপায় নীল নদ। বৃষ্টির জলরাশি নীলনদের পথে বাহিত হইয়া, মিশর প্লাবিত করিয়া চলিয়া যায়। প্লাবন বেসী হইলে অনিষ্ট—কম হইলেও সর্ব্বনাশ। বেসী

হইলে, সমস্ত বিধৌত—কম হইলে, দেশের শস্য প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে ভস্মীভূত হয়। রাজা মরিস্ এবিষয়ে প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া, দেশের জন্য উৎকণ্ঠিত হন এবং স্বভাবকে শিল্পের শাসনে আনিয়া, ইহার কোনরূপ স্থায়ী প্রতিবিধান হইতে পারে ক না, তাহাই চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। শক্তিমান নৃপতির সেই চিন্তার ফল,—এই হ্রদ।

মরিস্ হ্রদ মধ্যমিশরে। হ্রদের মধ্যস্থলে বিরাট-বপু দু'টি পিরামিড্। পিরামিডের প্রত্যেক পার্শ্বে এক একটা পর্ব্বতোপম প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রস্তর-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। পিরামিডের উচ্চতা জলের উপরে দুই শত হস্ত, জলের নিম্নেও উহার দৈর্ঘ্য প্রায় ঐ পরিমাণ। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, হ্রদ জলপূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পিরামিড্ গঠিত হইয়াছিল। বার মাইল দীর্ঘ ও পঁচিশ হাত প্রস্থ একটি খাল দ্বারা ঐ হ্রদ নীল নদের সহিত সংযোজিত আছে। এই খালের পথেই নীল নদের প্লাবন-প্রবাহ হ্রদটিকে জলপূর্ণ করিয়াছিল। এই খালের মধ্যে বিচিত্র কৌশলে দু'টি পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করিয়া, দুইটা কৌশলময় কবাট দ্বারা উহার মুখ নিরুদ্ধ রাখা হইয়াছে। কবাট দ্বয়ের একটি খুলিয়া দিলে, সেই পথে হ্রদের জল বহির্গত হইয়া, অসংখ্য খালের যোগে সমগ্র মিশর দেশকে প্লাবিত করিয়া ফেলে। আবার অন্যটি খুলিয়া দিলে, নীল নদের প্লাবন, সেই পথে বেগে হ্রদে প্রবেশ করিয়া, হ্রদটিকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে। যে বৎসর নীলনদের বার্ষিক প্লাবন এত কম হয় যে, জলাভাবে দেশে অজন্মা বা দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ঘটে, সে বৎসর উহার একটি দ্বার অর্থাৎ বহির্গমন পথটি উদ্ঘাটন করিয়া, হ্রদের জল বাহির করিয়া আনিয়া, প্লাবনের অভাব পূর্ণ করিয়া লওয়া হয়। আবার যে বৎসর প্লাবন অত্যধিক ঘটে, সে বৎসর অন্য দ্বার

অর্থাৎ প্রবেশ-পথের কবাট খুলিয়া, প্লাবনের অতিরিক্ত জলরাশি অনায়াসে হ্রদের ভিতরে টানিয়া লওয়া যায়। যে বৎসর প্লাবনের জল মাপ মত ঠিক হয়, সে বৎসর উভয় দরোজাই বন্ধ থাকে।

এই দ্বারাবরোধ ও দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্যে অবশ্যই অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইহা দ্বারা দেশের যে ব্যাপক উপকার সাধিত হইয়া থাকে, তাহার তুলনায় এই ব্যয় কিছুই নহে।

মিশর অতি প্রাচীন সময়ে উপর্য্যুপরি সাতবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে দৈব-প্রেরিত মহাপুরুষ যোজেফ্ তখন মিশরের রাজমন্ত্রী ও সর্ব্বময় কর্ত্তা। যোজেফ্ পূর্ব্বেই ফেরেওর স্বপ্ন ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, ভাবী দুর্ভিক্ষের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিণাম-দর্শিতায় পূর্ব্বেই বহুসংখ্যক গোলায়, সাত বৎসর কাল সমগ্র দেশকে অন্ন যোগান যায়, এই পরিমাণ শস্য সংগৃহীত হয়। সঞ্চিত-শস্য-ভাণ্ডারের আশ্রয়ে, সাত বৎসর ব্যাপী মহাবিপত্তিতে মিশরবাসী কোন প্রকারে প্রাণে বাঁচিয়া রহিয়াছিল। কিন্তু এই হ্রদ খনিত হইবার পরে, হ্রদের প্রসাদাৎ মিশর আর দুর্ভিক্ষের উপদ্রবে বিপন্ন হইতে পারে নাই। মরিস্ হ্রদের মৎস্যে মিশর-রাজকোষের বিস্তর আয় হইয়া থাকে। ধন্য রাজা মরিস্! ধন্য মিশর শিল্পীর আশ্চর্য্য শক্তি ও কৌশল!

রাজা মরিস্ অপরিমিত অর্থব্যয়ে এই হ্রদ খনন করিয়া, আপনার নামে উহার নামকরণ করেন। মরিস্ রাজার নামানুসারেই ইহার নাম—"মরিস্হ্রদ।" অনেক ঐতিহাসিক এই তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপনে অসমর্থ। তাঁহারা বলেন, এক রাজার যত্নে ও জীবনে এতবড় মহাব্যাপার সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর নহে। মিশর-রাজ এই পরিমাণ ভূমির মমতা ত্যাগ করিয়া একপ

খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন, কাহারও মতে ইহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। কেহ বলেন, এত মাটী খনন করিয়া মৃত্তিকার সেই পর্ব্বত-স্তূপ কোথায় রাখা হইল?—ইত্যাদি নানারূপ জল্পনা কল্পনার বলে কেহ অনুমান করেন, হ্রদ যখন খনিত হয়, তখন উহা আয়তনে এত বৃহৎ ছিল না। এক রাজার জীবনে ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকুক, আর না থাকুক, খনন সময়ে আয়তন এত বৃহৎ রহুক, আর না রহুক, ইহা যে মনুষ্যকৃত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বলিতে কি, রামরাজ্যে, রামের প্রাণে রাবণের কল্পনা ও শক্তির সংযোগ ঘটিলেই এরূপ ব্যাপার সম্ভবপর; আর ঐশ্বরীয় শিল্পীর অপার ও অতুল নৈপুণ্য ও কারু-কৌশলেরই ইহা সর্ব্বথা আয়ত্ত ও সাধ্য।

ক্রমশঃ।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু।

ইটালীর প্রাচীন কবি পেট্রার্ক।

অনেকেই হয়ত ইটালীর সুবিখ্যাত প্রাচীন কবি পেট্রার্কের (Petrarch) নাম শুনিয়াছেন। এই প্রাচীন কবির জীবনী অতীব বিচিত্র। অতএব পাঠকপাঠিকাগণের অবগতির জন্য আমরা সেই মহজ্জীবনের কতিপয় কাহিনী নিম্নে বিবৃত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি।

পেট্রার্কের পূর্ণ নাম ফ্রেন্‌সেস্‌কো পেট্রার্কা (Francesco Petrarca)। ইটালীর প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসে যে চারিজন প্রধান কবির নামোল্লেখ আছে, পেট্রার্ক তাঁহাদের একজন মধ্যযুগে (Middle Ages) ইউরোপীয় সাহিত্যের লুপ্ত গরি-

মার পুনরুদ্ধারকর্তা বলিয়া, ইনি যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, এবং এমনকি, এখনও তজ্জন্য ইঁহার নাম আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে।

১৩০৪ খৃঃ অব্দের ২০শে জুলাই তারিখে এরেজো (Arezzo) নগরে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা—পেট্রেক্কো (Petracco) ফ্লোরেন্সের (Florence) রাজ-বিচারালয়ে কোন কার্য্য করিতেন; কিন্তু "কালা-সাদার" (The Blacks and the Whites) বিবাদের সময়, কবিবর ডেন্টির (Dante) পন্থাবলম্বন করায়, ইনি ফ্লোরেন্স হইতে বিতাড়িত ও যাবজ্জীবনের জন্য কারারুদ্ধ হন। ইনিও একজন কবি ছিলেন। ইনি "ডিভাইন্ কমিডি" (Divine Comedy) নামক একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। পেট্রার্কের পিতা সস্ত্রীক কারারুদ্ধ হন; তখন পেট্রার্কের জন্ম হয় নাই,—তিনি গর্ভে ছিলেন। কারাগারেই পেট্রার্কের জন্ম হয়। "নিয়তি কেন বাধ্যতে?"

পেট্রার্কের জন্মের পর তাঁহার পিতা মাতা কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্রকে লইয়া কারামুক্ত হন। পেট্রার্ক জন্মগ্রহণ না করিলে, তাঁহারা কারামুক্ত হইতে পারিতেন কি না সন্দেহস্থল। এই শিশুর দুঃখাপনোদনের জন্যই সহৃদয় কর্তৃপক্ষ সস্ত্রীক পেট্রেক্কোকে কারামুক্ত করেন। সে যাহাহউক, কারামুক্ত হইয়া, পেট্রার্কের জনক-জননী আর্ণো (Arno) নদীর তীরবর্ত্তী ইন্‌সিসা (Incisa) নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। উক্ত পল্লীতেই পেট্রার্কের শিশু-জীবনের সাতটি বৎসর কাটিয়া যায়। কবিগণ প্রকৃতির প্রিয়পুত্র; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-চিত্রণে তাঁহারা সিদ্ধহস্ত ও মুক্তহৃদয়। বিধাতার অচিন্ত্য বিধানে কবি পেট্রার্কেরও শৈশবকালের অনেকটা প্রকৃতিদেবীর লীলা-ক্ষেত্র পল্লীতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। পল্লীর মুক্তবায়ু ও

নৈসর্গিক শোভাসম্পদ কবি-হৃদয়ের কোমল স্তরে স্তরে যে বীজ বপন করিয়াছিল, তাহা তাঁহার ভাবী জীবনে অঙ্কুরিত ও পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইয়া, চারিদিক আমোদিত করিয়াছিল। ছেলে-বেলায় কবি যে সৌন্দর্য্য-মদিরা পান করিয়াছিলেন, সেই নেশার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ও পূর্ণ বিকাশ, তৎপ্রণীত পুস্তকাবলীর প্রতি পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে পূর্ণাবয়বে বিকাশমান্। ১৩১২ খৃঃ অব্দে পেট্রেক্কো পিসা (Pisa) নগরে চলিয়া যান; কিন্তু তথায় তাঁহার কাজ কর্ম্মের সুবিধা না হওয়ায়, ১৩১৪ খৃঃ অব্দে এভিংননে (Avingnon) বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লন। এতাদৃশ পল্লী-জীবন কবিবর পেট্রার্কের কল্পনা-শক্তির পূর্ণ-স্ফূরণে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

ইন্‌সিসা ও পিসায় অবস্থানের সময় তিনি তাঁহার মাতৃভাষা সম্যক্ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৩১৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৩১৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি মানব-চরিত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পাঠ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি পিতা মাতার "আদু'রে" ছেলে ছিলেন না। পিতার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, ছেলে উকীল হউক; এবং তদুদ্দেশ্যেই তাহাকে শিক্ষার জন্য মণ্টপিলার (Montpellier) নগরে পাঠান হয়। কিন্তু আইন-শিক্ষা পেট্রার্কের রুচির বহির্ভূত ছিল; ওকালতীকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।

১৩২৭ খৃঃ অব্দে পেট্রার্কের জীবনে একটি প্রধান ঘটনা ঘটে। এভিংননে অবস্থানকালে লোরা নাম্নী জনৈকা সুন্দরী যুবতী তাঁহার নয়নে রূপ-মদিরা ঢালিয়া দেয়। ইনি কে, এবং কি অবস্থায়ই পেট্রার্কের নয়নে নিপতিত হন, তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, এই সৌভাগ্যশালিনী রমণীর

পাইব। এক্ষণে আমরা এই প্রাচীন কবির সাহিত্যচর্চ্চার বিষয়ে কএকটি কথাই বলিতেছি।

পেট্রার্কের সাহিত্য-জীবন দুইটি বিশেষ বিষয়েই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে একটি প্রাচীন সাহিত্য হইতে সার-সংগ্রহ, এবং অপরটি তদীয় কবিতাবলীতে মানবীয় মনোবৃত্তি-নিচয়ের পূর্ণ স্ফূরণ বা বিকাশ। এই বিষয় দুইটি বিভিন্ন নহে—বরঞ্চ একাত্মক। এই প্রাচীন কবির গীতি-কবিতাগুলির ভাষা এতই প্রাঞ্জল এবং ভাব এতই গভীর যে, পড়িলেই মুগ্ধ হইতে হয়। কল্পনা যেন আজ্ঞাধীনা দাসীর ন্যায় তাঁহার অভীপ্সিত সামগ্রীসম্ভার যোগাইয়া দিয়াছিল। নৈসর্গিক দৃশ্য-বর্ণণে, মানব-চরিত্র-চিত্রণে, কোমল বচন-বিন্যাসে, গভীর ভাব-বিকাশে, ছন্দ-সৌন্দর্য্যে, ও রাগ-মাধুর্য্যে, এই কবির কবিতাগুলি কোন অংশেই হীন নহে, একথা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পেট্রার্ক জনৈকা সুন্দরীকে তাঁহার হৃদয়-নিহিত পবিত্র ভালবাসা দান করিয়াছিলেন; এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণও তদীয় কবিতায় পাওয়া যায়। জীবিতাবস্থায় সেই গুণবতী রমণীকে তিনি কল্পনার স্বর্ণ-সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিয়া গিয়াছেন। এমনও শুনা গিয়াছে যে, সেই সুন্দরী পেট্রার্কের নিকটে না থাকিলে, কল্পনাদেবী স্বর্গ হইতে সহসা নামিয়া আসিতেন না,—বীণার সেই পীযূষ-ঝঙ্কার থামিয়া যাইত! এমন কি, ঐ গুণবতীর মৃত্যুর পরেও, কবিবর পেট্রার্ক তদীয় অনেক কবিতায় সেই সুন্দরীর স্মৃতি-লেখা অমর-তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; সেই সুখ-স্মৃতি-সমন্বি বহুতর কবিতা, ঐ সুন্দরীর স্বর্গীয় নামে উৎসর্গীকৃত করিয়া,

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; বলিতে কি, ইনিই মানব-চরিত্রজ্ঞ ইটালীর প্রথম কবি ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। তৎকালের গীতি-কবিতায় ইহার কবিতাই উচ্চাসন পাইবার যোগ্য। তাঁহার সাহিত্য-জীবন সুদীর্ঘ ও সুখদ হইলেও, ইহা বড়ই বিপদ-সঙ্কুল ছিল। অনেকানেক বাধা-বিপত্তি তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

এভিংনে (Avingnon) তিনি বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন। পোপের অনুগত ভক্তদের মন্ত্রীসমাজকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। ইউরোপে এমন কোন স্থান ছিলনা, যেস্থানে তিনি পর্য্যটন করিয়াছিলেন না; ইউরোপীয় রাজন্য-বর্গের নিকট তিনি সর্ব্বদা পত্রাদি লিখিতেন, এবং তাঁহারাও প্রতিপত্র দানে কবিকে খুসী রাখিতেন। তাঁহার সময়ে তিনিই সর্ব্বপ্রধান সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার সম্মান ও সঙ্গতি উভয়ই ছিল; কিন্তু তথাপি তিনি অহর্নিশ অসুখ, অশান্তি ও অসন্তুষ্টিতে কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, তিনি নিজেও সুখী বা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, এবং অপরকেও সুখী বা সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন না।

লাটিন ভাষায় তিনি বহুতর পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে "ইপিষ্টোলি" (Epistolæ) এবং "এফ্রিকা" (Africa) নামক কাব্য গ্রন্থই উল্লেখযোগ্য। তিনিই সর্ব্বপ্রথম এক নূতন ধরণের ভাষা-বিন্যাসের (Style) প্রবর্ত্তন করেন, এবং প্রাচীন লাটিন গ্রন্থকারদের লুপ্ত গুণ-গরিমার পুনরুদ্ধারে যত্নবান্ হন। পেট্রার্কের সাহিত্য-জীবন, গুণপণা, মানসিক বৃত্তিনিচয়ের প্রকৃত স্ফুরণ ও তৎসাময়িক ইতিবৃত্ত, যদি কেহ জানিতে অভিলাষী হন, তবে আমরা তাঁহাকে পেট্রার্ককৃত "এপিষ্টোলি" (Epistolæ) নামক গ্রন্থ পাঠ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি।

উহা পাঠ করিলে, ইটালীর এই প্রাচীন কবির সম্বন্ধে বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন।

"এফ্রিকা" (Africa) যদিও "স্কিপিও" (Scipio) অবরোধ সম্বন্ধীয় একখানি সুদীর্ঘ কাব্য, তথাপি ইহার স্থানে স্থানে প্রথিতনামা কবির প্রতিভার প্রকৃত স্ফূরণ দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। পেট্রার্ক একজন ভৌগোলিকও ছিলেন; তাঁহার কতিপয় পুস্তকে এবিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। দেশ-পর্য্যটনই যে, তাঁহার ভৌগোলিক জ্ঞানের একমাত্র মূলসূত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পেট্রার্ক যেসুন্দরীকে ভাল বাসিতেন, তিনি কে তাহা কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। তবে কোন কোন কারণে ধরিয়া লওয়া যায় যে, লুরা ডি নভিস্ (Laura De Noves) নাম্নী কোন সুন্দরী যুবতী পেট্রার্কের কবিতার সৌন্দর্য্যের রাণী (Queen of beauty) ছিলেন। লুরা ইউগো ডি সেডির (Ugo De Sade) বিবাহিতা পত্নী ছিলেন। কিরূপে—কি ভাবে এই সুন্দরী পেট্রার্কের কল্পনা-কাননের নিভৃত-নিকুঞ্জে ভাল-বাসার পবিত্র আসনের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে শুধু এইটুকু জানা যায় যে, ঐ যুবতী এভিংননেই বাস করিতেন।

"কেন্‌জোনিয়ার" (Canzoniere) কবিবর পেট্রার্কের একখানি কবিতা-পুস্তক; উহা তিনটি অধ্যায়ে বা সর্গে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়টি লুরার (Laura) জীবিতাবস্থায়ই লিখিত হয়,—দ্বিতীয় অধ্যায়টি লুরার মৃত্যুর পর লিখিত হয়; এবং তৃতীয় অধ্যায়টির নাম—"ট্রিনফি" (Trinofi)। ইহার প্রত্যেকটি কবিতার ভিতরেই যেন পবিত্র ভালবাসার একটি অন্তঃসলিলা ফল্গু নদী বহিয়া যাইতেছে! যদিও প্রত্যেকটি কবিতার মূলেই

ভালবাসা নিহিত রহিয়াছে, তথাপি বিষয়-নির্ব্বাচনে, বচন-বিন্যাসে, ভাব-বিকাশে, চরিত্র-চিত্রণে, স্বভাব-বর্ণণে, কল্পনা-মাধুর্য্যে, ভাষা-চাতুর্য্যে, ও নৈসর্গিক বিষয়বাহুল্যে, একটি অপরটি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্।

পেট্রার্কের ভালবাসা প্রকৃত ও গভীর। তাঁহার গীতি-কবিতার ইহাই বিশেষত্ব এবং উহাই ভাব-বিকাশের সম্পূর্ণ অনুকূলে রহিয়াছে। ইটালীর অন্যান্য কবির—এমন কি, ডেন্টির (Dante) গীতি-কবিতা হইতেও পেট্রার্কের কবিতাগুলি সম্পূর্ণ-রূপে বিভিন্ন। তাঁহার কবিতার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে কি যেন একটুকু অজ্ঞাত মাধুরী লাগিয়াই রহিয়াছে। পেট্রার্ক একজন স্বভাব-কবি ছিলেন; তিনি মানবের মনঃসরোবরে সম্যক ডুবিয়া, তথায় কোথায় কি রহিয়াছে, ডুবুরীর ন্যায় তদ্বিষয়ের প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন; এবং কিরূপে তৎসমুদায় অপ্রত্যক্ষ বিষয়াদি ললিত-বচন-বিন্যাস দ্বারা লোক-লোচনের গোচরীভূত হইতে পারে, সেই কৌশলটুকু তিনি সবিশেষ অবগত ছিলেন।

সম্পদে, বিপদে, ভয়ে, নির্ভয়ে, সন্দেহে, নিঃসন্দেহে, আশায়, নিরাশায়, সুখে, দুঃখে, সকল অবস্থায়ই পেট্রার্কের কবিতা লিখিবার উপকরণ মিলিত;—অর্থাৎ সকল অবস্থায়ই তিনি কল্পনাকে টানিয়া আনিতে সক্ষম ছিলেন। কল্পনাদেবী যেন আজ্ঞাধীন দাসীর ন্যায় তাঁহার অনুগতা ছিলেন। "কেন্‌জোনিয়ারের" (Canzonier) দ্বিতীয় অধ্যায়টি বড়ই চিত্ত-বিনোদক ও পবিত্র ভাবের ভাণ্ডার বিশেষ। কিন্তু "ট্রিনফি" (Trinofi) অধ্যায়টি পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়দ্বয় হইতে বহু নিম্নে পড়িয়া গিয়াছে। শত চেষ্টা করিয়াও যেন কবি এখানে উদ্দাম কল্পনাকে বশে আনিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং স্থানে স্থানে দোষবাহুল্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত পেট্রার্ক বহুতর চতুর্দ্দশপদী কবিতাও (Sonnet) লিখিয়া গিয়াছেন। সেক্ষপীয়র, মিলটন্, কাউপার প্রভৃতি অনেকেই চতুর্দ্দশপদী কবিতা (Sonnet) লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু পেট্রার্কের চতুর্দ্দশপদী কবিতাই (Sonnet) সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে। কাহার চতুর্দ্দশপদী কবিতা (Sonnet) ভাল,—কাহার ভাল নয়, এবিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন আমাদের নাই। তবে সুকৃতী সমালোচকগণের সকলই একবাক্যে বলিয়া থাকেন,—"পেট্রার্কের চতুর্দ্দশপদী কবিতাই (Sonnet) শীর্ষস্থানীয়।" মার্ক পেটিসন্ একস্থানে বলিয়াছেন,—"* * * * By blending octave with sestet Milton missed the very object and end of the Petrarchan scheme." মিঃ হল কেইন্ বলেন,—"* * * * Octave flow into sestet without break of music or thought."

শ্রীকামিনীকুমার দে রায়।

মলয়া।

১

ছেলেবেলা হইতেই আমার বন্ধুর সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। যৌবনেও এ নিয়মের বিশেষ কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। মোট কথা, লোকের সহিত মেশামেশি করিবার আগ্রহটা কোন কালেই আমার তেমন নাই। আমাদের একটু পৈতৃক ভূসম্পত্তি ছিল। অনেকেই জানেন, যাহাদের একটু ভূসম্পত্তি আছে, তাহাদের উদরান্নের জন্য পরের উমেদারী না করিতে হইলেও, সম্পত্তি-রক্ষার জন্য অনেক সাহেব-সুবা, হাকিম, পুলিশ প্রভৃতির

সুনজরে থাকিতে হয়। আমার এক বড় ভাই ছিলেন; তিনিই সংসারের যাবতীয় কার্য্য দেখিতেন। সুতরাং আমার নির্জ্জন-প্রিয়তা রক্ষা করার পথে অনেকটা সুবিধা ছিল। দু'টি ভাই এবং দু'টি বোন্ লইয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র সংসার। অভাব বিশেষ কিছুই ছিল না। যে সম্পত্তিটুকু ছিল, তাহাতেই স্বচ্ছ-ন্দতা অনুভব করিতাম। আমার মত অবস্থায় সংসারের চাপ না খাইয়া, বাড়ী বসিয়া থাকিলে, অনেকেরই একটা খেয়াল চাপে! আমিও যে সে বিষয়ে একবারে মুক্ত ছিলাম, তাহা নহে। বাল্যকাল হইতেই কাব্যশাস্ত্রের উপর বিশেষ ঝোঁক ছিল। কিন্তু পাসের তাড়নায় তখন পদ্যও কঠোর গদ্য হইয়া পড়িত! তখন কাব্যের সৌন্দর্য্য বোধ অপেক্ষা, প্রশ্নের উত্তর দিতেই সমধিক ব্যস্ত থাকিতাম। কাব্য সম্বন্ধে আমার যে একটা খেয়াল ছিল, তাহা যদিও অর্থকরী না হউক, তথাপি তত দূষ্য নয় বিবেচনায় আমার শুভানুধ্যায়িগণ আমাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে আমার স্নেহময় দাদাও এ বিষয়ে আমাকে কখনও কিছু বলিতেন না।

নেশাখোর, দলে বসিয়া নেশা না করিতে পারিলে, অসুখ বোধ করে। আমিও দুই একটি কাব্য-প্রিয় লোক খুঁজিয়া বেড়াইতাম। বলা বাহুল্য, আমার যে কয়টি বন্ধু ছিলেন, তাহাদের মধ্যে এবিষয়ে কাহারও রুচি ছিল না। অন্যান্য বিষয়ে তাহারা আমার "কাজের বেলায় প্রকৃত বন্ধু" হইলেও, এ বিষয়ে তাহারা আমার প্রতি একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া,—চুরুটের সবগুলি ধুঁয়া আমার মুখের দিকে ছাড়িয়া, উদাস প্রাণে বলিতেন,—"ওসব ক'রে কি হবে? কিসে দু'টো কড়ি আসে, তাই দেখুন। Silver tonic না থাক্‌লে সংসারে থাকা পোষায় না।" সময়ে সময়ে তাহাদের মুখ গরা-

মর্শের সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর শ্রী ধারণ করিত। আমিও তখন বন্ধু-জনোচিত চপলতা ক্ষণিকের তরে বিস্মৃত হইতাম, এবং সংসার-সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গমালা যেন অদূরে দেখা দিত!

লোকে বলে—"স্বভাব যায় ম'লে"। তাহাদের পরামর্শে আশায়, নিরাশায়, সংশয়ে ক্ষণিক দোলায়মান হইলেও, আমি পূর্ব্ববৎই রহিলাম। এই ভাবে আমার দিন কাটিতে লাগিল। ইহার মধ্যে হঠাৎ কোন কর্ম্মোপলক্ষে আমাকে কলিকাতা যাইতে হইল। কলিকাতায় আমার এক পরিচিত ছাত্রমেস্ ছিল। কলিকাতা গেলে, আমি সেই স্থানেই থাকিতাম। কলিকাতা পঁহুচিয়া দেখিলাম, আমার একটি পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু,—যিনি ঐ মেসে থাকিতেন; তিনি কি এক টেলিগ্রাম পাইয়া, বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। আমি ইহাতে একটু অসুবিধা বোধ করিলাম। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে আরও দুই তিনবার ঐ মেসে আসিয়া অবস্থান করায়, ঐ মেসের ছাত্রগণ আমার নিতান্ত অপরিচিত ছিলেন না। তাঁহারা আমাকে তথায় থাকিতে অনুরোধ করিলেন। আমিও "গতিরন্যথা" না দেখিয়া তথায়ই রহিলাম।

কার্য্যোপলক্ষে সপ্তাহকাল আমার কলিকাতায় থাকিতে হইল। আমার জন্য যে প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেটিতে আর একজন ছাত্র ছিলেন। তাহার নাম—সুরেশ বাবু। শ্রুতি-কটু শুনায় বলিয়াই তাহাকে "বাবু" বলিতেছি; নতুবা বাবুদের চিহ্নস্বরূপ বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার অনাবশ্যক লাঞ্ছনগুলি তাহার ভিতর কিছুই ছিল না। তাহার মস্তকের সম্মুখ ও পশ্চাৎ-ভাগে কেশের দৈর্ঘ্য ও পরিমাণ সমানই ছিল। অল্প বয়সে নাকের উপর কাঁচ, কিংবা মুখে চুরুটের আগুণ, এসব কিছুই ছিল না। সার্ট কোটও তিনি এমন পরিধান করিতেন না, যাহাতে আমার এই সংস্কারের বিরুদ্ধে কোন ভাব মনে আসিতে পারে।

শুইবার ইচ্ছা থাকিলে নাকি তাহা "বসা" দ্বারাই সূচিত হয়। এক ঘরে থাকিতাম, কাজেই সুরেশ বাবুর সহিতই আমার বেশী কথা বার্ত্তা হইত। ক্রমে একটু বিশেষ পরিচয় হইলে, আমি জানিতে পারিলাম, তিনিও একজন কাব্য-রসের রসিক। তবে তাহার ঐ রসের উচ্ছ্বাস কোন কর্ম্মে পরিলক্ষিত হয় নাই; ভিতরে ফল্গুর ন্যায় উহা কোন দিকে প্রবাহিত হইতেছিল কিনা, তাহা তিনিই জানেন। সমপ্রাণ-হৃদয় সহজেই বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়ে। তাহার সহিত আমার নানা পুস্তক সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা চলিত। তিন চার দিনের আলাপে তাহার সহিত একটু সখ্যতাও জন্মিয়াছিল। পাঁচ ছয় দিনের আলাপে, সখ্যতার বাঁধ ভাঙ্গিতে আমার একটু ভয় হইয়াছিল; তাহা না হইলে, কোন ছুটি উপলক্ষে তাহাকে আমাদের বাড়ী যাওয়ার জন্য অনুরোধ করার ইচ্ছা হইয়াছিল।

আমার কলিকাতার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। দুই এক দিনের মধ্যেই বাড়ী ফিরিতে হইবে। যাওয়ার দিন পূর্ব্বাহ্নেই সকল জিনিস পত্র খরিদ করিয়া বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিলাম। সন্ধ্যার সময় ট্রেণে চাপিতে হইবে। পাঁচটার সময় বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া, ঘোড়ার গাড়ী ডাকিতে পাঠাইলাম, এবং সুরেশ বাবুর সহিত দেখা করিবার জন্য দোতালার উপরে গেলাম। সুরেশ বাবু তখন ছাদে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তিনি সিঁড়ি হইতে ছাদের দূরতম কোণে থাকায়, এবং স্থানান্তরে তাহার মনোযোগ-দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায়, বোধ হয়, আমার পদশব্দ প্রথমে শুনিতে পান নাই। আমাকে ছাদের উপর হঠাৎ দেখিয়া, যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন! আমিও যেন একটু থতমত খাইলাম! ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সুরেশ বাবু যেদিকে চাহিয়াছিলেন, সেইদিকে স্বভাবতঃই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

দেখিলাম, বিদ্যুতের ন্যায় একটি বালিকা যেন ছাদের রেইলিং-এর নীচে সামুদ্রিক শুশুকের ন্যায় ডুবিয়া গেল! আমি এই দৃশ্য দেখিয়া, মুহূর্ত্তের জন্য অনন্যচিন্তা বিরহিত হইয়া, এই কথাই মনে ভাবিতে ছিলাম, এবং পরক্ষণেই সুরেশ বাবুকে কহিলাম,—"তবে এখন আসি; দয়া করিয়া মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখিবেন।" সুরেশ বাবুও আমাকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করিলেন। তিনি যে গ্রীষ্মাতিশয্য হেতুই ছাদে বেড়াইতেছেন, এই কথাগুলি রচনার মধ্যগত বন্ধনীস্থ পদের ন্যায় বিদায়-কালীন অভ্যর্থনার মধ্যেও পুনঃ পুনঃ বসাইয়া দিতেছিলেন!

আমি তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া নীচে আসিলাম। দেখিলাম, ঘোড়ার গাড়ী হাজির। রামলাল চাকর সব বাজে জিনিসের একটা গাঁঠুরী লইয়া, গাড়ীর উপরে গিয়া বসিল; আমিও বাসার অন্যান্য সকলের নিকট সংক্ষেপে বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ষ্টেশনের দিকে ছুটিল। তখন মনে নানা কথাই হইতেছিল। কিন্তু আজ সুরেশ বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইবার সময়, যে দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহাই বেসী করিয়া মনে উঠিতেছিল। ষ্টেশনের লোকের ভিঁড়ে টিকেট করার উপদ্রবে আমি আর কোন কথা ভাবিবার অবসর পাইলাম না। যখন নিশ্চিন্ত মনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম; তখন আবার সেই সুরেশ বাবুর কথা,—সেই অমেঘবাহিনী বিদ্যুল্লতা-সমা বালিকার কথা পুনঃ মনে হইতে লাগিল।

ট্রেণ ষ্টেসনের পর ষ্টেসন পার হইয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু আমার মন হইতে কিছুতেই সেকথা গেলনা, বরং চলিত ট্রেণের সুখলভ্য শীতল বায়ু-প্রবাহে আমার উদ্দাম কল্পনা বল্মীক-পিণ্ডকেও পর্ব্বত করিয়া গড়িতে ছিল! যথা-সময়ে বাড়ী আসিলাম। দাদা আমার প্রতীক্ষায় ছিলেন;

কলিকাতার কার্য্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে তাঁহার সহিত কিছু সময় কথাবার্ত্তা হইল।

২

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দাদা বৈষয়িক লোক। বিষয় সম্পত্তির সম্পর্কে তিনি স্থানীয় হাকিম, উকীল, ও মোক্তারগণের সহিত পরিচয় রাখিতে যত্ন নিতেন। আমিও যে একবারে অপরিচিত ছিলাম, তাহা নহে। স্থানীয় হাকিমদের মধ্যে রাম গোপাল বাবুর সহিত আমার বিশেষরূপ আলাপ পরিচয় ছিল। বয়সের অনেক বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও, তিনি আমাকে অনেক বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। আমিও তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহারে বড় সন্তুষ্ট ছিলাম। তাঁহার সহিত ক্রমশঃ এরূপ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল যে, বাড়ীর ছেলেমেয়েরা আমাদের অজ্ঞাতেই পরস্পরের বাড়ীতে আসা-যাওয়া করিত।

রামগোপাল বাবু যশোহরে মুন্সেফ্। তাঁহার বড় ভাই নবকুমার বাবু কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। নবকুমার বাবু যথাক্রমে তিনটি পুত্রের মুখ দেখিয়াও আজ নিঃসন্তান। ভগবান্ একে একে সেই পুত্র তিনটি হইতে নবকুমার বাবুকে বঞ্চিত করিয়াছেন। রামগোপাল বাবুর দু'টি মেয়ে এবং একটি পুত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা বিবাহিতা; দ্বিতীয়া কন্যা মলয়া অধিক সময়ই কলিকাতায় জ্যেঠার বাসায় থাকিয়া পড়িত। নবকুমার বাবুর স্ত্রীও দেবরের কন্যাটি লইয়া, পুত্র-শোকাতুর চিত্তকে শান্ত করিতে যত্ন করিতেন। বস্তুতঃ এই পুত্রহীনা রমণীর সন্তান-স্নেহ, এই একাদশবর্ষীয়া বালিকাকেই আশ্রয় করিয়া জীবিত ছিল। কোন বন্ধোপলক্ষে যখন মলয়া তাহার মাতার নিকট আসিত, তখন এই রমণী প্রতিপদে মলয়ার অভাব বোধ করিতেন।

একদিন রাম গোপাল বাবু আমাকে বলিলেন,—"দেখ সুরেন্! তোমাদের সহিত ত কত ছেলেরই আলাপ পরিচয় আছে,—মলয়ার একটা বিবাহের যোগাড় করিয়া দাও না।" মলয়ার বিবাহের বয়স হইয়াছে, আমার সে ধারণা ছিল না। কারন অনেক দিন আমি তাহাকে দেখি নাই। আমি বলিলাম,— "মলয়ার কি বিবাহের বয়স হয়েছে?"

রামগোপাল বাবু বলিলেন,—"মলয়া সামনের মাসে বারতে পড়িবে; বিশেষতঃ সুরবালার বিবাহে আমি যে গোলমালে পড়িয়াছিলাম, তাহাতে নিচিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা ভাল নহে; তুমি একটু চেষ্টা করিয়া দেখিও।"

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে আমি মলয়াকে দেখিয়াছি। মেয়েটি বড়ই সুন্দর। মলয়ার বিবাহের কথা তুলিতেই আমার সেই নব-পরিচিত বন্ধু সুরেশ বাবুর কথা কিজানি কেন মনে হইল। রামগোপাল বাবুকে বলিলাম,—"আপনার কথা আমার বিশেষ রূপ মনে থাকিবে; দেখা যা'ক্ মলয়ার বিবাহের কোন একটা সুবিধা করা যাইতে পারে কি না। মলয়া যেরূপ ভাল মেয়ে, যদি তাহার বিবাহ ভাল জায়গায় না হয়, তবে বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে"।

রামগোপাল বাবু বলিলেন,—"দেখ সুরেন্! আজ কাল মেয়ে বিবাহ দিতে কি লাগে, তা'ত জানই। শুধু চাকুরীর উপর ভরসা করিয়া, ভাল জায়গায় মেয়ে দেওয়া বড়ই কষ্টকর।" রাম-গোপাল বাবুকে আশ্বাস দিয়া, সেদিন বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

একদিন অপরাহ্নে দালানের বারান্দায় বসিয়া আছি, বেলা সম্ভবতঃ পাঁচটা বাজিয়া থাকিবে; আকাশ বেস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমি নিরুদ্বেগে বসিয়া আমার পোষা খরগোসটি যে তাহার ছানা দু'টি লইয়া খেলিতেছিল, তাহাই দেখিতে

ছিলাম। এমন সময় দাদা আসিয়া বলিলেন,—"তোর ত আবার কলিকাতায় যাইতে হয়; আজ কলিকাতার চিঠি পাইলাম"। আমি বলিলাম,—"কবে যাইব, বলুন"। দাদা বলিলেন,—"সুবিধা করিয়া, যত শীঘ্র কলিকাতা যাওয়া যায়, ততই ভাল"।

কলিকাতা যাওয়ার কথার সঙ্গে সঙ্গে রামগোপাল বাবুর কথাও মনে হইল। এবার কলিকাতা গেলে সুরেশ বাবুরও যে মতামত জানিতে পারিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখান হইতে পত্রে এ বিষয়ের কোন মিমাংসা করিতে পারিব, এ ভরসা হয় নাই বলিয়াই, সুরেশ বাবুর নিকট কোন পত্র লিখি নাই। মনে করিয়াছিলাম, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ বিষয়ে কথা হওয়াই ভাল।

আমি যথাসময়ে কলিকাতা পঁহুছিলাম। সুরেশ বাবু আমাকে পাইয়া বড়ই প্রীত হইলেন। এবার সুরেশ বাবুর অনেকটা পরিবর্ত্তন দেখিয়া, আমি বিস্মিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি তাহার সেই অসংযত কেশরাশির সুশ্রী সম্পাদনের জন্য ব্রাস লইয়া বিস্তর পরিশ্রম করিয়া থাকেন। বেশ-ভূষাও পূর্ব্বের মত আর এলো-মেলো নাই। এখন আর সার্টের গলার বোতাম বা হাতের স্লিপ লাগাইতে কখনও ভুল হয় না। সময় সময় রুমালে এসেন্সের গন্ধও পাওয়া যায়। যাহারা সুরেশ বাবুকে পূর্ব্বে দেখেন নাই, তাহারা সুরেশ বাবুর এই পোষাক-পরিচ্ছদে বিন্দুমাত্রও বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না। বরং সুরেশ বাবুর পূর্ব্বাবস্থাই বিস্ময়জনক ছিল। বিংশ শতাব্দীর একটি শিক্ষিত যুবা নেহাৎ পাড়াগেঁয়ে-গোছের হইয়া থাকিবে, ইহা কি কম আশ্চর্য্যের বিষয়! আমি যদিও এই "অকাল বসন্ত সমাগমের" কোনও কারণ বুঝিতে পারিলাম না, তবু এই পরিবর্ত্তনে আমি সুখী হইলাম।

কলিকাতা আসিয়াছি পর, যে কয় দিন নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলাম, সেই কয় দিন সুরেশ বাবুর সহিত বিশেষ কোন আলাপ করিবার অবসর হয় নাই। তবু আমি ইচ্ছা করিলে, তাহার বিবাহ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে পারিতাম। বিশেষতঃ সুরেশ বাবুর সহিত আমার যেরূপ মেশামেশি হইয়াছিল, তাহাতে একবারে আমার মনের কথা বলিয়া ফেলিতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু পাছে তিনি মনে করেন যে, আমার কোন অচল আত্মীয়-কন্যাকে তাহার সাহায্যে তড়াইবার বন্দোবস্ত করিতেছি, এই আশঙ্কায়ই আমি তাহাকে কোন কথা বলি নাই।

৩

প্রায় পনর দিন হয়, আমি কলিকাতা আসিয়াছি। দাদা যে কাজের ভার দিয়া আমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া ছিলেন, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। একদিন রাত্রে যখন সুরেশ বাবু আলোটি নিবাইয়া, শুইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন আমি সুরেশ বাবুকে বলিলাম,—"আপনার বিয়ের আমোদটা কবে করিব?" সুরেশ বাবু হাসিয়া বলিলেন,—"বেস ত, এখনই করুন; আমোদ প্রমোদে বাধা কি?" আমি বলিলাম,—"রাম না জন্মিতেই রামায়ণ গাইবার দরকার কি? আগে বিবাহ করুন, তবে আমোদ প্রমোদটা করিতে পারি।" হাস্য পরিহাসের পর, যখন আমি একটু ব্যগ্র হইয়াই সুরেশ বাবুকে বিবাহের কথা নিয়া ধরিলাম, তখন তিনি একটু গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন,—"ঠিক হ'য়ে না বসিয়া বিবাহ করাটা উচিত নয়। আর সংসারে সকলকেই বিবাহ করিতে হইবে, এমনও কোন কথা নাই।" বলিতে বলিতে আরও অনেক গভীর বিষয়ের অবতারণা করিলেন; পলিটিক্যাল ইকোনমি (Political Economy) লইয়া বহু কথাই বলিয়া ফেলিলেন। অগত্যা

আমি বিবাহের কথা বন্ধ করিতেই বাধ্য হইলাম। বিবাহের নামে সুরেশ বাবুকে বীতশ্রদ্ধ দেখিলেও, তাহার মধ্যে বৈরাগ্যের কোন লক্ষণই দেখিলাম না,—অথবা তিনি কোনরূপ স্বদেশ-প্রেমে আপনার সুখ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, তাহাও আমার মনে হইল না।

আমি একদিন সুরেশ বাবুকে বলিলাম,—"এবার বড় দিনের সময় অনুগ্রহ ক'রে আমাদের দিকে চলুন।" সুরেশ বাবু তাহাতে কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না; বরং কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতেই যেন তাহার অনিচ্ছা, এরূপ বোধ হইল। যাহা হউক, আমি অনেক বলাতে শেষে সুরেশ বাবু আমাদের দিকে যাইতে সম্মত হইলেন। তাহাকে আরও বলিলাম,—"আমাদের দেশে জনৈক পদস্থ ব্যক্তির একটি অতি সুন্দরী মেয়ে আছে; যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে তাহাকে দেখাইতে পারিব।" সুরেশ বাবু তাহাতে সেক্ষপীয়রের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বলিলেন,—"সুরেন্ বাবু! আপনি কি মনে করেন, প্রথম দৃষ্টিতেই একটা ভালবাসা হইয়া যাবে?" আমি বলিলাম,—"মেয়ে দেখুন, বা নাই দেখুন, কিন্তু এই বড় দিনের বন্ধে আমাদের বাড়ী যেতেই হবে; মেয়ে দেখাবার জন্য যে আমার বড় আগ্রহ, তা' নয়। এখানে আসিয়া আপনার উপর কত দৌরাত্ম্য করি, আপনাকে কি একবার আমাদের বাড়ীতে পাইতে ইচ্ছা করে না?" এবার সুরেশ বাবু প্রতিবাদ না করিয়া, বলিলেন,—"আচ্ছা, আপনাদের বাড়ী যাইব, তা'তে আর আপত্তি কি? বিবাহের কথা তুলিয়াছিলেন বলিয়াই, এত কথা কাটা-কাটি করিলাম"। আমি বলিলাম,—আচ্ছা, বিবাহের কথাটা ফিরাইয়াই নেওয়া গেল"।

বড় দিনের বন্ধে সুরেশ বাবুকে লইয়া বাড়ী আসিলাম।

কলিকাতার একঘেঁয়ে দৃশ্য দেখিবার পর এ স্থান-পরিবর্ত্তনে বোধহয় সুরেশ বাবু একটু তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলেন। তাহার মুখ-মণ্ডলে প্রফুল্লতার চিহ্ন বিদ্যমান থাকিলেও মাঝে মাঝে তাহাকে উম্মনস্ক হইয়া চিন্তা করিতে দেখিতাম। মনে করিতাম, ইহা কবি-প্রকৃতি,—সুতরাং বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

বন্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। মলয়ার বিবাহের কথা আমি একবারে ভুলিয়া যাই নাই। তবে সুরেশ বাবু বিবাহের নামে যেরূপ খড়্গাহস্ত ছিলেন, তাহাতে সুরেশ বাবুকে বিরক্ত করা সম্পূর্ণ নিরর্থক বলিয়াই মনে করিতেছিলাম। কলিকাতা হইতে আসিয়াছি পর, রামগোপাল বাবুর সহিত দেখা হইয়াছে; অন্যান্য কথা হইলেও বিবাহের সম্পর্কে কোন কথাই হয় নাই। আমার তহবিলে একটি মাত্র বর,—সেও আমার আয়ত্তাধীন নহে বলিয়া, আমি বিবাহের কথায় গা-ঢাকা দিয়া থাকিতেই ইচ্ছুক ছিলাম। রামগোপাল বাবু কখন বিবাহের কথা তুলিয়া বসেন, মনে মনে এও একটা চিন্তা ছিল।

একদিন বৈকালে সুরেশ বাবুকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে রামগোপাল বাবুর বাসার দিকে চলিলাম। বৈকালে সেদিন বেস একটু শীত অনুভব করিতেছিলাম। রামপুরী আওলান খানি বেস করিয়া গায় জড়াইয়া, একটি সিগারেট ধরাইয়া রওনা হইলাম। রামগোপাল বাবুর বাসায় আসিয়া দেখিলাম, তিনি তখনও কাছারী হইতে আসেন নাই। আমরা উভয়ে ফিরিয়া আসিব, এমন সময় মুন্সেফবাবুর ছোট ছেলে ঝুম্‌কা দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে ধরিয়া বলিল,—"তোমাকে যে'তে দেবো না।"

আমি বলিলাম,—"কেন, যেতে দেবে না? তোদের বাড়ী

কিছু খাবার আছে নাকি ?" ঝুমকা বলিল,—"না, যেতে দেব-দেবই না।" এই বলিয়াই "বাবলা-কাঁটার" ন্যায় আমার কাপড় ও আওলানে জড়াইয়া ধরিল। এমন সময় লালপাগড়ীওয়ালা ডাক-পীয়ন বাড়ীর গেট দিয়া প্রবেশ করিয়া, দালানের সম্মুখের আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া উচু গলায় ডাকিল,—"চিঠি আছে"। অমনি একটি বালিকা বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—"কৈ চিঠি দাও।" আমরা যে অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহা সে, বোধ হয়, লক্ষ্য করে নাই। ইত্যবসরে সুরেশ বাবুর উপর যেন একটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া হইয়া গেল! সুরেশ বাবু আপনা আপনি কি জানি কি বলিয়া উঠিতেছিলেন,—অমনি নিজকে সামলাইয়া বলিলেন,—"চলুন, একটু অপেক্ষা করি; মুন্সেফ বাবুর সঙ্গে দেখাটা করিয়াই যাওয়া যা'ক্।" সুরেশ বাবুর মনের মধ্যে যে একটা ফরাসী-রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, আমি তখন তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই! বিশেষতঃ আমারও ইচ্ছা ছিল, রামগোপাল বাবুর সহিত দেখাটা হয়। সুরেশ বাবুকেও তদ্বিষয়ে ইচ্ছুক দেখিয়া, বৈঠকখানায় গিয়া বসিলাম। মুন্সেফ বাবুর কয়টি ছেলে কয়টি মেয়ে ইত্যাদি অনেক সংবাদই সুরেশ বাবু আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

এমন সময়, মুন্সেফ বাবু বাসায় আসিলেন। আমার দিকে চাহিয়াই বলিলেন,—"সুরেন, কখন এলে ?" আমি বলিলাম,—"এদিকে বেড়াইতে আসিয়াছিলাম,—মনে করিলাম, আপনার সহিত দেখাটা করিয়াই যাই; সে জন্যই আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম।" রামগোপাল বাবু আমাদিগকে বসিতে বলিয়া, কাছারীর পোষাক ছাড়িবার জন্য বাড়ীর মধ্যে গেলেন। আমিও অবসর বুঝিয়া সিগারেটে আগুন ধরাইলাম। সিগারেটটা প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে, এমন সময় চটি জুতার শব্দে বুঝিতে পারিলাম,

রামগোপাল বাবু আসিতেছেন। ত্রস্তহস্তে সিগারেটের অবশিষ্টাংশটুকু বাহিরে নিক্ষেপ করিলাম এবং আওলান সঞ্চালনে পর্ব্বতাকৃতি ধূমপুঞ্জ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দিলাম। রামগোপাল বাবু আসিয়া বলিলেন,—"সুরেন, আজ একটু জল খাইয়া যাও।" জল-খাওয়া সম্বন্ধে অনেক প্রচলিত এবং অপ্রচলিত আপত্তি উত্থাপিত হইলেও রামগোপাল বাবু বলিলেন,—"তোমাদের বয়সে আমরা যেরূপ খাইতে পারিয়াছি, আজ কাল ত তার অর্দ্ধেকও তোমরা খাইতে পার না। সামান্য একটু খাওয়ার ব্যতিক্রমে অসুখ করিবে বলিয়া অস্থির হও।" সুরেশ বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আপনিও অনুগ্রহ করিয়া চলুন।" সুরেশ বাবু আমার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। রান্না ঘরে যাইয়া দেখিলাম, দু'টি থালা বিবিধ পিষ্টকে পরিপূর্ণ। খাইতে বসিলাম। বোঝার উপর বোঝা চাপিতে লাগিল। দুইটি মিষ্টান্ন পরিপূর্ণ পেয়ালা মলয়া আনিয়া আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গেল।

খাওয়ার পর আর বেসী গৌণ করিলাম না। রামগোপাল বাবুর নিকট বিদায় লইয়া, বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

৪

রাত্রে শুইবার সময় সুরেশ বাবুর সহিত অনেক আলাপ হইয়াছিল। খুব শীত পড়িয়াছে; সুতরাং বেস করিয়া লেপ লইয়া শয়ন করা গেল। ১০।১৫ মিনিট পর্য্যন্ত কাহারও মুখে কোন কথা নাই। যখন লেপের নীচে গরম বাঁধিল, তখন সুরেশ বাবুই প্রথমে বলিলেন,—"সুরেন বাবু! আপনি না আমার জন্য এখানে কার মেয়ে পছন্দ করিয়া ছিলেন? একবার দেখান না,—দেখা যা'ক, আপনার পছন্দ কেমন!" আমি বলিলাম,—"সে কথায় আর এখন প্রয়োজন কি? আপনি

ত আর এখন বিবাহ করিবেন না। আপনি কোন্ তিলোত্ত-মার আশায় জগৎসিংহ সাজিয়া বসিয়া আছেন, তার ঠিক কি! আপনি কলেজের ছেলে, হঠাৎ বিয়ে করাটা আপনার সাজে না; আপনাদের বিবাহে একটা কিছু রোমান্স (Romance) না থাক্‌লে কি ভাল দেখায়?" এই কথা বলিয়া আমি লেপখানা ভাল করিয়া গায় দিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। সুরেশ বাবু আবার আরম্ভ করিলেন,—"বলুন না সুরেন বাবু! আপনি কোথায় মেয়ে দেখিয়া ছিলেন"। আমি সুরেশ বাবুর কোন কথারই গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিলাম না। মনে হইল, তাহার ঘুম পায় নাই, তাই একটা জমকান-গোছের গল্প তুলিয়া, আমাকে সজাগ রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।—না, দেখিলাম, সুরেশ বাবুর আগ্রহ কিছুতেই কমিতেছে না। শেষে বলিলাম,—"আজ যে বাসা হইতে জল খাইয়া আসিয়াছেন, সেই বাসায়ই একটি মেয়ে আছে।" সুরেশ বাবু অধিকতর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মেয়েটির নাম?—লিখা-পড়া শিল্প-কাজ ইত্যাদি জানে কি?" প্রত্যুত্তরে আমি বলিলাম,—"মেয়েটির নাম মলয়া। কলিকাতা তাহার জ্যেঠার বাসায় থাকিয়া পড়ে; শিল্প-কার্য্য জানে কি না সে সব খবর আমি রাখি না। তবে আজ কালের মেয়েদের সকলেই যখন দুই একটা ছুঁচের ফোঁড় দিতে জানে, তখন যে মলয়া কিছু জানে না, আমার এমন বোধ হয় না।"

আমার কথা শুনিবা মাত্র সুরেশ বাবুর লজ্জার 'বেষ্টাইল' প্রাচীর শতধা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল! প্রাণের চির-পোষিত ভাবগুলি বিদ্রোহীর ন্যায় বাহির হইয়া পড়িল! সুরেশ বাবু বলিতে লাগিলেন,—"সুরেন্ বাবু! আজ আমি আপনাকে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস বলিব"। আমি অগত্যা

চক্ষু রগড়াইয়া উঠিয়া বসিলাম ; বলিলাম,—"বলুন"। তখন তিনি ধীরে ধীরে—কখন ভাব-গদ্‌-গদ্‌-কণ্ঠে,—কখন বিষাদ-ব্যঞ্জক স্বরে, কি করিয়া মলয়া তাহার মানস-সুন্দরী হইল, এবং এযাবৎ যে তিনি তাহার উদ্দেশেই প্রীতির পুষ্প-গুচ্ছ উপহার দিয়া আসিতেছিলেন, তাহার বিস্তৃত কাহিনী আমার নিকট বর্ণন করিলেন। সেদিনকার মলয়ার সহিত একটি জীবনের সুখ-দুঃখ কিরূপে অলক্ষিতে—অজানিতরূপে জড়িত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম। সুখ-দুঃখ-বিজড়িত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মলয়া কি আপনাকে চেনে ?" সুরেশ বাবু বলিলেন,—"হাঁ আমাকে সে বেস চেনে ; তবে তাহার সহিত আমার কখনও দুই একটি কথা ভিন্ন বিশেষ আলাপ হয় নাই। আমি যখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে (First Years Class) পড়ি, তখন আমি মলয়াদের বাসায় মাঝে মাঝে যাইতাম। আমার একটি ক্লাশ-ফ্রেণ্ড সেই বাসায় থাকিয়া পড়িতেন।"

আমি বলিলাম,—"আপনার ভুল হয় নাই ত ? এই মলয়াই যে আপনার সেই পরিচিতা, তাহা ত ঠিক ?"

"না, আমার ভুল হয় নাই,—আমার ভুল হইতে পারে না।"

"আপনার পরিচিত মেয়েটির নাম যে মলয়া, তা' জানেন ত ?"

সুরেশ বাবু বলিলেন,—"বেস জানি।"

পরদিন প্রাতে উঠিয়া, রামগোপাল বাবুর বাসায় গেলাম। মলয়ার বিবাহের কথা উত্থাপন করাতে তিনি বলিলেন,—"কৈ তুমি ত কোন সুবিধাই করিতে পারিলে না। আমিও কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

"কল্যকার ছেলেটিকে দেখিয়াছেন ? ছেলেটি পড়া-শুনায় খুব ভাল,—স্বভাবও বিশুদ্ধ ; তবে তার অবস্থা খুব ভাল নয়। যদি আপনাদের মত হয়, তবে এখানে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।"

"এখানে হ'লে ত ভালই হয়। অবস্থা তত ভাল নয়,—না-ই বা হ'ল; আর সবটা সমান কোথায় পাওয়া যাইবে? লেখা পড়া যখন জানে, তখন একটা উপায় হ'বেই। তুমি এখানেই চেষ্টা কর।"

রামগোপাল বাবু সুরেশবাবুর সম্বন্ধে আরও বহুকথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—"তুমি যাহা করিতে পার, দুই এক দিনের মধ্যেই তাহা আমাকে জানাইবে।" কিন্তু বর যে আপনা হইতেই গড়াইয়া তাঁহার বাসায় আসিতে পারে, তাহা আর রামগোপাল বাবুকে সেদিন বলিলাম না। বাসায় আসিয়া দেখিলাম, সুরেশ বাবু পিনাল-কোড্ (Penal code) পড়িতেছেন। আমাকে দেখিয়াই বহিখানা বন্ধ করিয়া রাখিলেন,—কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। সুরেশ বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলাম,—"মুন্সেফ বাবুর সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম, মলয়ার বিবাহ অন্যত্র ঠিক হইয়া গিয়াছে; সুতরাং আমার আর চেষ্টা করিবার কিছুই রহিল না।" সুরেশ বাবু ম্লান-মুখে বলিলেন,—"কোথায় জানি ঠিক হইল!"

"আমি অত জিজ্ঞাসা করি নাই। যখন জানিলাম, বিবাহ অন্যত্র ঠিক হইয়াছে, তখন আর এবিষয়ে কোন আলাপ করিতেই ইচ্ছা হইল না।"

সুরেশ বাবুকে আরও বলিলাম,—"সুরেশ বাবু! আপনি মন শান্ত করুন; মলয়ার চেয়ে যদি ভাল মেয়ে না আনিতে পারি, তবে আর আপনার সহিত বৃথা বন্ধুত্বের ভাণ করিব না।"

সুরেশ বাবু একটু ম্লান হাস্য করিলেন। তিনি বোধ হয় মনে করিলেন যে, আমি তাহার মানসিক যাতনার বিষয় অবগত হইলেও, মলয়ার প্রতি যে তাহার কিরূপ অচ্ছেদ্য প্রেম হইয়া রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

দেখিলাম, সুরেশ বাবু বড় বেসী রকম ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। বুঝিলাম, আর উপহাস করা সঙ্গত নহে। অতএব প্রকাশ্যে বলিলাম,—"সুরেশ বাবু! ক্ষমা করুন, এতক্ষণ আপনার সহিত উপহাস করিতেছিলাম ; আপনি ইচ্ছা করিলে বোধ হয়, আপনার চিরাকাঙ্ক্ষিত মলয়াকে পাইতে পারেন।"

সুরেশ বাবু হাসিয়া কহিলেন,—"আমিও আপনার কথায় একটু সন্দেহ করিতেছিলাম।"

"সুরেশ বাবু! এ বিবাহের কথা কিরূপে ঠিক হইবে?— আপনাদের কোন আত্মীয়কে সংবাদ দিয়া এখানে আনুন।"

"দয়া করিয়া আপনিই ঘটকের কাজটা করিয়া ফেলুন ; বাবার ইহাতে কোন আপত্তি হইবে না।"

"টাকা পয়সা দেনা-পানার কথা কি ভাবে ঠিক করিব, তা'ই ভাব্‌ছি!"

"সুরেন বাবু! একথা ঠিক জানিবেন, গরীব হইলেও, কোনকালে আত্ম-বিক্রয় করিব না। বিবাহ করিয়া বড়লোক হইব, এ আশা করি না। দেনা-পানা সম্বন্ধে আমাদের কোন কথাই নাই।"

যথাসময় মুন্সেফ বাবুকে এই (Unconditional surrender) আন্‌কণ্ডিসনাল ছাড়েণ্ডারের সংবাদটা দিলাম। রামগোপাল বাবু আমার পিঠে চাপড় দিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"তবে অবিলম্বে একটা দিন ঠিক করিয়া ফেল।"

৫

সুরেশ বাবু কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। আমিও মনে করিতেছিলাম, শীঘ্র তথায় যাইয়া একটা দিন ঠিক করিয়া আসিব। সুরেশ বাবুর পিতাকেও পত্র লিখা হইয়াছে।

আমি সকাল বেলা বেড়াইয়া আসিয়া দেখিলাম, আমার

টেবিলের উপর একখানা পত্র রহিয়াছে। উপরের লেখা দেখিয়াই বুঝিলাম, সুরেশ বাবুর পত্র। পত্র খুলিয়া পড়িয়া দেখিলাম, আমাকে অবিলম্বে কলিকাতা যাইতে লিখিয়াছেন। মনে মনে ভাবিলাম,—"আবার কি হইল!" যথাসময়ে কলিকাতা পঁহুছিলাম। সুরেশ বাবু আমাকে দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন; এবং বলিলেন,—"এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে!"

আমি বলিলাম,—"বলুন, আবার কি হইল?"

"কলিকাতার মহেশচন্দ্র ঘোষ নামে আমার এক জ্ঞাতি খুড়া আছেন; তিনি বাবাকে এক পত্র লিখিয়াছেন,—'সুরেশ এক খৃষ্টানের মেয়ে বিবাহ করিবার যোগাড় করিতেছে; মেয়ে স্কুলে পড়ে,—কাঁটা-চামচা ছাড়া খাইতে পারে না,—সর্ব্বদা গাউন পরিয়া থাকে। অতএব তুমি শীঘ্র এখানে আসিয়া, যাহা করিতে হয় করিবা।' বাবা এখানে আসিয়াছেন; তিনি-কিছুতেই এখানে বিবাহ হইতে দিবেন না।" দেখিলাম, সুরেশ বাবু বড় হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন!

সুরেশ বাবুর পিতা গোঁড়া হিন্দু। পুত্রের বিবাহ এক খৃষ্টান-কন্যার সহিত হইতেছে শুনিয়া, তিনি যে বিচলিত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, প্রকৃত কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিলে, এ বিবাহে তিনি কখনও অসম্মত হইবেন না।

সুরেশ বাবুর পিতা বাসায় ছিলেন না। কলিকাতা আসিলে তিনি কখনও পুত্রের বাসায় থাকিতেন না। তাহার বিশ্বাস ছিল, আজ-কালকার ছেলেদের "মেসে" পাউরুটি প্রভৃতি অনেক অচল পদার্থের অবাধ-গতি। সুতরাং তিনি পূর্ব্বোক্ত মহেশ ঘোষের বাসায়ই সময় সময় আসিয়া থাকিতেন।

বৈকালে সুরেশ বাবুকে লইয়া তাহার পিতার সহিত দেখা

করিতে গেলাম। সুরেশ বাবুই তাঁহার পিতার নিকট আমার পরিচয় দিলেন, এবং তাহার সহিত যে সখ্যতা জন্মিয়াছে, তাহারও উল্লেখ করিলেন।

বৃদ্ধ অশ্রু-পূর্ণ-নয়নে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,— "আপনারা অবশ্যই সুরেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; আপনারা সুরেশকে রক্ষা করুন,—যাহাতে এই "খৃষ্টানী" বিবাহ না হয়, দয়া করিয়া তাহাই করিয়া দিন"।

যেরূপ করুণ স্বরে বৃদ্ধ কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে আমার প্রাণে বড় আঘাত পড়িল। আমি বলিলাম,—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, খৃষ্টানী বিবাহ কিছুতেই হইতে দিব না। আপনার অমতে কোথাও বিবাহ হইবে না। আমাদের দেশে একটি সুন্দরী মেয়ে আছে। মেয়ের পিতা হিন্দু ধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্। আপনার যদি মত হয়, তবে সেখানে বিবাহ হইতে পারে"।

"সুরেশের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বিবাহ হউক, কিন্তু বিধর্ম্মীর মেয়ে বিবাহ করিলে, আমি আর দেশে ফিরিব না-ই।" আমি সুরেশ বাবুর পিতাকে বলিলাম,—"আপনি নিজে দেখিয়া সুরেশ বাবুর বিবাহ দিন। আমার সহিত অনুগ্রহ করিয়া আমাদের দেশে চলুন। যদি মেয়ে আপনার পছন্দ হয়, তবে সেখানেই বিবাহ হইবে। সেখানে বিবাহ করিতে সুরেশ বাবুরও মত আছে"। আমার কথা শুনিয়া সুরেশ বাবুর পিতা আনন্দিত হইলেন।

যথাসময়ে সুরেশ বাবুর পিতাকে লইয়া যশোহরে আসিলাম। রামগোপাল বাবু বিশেষ যত্ন সহকারে ভাবী বৈবাহিকের অভ্যর্থনা করিলেন। রামগোপাল বাবুর আচার-ব্যবহারে যদিও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইহাদের মধ্যে কোন খৃষ্টানী

স্তাব প্রবেশ করে নাই, তবু মেয়ে না দেখা পর্য্যন্ত তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। অনতিবিলম্বে দেহ-ভারে অবনতা প্রফুল্ল প্রভাত-কুসুমের ন্যায় একটি বালিকা লজ্জায় জড়-সর হইয়া আসিয়া তাঁহার পায় পড়িয়া প্রণাম করিল; তখন আর তাহার মনে আনন্দের সীমা রহিল না।

ইহার পর যথাসম্ভব সমারোহে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। সুরেশ বাবু ইহার পর সস্ত্রীক কলিকাতায়ই একখানি বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতেন। আমি ইহার পর কলিকাতায় যাইয়া যখনই সান্ধ্য-ভ্রমণে সুরেশ বাবুর সঙ্গে একত্র বাহির হইতাম,—এবং তাহার সেই পূর্ব্ব ছাত্র-নিবাসের নিকট দিয়া যাইতাম, তখনই সুরেশ বাবু অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ঐ বাসার ছাদের দিক দেখাইয়া, অধরে হাস্যরেখা মুদ্রিত করিয়া, বলিতেন,—"কিছু মনে পড়ে কি?—ঐ দেখুন।" কখনও বা শুধুই প্রাণের ভাব বাক্যের অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিত।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

প্রত্যক্ষ কবিত্ব।

কোকিলের কুহুরব, ভ্রমর-গুঞ্জন,
ঊনবিংশ শতাব্দীর পাপিয়া-ক্রন্দন;
চাঁদনীর মধুরাত্, মলয় সমীর,
দূর-শ্রুত উন্মাদন সুতান বাঁশীর;
কুসুমের মৃদুহাসি, লতিকার খেলা,
যমুনার কাল' জলে লহরীর লীলা;
নায়িকার রূপজ্যোতিঃ, নলিন-নয়ন,

বিদ্যুৎ-কটাক্ষ, কভু উদাস ঈক্ষণ ;
বিরহের হা-হুতাশ, প্রলাপ-কাহিনী,
বিরহান্তে নিশিদিন, প্রণয়ের বাণী ;
কথনো বক্তৃতা, কভু আত্ম-বিসর্জ্জন,
হীরক-অঙ্গুরী, কিম্বা গরল-লেহন ;
জলে ডু'বে, কিম্বা গলে ছুরি মেরে মরা,
অন্ধকার রজনীতে ঝম্ফ দিয়া পড়া
কারাগৃহ হ'তে,—সঙ্গে নায়ক সুন্দর ;
পালাবার কালে মূর্চ্ছা, শত্রুর ভিতর
প্রেমের উচ্ছ্বাসে ; এবে হিষ্টিরিয়া হায় !
লভিয়াছে সেই স্থল ; কথায়-কথায়
বিষম প্রতিজ্ঞা সব ছড়া-ছড়ি যায় ;
নিষ্কাম প্রেমের কথা, হাটে ঘাটে হায় !
শু'নে কাণ ঝালা-পালা ; ক্ষান্ত দাও তবে
একটানা নাঁকি-সুর,—প'চে গেছে এবে,
প্রেমের কাহিনী ; সাংসারিক জীব আমি,
পূর্ব্বেই ব'লেছি তোমা ; মিছে চট তুমি,
আমি বুঝি খাঁটি বুঝ,—যা' কেন বলনা,
নভেল কাব্যের তুমি করি' উপাসনা ;
সুস্বাদু ইলীশ—আর গাঢ় দুধ সহ
ফজ্‌লী আমের কাছে লাগেনাকো কেহ !

শ্রীঃ—

মাসিক সাহিত্য-সমালোচন।

বান্ধব—১৩১১ জ্যৈষ্ঠ। কিশোর গৌরাঙ্গ—তৃতীয়খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ। পূর্ব্ববৎ।

আদর্শ সংস্কারক দয়ানন্দ (৩—পাঠযোগ্য প্রবন্ধ। মাঝে মাঝে "কি আত্মাভিমান-শূন্যতা,"—"কি আত্ম-বিলোপ" ইত্যাদি দু'একটি সানুনাসিক সুরের লাঞ্ছন না থাকিলে, প্রবন্ধটি আরও উপাদেয় হইত। যাহাতে একঘেঁয়ে,—একগুঁয়ে,—বা একদেশ-দর্শি হইয়া না পড়ে, তদ্বিষয়ে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ-লেখকগণের সর্ব্বদাই দৃষ্টিরাখা উচিত।

জাপান সম্বন্ধে কএকটি কথা—(দ্বিতীয় প্রস্তাব) শ্রীরসিক-লাল গুপ্ত বি, এল। এবারও বিশেষত্ব কিছুই দেখিলাম না;—সেই পুনঃ পুনঃ শ্রুত কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। মাঝে মাঝে কতকগুলি অভ্রান্ত সত্যের উল্লেখ ক্রমশঃই একটু অসহ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। একই কথার পৌনঃপুনিক আবৃত্তিতে কাণ ঝালা-পালা হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্থলে একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি;—"ত্রিংশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানের যে অবস্থা ছিল, তাহার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে বোধ হয় যেন এক সম্পূর্ণ নূতন রাজ্যে উপনীত হওয়া গিয়াছে।" দু'একটি নূতন তথ্য থাকা একান্তই সঙ্গত।

সুন্দর (কবিতা)—শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। কবিতাটি না উদ্ধৃত করিয়া সমালোচনা করিলে, পাঠকের নিকট সমালোচন হয়ত অসমীচীন বোধ হইবে, এই বিবেচনায় আমরা কবিতাটি উঠাইতে বাধ্য হইলাম। কবিতাটি এই :—

"শিশুর বিমল হাসি প্রফুল্ল কুসুম রাশি
বিমল গগনে শশী বড়ই সুন্দর!

খুলিয়া রূপের ডালা হাসে তারকার মালা
স্বভাবের নবশোভা বড়ই সুন্দর !

"শারদ জোছনানিশি অযুত চন্দ্রমা হাসি
মৃদু নীর লহরীতে বড়ই সুন্দর !
জড়িত, লতার করে বসন্তের তরুবরে
নব পত্র পুষ্প শোভা বড়ই সুন্দর !

"শরতের শস্যাধরে নিশার তুষার নীরে
নবীন রবির বিম্ব বড়ই সুন্দর !
বসন্তের মন্দবায়ে প্রফুল্ল সৌরভ ল'য়ে
হৃদয়ের প্রফুল্লতা বড়ই সুন্দর !

"বরষার ভরা নদে মৃদু কুলুকুলু নাদে
মৃদুল তরঙ্গলীলা বড়ই সুন্দর !
ঊষার অমল গায়ে অরুণ আলোক ল'য়ে
নবীন রবির খেলা বড়ই সুন্দর !

"সুনীল আকাশ তলে নিবিড় জলদ কোলে
চপলার লোল'হাসি বড়ই সুন্দর !
প্রেমিকের প্রেমগীতি প্রণয়ীর প্রতিকৃতি
প্রণয়ের অভিমান বড়ই সুন্দর !

" পরের কারণে যার বহে সদা অশ্রুধার
বিশ্ব প্রেমিকের চিত্ত বড়ই সুন্দর !
ভাবের অঞ্জন মাখি যে দিকে ফিরাই আঁখি

লোলিত-চর্ম্ম, গলিত-দন্ত ঠাকুরদাদা কচি নাত্‌নীকে কোলে লইয়া, লালা-বিতাড়িত-দন্তহীন মাড়ী ও জিহ্বার সাহায্যে কফ-জড়িত-কণ্ঠে যদি এইরূপ স্নেহের ছড়া কাটিতেন, তাহা হইলে ইহা একবারেই দূষ্য হইত না ; কিন্তু কোন শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকায় ইহা স্থান পাইলে, উহা অসঙ্গত প্রশ্রয়ের চরম নিদর্শন বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। কবিতাটিতে আর কিছু থাকুক, আর না থাকুক, "মিল" যুটাইবার কৌশলটি "বড়ই সুন্দর" রূপে দেখান হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় "বড়ই সুন্দর" —"বড়ই সুন্দর" রূপসহজ ভেলা সংগ্রহ করিয়া, কবিতার "মিল" যুটানরূপ বিপদ-সমুদ্রে বিশেষ স্থূল-কৌশলে সহজে কূল পাইয়াছেন। কবিতাটিতে গ্রথিত সুন্দর পদার্থ নিচয় অনন্য-দৃষ্টি-সাধারণ বলিয়াই কি "বান্ধব" ইহা পত্রস্থ করিলেন ? কিন্তু তাহা হইলে, "ঘন দুধ দিয়ে, কলা দিয়ে, চিনি দিয়ে থৈ মাখিলে আমার মুখে যেমন লাগে, এমন আর কাহারও মুখে নয়"—এই প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা থাকে কৈ ?

পদার্থের অবনতি—শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এস্, সি। পাঠযোগ্য প্রবন্ধ। লেখক কিরূপে পদার্থের ক্রমে অবনতি হয়, তাহাই সংক্ষেপে দেখাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে এসব বিষয় সংক্ষেপে সারাটা ঠিক নয় ;—লেখকও সে কথা স্বীকার করেন।

পারস্য দেশীয় কবি হাফেজের প্রথম গজল—শ্রীহরিনাথ দেব, বি, এ (Cantab), এম্, এ, (Cal)। পারস্য দেশীয় কবি হাফেজ-রচিত গজলের বাঙ্গালায় এই পদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। মাতৃ-ভাষার সাহিত্য পরিপুষ্ট করিতে স্বাধীন রচনা যেমন আ[illegible] নানা ভাষা হইতে নানাবিধ রত্ন সংগৃহীত [illegible]দের সাহায্যে সাহিত্যের অঙ্গে গ্রথিত করাও [illegible] হরিনাথ বাবু

বহুভাষাবিদ্ বলিয়া বিদ্বৎ-সমাজে পরিচিত। পর-ভাষায় জ্ঞান না থাকিলে, মাতৃভাষায় উহার অনুবাদ অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় তিনি যে বঙ্গ-সাহিত্য-সেবায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে বঙ্গ-সাহিত্যের শুভই সূচনা করিতেছে। ইহা তাঁহার সাময়িক উচ্ছ্বাসে পর্য্যবসিত না হইয়া,—মাতৃ-ভাষার সাহিত্যের উপর দৃঢ় ও স্থায়ী অনুরাগে পরিণত হইতে দেখিলে, আমরা সুখী হইব।

অযোধ্যার মন্থরা—এবারের বান্ধবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। ভাষা, ভাব ও লিপিচাতুর্য্যে উহা অতি সুন্দর হইয়াছে। এমন প্রবন্ধ সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

সাহিত্য।—আষাঢ়, ১৩১১।—উপবেদ ও উপাঙ্গ—শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার। প্রবন্ধটিতে অসঙ্গত কিছুই দেখিলাম না; অন্নের উপর মন্দ হয় নাই।

মৃত্যুমুখে—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। একটি চলন-সই গল্প। আজ কালের গল্পে পদার্থ কিছু থাকুক, আর না থাকুক, মুন্সীয়ানা কথার বড় একটা অসদ্ভাব দেখা যায় না।

বারভূঁইয়া—শ্রীনিখিলনাথ রায় লিখিত ছোট একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।

বর্ষ-নারী—চলন-সই কবিতা।

নিবেদন—শ্রীমতী সরলাবালা সরকার। কবিতাটিতে লেখিকা ভগবৎ পাদপদ্মে প্রেম-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। কবিতাটি ভাবের অংশে প্রশংসনীয় বটে; কিন্তু ভাষাটি তত ভাল লাগিল না।

কর্ম্মবীর টাটা—শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। মহানুভব দেশহিতৈষী কর্ম্মবীর টাটার কথা কাহার না পাঠ্য? এরূপ মহাত্মার সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় পুণ্য-জীবনী সর্ব্বথা অনুকরণীয়। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

রোমিও জুলিয়েট্—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। কবিতাটিতে ঝঙ্কার আছে,—লালিত্য আছে,—ভাবেরও অসদ্ভাব নাই।

মেঘাসীনা—শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ। লালিত্য-পূর্ণ সরস শব্দ-ঝঙ্কারে আধো আলো আধো ছায়াময়ী বর্ষা-সম্পদ্ অতি সুন্দর-রূপে কবি-তুলিকায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; কবির লেখনী সার্থক।

সহযোগী সাহিত্য—সুন্দর; পাঠ-যোগ্য।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা—বেস চলিতেছে।

বঙ্গ দর্শন।—শ্রাবণ, ১৩১১। গুরুদক্ষিণা—বঙ্গদর্শন-সম্পাদক ৺ সতীশচন্দ্র রায় প্রণীত "গুরুদক্ষিণা" নামক পুস্তক খানির সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনায় একটু নূতনত্ব আছে; সেটুকু এই,—সমালোচক স্বর্গগত লেখকের ব্যক্তিগত সমালোচনা করিয়া, পরিশেষে কহিয়াছেন,—"গ্রন্থে যাহা আছে, গ্রন্থই তাহার পরিচয় দিবে; গ্রন্থের বাহিরে যাহা ছিল, তাহাই আমি বিবৃত করিলাম।"

সারসত্যের আলোচনা,—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্র বাবু যাবতীয় দর্শনের দুরূহ তত্ত্বগুলি চলিত কথা-বার্ত্তার সাহায্যে, সহজ প্রণালীতে শিশু-পরিপাচ্য তরল দুগ্ধের ন্যায় করিয়া, সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। এটা নূতন প্রয়াস বটে,—তবে তাঁহার এই প্রণালী তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে কতটা উপযোগী হইবে, তাহা বলা শক্ত।

ভারতীয় জ্ঞান-সাম্রাজ্য (যাপান সম্বন্ধে শেষ প্রস্তাব)—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। এবারের প্রস্তাব আমাদের নিকট অত্যন্ত উপাদেয় বোধ হইল। অক্ষয় বাবু এবার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধীর চিন্তাশীলতা ও লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। এই শ্রেণীর প্রবন্ধ, আমাদের ধ্রুববিশ্বাস, জাতি,

ভাষা ও সাহিত্যকে নিঃসন্দেহ উপকৃত করিবে। আমরা সকলকেই উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

গৌতমমুনি ও ন্যায়দর্শন,—শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ। একে ন্যায়দর্শন, তাহাতে আবার "বেদান্তবাগীশ" দেখিয়া আমাদের প্রথম মনে হইয়াছিল, ইহা পাঠ করিতে বুঝি দুই একটা দন্তের মায়া পরিত্যাগ করিতে হইবে! কিন্তু পড়িয়া দেখিলাম যে, প্রাঞ্জল ভাষায়, যথাসম্ভব সুখবোধ্যরূপে বেদান্তবাগীশ মহাশয় গৌতমমুনি ও ন্যায়দর্শন বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

পাগল—সাধারণের উপভোগ্য বলিতে পারি না! তবে ইহাতে যে রস আছে, তাহা স্বাদে বিশুদ্ধ—অতি সত্য ও তাহা মানুষকে জীবনের কোন না কোন মুহূর্ত্তে আকুলপ্রাণে মুখের ভাষার সাহায্যে, উহার আস্বাদন করিতে আকর্ষণ করিবে। লেখক অতি সাধারণ, অথচ সম্যকরূপে প্রকাশের অতীত ছায়ার ন্যায়—বাষ্পের ন্যায়, মানব-হৃদয়ের কতকগুলি অস্থির-ভাবকে ভাষার শৃঙ্খলে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক সম্পূর্ণ সফলকাম হইয়াছেন, এমন কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে চেষ্টাতেও লেখকের আত্মশক্তির উপর যথেষ্ট নির্ভরের ভাব ব্যক্ত হইতেছে।

নমস্কার (কবিতা)।—কথিত আছে, কোন স্থানে দধি-চিড়ার নিমন্ত্রণ উপলক্ষে, দধির পরিমাণ কম হইয়া পড়াতে, বাড়ীর কর্ত্তা অতি বিনীতভাবে গলবস্ত্র হইয়া, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে, আহারের আয়োজন সম্বন্ধে নানারূপ ত্রুটির উল্লেখ করিয়া, কর-যোড়ে বারংবার বিনয়ের ভাষা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন! তন্মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ একটু "মুখপোড়া" রকমের ছিলেন; তিনি সাহস করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"বিনয়েতে মন ভিজে, চিড়া ভিজে কৈ?" এই কবিতাটি সম্বন্ধেও আমাদের

সেইকথা। যদিও ইহা "নমস্কার" হউক, তথাপি উহা প্রাণহীন বলিয়া, গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

সাময়িক প্রসঙ্গ—বেস ভাল লাগিল; তবে স্নেহপদার্থ সিঞ্চনকারীদের নিকট কেমন লাগিবে বলিতে পারি না।

পুরুষ-সিংহ (কবিতা)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। বিজয় বাবু তাহার এই কবিতাটি "সখা ও সাথী", "মুকুল" কিম্বা যোগীন্দ্রনাথ সরকারের "খুকুমণির ছড়া"য় উঠাইয়া দিলেই পারিতেন। তিনি বঙ্গদর্শনের এ বিড়ম্বনা করিতে গেলেন কেন? বঙ্গদর্শন-সম্পাদক মহাশয় কি এমন করিয়াই "বঙ্গদর্শন" কে "হাস্যরসের খনি" করিতে চাহেন?

"আমি সে জানি" ও "বংশীধ্বনি" নামক দু'টি কবিতা মন্দ লাগিল না। দু'টি কবিতাই এক সূতায় গাঁথা।

"উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ।"

পরগাছা বা 'পেরেসাইট্'।

বর্ত্তমান যুগের সহরবাসী, বঙ্গীয় নব্য সভ্য সমাজের অনেকেই হয়ত, পরগাছা পদার্থটা কি, তাহা চিনিবেন না। তাঁহারা, সম্ভবতঃ, মূলগত অর্থ-উদ্ঘাটন-চেষ্টা কিংবা অভিধান-অন্বেষণ দ্বারা একটা অনুমান মাত্র করিয়া লইবেন; আসল জিনিসটি কেমন, ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না। কিন্তু, 'পেরেসাইট্' (parasite) বলিলে, আর কোন কথা থাকে না। কারণ, এটি ইংরেজী আখরে লেখা বিলাতী নাম। সাহেব-মেমেরা পরগাছাকে 'পেরেসাইট্' বলিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে, দেশী নাম অপেক্ষা বিলাতী নামেই, এখন এদেশে, অনেক জিনিসের গৌরব বাড়ে ও সহজে পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব সকল পাঠকের সহজবোধ্য করিবার নিমিত্তই, পরগাছার পশ্চাতে 'পেরেসাইট্' নাম যোজনা করা হইল।

চাঁদ' সওদাগর, দক্ষিণ পাটনে,—রাজা চন্দ্রধরের দেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার 'মধুকর ডিঙ্গায়' অন্যান্য পণ্য-জাতের সহিত এক-ভরা নারিকেল বোঝাই করা ছিল। দক্ষিণ পাটনের লোকে নারিকেল কি পদার্থ, তাহা জানিত না। রাজা চন্দ্রধর নারিকেলের স্বাদ পাইয়া একবারে আত্মহারাবৎ মোহিত হইয়া পড়িলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মিতা মহাশয়, নারিকেল প্রস্তুত হয় কিরূপে?—নারিকেল জিনিসটা কি?"

সওদাগর কহিলেন,—"গাছের ফল"। আবার প্রশ্ন হইল,—"সে গাছ কেমন?" চাঁদ' উত্তর করিলেন,—

"চিড়ল চিড়ল পাত তার লত বেয়ে যায় আগে,
যে যায় নারিকেল পাড়িতে তারে খায় বাঘে।"—

"মহারাজ, বড় কষ্ট করিয়া নারিকেল সংগ্রহ করিতে হয়। তথাপি দেখুন, মূল্য বেশী ধরা যায় নাই,—এক একটা নারিকেলের মূল্য উহার সমান ওজন কএক ভরি সোনা মাত্র।"

প্রবন্ধ লেখা চাঁদ' সওদাগরের বাণিজ্য নহে। বক্তব্য বিষয়ের যথার্থ তথ্য পাঠককে ভাল করিয়া বুঝানই উহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং নাম শুনিয়া যেন কোন পাঠককে গোলে পড়িতে না হয়, এই হেতুই, অদৃষ্টদোষে ও কালমাহাত্ম্যে এক্ষণ স্থানবিশেষে দুর্ব্বোধ (?) 'পরগাছার' সঙ্গে 'পেরেসাইটের' টিপ্পনী গাঁথিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করা হইয়াছে। নতুবা একার্থবোধক বিভিন্ন ভাষার দু'টি শব্দ একত্র বসাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

সামান্য কোন একটা বস্তুর নাম তুচ্ছ কথা,—অধুনা এ দেশের অনেক রীতি-নীতিও, বিদেশীর কাছে সার্টিফিকেট পাইলেই, আমাদিগের অধিকতর মনোমত হইয়া থাকে। ইউরোপের অগাষ্ট কোম্‌টি শ্রাদ্ধক্রিয়ার অনুরূপ কার্য্য করিলে,—আমাদিগের দেশীয় অনেক ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকের শ্রাদ্ধ বিষয়টা কি, তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ ও অবসর হইল। মোক্ষমুলার বলিলেন, —"সংস্কৃত ভাষার ভিতরে পদার্থ আছে।" আমাদিগের ভিতরেও, সেই অবধি, অনেকে সংস্কৃতকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল, আমাদিগের সভ্যতাটা নিরবচ্ছিন্ন কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অতএব গ্রাহ্য করিবার অযোগ্য,—ইউরোপীয় সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা। এক্ষণ, ইউরোপের বিজ্ঞ

ও প্রাচীন সমাজনেতারা বলিতেছেন,—"ইউরোপের সভ্যতা কেবল মানুষ-মারা কল মাত্র"! আমরাও, সুতরাং, চক্ষু উন্মীলন করিয়া, তাঁহাদিগের কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব, বাঙ্গালার নিরেট 'নেটিভ' 'পরগাছাও', আজি, নিজ গুণে না হউক, বিদেশীর গ্রাহ্য 'পেরেসাইট্' নামের মাহাত্ম্যেই, তরিয়া যাইবে বলিয়া আশা করি।

পরগাছা লতাজাতীয় বস্তু। কিন্তু লতা আর পরগাছা এক কথা নহে। বন-শোভিনী লতা বন-তরুর অঙ্গ-অলঙ্কার বা গলার হার,—আর বনবাহার পরগাছা উহার গলগ্রহ বা গল-ফাঁস। লতা, কৃশ-তনু ও ক্ষীণদেহা হইলেও, জননী জন্ম-ভূমির ক্রোড়ে আত্মনির্ভরে দণ্ডায়মান হয়, এবং বিনয়ে নুইয়া,—যেন সরমে ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া, প্রেমাকুলা-অবলা র ন্যায়, ধীরে ধীরে কর প্রসারিয়া, প্রাণের আশ্রয় বা অবলম্ব তরুর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া রহে। সে পেলব পল্লব ও প্রস্ফুট ফুলের মধুর হাসিতে আপনি হাসিয়া, তরুকেও হাস্যময় করিয়া তু লে, এবং মলয়ের আদরে হেলিয়া দুলিয়া, ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত রহিয়া, আপনার ভাবে আপনি ভাবুকের নয়ন-মন আকর্ষণ করে। কিন্তু পরগাছার সহিত ভূরূপিণী জননীর কোন সম্পর্ক নাই। সে প্রাণান্তেও ভূমির রস আকর্ষণ দ্বারা আত্মনির্ভরে জীবন যাপনার্থ কষ্ট স্বীকারে প্রস্তুত নহে। পরগাছা কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া, অনিচ্ছুক তরুর তনু যুড়িয়া বইসে। তাহারা প্রায়শঃই বৃহৎ ও পুরাতন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া জন্মে, এবং ঐ বৃক্ষকাণ্ডের রস আকর্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করে।

পরগাছা বহু প্রকারের। কিন্তু পুষ্পের গঠন-বৈচিত্র্য, সুগন্ধি, ও বর্ণ ইত্যাদি বিষয়ে বিচার করিয়া, তাহাদিগকে, প্রধানতঃ ভাল ও ভালবাসিবার অযোগ্য, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা

যাইতে পারে। অর্কিড্স্, 'পেরেসাইট' বা 'পরগাছা' হইলেও, এই ভাল শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। অর্কিড্সের ফুল পুষ্পজগতে, সাহেব ও বিবিদিগের নিকট, উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহারা অর্কিড্সকে যথেষ্ট ভালবাসেন ও সম্মান করেন। যে শ্রেণীর পরগাছা ভাল, সেগুলিকে অতীব যত্নের সহিত, হরিৎকুঞ্জে (Green house) অথবা অর্কিড্স হাউসে (Orchid house) অর্কিড্স্-প্রেমিকদিগের নিত্য নয়নরঞ্জন মানসে রাখিয়া দেওয়া হয়। উহাদিগকে হৃষ্ট, পুষ্ট ও বর্দ্ধিষ্ণু রাখিবার জন্য অশেষ পরিশ্রম ও যত্নের প্রয়োজন ঘটে। কিন্তু যেগুলি শোভাশূন্য ও অকর্ম্মণ্য, সেগুলি, বিনা যত্নেই, মালিকবিহীন অথবা মুদ্রিতনেত্র মালিকের মূল্যবান্ বৃক্ষের সার শোষণ করিয়া, আপনা-আপনি বাড়িতে থাকে, এবং অল্পকালের মধ্যেই বিস্তৃত কলেবরে বহু স্থান আবরিয়া লয়। ঈদৃশ পরগাছা, যে সুস্বাদু ফলবান্ বৃক্ষের উপর 'সওয়ার' হয়, দু'দিনেই উহার ফল-পরিমাণ দশ-আনি ছয়-আনি কমিয়া যায়। এই শ্রেণীর পরগাছা কিছুতেই সহজে মরিতে চাহে না। নানা দিকের প্রবল ঝড়-ঝট্কায়ও ইহাদিগের কিছু হয় না ;—ঝড়ের তালে তালে মাথা নাড়িয়া, আপনারা মূলে স্থির থাকিয়া যায়। উপাদেয় ফলের গাছেই এই সকলের উপদ্রব একটু বেশী। পরগাছা আমগাছকে জড়াইয়া ধরিয়া, অচিরেই উহাকে একবারে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলে।

উদ্ভিদের ন্যায় মনুষ্য-সমাজেও পরগাছা আছে। পর-বল-শোষী প্রাণঘাতী রিপু, যেমন উদ্ভিদ-জগতে অকর্ম্মণ্য পরগাছা,—মানব-জগতের রিপু-পরগাছাগুলিও তেমনই পর-বল-পুষ্ট, পরগলগ্রহ, কর্ম্মনাশা, অলস ও মানুষের মধ্যে ওছা।

সত্যের অনুরোধে ইহা বলা আবশ্যক যে, মানবীয় পরগাছার মধ্যেও, ভাল ও মন্দ, সহনীয় ও অসহনীয় ভেদে বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ

আছে। ভালগুলি, সময় সময়, আশ্রয়-স্থানের শোভা বৃদ্ধি করে, অধিক স্থান যুড়িয়া বসিতে সঙ্কুচিত হয়, সুতরাং কোন অংশেও মারাত্মক বা হানিজনক হইতে পারে না; অবস্থা বিশেষে, বরং উপকারেই লাগিয়া থাকে। কিন্তু যে গুলি চিহ্নিত মন্দ, স্বভাবতঃ অনিষ্টকর, সে গুলির কথা স্বতন্ত্র। সেগুলি কেবলই স্বাধিকার বিস্তার দ্বারা সমস্ত কবলিত করিয়া লইতে চাহে, এবং আপনার অসার, অকর্ম্মণ্য ও কদর্য্য দেহের পুষ্টি সাধনে নিরত রহে। সেগুলি এমনই অদূরদর্শী, মোহান্ধ ও খল-প্রকৃতির যে, তাহাদিগের আশ্রয়-তরুটিকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া, আপনাদিগের পরিণামটাও যে অন্ধকারময় করিয়া তুলে, ইহাও তাহারা বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না।

উদ্ভিদ-পরগাছা যেমন বড় বড় গাছের,—মানুষ-পরগাছাও তেমন বড় বড় ধনী মানুষের অঙ্গলগ্ন উপাঙ্গ বা শোণিতশোষী টিউমার (Tumour)। একদিকে ফলবান্, অন্যদিকে ধনবান্,—এই দুই-দিকেই ঐ দ্বিবিধ পরগাছার লক্ষ্য। সুমিষ্ট ফলবান্ আমগাছের উপর উদ্ভিদ পরগাছার আকর্ষণ যেমন প্রবল, মানবরূপী পরগাছারও তেমন ধনবানের উপরেই মমতার টানটা একটুকু বেসী কড়া। কিন্তু, সাধারণতঃ পরগাছার স্বভাব এরূপ হইলেও, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায়, পরগাছার লাঞ্ছন, জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই সম্ভবপর।

ধর্ম্ম-জীবন, সত্যপরায়ণ, ঈশ্বর-নিষ্ঠ ধার্ম্মিক, ভক্ত, সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, দণ্ড-কমণ্ডলু-করে, লোকালয় হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন, তথাপি পরগাছা তাঁহার পিছ ছাড়িতে চাহে না! ভক্তের পরগাছা—ভাক্ত। ভক্ত, জীবের উদ্ধার কামনায়, তাঁহার অশ্রুগঙ্গাজলে ধোয়া মধুর হরিকথায়, প্রাণের

মুখ হইতে বৈরাগ্যের কথা কাড়িয়া আনিয়া, তাঁহার প্রাণের ভাব-রসনার লেহনে শুষিয়া লইয়া, অভিনয়ের ঢঙে, তাঁহার সেই অকৃত্রিম নয়নজল ও ঢল-ঢল ভাবের কৃত্রিম অনুকৃতি ফলাইয়া লয়, এবং আপনার চির চতুর নটবর প্রাণ বা বাবু-আনা 'দেলের' উপর আলখেল্লার ঢাকনি দিয়া, পসার জমকাইতে চেষ্টা করে। ভাক্ত এইরূপে ভক্তকে শোষণ করিয়া, নিজে প্রকৃত পুষ্টি লাভ করে না, অন্যকেও পুষ্ট করিতে পারে না। অথচ ভক্তের জীবন-সম্বল হরি-কথার পবিত্র মাহাত্ম্যকে লোক-সমাজে হীনপ্রভ ও খর্ব্ব করিয়া ফেলে! এ পরগাছা নয় ত কি?

কৃতবিদ্য, বিজ্ঞ জ্ঞানীর পরগাছা,—তাঁহার যশোলিপ্সু বন্দী বা পার্শ্বচর ধামা-ধরা মূর্খের দল। ভাষাতত্ত্বজ্ঞ যুগ-প্রবর্ত্তক লেখক, কঠোর সারস্বত-সাধনালব্ধ জ্ঞান-রত্ন ও গভীরচিন্তা-প্রসূত ভাবের মণি আহরিয়া, ভাষার সূতায়, মোহন-মণি-মালা গাঁথিয়া রাখেন; আর তাহাতে তাঁহার স্বদেশ, স্বজাতি এবং কখনও বা সমস্ত মানবজগৎ সমৃদ্ধ, সমুজ্জ্বল ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। ঈদৃশ মহামহীরুহের কাছেও পরগাছার অত্যাচার কম নহে। এই সকল পরগাছা অবশ্যই কোনরূপ কৃতিত্বের কোন ধার ধারে না। ইহারা চিরদিনই সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছ্র-সাধন ও পরিশ্রমে বীতস্পৃহ ও পরাঙ্মুখ। ইহাদের কেহ আশ্রয়-পুরুষের মুখের কথা গ্রাস করিয়া, তাঁহার মনের ভাব চুরি করিতে চেষ্টা করে, এবং কেহ কেহ তাঁহার লেখার উপর 'বাটপারি' করিয়া, আপনার নামে আসর গুলজার করিতে চাহে। ইহাদের এক শ্রেণী 'নামকা ওয়াস্তে' সৌখীন গ্রন্থকার,—আর এক শ্রেণী 'পয়সাকা ওয়াস্তে' ব্যবসায়ী সোর্দ্দাক্রাস! ইহারা রাজ-ব্যবস্থা অনুসারেও দণ্ডার্হ। সুতরাং ইহাদিগের সম্বন্ধে বেসী কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

ভাগ্যবানের গৃহে, ভ্রাতা, ভগিনী, ভগিনীপতি, ভগিনীর

অপত্য, পুত্র, কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, শ্বশুর, মাতুল ও শ্যালক প্রভৃতিও, সময় ও অবস্থাবিশেষে, পরগাছার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিরাট-গৃহের প্রসিদ্ধ শ্যালক পরগাছা—কীচক; কৌরবকুলের সর্ব্বজনপরিচিত মাতুল পরগাছা—শকুনি। ইহারা উভয়েই মহাভারতে ও ভারতীয় লোকসমাজে চিরনিন্দিত ও ঘৃণার্হ হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু, তাহা হইলেও, এবং "শ্যালকঃ কুলনাশায়, সর্ব্বনাশায় মাতুলঃ" ইত্যাদি উদ্ভট বচনে শ্যালক ও মাতুলের কলঙ্ক সর্ব্বত্র বিঘোষিত রহিয়া থাকিলেও, অধিকাংশ স্থলেই এই সকল পরগাছা মারাত্মক নহে। ইহারা, অনেক সময়েই, একহাতে, একপ্রকারে শোষণ ও আর এক হাতে, অন্য প্রকারে পোষণের পথ অন্বেষণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে, যেখানে শুধুই শোষণের সম্পর্ক, সেখানেও ইহারা, মমতার দায়ে স্বভাবতঃ আবদ্ধ রহিয়া, শোষণের রসনা যথাশক্তি সংযত রাখে,—কদাপি প্রাণ ধরিয়া টান দিতে ইচ্ছা করে না! ইহারা যেমন শোষণ করে, তেমন আশ্রয়-পুরুষকে জনবলে সংবর্দ্ধিত ও স্বজনপালকরূপে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত ও সম্মানিত রাখিয়া, তাঁহার অন্যতর শোভার নিদান স্বরূপ হইয়া রহে।

পত্নী চিরদিনই পরগাছা। কিন্তু যখন তিনি পতির প্রাণে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া আপনাকে ভুলিয়া যান, যখন তিনি অভিন্ন-অস্তিত্ব প্রাণাধিকের দ্বিতীয় প্রাণরূপে প্রকৃতই তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী হইতে সমর্থ হন, তখন তিনি পরগাছা হইলেও, পর-গাছা থাকেন না, সুখ-শীতল সঞ্জীবনী মহৌষধির ন্যায়, পতির হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া রহেন। তিনি যদি তখন পতি-হৃদয়ের অমিয়ধারা শোষণ করিয়া লন একগুণে, সেই অমিয়কে আরও মধুময় করিয়া, ফিরাইয়া দিতে উৎসুক হন, সহস্রগুণে। এ ক্ষেত্রে পত্নী পরগাছা হইলেও 'অর্কিডস' শ্রেণীভুক্ত,—সৌরভ-সুষমায়

আদরের আভরণ। এমন পরগাছার কাছে, কোন্ তরু, সাধ করিয়া আত্মবিক্রয়ে প্রস্তুত হইবেন না ? কিন্তু পত্নী যেখানে আদরের অমৃত, সোহাগের মধু শতজিহ্বায় শুষিয়া লইয়াও, প্রাণের অভ্যন্তরে অতৃপ্ত ; ললিত, লঘীর নির্ম্মল প্রেমাশ্রুতে সতত অভিষিক্ত রহিয়াও, জ্বলন্ত দীপকের ঝঙ্কারে ও হুঙ্কারে নিত্য কল্লোলিত, সেখানকার কথা অন্যরূপ। যিনি হাসির প্রত্যুত্তরে ভ্রূকুটি, রাগের বদলে বিরাগ, ও মধুর বিনিময়ে লঙ্কা লইয়া নিঃশঙ্কমনে দণ্ডায়মান হইতে অভ্যস্ত, তিনিই পত্নীরূপিণী প্রকৃত পরগাছা,—তিনিই পতিবিমর্দ্দিনী চণ্ডী বা পতিহৃদয়ের মার্কামারা 'পেরেসাইট' (Parasite) !

এতক্ষণ যে সকল পরগাছার কথা বলা হইল, সেগুলি সকল সময়েই সহনীয় এবং কোন কোন সময়ে প্রীতির আস্পদ ও আদরণীয়। কিন্তু এক্ষণে যে সকল পরগাছার কথা বলা হইতেছে, সেগুলির অত্যাচার প্রায় সকল অবস্থায়ই যারপর-নাই ভয়াবহ ও সর্ব্বাংশে সর্ব্বনাশকর। এই সকল মারাত্মক পরগাছার আক্রমণ হইতে দেশীয় রাজরাজ্ড়া, জমিদার ও ধনীদিগেরই ভয় ও আতঙ্ক বেসী। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লতাজাতীয়, কতকগুলি তরুশ্রেণী ভুক্ত। লতাজাতীয় বিষবল্লরীর কথা বেসী করিয়া বলা অনাবশ্যক। ইহারা, রূপে, কৃত্রিম সাজসজ্জায় ও হাবে ভাবে মোহিনী,—শোষণে রাক্ষসী ! ইহাদিগের নয়ন-হিল্লোলে বিষ ঝরে ; কিন্তু লোকে অমৃতজ্ঞানে উহা লুফিয়া লয় ! ইহাদিগের অধরে বিদ্যুৎ,—কিন্তু সেই বিদ্যুতের পশ্চাৎভাগে লুক্কায়িত বজ্র ! এই লতা একবার কোন সমৃদ্ধ সন্তানের তরুণ তনুতে লতাইয়া উঠিতে পারিলে আর কথা নাই,—অচিরেই শত রসনার তৃষিত আকর্ষণে, বেচারীর সুখ, স্বাস্থ্য ও ধন-প্রাণ সমস্ত শুষিয়া লইবে।

তরুশ্রেণীভুক্ত মারাত্মক পরগাছার মধ্যে, দেশী ও বিলাতী-ভেদে দ্বিবিধ পরগাছা বা 'পেরেসাইট' দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ৺ দীনবন্ধু মিত্রের নিমেদত্তের মত, অটলের বৈঠকখানায় মদ খাওয়াই যাহাদিগের জীবনের একমাত্র ব্যবসায় ও কর্ম্ম, ধনী জমিদারদিগের তাদৃশ মোসাহেব বা ইয়াররূপী দেশী পরগাছা বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই শ্রেণীর পরগাছা কাহাকেও বেড়িয়া ধরিলে, সে কর্ম্মকে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মকে কর্ম্ম বুঝিয়া নিরন্তর ক্ষিপ্তবৎ পরিচালিত হইতে থাকে এবং অন্ধের ন্যায় আপন হাতে নুড়া লইয়া, আপনার সোনার লঙ্কা ছারখার করিয়া ফেলে! যেখানে ধনী জমিদার, যেখানে বৈঠকখানার বাহার, সেইখানেই এই শ্রেণীর পরগাছার পূর্ণ দরবার! কিন্তু মোসা-হেব যখন যথার্থ বন্ধুতার আকর্ষণে, মোসাহেব বা ইয়াররূপে কাহারও দ্বারস্থ হয়, তখনকার কথা স্বতন্ত্র। তাদৃশ মোসাহেব, পরগাছা নহে, ব্যথার ব্যথী, প্রকৃত অন্তরঙ্গ, প্রাণের সঙ্গী বা সখা। সখা ও ইয়ার সর্ব্বতোভাবেই স্বতন্ত্র পদার্থ।

প্রবন্ধের উপসংহারে আর একটি মাত্র পরগাছার কথা বলিব। এই পরগাছা দেশী নহে,—বিলাতী; এবং ইহার সহিত দেশী রাজরাজ্‌ড়া ও বড় জমিদারদিগেরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু কোন কোন সময় দেশী রাজরাজড়া ও বড় জমিদারদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে সর্ব্বনাশকর ও ভয়াবহ পরগাছা, অন্য কোনটিই নহে। তাঁহাদিগের 'পোষাকে' সাহেব-কর্ম্মচারী বা ভৃত্যরূপী মুনিবই এই বিলাতী পরগাছা রূপে গণ্য। বলা নিষ্প্রয়ো-জন, সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। এই বিলাতী পরগাছার আশ্রয় পাইয়া অনেক ধনী পরিবার রক্ষাও পাইয়া থাকে; কিন্তু কখন কখন দৃষ্ট হয় যে, সখ করিয়া একবার এই পরগাছাকে বুকে টানিয়া লইলে, আর রক্ষা থাকে না! কাছিমের

কামড়,—গলা কাটা গেলেও ছাড়ে না! ইহারা, বিলাতী বলে, জেঁাকের মত, শোষণ করে, এবং বিন্দুমাত্র 'তস' থাকিতেও খসিয়া পড়ে না! লতা জাতীয় পরগাছা, কখন বয়স ফুরাইলে, কখন আদরে ভাটার টান পড়িলে, আপনা হইতেই গা ছাড়িয়া দিয়া ঢলিয়া পড়ে। মোসাহেব বা ইয়ার রূপী পরগাছাও, মোহের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে, কিংবা সময় থাকিতে ভাবাকুল নেত্রে বিবেকের দৃষ্টি স্ফুরিত হইলে, সামাল-সামাল বলিয়া 'সেলাম' দিয়া আপনি সরিয়া পড়িতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে, সখের নেশা সময় থাকিতে ছুটিবার অবসর পাইলে, এবং পরিণাম চিন্তার শত চক্ষু একসঙ্গে উন্মীলিত হইলেও, কোন কোন বিলাতী পরগাছা অপসৃত হইবার পাত্র নহে! শত হস্তে ঠেলিয়া ফেলাও, সে লাগিয়া থাকিবে;—একপাও হেলিবে না! তুমি আছাড়িয়া ফেলিতে চাও, সে আরও আকরিয়া ধরিবে;—তুমি চক্ষু রাঙ্গাইলে, সে গলা শাণাইয়া গর্জ্জিয়া উঠিবে! যাবৎ তোমার অস্তিত্ব, যাবৎ তোমার ধমনীতে শোণিতের চলাচল আছে, তাবৎ সে তোমাকে ছাড়িবে না। যদি ছাড়ে, এমন করিয়া ছাড়িবে যে, তুমি আর কোন দিক দিয়া, তোমার আপনার রহিতে পারিবে না! তাই বলিতে ছিলাম, যত রকমের পরগাছা আছে, এই শ্রেণীর বিলাতী পরগাছার তুলনায় সমস্তই হীনপ্রভ ও নিস্তেজ। ভাগ্যবন্তের ঘরে তিনিই ভাগ্যবান্,—যাঁহার ত্রৈলোক্য তন্ন জীবনে কখনও ঈদৃশ পরগাছার শুভ দৃষ্টিপথে নিপতিত না হয়।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

তুমি ও আমি।

তুমি মালতীর বনে সুরভি-স্বপনে
রেখো রজতের ধারা লুকা'য়ে ;
নীলিমা আমি গো আকাশ যুড়িয়া,
চির আঁখি মেলি' রব তাকা'য়ে।
তুমি স্বপনের ভুল, ঘুম-ঘোরে এসে,
চ'লে যা'বে কোথা সুখ-উছাসে,—
আমি তিয়াসা-দহনে দগধ পরাণে,
একা প'ড়ে র'ব হেথা হতাশে !
তুমি নব অনুরাগে সোহাগের মত
সদা ফু'টে থেকো মোর স্মরণে ;
আমি চকিতে চাহিয়া বুকে আঁকি' ল'ব,
চারু আভাখানি তারি গোপনে।
তুমি চির মধু ল'য়ে, মরম-মরুতে
মরীচিকা সম থেকো ফুটিয়া,—
আমি আশে-আশে র'ব, তোমারে যে আমি
ওগো ফেলিয়াছি ভালবাসিয়া !

কুমার সুরেশচন্দ্র সিংহ বি, এ।

হয়বৎনগরের দেওয়ান বংশ।

ইতঃপূর্ব্বে "ধূমকেতুর" পাঠকপাঠিকাগণকে দেওয়ান ইসা খাঁ মসনদ আলি সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী উপহার দিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। অদ্য সেই মহাপুরুষের বংশধরগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত করিতে প্রয়াসী হইলাম। ভরসা করি, পাঠকপাঠিকা-

গণের নিকট এতাদৃশ প্রবন্ধ অপ্রীতিকর হইবে না। আমরা বহু কষ্টে দেওয়ান ইসা খাঁ মস্নদ আলির বংশাবলীর যোগাড় করিতে পারিয়াছি ; এতৎসঙ্গে তাহাও আমরা মুদ্রিত করিয়া দিলাম। এস্থলে ইহা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, দেওয়ান ইসা খাঁ যখন এতদ্দেশের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন, তখন দিল্লীতে মোগল সম্রাট্ স্বনামখ্যাত আকবর বাদশাহ রাজত্ব করিতেছিলেন ; এবং সেই হিসাবে ইংলণ্ডে তখন রাজ্ঞী এলিজাবেথের (Queen Elizabeth) রাজত্ব ছিল। তখনও ইংরেজ-বণিক্‌গণ ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থ আগমন করেন নাই।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি যে, দেওয়ান ইসা খাঁ মস্নদ আলি দুইটি পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া মানব-লীলা সংবরণ করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম,—দেওয়ান মুসা খাঁ ও দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠের নাম,—দেওয়ান মহম্মদ খাঁ। এই ভ্রাতৃযুগল একান্ত একতার সহিত স্বীয় সম্পত্তি শাসন-সংরক্ষণ করিয়া, সুখে কাল-যাপন করতঃ পরিণত বয়সে, প্রত্যেকেই এক একটি পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া, পরলোক গমন করেন। দেওয়ান মুসা খাঁর পুত্র,—দেওয়ান মাছুম খাঁ ও দেওয়ান মহম্মদ খাঁর পুত্র,—দেওয়ান এওজমহম্মদ খাঁ স্ব স্ব পিতৃ-বিয়োগের পর সুচারুরূপে শাসন-কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। দেওয়ান এওজমহম্মদ খাঁর শাসন-সময়ে মোগল সম্রাট্ সাজাহান বাদশাহের অনুমতিক্রমে, স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ও শা সুজার স্বাক্ষরিত বিশেষ সম্মান-সূচক দুইখানি পত্র উপরোক্ত দেওয়ান এওজমহম্মদ খাঁর নিকট প্রেরিত হয়। *

---

* পত্র দুইখানি হিজিরী ১০৫৯ ও ১০৭৮ সনে লিখিত হইয়াছিল। অদ্যাপিও সেই পত্র দুইখানি তাঁহার বংশধরগণের

দেওয়ান মনোহর খাঁ নামক অতিশয় দুর্দান্ত ও উগ্র-প্রকৃতি-সম্পন্ন এক পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া, দেওয়ান মাছুম খাঁর মৃত্যু হয়। স্বহস্তে শাসন-ভার গ্রহণ করিয়াই দেওয়ান মনোহর খাঁ, আদি বাসস্থান জঙ্গলবাড়ী পরিত্যাগ করতঃ পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় (জাহাঙ্গীরনগরে) একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া, সপরিবারে বসবাস করিতে থাকেন, এবং ঐ বাস-ভবনের সন্নিকটে একটি বাজারও সংস্থাপন করেন। "মনোহর খাঁর গলি", "বাজার", তাঁহার ব্যয়ে নির্ম্মিত সুবৃহৎ "জুম্মা মস্‌জিদ্" ও "গোরস্থান" অদ্যাপিও বর্ত্তমান থাকিয়া, সহৃদয় ভাবুকের মনে পূর্ব্বস্মৃতি অলক্ষ্যে জাগাইয়া তুলিতেছে!

দেওয়ান মনোহর খাঁর স্বভাব চরিত্র ও শাসন-পদ্ধতি মোগল সম্রাটের অপরিজ্ঞাত ছিল না। তথাপি দিল্লীশ্বর তাঁহার প্রতি যথেষ্ট কৃপা ও স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। একদা মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজিব দেওয়ান মনোহর খাঁর নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—"শা সুজা বিদ্রোহী হইয়া, আপনার দিকে অগ্রসর হইতেছে; আপনি তাহাকে সাহায্য না করিয়া, বন্দী করিবেন। কুমার জৈনউদ্দিনকে আপনার সাহায্যার্থ শীঘ্রই পাঠাইতেছি।" * কিন্তু শা সুজা একছত্র মনোহর খাঁর সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন না; তিনি রেঙ্গুণ-রাজের সাহায্যে দেওয়ান মনোহর খাঁকে খুব ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখনই খুব সম্ভবতঃ এদেশে দলে দলে 'মগ' আসিয়া বিবিধ উৎপাত ও অত্যাচার করিত। পরিশেষে কুমার জৈনউদ্দিন পঁহুছিলে, শা সুজা পরাজিত হইয়া আরাকানে পলায়ন করেন। অবিচার, অপরিণামদর্শিতা প্রভৃতি নানাকারণে দেওয়ান মনো-

* "সিয়োরোল মোতাখেরিল্" নামক পারসিক গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩৯০ পৃষ্ঠা হইতে ৩৯৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

হর খাঁ প্রভৃত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলেন। সুতরাং, শেষকালে তাঁহাকে তজ্জন্য কিঞ্চিৎ দুঃখ ও অনুতাপ ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি পাঁচ পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া, পরলোক গমন করেন।

দেওয়ান এওজমহম্মদ খাঁর পুত্র দেওয়ান হায়াৎ খাঁ এতদিন পিতৃব্য-পুত্র দেওয়ান মনোহর খাঁর সহিত একান্নভুক্তই ছিলেন। কিন্তু, এক্ষণ ভ্রাতার কালপ্রাপ্তি হওয়ায়, কর্তৃত্ব লাভ করিয়া, ইনি হৃত সম্পত্তির পুনরুদ্ধারকল্পে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া, আওরঙ্গজিব-তনয় শা আজিম বাদশাহের নিকট এ বিষয়ে আবেদন করেন। বাদশাহ ইঁহাদের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করতঃ একখানি সনন্দ দ্বারা বরদাখাত, কাটরাব, দরজিবাজু, জোয়ার-হুসেনপুর, বরদাখাত-মগরা, কুড়িখাই, স্বর্ণগ্রাম ও সিংহধা এই আটটি পরগণা প্রদান করেন। * হাজরাদি, মহেশ্বরদি ও জফরসাহি পরগণাত্রয় দেওয়ান ইসা খাঁ মস্‌নদ আলির বন্দোবস্ত মতেই তাঁহাদের অধীন ছিল। এইরূপে এগারটি পরগণা তাঁহার হস্তগত হইল। পরগণে নসরত সাহির তপ্পার অবশিষ্ট এগারটি পরগণা পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান অপরাপর জমিদারবর্গের পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত বন্দোবস্ত হইয়া গেল। দেওয়ান হয়বৎ খাঁ নামক একটি পুত্র ও পাঁচটি ভ্রাতৃষ্পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া, দেওয়ান হায়াৎ খাঁ অনন্তধামে গমন করেন। এই দেওয়ান হয়বৎ খাঁ-ই "হয়বৎনগরের দেওয়ান বংশের" প্রতিষ্ঠাতা। আমরা ক্রমে তাহা বলিতেছি।

ইত্যবসরে দেওয়ান ইসা খাঁ মস্‌নদ আলির সম্বন্ধে একটি কথা বলিলে, বোধ হয়, তাহা পাঠকপাঠিকাগণের নিকট অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দেওয়ান ইসা খাঁ মস্‌নদ আলি "বার ভূঁইয়ার" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে, এই দেওয়ান বংশ কতদূর সম্মানার্হ ও প্রাচীন।

* "আইন-আকবরি" নামক পারসিক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পিতৃব্য-পুত্রদিগের সহিত মনোমালিন্য ঘটায়, দেওয়ান হয়বৎ খাঁ বরদাখাত, স্বর্ণগ্রাম, জোয়ার-হুসেনপুর ও বরদাখাত-মগরা এই পরগণা চতুষ্টয় লইয়া, জঙ্গলবাড়ীর ছয় কি সাত মাইল পশ্চিমে নগুয়া নামক স্থানে বাস-ভবন নির্ম্মাণ করেন; এবং তাঁহারই নামানুসারে উহার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের "হয়বৎ-নগর" নামকরণ হয়। দেওয়ান হয়বৎ খাঁ স্বীয় ভ্রাতষ্পুত্রী ফতেমা বিবিকে * বিবাহ করেন। ফতেমা বিবির গর্ভে দেওয়ান আবদুল্লা খাঁর জন্ম হয়। শৈশবেই দেওয়ান আবদুল্লা খাঁর পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। ইত্যবসরে তদীয় মাতামহ দেওয়ান সরিফ খাঁও নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। সুতরাং দেও-য়ান সরিফ খাঁর সম্পত্তি—মহেশ্বরদি, দরজিবাজু ও সিংহধা পরগণাত্রয়ও দেওয়ান আবদুল্লা খাঁর অধিকারে আসে। এইরূপে তিনি সাতটি পরগণার সর্ব্বময়কর্ত্তা হন।

দেওয়ান আবদুল্লা খাঁর শেষ অবস্থায় ইংরেজাধিকার ও নবাব মিরজাফরের দ্বিতীয় বারের কর্তৃত্ব আরম্ভ হয়। ইংরেজ-গবর্ণর লর্ড ক্লাইভ এক সুচতুর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নবাবকে সামান্য বৃত্তি-ভোগী সাক্ষীগোপাল করিয়া, স্বহস্তেই রাজ্যভার গ্রহণ করেন, এবং অপরাপর সকল বন্দোবস্ত করিতে সচেষ্ট হন। এতদুপলক্ষে বন্দোবস্ত করার জন্য দেওয়ান আবদুল্লা খাঁকেও আহ্বান করা হয়। কিন্তু তিনি তাচ্ছিল্য প্রকাশে, উপস্থিত হইয়াছিলেন না। যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া, বন্দোবস্ত না করায়, বরদাখাত প্রভৃতি চারিটি পরগণার অপর চারি ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত হইয়া যায়। ইত্যবসরে দেওয়ান আবদুল্লা খাঁর লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে। ইহার কতিপয় বৎসর পরে তৎপুত্র দেওয়ান মামুদ খাঁও অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

* ইনি সরিফ খাঁর কন্যা।

দেওয়ান মামুদ খাঁর দুই পুত্র ছিল,—দেওয়ান জোলকরণ খাঁ ও দেওয়ান জোলকদর খাঁ।

ইঁহাদের কর্ত্তৃত্ব-কালে ইংরেজ-কর্ম্মচারী মিঃ ডে ঢাকা-বাঙ্গলাবাজার নিবাসী সেখ গোলাম আলির সহিত মহেশ্বরদি, দরজিবাজু ও সিংহধা পরগণাত্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া ফেলেন। দেওয়ান সাহেবগণ এই সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া, সুন্দরবন নামক স্থানে গিয়া, মিঃ ডের সহিত সাক্ষাৎ করেন; এবং পিতৃ-বিয়োগাদি নানাবিধ দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করতঃ গোলাম আলি সেখের বন্দোবস্ত রহিত করিয়া, দেওয়ান জোলকরণ খাঁর নামে সনন্দ গ্রহণ করেন। উক্ত সনন্দের বলেই অদ্যাপিও দেওয়ান সাহেবগণ উল্লিখিত পরগণাত্রয় ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছেন। ইতাবসরে দেওয়ান জোলকরণ খাঁ পরলোক গমন করেন। অগ্রজের লোকান্তর প্রাপ্তিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা—দেওয়ান জোলকদর খাঁ কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন।

দেওয়ান জোলকদর খাঁ বড় অর্থপিপাসু জমিদার ছিলেন। তাঁহার শাসন-কাহিনী শুনিলে, কখন২ দুঃখে ও লজ্জায় মুখ নত করিতে হয়। আমরা এস্থলে সে সকলের অবতারণা করিতে চাই না। * তিনি অতিশয় কৃপণ ছিলেন ও কৃপণতার বলে বহুতর অর্থ সঞ্চয় করিয়া, পরিণত বয়সে মানব লীলা সংবরণ করেন।

তৎপুত্র দেওয়ান শা নেওয়াজ খাঁ কর্তৃত্ব পাইয়া, ব্যয়কুণ্ঠ পিতার সঞ্চিত অর্থরাশি তদীয় "ফতেয়া" † উপলক্ষে ব্যয় করতঃ, অর্থের সদ্ব্যবহার করেন।

দেওয়ান শা নেওয়াজ খাঁ খুব মিষ্টভাষী, দাতা ও নিরহঙ্কারী

---

* "মস্‌নদ আলি ইতিহাস" দ্রষ্টব্য।

† শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া।

ছিলেন। একদা তিনি বৈঠকখানায় বসিয়া, বাদশাহ-প্রদত্ত সনন্দ ও পত্রাদি পাঠ করিতে করিতে বলিয়া ছিলেন,—"আমার মত অক্ষম ও নিঃস্ব ব্যক্তির এত উচ্চ সম্মান-সূচক নিদর্শনাদি আর শোভা পায় না ; এ সকলই আমার বিনাশের হেতু হইয়াছে।" এতাদৃশী মহিয়সী উক্তির পরই তিনি দ্বিতল প্রাসাদ হইতে সে সমস্ত কাগজ-পত্র নিকটস্থ পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করেন ! ইনি খুব বিদ্বান, বুদ্ধিমান্, উদারচেতা ও পরিণামদর্শী ছিলেন। এতাদৃশ সহৃদয় মহাপুরুষগণ জগতের নমস্য।

দেওয়ান খোদানেওয়াজ খাঁ ও নবিনেওয়াজ খাঁ নামক দুই পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া, শা নেওয়াজ খাঁ মানব-লীলা সংবরণ করেন। পিতৃ-বিয়োগের পর জ্যেষ্ঠ খোদানেওয়াজ খাঁ বিপুল বিক্রমে কতিপয় বৎসর শাসন-কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। কিন্তু মনোবিকার উপস্থিত হওয়ায়, "ফকিরী" অবলম্বনে কএক বৎসরের জন্য পশ্চিম-অঞ্চল-বাসী হন ; পশ্চাৎ তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। রহিমনেওয়াজ খাঁ নামক একটি পুত্র ও রোওসন্ আক্তর খাতুন্ ও হুমাউন্ আক্তর খাতুন্ নাম্নী দুইটি কন্যা বর্ত্তমান রাখিয়া, ১২৬৬ বঙ্গাব্দে ঢাকা-সাচিপান্দরিপাস্থ বাটীতে পরলোক গমন করেন। ইহার কতিপয় দিবস পরেই তৎপুত্র উক্ত রহিমনেওয়াজ খাঁরও অকাল মৃত্যু ঘটে। রোওসন্ আক্তর খাতুন্ শ্রীহট্ট জিলার তরফ-নিবাসী শা মহীউদ্দিন হুসেনকে বিবাহ করিয়া, স্বীয় সম্পত্তি সহ উক্ত সাচিপান্দরিপাস্থ বাস-ভবনেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। এখন ইঁহাদের কেহই জীবিত নাই ; মাত্র দুইটি কন্যা বর্ত্তমান আছেন। হুমাউন্ আক্তর খাতুন্ নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন।

দেওয়ান খোদানেওয়াজ খাঁর মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর দেওয়ান নবিনেওয়াজ খাঁর হস্তেই কর্ত্তৃত্ব-ভার আসে।

ইনি একজন দাতা, দয়াল, পরোপকারী, বিনয়ী, ধর্ম্মপরায়ণ ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, তৃষ্ণার্ত্তকে জল-দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, গরীব কাঙ্গালকে অর্থদান, তাঁহার দৈনন্দিন ব্রত ছিল। সম্পত্তির আয় সমস্তই সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। ইঁহার কৃত উইলে বহুতর সৎকার্য্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি মাসিক শতাধিক টাকা ব্যয়ে তিনটি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করেন। এই কৃতী পুরুষ মাত্র তিন বৎসর কাল কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। ১২৬৯ বঙ্গাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

ইঁহার মৃত্যু অতিশয় বিস্ময়োদ্দীপক। মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে তিনি মৃত্যুর সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া, প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং এতদুপলক্ষে দূরস্থ আত্মীয় স্বজনকেও খবর দিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে ধর্ম্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং মৃত্যুর দিবস প্রাতে সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন। তিনি তখন সর্ব্বসমক্ষে ধর্ম্ম-বিষয়ক একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করতঃ পুত্র দেওয়ান এলাহানেওয়াজ খাঁকে কিরূপে বিষয়-সম্পত্তি শাসন-সংরক্ষণ করিতে হয়,— আত্মীয়, স্বজন ও কর্ম্মচারী প্রভৃতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তদ্বিষয়ে বহুতর উপদেশ প্রদানান্তর, সমবেত আত্মীয়স্বজন সমভিব্যাহারে মাধ্যাহ্নিক আহার সমাপন করিলেন। তখনও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন; মৃত্যুর কোন লক্ষণই তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রকটিত হইয়াছিল না।

আহারান্তে উক্ত দেওয়ান সাহেব সকলকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন,—"অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা; অতএব তোমরা তজ্জন্য প্রস্তুত হও!" একথা শ্রবণ মাত্রই সমবেত আত্মীয়মণ্ডলীর বদনমণ্ডলে একটা অনির্ব্বচনীয়

কাল ছায়া যেন আপনা হইতেই ছড়াইয়া পড়িল! কেহ কোন জবাব করিতে সাহসী হইলেন না,—সকলই নির্ব্বাক্ রহিলেন। ডাক্তার, কবিরাজ, হেকিম, ওঝা প্রভৃতি অনেকেই তথায় উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু পীড়ার কোন লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া, সকলই বসিয়া রহিলেন,—ঔষধ প্রয়োগ করিতে কেহই সাহসী হইলেন না।

বেলা প্রায় এক ঘটিকার সময় উক্ত দেওয়ান সাহেব আবার কহিলেন,—"আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে"। সকলেই বুঝিল, দেওয়ান সাহেবের চরম কাল সমুপস্থিত! তখন তিনি আত্মীয়বর্গের সহিত শেষ কথোপকথন করিতে করিতে,—'তস্‌বি' * জপিতে জপিতে, সদ্‌জ্ঞানে অনন্ত ধামে চলিয়া গেলেন। স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী-মণ্ডলী ও কর্ম্মচারিগণ হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু সেই মায়াময় রোদনের প্রতি সেই মহাপুরুষ ভ্রমেও দৃক্‌পাত করিলেন না,—তিনি শান্তিতে শান্তি-নিকেতনে শান্তিময়ের কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

পিতৃ-বিয়োগের পর, দেওয়ান এলাহানেওয়াজ খাঁ স্বয়ং জমিদারী শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইনি দুইটি দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। শেষ পরিণয়ের কোন সন্তানই বর্ত্তমান নাই। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে জমিলা আক্তর খাতুন্ ও আয়েসা আক্তর খাতুন্ নাম্নী দুইটি কন্যা জন্মে। দেওয়ান এলাহানেওয়াজ খাঁ খুব বৈষয়িক লোক ছিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ইনি প্লীহাদি দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়া, চিকিৎসার্থ কলিকাতায় যান; এবং ১২৭৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে রাজধানীতেই তিনি মানব-লীলা সংবরণ করেন।

* জপমালা।

কলিকাতার "কলিঙ্গা" (কলেঙ্গা) নামক স্থানে তাঁহার সমাধি হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রীহট্ট জিলার সুলতানসী নিবাসী সৈয়দ আবদুল্লা উক্ত দেওয়ান সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা জামিলা আক্তর খাতুন্‌কে বিবাহ করিয়া, হয়বৎনগরের বাড়ীতেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১২৮১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে জামিলা আক্তর খাতুন্ নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন।

দ্বিতীয়া কন্যা আয়েসা আক্তর খাতুন্ জঙ্গলবাড়ী নিবাসী স্বীয় মেসতুত ভ্রাতা দেওয়ান আলীমদাদ খাঁকে বিবাহ করিয়া, পিতৃ-ভবনেই অবস্থিতি করিতেছেন। আয়েসা আক্তর খাতুন্ পতির সাহায্যে স্বয়ংই জমিদারী শাসন-সংরক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাদের একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিয়াছে।

দেওয়ান নবিনেওয়াজ খাঁর খোজেস্তা আক্তর খাতুন্ নাম্নী একটি কন্যা ছিলেন। জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান রহিমদাদ খাঁর পুত্র দেওয়ান ছোবহানদাদ খাঁর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি অতি শান্ত-মূর্ত্তি ও সরলা রমণী ছিলেন। ১২৭৭ বঙ্গাব্দে ঢাকায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সমাধি দারোগা আমির উদ্দিনের ভবনে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার গর্ভে কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই ; একমাত্র কন্যা ররজস্তা আক্তর খাতুন্‌ই বর্ত্তমান আছেন।

শ্রীকামিনীকুমার দে রায়।

কুমার সম্ভব।

দ্বিতীয় সর্গ।

(৪৮)

"মহাবীর্য্যবান্ মহৌষধ (ও)ব্যর্থ
ঘোর সান্নিপাতে যথা,
সে ক্রূরে মোদের সমস্ত উপায়
নিষ্ফল নিরন্ত তথা।

(৪৯)

চক্র সুদর্শন,— জয়-আশা যাহে,
প্রতিঘাতে উঠে যায়
প্রদীপ্ত পাবক;— তারকের কণ্ঠে
লগ্ন তা'ও কণ্ঠী প্রায়!

(৫০)

ঐরাবত-জয়ী গজকুল তার
অভ্যাস করিছে রঙ্গে
দন্তাঘাত কেলি, পুষ্কর, আবর্ত্ত,
দ্রোণাদি মেঘের অঙ্গে।

(৫১)

সেনানী স্থজিতে চাহি, তাই, প্রভো,
দমিতে সে তারকায়,—
ভব-পাশ-চ্ছেদে, মুমুক্ষু যেমন,
কর্ম্মচ্ছেদী ধর্ম্মে চায়।

(৫২)

হবে, দেব-সেনা- রক্ষিতা সে জন,
ইন্দ্র, অগ্রে রাখি, তা'য়,

আনিবে কাড়িয়া, অরিকুল হ'তে
জয়-শ্রীকে বন্দী প্রায়।"

(৫৩)

হ'লে, বৃহস্পতি- বাক্য-অবসান,
আত্মভু কহিলা বাণী,—
কিবা মধুমাখা,— গর্জ্জন-অন্তর
ধারা বরিষণ জিনি!—

(৫৪)

"পূর্ণ মনোরথ হ'বে তোমাদের,
থাক, কাল-প্রতীক্ষায়।—
সৃজন-ব্যাপারে, নিজে আমি কিন্তু,
যা'ব না এ সাধনায়।—

(৫৫)

মো হ'তে লক্ষ্মশ্রী, মো হ'তে বিনাশ,
সাজে না সাজে না তার।—
বিষ-তরুকেও নিজে বাড়াইয়া
নিজে কাটা অবিচার।

(৫৬)

সে যাহা যাচিল, আমিও তাহাই,
করেছিনু অঙ্গীকার।
লোক-দাহ-ক্ষম তপে প্রশমিত
বরদানে করি তার।

(৫৭)

পাত্রভেদে ক্রুত ধূর্জ্জটি-বীর্য্যের
অংশ বিনা কে সক্ষম,
সে রণ-কুশল, রণোগ্যত যবে,
সহে তার পরাক্রম ?

(৫৮)

তমঃ পারে স্থিত,— তমোগুণাতীত,
পরম সে জ্যোতির্ম্ময়!—
নাহি জানি আমি, নাহি বুঝে হরি,
প্রভাব-মহিমা চয়।[১]

(৫৯)

আকর্ষিতে যত্ন কর, যাও সবে,
চৌম্বকে লৌহ যেমন,—
উমা-সুষমায়, সমাধি-স্তিমিত
শম্ভুর ভাস্বর মন।

(৬০)

শিবের, আমার, সমাহিত তেজ,
এ দোহে, ধারণ-ক্ষম,—
উমা সে হরের হরের(ই) আবার
জলময়ী মূর্ত্তি, মম।

(৬১)

নীলকণ্ঠ-সুত হ'বে তোমাদের
যোগ্যতম সেনাপতি,
উন্মোচিবে সুর- বন্দিনীর বেণী
সুবীর্য্য সম্পদে অতি।"

(৬২)

দেবগণে হেন কহি বিশ্বযোনি
অম্বরে সম্বরে কায়!
এবে কি কর্ত্তব্য মনে করি স্থির
সুরদল (ও) স্বর্গে যায়।

(৬৩)

পাক-রিপু ইন্দ্র, নির্ব্বাচি কন্দর্পে
হরচিত্ত-সম্মোহনে,
স্মরিলা তাঁহারে, সাধনা-ঔৎসুক্যে
তুলো বেগবান্ মনে।—

(৬৪)

রূপবতী রমণীর ভ্রূলতের প্রায়,
চারু-শৃঙ্গ-যুত ধনু স্থাপি কণ্ঠ-মূলে—
রতির বলয়-চিহ্ন অঙ্কিত যথায়;
রাখি চূতাঙ্কুর অস্ত্র মধু-কর-তলে,
মধু সহচর তার, কৃতাঞ্জলি করি,
দাঁড়াল দেবেন্দ্রপাশে ফুল-ধনুধারী।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু।

মলিনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শচীন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মতগুলি জীবনে পালন করিতে চেষ্টা করিত; কিন্তু প্রকাশ্যে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে পারে এবং যাহা ভাল বুঝে তাহাই করিতে পারে, তাহার এত মনের বল ছিল না। সে গান শুনিবার ছলে প্রতি রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে যাইত। গলা বড় মিষ্ট ছিল; মাঝে মাঝে কলকণ্ঠে মন্দির ধ্বনিত করিয়া সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিত।

কলেজের অধ্যাপক হরিশবাবু শচীন্দ্রের বাঙ্গালা ও ইংরাজী দুখানা রচনা পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

শেষে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ও অনেকের মুখে তাহার অশেষ প্রশংসা শুনিয়া ক্রমে হরীশবাবু তাহাকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যাকালে হরীশবাবুর বাড়ীতে শচীন্দ্রের নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। হরীশবাবু ও তাঁহার স্ত্রী পঞ্চদশবর্ষীয়া কন্যা সুনীতিকে লইয়া বসিতেন, সে গান গাইত। সুনীতির একান্ত সঙ্গীতানুরাগ ছিল। শচীন্দ্রের গান তাহার বড় ভাল লাগিত।

শচীন্দ্র আসিলেই সুনীতি তাড়াতাড়ি অন্যকাজ সারিয়া, সেলাই ফেলিয়া, অবিলম্বে মাকে লইয়া গান শুনিতে উপস্থিত হইত;—কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও লজ্জা কিংবা বিনয়ের সীমা অতিক্রম করিত না।

একদিন সুনীতি বলিয়া ফেলিল,—"শচীন্ বাবু, আপনার গলা কি মিষ্টি! আপনি যদি কৃপা ক'রে রোজ সন্ধ্যেবেলা একবার আমাদের এখানে আসেন, তা'হলে আমরা কত সুখী হই। এ সময়ে ত পড়া ছেড়ে গল্পাদি ক'রেই কাটান,—না হয়, আমাদের অনুরোধ রাখ্‌তে এদিকেই একটু বেড়া'তে এলেন। কাল এলে আজকার গান কয়টা লিখে রাখ্‌বো!"

স্ত্রীজাতির প্রতি শচীন্দ্রের একটা সসম্ভ্রম লজ্জা ছিল,—সে লজ্জা স্ত্রীলোকের সম্মুখে তাহার মস্তক নত করিয়া রাখিত। কিন্তু আজ শচীন্দ্র বহু চেষ্টায় লজ্জার চাপ হইতে মাথাটি একটু তুলিয়া, সুনীতির মুখপানে চাহিল। ভাবিল,—কি সৌন্দর্য্য!—কি লাবণ্য!—কি নম্রতা! বলিল,—"আচ্ছা, আস্‌তে চেষ্টা কর্‌বো।"

সেদিন বাসায় ফিরিয়া, শচীন্দ্র কোনো মতেই পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারিল না। যে পৃষ্ঠায় পড়া আরম্ভ করিয়া-

ছিল, ঘণ্টা দুই পরে দেখিল, সেই পৃষ্ঠা এখনো উল্টে নাই ! হৃদয়ের মধ্যেও বিষম অরাজকতা উপস্থিত হইল ! সুনীতিকে হৃদয়ের রাণী না করিতে পারিলে, বুঝি এ অরাজকতা যাইবে না !

শচীন্দ্র সুনীতির মুখে তাহার সঙ্গীতের প্রশংসা শুনিয়া, অন্যান্যের প্রশংসা হইতে একটু পৃথক্ আনন্দ পাইয়াছিল। ভাবিল,—"সুনীতি কি তাহাকে ভালবাসে ? নতুবা রোজই সন্ধ্যাবেলায় যাইতে বলিল কেন ?" ভাবিতে ভাবিতে বহুদূরে চলিয়া গেল। আবার ভাবিল,—"সে কোন মতেই সুনীতির অযোগ্য হইতে পারে না ; তাহাকে বিবাহ না করিলে যে সুনীতির সঙ্গীতানুরাগের কোনো মূল্যই থাকিবে না।" যদি যথার্থই সুনীতি তাহাকে ভালবাসে, তবে হরীশবাবুর মত শিক্ষিত বিজ্ঞলোক কি সেই ভালবাসা বিনিময়ের বৈধ উপায় করিয়া, তাহার যোগ্যতার আদর করিবেন না ?

সেদিন যে গান কয়টা গাইয়াছিল, সেগুলি একখানা সুন্দর কাগজে বহুক্ষণে পরিপাটি করিয়া লিখিল,—সুনীতিকে দিবে। ভাবিল,—"সুন্দর হস্তাক্ষর দেখিয়া সুনীতি তাহাকে হৃদয়ের আরো উচ্চ আসনে বসাইবে !"

প্রতিদিন সন্ধ্যা না হইতেই শচীন্দ্র হরীশবাবুর বাড়ী যাইতে লাগিল। সে আশা করিত,—"ঘরে আর কেহ না থাকিলে, সুনীতি তাহার কাছে মনের কথা বলিবে।" কিন্তু সুনীতি নির্জ্জনে সজনে সমভাবে কথা বলিত, এবং যাহা বলিত, তাহার অধিকাংশই সঙ্গীত সম্বন্ধীয়।

সুনীতির হৃদয়-মন্দিরে সুরেন্দ্রনাথের সুবর্ণ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত ;—সে মন্দিরের দ্বার স্পর্শ করিবার অধিকারও শচীন্দ্রের নাই। কিন্তু শচীন্দ্র ভাবিত,—তাহার জ্যোতিতেই সে মন্দির

পাঠে একান্ত ব্যাঘাত জন্মিল। শচীন্দ্রের মন দিবারাত্রি কল্পনাস্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্বপ্নে—জাগরণে সুনীতির মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এফ্.-এ পরীক্ষা দিয়া শচীন্দ্র বাড়ী গিয়াই শুনিল,—"তাহার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে।" বিবাহ-প্রস্তাব ভাঙ্গিতে বহু চেষ্টা করিয়াও নিষ্ফল হইল। তাই শচীন্দ্র এ অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবে সঙ্কল্প করিয়া, বিবাহে আর বাধা দিল না। তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বার বৎসরের বালিকা মলিনার সহিত বৈশাখ মাসে তাহার বিবাহ হইয়া গেল। গ্রাম্য অসঞ্জাত-প্রেম ক্ষুদ্র মলিনার দিকে শচীন্দ্র একটিবারও মুখ তুলিয়া চাহিল না।

বিবাহের অব্যবহিত পরেই শচীন্দ্র কলিকাতা মাণিকতলায় তাহার বাল্যবন্ধু ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথের কাছে চলিয়া গেল। হরীশবাবুর বাড়ী আর যাওয়া হইল না,—সুনীতিকে মুখ দেখাইবে কি করিয়া? কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ সুনীতিকে লইয়াই বাল্যবন্ধুকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিল। শচীন্দ্র জানিত না যে, ইতিমধ্যে সুনীতির সঙ্গেই সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহ স্থির হওয়ার দুই তিন দিন পরেই শুভ-কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া, সুরেন্দ্র শচীন্দ্রকে জানাইতে পারে নাই।

শচীন্দ্রকে দেখিয়া, সুনীতির মুখখানা বিষাদের ছায়ায় আবৃত হইয়া গিয়াছে। শচীন্দ্রের সঙ্গীত-স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে পিতা মাতার স্মৃতিও জাগিয়া তাহাকে বিরহ-কাতরা করিয়াছে। শচীন্দ্র দেখিল, সুনীতির গণ্ডদেশে কএকবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া যাই-

তেছে। ভাবিল,—এ অশ্রু তাহারই জন্য! মনে একটু সান্ত্বনা আসিল; বুঝিল,—উভয়েরই সমান বেদনা!

রাত্রিতে অন্ন পরিবেশন করিতে করিতে সুনীতি বলিল,—"শচীন্ বাবু, আপনি এখানে থেকেই পড়ুন না,—আপনার খরচ পত্রের জন্য কিছুই ভাবতে হ'বে না।" শচীন্দ্রের আহার হইল না,—'ক্ষুধা নাই' বলিয়া সংক্ষেপে আহার শেষ করিল।

সুরেন্দ্রনাথের শয়ন-কক্ষের অনতিদূরেই শচীন্দ্রের শয়নগৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কত কি ভাবনায় সারা রাত্রি শচীন্দ্রের নিদ্রা হইল না,—শয্যা কণ্টকময় মনে হইল।

কিন্তু শচীন্দ্র এবাড়ী ছাড়িল না।

জ্যৈষ্ঠ মাস। আকাশে বড় মেঘ করিয়াছে। শচীন্দ্র তাহার ঘরে বসিয়া একখানা ইংরাজী নভেল্ হাতে লইয়া চিন্তায় মগ্ন। একদিন এমন সময় সুরেন্দ্রনাথ আসিয়া জানাইল,—গেজেটে শচীন্দ্রের নাম পাওয়া যায় নাই! এসংবাদ শুনিয়াই শচীন্দ্র শয্যায় শয়ন করিল। বারেক ভাবিয়া থাকিবে,—"আত্মহত্যা ছাড়া এলজ্জা ঘুচাইবার আর উপায় নাই!"

সুরেন্দ্রনাথ কত বুঝাইল,—শচীন্দ্র মাথা তুলিল না। সুরেন্দ্র নাথ চলিয়া গেলে, সুনীতি আসিয়া ডাকিল,—"শচীন বাবু, শচীন বাবু!"—শচীন্দ্র নিরুত্তর। আবার ডাকিল। এবার আর পারিল না,—শচীন্দ্র মাথা তুলিয়া চাহিল। তাহার বিষাদ-মেঘে একটা চকিত আনন্দের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল!

সুনীতি বলিল,—"আপনি এত অস্থির হয়েছেন কেন? শুনেছি এ পরীক্ষা বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষা নয়,—কতকটা পরিশ্রমের এবং অনেকটাই নাকি ভাগ্যের। যারা পাশ করেছে, তাদের চেয়ে আপনার বিদ্যাবুদ্ধি কম, একথা আমার কিছুতেই মনে হয় না। দৈবাৎ একবার পা পিছলে গিয়েছে ব'লে কি এমন করে গা'

ছেড়ে দিয়ে পড়ে থাকা উচিত? আমার কথা রাখুন,—উঠে বসুন। যে কত আশা বুকে নিয়ে আপনার মুখ চেয়ে আছে,—অন্ততঃ তার দিকে চেয়ে আবার নূতন উৎসাহে বুক বাঁধুন"।

শচীন্দ্র উঠিয়া বসিল। ভাবিল,—"কে মুখ চেয়ে আছে? মলিনা,—না সুনীতি?"

কএক দিন পরে মলিনার একখানা চিঠি আসিল। সে চিঠি-খানি এইরূপ—

"প্রাণেশ্বর!

তুমি আমাকে পায়ে ঠেলিয়া গিয়াছ। কিন্তু দাসীর ঐ চরণাশ্রয় ছাড়া আর আশ্রয় কোথায়? কি, অপরাধে আমাকে তোমার চরণ-তলে স্থান দিলে না, জানি না। একদিনের জন্যও তোমার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিলাম না; আমি কতবার তোমার দিকে চাহিলাম; তুমি একটিবারও অভাগিনীর পানে চোখ তুলিয়া চাহিলে না। আমি কি অপরাধ করিয়াছি, জানি না। অজ্ঞাতসারে কোনো দোষ করিয়া থাকিলে, জ্ঞানহীনা বালিকা বলিয়া মার্জ্জনা করিও।

হৃদয়ের দেবতা! তুমি কবে আসিয়া আমার হৃদয়-মন্দির আলোকিত করিবে? আমি যে কত অশ্রু লইয়া তোমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। আমাকে আর কষ্ট দিও না।

শুনিলাম, তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও নাই। না জানি তুমি কত কষ্টই পাইতেছ! তোমার কিছুই দোষ নাই—এ অলক্ষ্মীকে ঘরে আনিয়াছ বলিয়াই তোমার অদৃষ্ট এই ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বাড়ীতে এজন্য কেহই তোমাকে তিরস্কার করিয়া কিছু বলেন নাই,—কেহ কিছু বলিবেন না।

প্রিয়তম, জীবনের পথে আমার জন্য তোমার এই প্রথম পদস্খলন দেখিয়া আপনার শক্তিতে অবিশ্বাস করিও না।

আপনাকে হেয় মনে করিয়া, ক্ষোভে অভাগিনীর সর্ব্বনাশ করিয়ো না। আমি দিবারাত্রি বিধাতার চরণে তোমার কল্যাণ ভিক্ষা চাহিতেছি ;—তিনি অবশ্যই তোমার প্রাণে শান্তি প্রেরণ করিবেন।

জীবনসর্ব্বস্ব, দাসীর অপরাধ লইও না। তুমি কবে আসিবে—কেমন আছ, জানাইও। আমি পথ চাহিয়া রহিলাম।

সেবিকা
চরণাশ্রিতা দাসী—
মলিনা"।

মলিনা মলিনা নহে,—পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি। বালিকা গ্রাম্য হইলেও সর্ব্বগুণসম্পন্না জননীর নিকট হইতে বিদ্যা, বুদ্ধি, বিনয় গৃহিণীপণা সমস্তই শিক্ষা করিয়াছে। সে লজ্জার ছায়ায় অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত সুগন্ধি বন্য ফুল; সভ্যতার আলোকে, শিক্ষার মুক্তবায়ুতে পূর্ণ বিকশিত উদ্যান-কুসুম নহে,—তাই শচীন্দ্রের কাছে সুনীতির তুলনায় সে তুচ্ছ।

মলিনার আর্ত্তনাদে মোহনিদ্রায় অচেতন শচীন্দ্রের চৈতন্য হইল না। তাহার অশ্রু স্বামীর প্রতিশোধ-বহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চিত্রাঙ্কণে শচীন্দ্রের হাত ছিল। সে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া, আর্টস্কুলে প্রবেশ লাভ করিল। পিতা মাতার ইচ্ছা ছিল, শচীন্দ্র গ্র্যাজুয়েট হইয়া হাকিম হয়, অথবা অন্ততঃ ওকালতী করিয়া, সুনাম ও অর্থ উপার্জ্জন করে। কিন্তু বিবাহ-ব্যাপারে শিক্ষা পাইয়া, তাহার স্বাধীনমতে পিতামাতা আর বাধা দিলেন না।

চিত্রাঙ্কণ, সঙ্গীত ও নভেল লইয়াই শচীন্দ্র তাহার দিনগুলি

কাটাইতে লাগিল। আহার ও সঙ্গীতের সময় ছাড়া সুনীতির সঙ্গে বড় দেখা হইত না। সুনীতি তাহাকে আজো ভালবাসে, এই বিশ্বাস তাহাদের ছোট-খাট দেখাসাক্ষাৎগুলির সহিত একত্র মিলিয়া শচীন্দ্রকে একটা প্রেতাত্মার মত সুনীতির পশ্চাতে ঘুরাইতেছিল! সুনীতি তাহা দেখিতে পাইত না।

শচীন্দ্র ক্রমে সুনীতির পতিভক্তির কতকগুলি বাহ্য নিদর্শন দেখিতে লাগিল। কয়দিন দেখিল,—সে সুরেন্দ্রনাথের পাতে প্রসাদ খায়। একদিন তাহাদের শয়নকক্ষের দ্বার একটু উন্মুক্ত ছিল। শচীন্দ্র চকিতে দেখিল, সুনীতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ কালে পতির চরণে প্রণত হইয়াছে!" তবু ভাবিল,—"এসবের অধিকাংশই বাহিক না দেখাইলে চলে না।"

সুনীতি তাহাকে ভালবাসে না, একথা একবারও শচীন্দ্র ভাবিতে চাহে না। যদিই কখনো তাহার প্রতি সুনীতির ভালবাসার অভাব কিছু লক্ষিত হয়, সেই ভয়ে সুনীতি ও সুরেন্দ্রনাথকে একত্র দেখিলেই বা উভয়ের কথোপকথন শুনিলেই শচীন্দ্র যথাসম্ভব দূরে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিত।

একদিন সন্ধ্যাকালে সুরেন্দ্রের কক্ষে প্রদীপ জ্বলিলে, শচীন্দ্র ধীর পাদবিক্ষেপে বারান্দা দিয়া গৃহান্তরে যাইতেছিল; শুনিতে পাইল, সুনীতি জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিতেছে,—"শচীন্ বাবু কি নিষ্ঠুর!" শচীন্দ্র থমকিয়া বজ্রাহতের মত নীরবে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল,—এবার আর দূরে সরিয়া গেল না। দরজার ফাঁক দিয়া দেখিল,—সুরেন্দ্রনাথ সুনীতির কপোলে পতিত কুন্তল-গুচ্ছ তুলিয়া দিয়া, বাম বাহু দ্বারা তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়াছে, এবং উভয়ে সোহাগ-লীলায় একপ্রাণতা জ্ঞাপন করিতেছে। শচীন্দ্রের বুক কাঁপিয়া উঠিল! শুনিল, সুনীতি বলিতেছে,—"নিষ্ঠুর না হলে, এমন সরলা লক্ষ্মী বউটিকে তিনি

এত কষ্ট দিলেন কেন? সে দিন তাঁর ঘর ঝাড়্তে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর কএক খানা চিঠি দেখে অবধি আমার মনে হচ্চে, শচীন্ বাবুর প্রাণ কি কঠিন পাষাণে গঠিত! একখানা চিঠিরও নাকি জবাব যায় নি! তবু তার পতিভক্তি এত বেসী, অভিমান এত কম যে, সে না লিখে পারে না। কতবার বাড়ী যেতে লিখেছে, কই, কত ছুটি এল, একবারো ত তিনি বাড়ী গেলেন না। তিনি কেমন লোক? সারাদিন ছবি আর বই নিয়ে বসে থাকেন,—যে তার মুখ চেয়ে কত আশা বুকে নিয়ে বসে আছে, সে অভাগিনীকে মনে ক'রে একখানা চিঠিও লিখেন না। আমি যেমন তোমার কাছে কত আদর সোহাগ পাই, মলিনার কি তেমন সাধ হয় না? তাই বল্ছিলাম,—শচীন্ বাবু কি নিষ্ঠুর!"

সহসা যেন একটা ঝড় আসিয়া শচীন্দ্রের মনটা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়া গেল। মোহান্ধকারের আবরণ এক মুহূর্ত্তে ঘুচিয়া গেল,—সুনীতির পবিত্র পতি-প্রেমের আলোকে সে মলিনার বিষণ্ণ কম্পিত মুখ দেখিতে পাইল। সেখানে আর দাঁড়াইতে পারিল না। বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। ভাবিল,—"হায়! আমি এতদিন কি মোহেই না মজিয়া ছিলাম!—কি ভীষণ নরকের পথেই না চলিয়া ছিলাম! কোথায় ছিলাম!—কতদূরে চলিয়া আসিয়াছি!"

সেই রাত্রিতেই শচীন্দ্রের জ্বর হইল। সুরেন্দ্রনাথের এক চাকরের প্লেগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল; তাঁহাকে হাঁসপাতালে পাঠান হইতেছে দেখিয়া শচীন্দ্রও প্লেগের আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া, ঐ সঙ্গে চলিল। সুরেন্দ্র ও সুনীতি তাহাকে হাঁসপাতালে যাইতে বারংবার নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বলিল,—"আমাকে এখানে রাখিলে তোমাদের অকল্যাণ হইবে। যদি বাঁচি, সেখানে গিয়াই বাঁচিব,—যাইতে নিষেধ করিও না।" তাহাকে

কোনো মতেই রাখা গেল না,—সে তখন মৃত্যুকেও ভয় করিতেছিল না। কিন্তু হাসপাতালে গিয়া তাহার বুদ্ধি ফিরিল। কি জানি কি ভাবিয়া শচীন্দ্র তথা হইতে পলায়ন করিল। বাল্যবন্ধুর আলাময় আশ্রয়ে আর ফিরিল না। জনরব উঠিল,—"শচীন্দ্র মারা গিয়াছে!"

অভাগিনী মলিনা শুনিল,—"সে বিধবা হইয়াছে!" তাহার হৃদয়াকাশে আশার শেষ কিরণ মিলাইয়া গেল। এক দিনের জন্যও সে স্বামী-সুখ উপভোগ করে নাই; তবু সে মনে মনে ভাবিত,—"বিধাতার কাছে আমি ত কোনো দোষ করি নাই,—তিনি অবশ্যই আমার স্বামীকে আমার কাছে আনিয়া দিবেন।" পতিব্রতা সরলা বালিকা একমাত্র স্বামীধ্যানেই তাহার সমস্ত চিন্তা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; এত দিন আর কোনো চিন্তা তাহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। স্বামীর ধ্যানেই সে সুখ পাইত,—সেই সুখেই সে বাঁচিয়া ছিল। কিন্তু অভাগিনী এখন কি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে?

স্নেহময়ী বিধবা মাতা মলিনাকে শিশুর ন্যায় তাঁহার 'তাপহরণ স্নেহ-কোলে' ডাকিয়া লইলেন। মলিনার অতৃপ্ত উত্তপ্ত পিপাসার টানে জননী-হৃদয়ের স্নেহ-সিন্ধুতে জোয়ার আনিল। তাহাকে মাতৃস্নেহ দিয়াও পতি-প্রেমের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আরো কিছু না দিলে চলিবে কেন?

মাতা মলিনাকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন,—"মা, তুই ছাড়া আমার আর কে আছে?—তুই চির দুঃখিনীর অঞ্চলের নিধি। বার বৎসর আমার বুকেই ত ছিলে,—কএক দিনের জন্য সংসারের আবর্ত্তে ঘুরিয়া আসিলে;—দেখিয়া আসিলে, সংসারের সুখ কেমন! তোকে যতদিন বাঁচি বুকে ধরিয়া রাখিব, তুই দুঃখ করিস নে মা। তোর কপালে যে স্বামী

বর্ত্তমানেও স্বামীসুখ ঘটে নাই; এখন বুঝিতেছি, তাহা ভালই হইয়াছে। একবার সে আস্বাদ পাইলে, কি জীবনে তাহা ভুলিতে পারিতে? মা, চল আমরা কাশীতে গিয়া গঙ্গাতীরে পবিত্র নিষ্ঠার সহিত জীবনের অবশিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কাশীতে গঙ্গাতীরে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া, বিধবা মা মলিনাকে লইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ভূসম্পত্তি যাহা ছিল, তাহার আয় হইতে বাসা-খরচ ও দান-দক্ষিণাদির ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন।

মলিনা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতে লাগিল। মাসান্তে গয়ায় গিয়া স্বামীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে।

বৈধব্যের নিষ্ঠা নিয়মে বালিকার দেহ পুষ্ট হইতে লাগিল। বিবাহের পর হইতেই যৌবন প্রস্ফুটিত হইতেছিল;—চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে এখন সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠিল। অযত্নরক্ষিত অবেণীসম্বদ্ধ কেশরাশি পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়া, নিতম্ব চুম্বন করিতেছিল; দেখিয়া, শাপভ্রষ্টা বনদেবী বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। চোখে মুখে রূপজ্যোতিঃ বিভাসিত হইতে লাগিল,—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যৌবন-প্রবাহের তরঙ্গ উঠিল! কিন্তু মলিনা কাহার কাছে এ রূপের গর্ব্ব করিবে? এ ব্যর্থ রূপাগ্নির জ্বালায় সে নিজেই অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিল।

শচীন্দ্র হাঁসপাতাল হইতে পলায়ন করিয়া, জনৈক সদাশয় জমিদারের আশ্রয় পাইয়াছিল। তিনি ভ্রমণোদ্দেশ্যে পশ্চিমাঞ্চলে যাইতেছিলেন,—শচীন্দ্রকেও সঙ্গে লইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাহার জ্বর বৃদ্ধি পাওয়ায়, "চৌসা-প্লেগ্ ক্যাম্পে" তাহাকে আটক থাকিতে হইল। তাহার প্লেগ হয় নাই। ক্যাম্প্-

অর্থে কাশী পর্য্যন্ত গিয়া, সে একবারে নিঃসম্বল হইয়া পড়িল। ভয়ানক জ্বর,—পথ চলিতে না পারিয়া, গঙ্গা-তীরে একটা বড় বাড়ীর কাছে রাস্তার ধারে বসিয়া পড়িল।

মলিনা মায়ের সঙ্গে সেদিন গয়ায় স্বামীর পিণ্ডদান করিতে যাইবে। গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে দেখিতে পাইল, একটি যুবক রাস্তার ধারে বসিয়া শীতে কাঁপিতেছে; মুখখানা শুষ্ক। মলিনার সম্মুখে সহসা তাহার স্বামীর স্মৃতি একটি ক্ষীণ বিদ্যুৎরেখার মত চমকিত হইল! যুবককে ভাল করিয়া দেখিল,—আনন্দে ও আশায় হৃদয় ভরিয়া উঠিল। চিনিল,—তাহার স্বামী!

মলিনা মাতাকে একটু দূরে ডাকিয়া বলিল,—"মা, ইনিই আমার স্বামী;—জনরব সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু মা, আমরা এখন তাঁহাকে পরিচয় দিব না। তিনি আমার জন্যই গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন; জীবনে তিনি চোখ তুলিয়া আমাকে একবারও দেখেন নাই,—আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি,—আমি তাঁহাকে চিনিয়াছি,—তিনি আমাকে চিনিবেন না। তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থায় আমাদের পরিচয় দিলে, যদিই কোন অনিষ্ট হয়, তাই এখন পরিচয় দিব না। মা, শীঘ্র তাঁহাকে ঘরে লইয়া চল।"

ডাক্তার ডাকা হইল। বিকারাবস্থা দেখিয়া ডাক্তার সম্পূর্ণ আশা দিতে পারিলেন না। মলিনা মাকে লইয়া অহোরাত্র স্বামীর শুশ্রূষায় নিমগ্ন রহিল,—আহার নিদ্রার নিয়ম রহিল না। প্রাণেশ্বরকে কাছে পাইয়াছে, আজ মলিনা তাঁহার জন্য আপনার তুচ্ছ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে।

বিধাতা মলিনার কাতর ক্রন্দন শুনিলেন। মলিনা প্রাণ-পণ শুশ্রূষায় করালগ্রাস হইতে স্বামীকে কাড়িয়া রাখিতে সমর্থ হইল। শচীন্দ্র সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিল,

রূপলাবণ্যময়ী বালিকার বেশে তাহার শিয়রে বসিয়া আছে! দেখিল, তাহার চক্ষু দু'টি অশ্রু-প্লাবিত,—দৃষ্টি উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কা-ব্যঞ্জক। কথা বলিবার শক্তি জন্মিলেই, শচীন্দ্র মলিনাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কে? তুমি কি কোন শাপভ্রষ্টা দেবী?—আমি কোথায় আছি?" ভাবিল,—"আমি কি তবে মরিয়া স্বর্গে আসিয়াছি?"

মলিনা প্রথমে কোন কথার উত্তর দিতে পারিল না। অশ্রুর আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, গৃহান্তরে গিয়া অশ্রু মুছিয়া আসিয়া বলিল,—"এইমাত্র আপনার চৈতন্য হইয়াছে। বেসী কথা বলিবেন না—কোন চিন্তার কারণ নাই, আমরা আপনাকে যথাসাধ্য নিরাপদ স্থানে রাখিয়াছি।" এই বলিয়া মলিনা পতির মস্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, তাঁহাকে পথ্যাদি পান করাইতে লাগিল। এমন শুশ্রূষায় শচীন্দ্র রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল। এমনভাবে সারা জীবন রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেও তাহার অনিচ্ছা রহিল না।

শচীন্দ্র অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াও রমণীদ্বয়ের পরিচয় পাইল না,—কেবল বুঝিল, ইঁহারাই তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। কোলে মাথা রাখিয়াই বলিল,—"তোমরা যে-ই হও, তোমাদের ঋণ এ জীবন দিয়াও শোধ করিতে পারিব না।" এই বলিয়া মুগ্ধনেত্রে মলিনার হর্ষোৎফুল্ল মুখখানার দিকে শচীন্দ্র অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; ভাবিতে লাগিল,—"এ বালবিধবা মানবী—না দেবী?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শচীন্দ্র ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। মলিনা যখন বুঝিল, স্বামীর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে পারিয়াছে,—

বলিল,—"আমি বড় দুঃখিনী; আমি বিধবা হইয়াছি শুনিয়া, মাসাধিক কাল হইল মা আমাকে নিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিতে আসিয়াছেন। আমাদের আর কেহ নাই, এখানে থাকিয়াই বৈধব্য-জীবন কাটাইব মনে করিয়া আসিয়াছিলাম। আপনার মনে থাকিতে পারে, আপনাকে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় রাস্তার ধারে পাইয়া বাড়ী আনিয়াছিলাম। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যাহা পারি, আপনার শুশ্রূষা করিয়া, কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি। আমরা সেজন্য আপনার কৃতজ্ঞতায় পাত্রী নহি। করুণাময় বিধাতা আপনাকে বাঁচাইয়াছেন,—তাঁহার নিকট আমরা সকলে কৃতজ্ঞ।" একথা বলিতে বলিতে মলিনার চক্ষু দু'টি জলে ভরিয়া গেল।

মলিনা বহুকষ্টে এত দিন আত্মগোপন করিয়া, কেবল স্বামীর ভালবাসার দৃঢ়তা পরীক্ষা করিতেছিল। সম্প্রতি ভাবিল,—সমস্ত বলিয়া ফেলিবে। কিন্তু তাহার বড় সাধ হইল, স্বামীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে, এবং সেই অবস্থায় তাহাকে শপথ করায়,—"যে আর কখনও তাহাকে ত্যাগ করিবে না।"

শচীন্দ্র ভাবিল,—"ইহা আবার কোন্ মায়ার ছলনা!" তাহার মনে হইল,—যেন স্বপ্নরাজ্যে বাস করিতেছে। কিছুই বুঝিতে পারিল না। মলিনাকে তুলিতে গেল; তখন সে দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে শচীন্দ্রের বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়িল,—কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। ক্ষণকালের জন্য সে পতি-সুখ লাভ করিয়া, ধরা স্বর্গ মনে করিল। শচীন্দ্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও দ্রুত বুক হইতে সরিয়া গেল।

হঠাৎ মলিনারও চৈতন্য হইল। সে বুঝিতে পারিল,—পরিচয় না দিয়াই এতটা করিয়া স্বামীকে এখন সঙ্কটাপন্ন করা অন্যায় হইয়াছে। যে ভাবে পরিচয় দিবে ভাবিয়াছিল, সে ভাবে দিতে পারিল না। তখন লজ্জায় মিয়মাণ হইয়া ভাবিতে লাগিল

আর এস্থানে এবেশে পরিচয় দিবে না,—স্বামীর গৃহে সধবার বেশেই এ সাধ মিটাইবে।

শচীন্দ্র গভীরতর প্রহেলিকায় আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল। ভাবিতেছিল,—"এমন কত বালবিধবাই না তাহাদের অতৃপ্ত প্রেম-পিপাসা লইয়া শুকাইয়া যায়! ইহাদের জ্বালা কি জুড়াইবার নয়?—নিষ্ঠুর সমাজ কি এসব চাহিয়া দেখিবে?"

এমন সময়ে মলিনা বলিল,—"আমি অপরিচিতা, মনের আবেগে উন্মত্ত হইয়া, আপনার কাছে আজ বড় অন্যায় করিয়াছি,—আমায় ক্ষমা করিবেন।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই আবার বলিল,—"আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে, যদি শপথ করেন, আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, তবে আমি চিরদিন আপনার দাসী হইয়া থাকিব। শপথ করিতে পারিবেন কি?"

শচীন্দ্র বলিল,—"পারিব।"

মলিনা গম্ভীর স্বরে বলিল,—"তবে আমার মাথায় হাত রাখিয়া শপথ করুন,—আপনার পত্নীকে জীবনের চিরসঙ্গিনী করিয়া রাখিবেন,—তাহাকে কখনো ঘৃণা করিবেন না; তাহার স্থানে আর কাহাকেও বসাইবেন না।"

শচীন্দ্র এ কঠোর প্রতিজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হইবে কি না বুঝিতে পারিল না;—তবু শপথ করিতে হইল। বলিল,—"আমি যে তোমার কথার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমাকে ইহার অর্থ বুঝাইয়া বলিবে কি?"

মলিনা বলিল,—"আজ আর কিছু বলিব না, আমায় ক্ষমা করিবেন। আমার কাশীবাস আজ হইতে উঠিল,—আমি আজই এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইব। আপনি পত্নীর সহিত

সাক্ষাতের পূর্ব্বেই আপনার গৃহে আমার সাক্ষাৎ পাইবেন,—তখন অর্থ বুঝাইয়া বলিব।”

মলিনাকে শচীন্দ্র ক্রমেই দুর্জ্ঞেয় মনে করিতে লাগিল। এ রহস্যের কোন মীমাংসা করিতে পারিল না। সে সেই সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া, বাড়ী যাওয়ার দিন গণনা করিতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে শচীন্দ্রকে বাড়ী পাঠাইতে মাকে বলিয়া, মলিনা শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল।

শচীন্দ্রের পিতামাতা তখনো জানিতেন—“মলিনা বিধবা!” সেও বাড়ী গিয়া কিছুই বলিল না। নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার পর শচীন্দ্র বাড়ী পঁহুছিল। পিতামাতা হারাধন পাইয়া আহ্লাদে আত্মহারা হইলেন। শচীন্দ্র তাহার মৃত্যু-জনরব সম্বন্ধে কিছুই জানিত না; পিতামাতা তাহা বুঝিতে পারিয়া, সেই আনন্দের দিনে সে বিষয় কোন কথা তুলিলেন না।

মা বলিলেন,—“বাবা, তুমি আর কোথাও যাইতে পারিবে না। তোমার মনের মত পাত্রী দেখিয়া বিবাহ করাইব। যে বধূর জন্য বাড়ী ছাড়িয়াছিলে, তাহাকে কালই তাহার মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিব। ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিতে চাহিলে,—এমন কি, তুমি বিধবা বিবাহ করিতে চাহিলেও, সপরিবারে সমাজচ্যুত হইয়া, তাহাও করাইব; তবু তুমি আর বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না।”

মায়ের কথা শুনিয়া শচীন্দ্র একবার ভাবিল,—“তবে এখনত তাহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেই, পিতা সেইরূপ গুণান্বিতা বালবিধবার সহিত তাহাকে পরিণয়সূত্রে বন্ধন করিয়া, উভয়ের জীবন মধুময় করিতে পারেন।”

এদিকে মলিনা নির্জ্জনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া, গন্ধতৈল মাখিয়া

চুল আঁচড়াইয়া বহুদিন পরে খোপা বাঁধিয়াছে; ফুলের মালা পরিয়াছে, বস্ত্রে এসেন্স মাখিয়াছে, আলতা পড়িয়াছে, সীমন্তে সিন্দুর দিয়াছে,—আর একখানা নূতন বানারসী শাড়ী পরিয়া, সমস্তগুলি গহনায় শরীর মণ্ডিত করিয়াছে।

শচীন্দ্র শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াই শুনিতে পাইল,—অলঙ্কারের মৃদু ঝঙ্কার ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছে। শুনিয়া, ভাবিল,—"আজ না আমার সহিত সেই বালবিধবার সাক্ষাতের কথা; সে কি তবে কথা রক্ষা করিতে পারিল না?" পর-মুহূর্ত্তে সবিস্ময়ে দেখিল,—সেই বিধবা বালিকাই সধবার বেশে গৃহে প্রবেশ করিয়া, তাহার চরণে প্রণত হইয়াছে। শচীন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"একি এ! তোমার আজি এ বেশ কেন? আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!—মলিনা কোথায়?"

মলিনা তখন বাহুপাশে শচীন্দ্রের দেহ বেষ্টন করিয়া বলিল,—"প্রাণেশ্বর, প্রিয়তম, জীবনসর্ব্বস্ব, হৃদয়ের দেবতা, দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করিও—আমিই তোমার মলিনা!"

শ্রীউমেশচন্দ্র চাকলাদার।

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

বান্ধব।—আষাঢ়, ১৩১১।—কালোরূপ। ভারতে আবহমান কাল হইতে কাব্য-সাহিত্যে "কালোরূপ" কিরূপ প্রীতি, আনন্দ, গৌরব, কিংবা স্থান বিশেষে পূজার ভাষায় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা রঘুকুল-ধুরন্ধর লোকাভিরাম রামচন্দ্র, তাঁহার ভ্রাতা সুনীল পদ্মপত্রাক্ষ ভরত, অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত ও বেদান্তদর্শন প্রভৃতি রচয়িতা অলোকসাধারণ মনীষী কৃষ্ণ-

দ্বৈপায়ন, তাঁহার নায়ক কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অদ্বিতীয় অভিনেতা অর্জ্জুন, দ্রুপদ-দুহিতা কৃষ্ণা, এবং ভারতীয় কাব্য-সাহিত্য ও ভারতীয় নরনারীর কোটীকল্প প্রেমভক্তির গীতে 'কালোরূপ' নামে বিখ্যাত—পুরাণ, উপপুরাণ ও অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কাব্য-গ্রন্থ, যাঁহার অনির্ব্বচনীয় 'কালোরূপের' প্রভাব-বর্ণনায় উদ্ভাসিত, সে 'কালোরূপের' আলোময় কান্ত-কলেবর শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি লোকোত্তর পুরুষদিগের কথা উল্লেখ করিয়া, শ্রদ্ধেয় লেখক তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছেন। প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম আপত্তি "কালোরূপ"—এই শব্দটি ব্যবহারে। অভিধানে আমরা "কালো" বলিয়া কোন শব্দ পাই না; তবে মাঝে মাঝে কবিতায় এবং 'চুট্‌কী' গদ্যেও 'মোলায়েম্' শুনাইবার জন্য কাল শব্দটি "কালো" রূপে ব্যবহৃত হইতে দেখি। তবে যিনি শব্দ-শিল্প ও বাঙ্গালা ভাষা-বিজ্ঞানে বিশেষ অভিজ্ঞ বলিয়া বঙ্গদেশে শ্রদ্ধাস্পদ, তিনি অবশ্যই কোন বিশেষ বিধানানুসারে ইহার ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা শিক্ষার্থীর প্রাণে এই শব্দ-ব্যবহারের কারণ জানিবার জন্যই ইহার উল্লেখ করিলাম। দ্বিতীয় কথা,—'কালোরূপ' সম্বন্ধে। কালরঙ যখন অন্তরনিহিত অনন্যসাধারণ গুণের সংস্পর্শ পায়, তখনই উহা "কালোরূপ" হইয়া দাঁড়ায়! নতুবা কালরঙে কোনরূপ মহিমা, মাহাত্ম্য বা তপ্ত-কাঞ্চনসন্নিভ বর্ণের তুলনায়, কোন বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে বলিয়া, আমরা বোধ করি না। কালরূপজ মোহের ভিত্তি—গুণজ মোহে। শ্রদ্ধেয় লেখক যাঁহাদের প্রাতঃস্মরণীয় নাম প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলই জ্ঞান, ধর্ম্ম, কিংবা কর্ম্মভারে মানব-জগতের মুকুটমণি। বর্ত্তমান যুগেও সামাজিক প্রহসনে, "রূপ-যাচাই" করিবার যখন যেখানে আবশ্যক পড়ে তখনই "বরের রঙ কেমন",—"কনের রঙ কেমন" বলিয়া, একটি

বিশেষ কল-কল ধ্বনি উত্থিত হয়। যাহাদের ঘরে এই বিষয়ে—বিশেষ কনের দিক দিয়া, যদি একটু গলদ থাকে, তাহা হইলে, মুখে "পাউডারের" শ্রাদ্ধ করিয়া, কিংবা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কোন কৌশলে সুবিধা না দিয়া, "ফটোগ্রাফ্" সাহায্যে, আশঙ্কিত "অচল"কে পার করিবার চেষ্টা দেখা হয়; কারণ 'ফটোগ্রাফে' রঙ উঠে না। যখন দুই পক্ষই বিশেষ কোন কারণে অনন্যগতি হইয়া দাঁড়ায়, কিংবা কোন অবস্থায় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়, তখন 'কালরঙ' আসামীর পক্ষে মুখের "কাট্"ই উকীল হইয়া দাঁড়ায়! শুভানুধ্যায়িগণ বর কিংবা কন্যার—বিশেষ বরের যাহাতে মন না বিগড়ায়, সেই জন্য রঙ কাল হইলেও, মুখের "গড়ন" খানি ভাল,—এই ভণিতা আবৃত্তি করেন। কাজেই কাল রঙটা যে অনেকেরই বিশেষ বাঞ্ছনীয় পদার্থ নহে, আমরা ইহাতেই অনেকটা বুঝিতে পারি। তবে অবস্থাভেদে—কারণভেদে—দেশকালপাত্রভেদে, সকলই সুন্দর, মনোমত ও প্রীতিপ্রদ হইতে পারে। পাঠকপাঠিকাদের নিকট সবিনয় নিবেদন, যাহারা নিজে কাল, কিংবা যাহারা জীবনের অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারণজালে ও ক্রমতরঙ্গে "কালোরূপ" ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারা যেন আমাকে "কালোরূপের" নিন্দুক মনে না করিয়া, অন্তরের সহিত ক্ষমা করেন। কিন্তু কাল চুল ও চক্ষুর কাল তারার কথা লিখিত আছে; তাহার সৌন্দর্য্য ও স্নিগ্ধতার বিষয়ে কেহ প্রতিবাদ করিলে, "খুনা-খুনি" করিতে রাজি আছি।

ব্রহ্মদেশ-কাহিনী—(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)—শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত। লেখক যদি নিজের দার্শনিক মতের অবতারণা না করিয়া, সাদা-সিধা ব্রহ্মদেশের কাহিনী লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে বহু পুরাতন তণ্ডুলের ন্যায় "রস্-তস্" না থাকিলেও,

কোন অপকার নাই বিবেচনায়, উদরস্থ করিতে আপত্তি না করিয়া থাকিতে পারিতাম। লেখক এবার প্রথমে লিখিয়াছেন,—"মানবগণ জননী-গর্ভে, সূতিকাগৃহে, মৃত্যুমুখে, কর্ম্মক্ষেত্রে, অন্তরে বাহিরে, নিরন্তর কত অদ্ভুত ও আশ্চর্য্যজনক খেলাই খেলিতেছে, তবুও খেলার সাধ মিটে না; আবার দিন দিন নানাবিধ কৃত্রিম খেলার উপায় উদ্ভব করিয়া, এই সংকীর্ণ জীবন আরো সংকীর্ণ ভাবে কাটাইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে। পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই, যাহারা কখন অসার আমোদ প্রমোদে যোগ না দিয়াছে; সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত সভ্য অসভ্য সকল দেশেই কৃত্রিম আমোদ লইয়া সকলে মহাব্যস্ত, এই দেশেও ইহা ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য"। কিন্তু এ সকল দার্শনিক কথার, অন্যের কথা দূরে থাকুক, তিনি তাহার নিজ জীবনে সম্পূর্ণরূপে সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন কি? যাহা এ পর্য্যন্ত হয় নাই—হওয়ার আশা নাই, সেই সকল 'কৃত্রিম দার্শনিক আমোদ' কল্পনা-জগৎ হইতে টানিয়া আনিয়া, বাস্তব জগতে এইরূপে কালি-কলমে লিখিয়া ফল কি? যিনি অসার আমোদ প্রমোদের বিপক্ষপাতী, তিনি আবার কেন এরূপ আবার কতকগুলি কথা লিখিয়া, "কৃত্রিম খেলার" উপায় উদ্ভাবন করিলেন? লেখক আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"মান্দালা নগরীর আরাকান মন্দিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুন্দর। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে উহা আকিয়াব হইতে নীত হয়"। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, মান্দালা নগরীতে তেমন কোন মনোহর ধর্ম্ম-মন্দির বা 'ফয়া' আদৌ নাই। আকিয়াব হইতে যে মন্দির নীত হয় বলিয়া, কিংবদন্তী আছে, তাহা মান্দালায় নহে,—মান্দালার ২।৩ মাইল দক্ষিণে 'মেহং' (Mayhong) নামক স্থানে বিরাজিত। উহা সেখানে

সাধারণ্যে 'কয়াজি' বা 'বড় কয়া' নামে পরিচিত। ভ্রমণ-কাহিনী লেখকদিগের এতাদৃশ ত্রুটি সর্ব্বথা মার্জ্জনীয় নহে।

সেখানে (কবিতা)।—শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ। দুই এক স্থানে একটু অস্বাভাবিকতা দোষে দুষ্ট হইলেও, লালিত্য-প্রভাবে কবিতাটি মধুর হইয়াছে। কবিতাটির আরম্ভে আছে,—

"নীরব রজনী নিথর অম্বর
আলোক বসনে ঢাকিয়া কায়,
জ্যোছনা আননে, তরলা তটিনী
হাসিয়া গাহিয়া চলিয়া যায়"।

ইহার কএক ছত্র পরেই আবার আছে,—

"সুনীল সলিলে, রজত তরঙ্গে
গলায় পরিয়া তারকা মালা,
ভাসিছে কাঁপিছে নীল চন্দ্রাতপ
হাসিছে অদূরে সরোজ-বালা"।

নদীতে কখনও পদ্ম ফুল ফুটে বলিয়া আমরা জানি না; উহা সরোবরেই স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে বলিয়া জানি; এবং রাত্রিতে "সরোজ-বালার" হাসি নিতান্তই অস্বাভাবিক। পূজনীয় সংস্কৃত-কবিদের আমল হইতে এ তত্ত্ব কতবারই যে পঠিত, কণ্ঠস্থ ও উদরস্থ হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই; এবং যাঁহারা সরোবরে প্রভাত-সূর্য্য-কিরণে পদ্মকে ফুটিতে ও রজনী সমাগমে মুদিত হইতে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ত কোন কথাই নাই। নবীন কবি, তাঁহার ভাবী রচনায়, যাহাতে এরূপ অস্বাভাবিক দোষ না ঘটে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিলে, আমরা সুখী হইব।

মোগলের অধঃপতন (মোহম্মদ সাহ)।—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত। এটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। মন্দ লাগিল না। লেখক যদি

চরিত্র বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি 'মুন্‌সীয়ানা' কথা ভরিয়া দিতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, প্রবন্ধটি পড়িতে আরও উপাদেয় হইত।

বিজয়াবসান (কাব্য)।—শ্রীবসন্তকুমার রায় এম্, এ, বি, এল। এই কাব্যের প্রথমাংশ,—যাহা এই সংখ্যায় বাহির হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বোধ হইল যে, গুরুপাক সংস্কৃত সাহিত্য সম্যকরূপে পরিপাক না পাওয়ার দরুণ বদ্‌হজম হওয়ায়, এবং সেই সময়ে মস্তিষ্ক গরম নিবন্ধন লেখক উৎকট যশাকাঙ্ক্ষারূপ বায়ুরোগে আক্রান্ত হওয়ার দরুণ, উদ্‌গাররূপ উচ্ছ্বাস-সাহায্যে ঐ সকল গুরুপাক পদার্থের অনুকরণ, অর্দ্ধজীর্ণ অবস্থায়, বাঙ্গালার রূপ ধারণ করিয়া, পদ্যাকারে বাহির হইয়াছে! কবিতাটি পাঠ করিতে দন্ত, ওষ্ঠ, এবং তালু ইত্যাদি স্থানের অতি উৎকট রকমের ব্যায়াম হয়! নিদর্শন স্বরূপ দুই একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি;—

*   *   *   *   *

"বহ্বৃচী ঋক্ কহিতে কণ্ঠ
নিরুদ্ধ কি অত্যাহিত,
উদ্‌গাতা সভয়ে গহনে গাহয়ে
কোথা সাম উদগীথ!"

*   *   *   *   *

কামান-গর্জ্জন অন্তরে শুনহ
সোল্লাস তূর্য্য-নিনাদ;
সানাই টিকারা শাঁ শাঁ ত্রেখিগিটি
ঘোষে ধ্বনি অবিষাদ।"

এইরূপ "শাঁ শাঁ।" "ত্রেখিগিটি" ইত্যাদি উৎকট শব্দ এই কবিতার প্রতি ছত্রেই দুই চারিটি পাওয়া গিয়াছে। পাঠক "ফর্টি ক্যাণ্ডলস্ পাউয়ারের ল্যাম্পের" আলোর নিকটে না পড়িলে,

এই প্রকার শব্দ-পাঠ-সময়ে মুখ-নিঃসৃত প্রভঞ্জনে বাতি নির্ব্বাপিত হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা! যদি এইরূপ "ত্রেধিগিটি" তালেই পড়িতে হয়, তাহা হইলে, মং ৩।৶০ আনার বাব্দবে পড়িব কেন?—সন্ন্যাসপূজায় দেখিলেই ত চলে! আর যদি "এম্ এ, বি, এল" ধ্বজাই ইহা পত্রস্থ করিবার একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার! আবার লেখা আছে—"ক্রমশঃ"! আতঙ্কের বিষয় বটে! যদি একান্তই প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে, এই গ্রীষ্মকালে প্রকাশ না করিয়া, শীতকালে ক্রমে প্রকাশ করিলেই ভাল হয়; কারণ ইহা ঘর্ম্মোদ্রেকের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে।

আদর্শ সংস্কারক দয়ানন্দ (৪)—শ্রী দেঃ—পৃথিবীতে ধর্ম্ম স্থাপনের নামে যে পরিমাণ অধর্ম্মের কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এত আর কিছুতেই হয় নাই। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিবে; এবং কেন এই স্বর্গের সুরভি-শীতল নন্দন-মলয় প্রবাহিত করিতে যাইয়া, নরকের বিশ্বত্রাসজনক বিভীষিকাময় নীলাভ অনল-জ্বালা সাধারণতঃ অত্যধিক পরিমাণে বাহির হইয়া পড়ে, তাহার কারণ খুঁজিতে গেলে, "গোড়ামিতে অন্ধ" নামক অবস্থাটি অন্য দশ কারণের মধ্যে একটি কারণ বলিয়া দেখা যায়। এমন কি, যাহারা এসকল বিষয়ে কাগজে-কলমে কিছু লিখিতে চাহেন, তাহারাও অনেক সময়, কোন মহাত্মার পিছু ধরিয়া, এতদূর খেপিয়া উঠেন যে, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা না করিয়া, স্তুতির নেশায় দিশাহারা হইয়া, যে কোন কথা,—খেয়াল চাপিলেই এক ধাক্কায় "মাঝ-দরিয়ার" মাঝে ঠেলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন না। লেখক স্থানে স্থানে "দয়ানন্দকে" শঙ্করাচার্য্যের সহিত প্রায় একাসনে বসাইতে চেষ্টা করিয়াছেন! লোকে কথায় বলে,—"যার না জানি বাপের নাম, তার বলি দাদার

নাস্ক!” কিন্তু এ যে তাহা হইতেও বেশী। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম যখন ভারতবর্ষকে একবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তখনই ব্রহ্মণ্য বলের সমবেত শক্তি লইয়া, শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন; এবং অনেকটা তাঁহারই শক্তিতে বুদ্ধদেবের “অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ” এই ধর্ম্মসূত্র ভক্তি ও ভগবান্ বিহীন নীরস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ভারত ছাড়িয়া সুদূর সিংহল, জাপান, ব্রহ্ম, এবং চীনে আশ্রয় লইয়াছিল। আর ঐ কঠোর ‘অহিংসা ধর্ম্মই’ ভারতে দয়ার অমিয়ে দ্রবীভূত হইয়া ও ভক্তিতে নূতন প্রাণ পাইয়া, সেই এক অভিনব বিচিত্রভাবে পুনরুজ্জীবিত সনাতন ধর্ম্মরূপে ভগবানের পাদপদ্মে প্রণত হইয়াছিল। যে পৃথ্বী-বিরল মনীষী মহাপুরুষ দ্বাত্রিংশ বৎসরের মধ্যে এতাদৃশ কার্য্য করিয়া, এবং বহুতর উপদেশ পূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, মানবলীলা সংবরণ করেন, তাঁহার সহিত দয়ানন্দ সরস্বতীর তুলনা করিলে, লেখকের সমীচীনতায় সন্দেহ জন্মিবে, আশ্চর্য্য কি? লেখকের ভাষার সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। কিন্তু তাঁহার মতের সহিত অনৈক্য ঘটাতেই, একথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি।

আশার সান্ত্বনা (কবিতা)—শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ। অনুরোধে-উপরোধে অনেক সময় “ঢেকি” গিলা যায় বটে, কিন্তু ভাল কবিতা সাধারণতঃ লিখিয়া উঠা যায় না। বান্ধবে ‘ছায়াদর্শন’ বাহির হয়; এই কবিতাটিও উহারই তত্ত্ব লইয়া লিখিত হইয়াছে। কবিতার নামটি বড়ই মধুর—“আশার সান্ত্বনা”। ‘বান্ধবে’ প্রকাশিত “ছায়াদর্শনের” তত্ত্ব অনুগমন করিলেও, এক স্থলে কবিতাটির একটু পার্থক্য আছে। কবি লিখিয়াছেন:—

“এ ধরার দুঃখক্লেশ এখানেই পা’বে লয়”।

কিন্তু “ছায়া-দর্শন” বলেন,—“পাপের যে পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত তুমি জীবিতই থাক কিংবা মৃতই হও, কিছুতেই

কষ্টের নিবৃত্তি নাই”। কবিতাটি উৎকৃষ্ট শিল্পীর হস্তের সুন্দর প্রাণহীন প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় যথাসম্ভব জীবন্ত ভাব উজ্জীবিত করিতে প্রয়াস পাইতেছে।

পর-পার-বাসিনী (কবিতা)—শ্রীঃ—। এই কবিতাটিও “ছায়াদর্শনের”ই ভাবে অণুপ্রাণিতা। তবে একটি কথা, শ্রদ্ধের সম্পাদক মহাশয়, যদি “পর-পার-বাসিনী” কবিতাটিতে টীকা দিয়া, কিংবা “ফুটনোট্” (Foot-note) দিয়া লিখিয়া দিতেন যে,—“এই কবিতাটির প্রথম লাইন আঠার অক্ষরে সমাপ্ত; তৎপরের প্রতি লাইনেই চারি অক্ষর কম হইয়া চলিয়াছে,”—তাহা হইলে ছন্দ সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্যই ছিল না। কবিতাটির একস্থলে লিখিত আছে,—“তারার তৃষিত আঁখি করুণ-লোহিত।” তারার “করুণ-লোহিত আঁখি” পদার্থটা কেমন বুঝিলাম না। তারার “লোহিত আঁখি” কখনও দেখি নাই,—হয়ত আমরা অকবি বলিয়াই তারা “লোহিত আঁখি”তে আমাদের দিকে চাহেন নাই। কবিতাটি চলন-সই হইয়াছে।

ছায়াদর্শন—পূর্ব্ববৎ।

দ্বিতীয় খণ্ড] কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ, ১৩১১। [৭ম

“উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিত
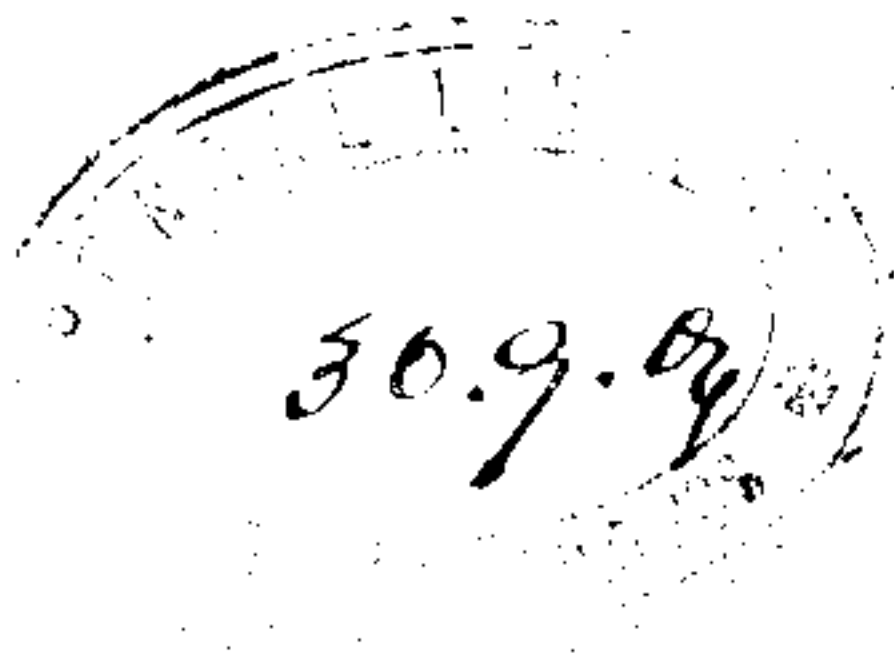
ক্লিওপেট্রা ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

ব্যক্তিবিশেষের চরিত-আখ্যানের নাম জীবন-চরিত ; জাতীয় জীবন-চরিতের নাম ইতিহাস। অক্ষরে অক্ষরে সত্যের সম্মান রক্ষা করিয়া জীবন-চরিত লেখা যেমন কঠিন কর্ম্ম, ইতিহাস লেখা তেমনই, বা ততোধিক দুরূহ ব্যাপার। যেখানকার যে সময়ের ঘটনা, সেই স্থানে, সেই সময়ে উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টাও যদি উহা লিখেন, তাহা হইলেও, সত্যের মর্য্যাদা, সকল সময়ে, অক্ষুণ্ণ থাকে কি না সন্দেহ। কারণ, প্রথমতঃ মনে যাহা বুঝা যায়, বর্ণে তাহা সম্যক্ ফোটে না। ভাষা ভাবের আভাস মাত্র,—অবিকল প্রতিকৃতি নহে। দ্বিতীয়তঃ, মনে যাহা বুঝা যায়, তাহাই ঠিক কি না, ইহাও অনিশ্চিত। দৃষ্টিদোষে, অনেক সময়, মানুষ রামকে শ্যাম বুঝিয়া, তাঁহার করে ধনুর পরিবর্ত্তে মুরলী তুলিয়া দিয়া, একে আর করে এবং পদে পদে বিড়ম্বিত ও উপহসিত হয়। এই সকল কারণেই বলি, প্রকৃত ইতিহাস পৃথিবীতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাণী এলিজাবেথের সভাসদ্ ও প্রিয়পাত্র স্যার ওয়াল্টার রেলী, যখন ভাগ্য-বিপাকে কারাগৃহে আবদ্ধ হন, তখন তিনি কারাগারে বসিয়া পৃথিবীর ইতিহাস লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহা বলাই বাহুল্য যে, তিনি সেখানে সাধারণ্যে পরিচিত নিত্যপ্রত্যক্ষ জেলখানার কএদীর মত ছিলেন না। তিনি একদা কারাগারের বাতায়নে উপবিষ্ট

আছেন, এমন সময়, অদূরে কতকগুলি লোক চীৎকার ও উচ্চ কলরব-সহকারে কলহ করিতেছিল। তিনি ঐ স্থানে, কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, ইহা জানিবার জন্য, ঐকান্তিক আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বশতঃ, একাদিক্রমে তিন চারিটি ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিলে, তিনি এক এক জনের মুখে এক একরূপ কথা শুনিয়া, বিস্ময়ের সহিত, চিন্তা করিলেন যে, এইমাত্র চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঘটনার বর্ণনাই যখন এইরূপ পরস্পর-বিরোধী, তখন পৃথিবীর ইতিহাসে যে কি পরিমাণ ভুল, ভ্রান্তি হওয়া সম্ভবপর, তাহার ইয়ত্তাই করা যায় না। অতএব, তিনি নিরাশচিত্তে পৃথিবীর ইতিহাস লেখার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃত ইতিহাস যে লিখিত হইতে পারে না, তদ্বিষয়েই এক প্রকাণ্ড প্রবন্ধ রচনা করিলেন।

বস্তুতঃ, এই অর্থে প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলন অসম্ভব কথা। কিন্তু তাই বলিয়া, ইতিহাস লিখন ও পঠন অনাবশ্যক পণ্ডশ্রম, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। অপূর্ণ মানবকৃত, আধ-প্রকৃত, আধ-অপ্রকৃত বৃত্তান্তমূলক অপূর্ণ ইতিহাস দ্বারাও, জগতের যখন প্রভূত মহোপকার সাধিত হইতেছে, হইয়াছে ও হইবে, তখন সেই অপ্রকৃত ও অপূর্ণ ইতিহাসও উপেক্ষার সামগ্রী নহে। যদি আত্মোৎকর্ষ-বিধানে যত্ন করিতে হয়, 'আপনি কি',—আগে তাহাই ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। আত্মগত অভাব, সদ্ভাব, অপকর্ষ ও উৎকর্ষ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে, উৎকর্ষ ও উন্নতির প্রকৃত পথ পাওয়া যাইতে পারে না। একথা যেমন ব্যক্তি সম্বন্ধে, তেমন জাতি সম্বন্ধে, যেমন জাতি সম্বন্ধে, তেমন সমগ্র মানবজগৎ সম্পর্কে প্রযুজ্য। জাতীয় উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, সেই জাতি কি ছিল, কি হইয়াছে,—কোন্ সূত্রে, কখন, কিভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল, আবার কি

কারণে, কিরূপে অধঃপাতের পথে অবতরণ করিয়াছে, দুই দিককার এই দু'টি সোপান জানিয়া, বুঝিয়া, চিনিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহা না করিলে, ভাবী উন্নতির যথার্থ পথ বাহির করা কদাপি সম্ভবপর হইতে পারে না। ইতিহাসই এ অংশে প্রকৃত পদপ্রদর্শক। ইতিহাস, বিবরণের সূক্ষ্মবিশ্লেষে, অশেষ ভুল, ভ্রান্তি ও অসত্যের শত অভ্যুক্ষণে, কলঙ্কিত হইলেও, মোটামোটিরূপে মানবীয় উন্নতি ও অবনতিরই ধারাবাহিক প্রস্ফুট চিত্র। এই হেতুই, ইতিহাস শত ভ্রম-প্রমাদ সত্ত্বেও শিক্ষাপ্রদ ও মানুষের চির আদরণীয় উপাদেয় সম্পদ্। অসাধারণ প্রতিভাশালী ও অলোকসাধারণ মনীবী স্যার ফ্রেন্সীস বেকন (Sir Francis Becon) "On Studies" নামক প্রবন্ধে ইতিহাসের গৌরব ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন :—

"History makes a man wise".

* * * * * *

যেমন স্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাস, তেমন পরজাতীয় পরদেশী ইতিহাস, উভয়েই এ অংশে প্রয়োজনীয়। জাতিগত বৈষম্য হেতু, বাহ্য আকৃতি ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে, এক জাতির ইতিহাসের সহিত অন্য জাতির ইতিহাসে বহিরঙ্গে উপর-ভাসা পার্থক্য থাকিলেও, উহা মূলে এক। সমস্ত ইতিহাসই এক মানবজাতির আখ্যায়িকা। সুতরাং কোন জাতির ইতিহাসই, উন্নতি-প্রয়াসী কোন জাতির পক্ষে অবহেলার বস্তু হইতে পারে না। এই কারণেই, শত আয়াস স্বীকার করিয়াও, ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞ ঐতিহাসিকগণ, নানা দেশের নানা পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া, আপন আপন ভাষায় আগ্রহের সহিত গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন।

স্বদেশের ও বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস লেখা অনেকটা

সুসাধ্য। কিন্তু শত সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী পরদেশ, এবং তৎ-সংক্রান্ত, শত সহস্র যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন ইতিহাস লিখিয়া তুলা, যায়-পর-নাই কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপার। ইহার পরে মিশরীয় রাজবংশের ইতিহাসে, একই নামাঙ্কিত বহু ব্যক্তির উল্লেখ থাকা হেতু, বিষম গোলে পড়িতে হয়। প্রাচীন ও বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ সকলেই এই নাম-বিভ্রাটে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়াছেন। তাঁহারা, এতদুপলক্ষে প্রাচীন মৈশর-সভ্যতা কিংবা তৎসাময়িক রাজবংশের উপর একটু তীব্র কটাক্ষপাত করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। মিশরীয় রাজাদিগের মধ্যে টলিমি রাজবংশের ইতিহাস এই অংশে, অধিকতর দুরূহ ও দুরধিগম্য। প্রসিদ্ধনামা কৃতী ঐতিহাসিক-গণও টলিমি-ইতিহাসের জটিল বর্ত্মে প্রবিষ্ট হইয়া, এক এক বার ধৈর্য্যচ্যুত ও দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। আমিও আজি তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই "টলিমি" ধাঁ-ধাঁ-থানায় পা ফেলিয়া, বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার জন্য, ক্লিওপেট্রার কাহিনী সঙ্কলনে প্রয়াসপর হইলাম।

পৃথিবী যখন অজ্ঞানতার গভীর তিমিরে আচ্ছন্ন, মনুষ্য যখন ব্যাঘ্র ভল্লুকের ন্যায় বন্যভাবাপন্ন বনচর মাত্র,—পৃথিবীর সেই ঘোর তমসান্ধ অমানিশার নিবিড়-অন্ধকারে, প্রথম-প্রভাত-রশ্মি বা তরুণ-অরুণ-আলোক প্রথম স্ফুরিত হয় ভারতবর্ষে,—তৎপর প্রাচীন মিশরে। ঋক্ প্রভৃতি বেদচতুষ্টয়ের কতিপয় সূক্তের ব্যাখ্যা দ্বারা, কেহ কেহ প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, আর্য্যজাতি মানবীয় সভ্যতার বীজ-মন্ত্র,—জ্ঞানের স্ফুরন্ত প্রতিভা লইয়া, দেব-ভূমি উত্তর মেরু হইতে ভারতের দিকে প্রস্থিত হইয়াছিলেন; কেহ অনুমান করেন, তিব্বত ও তাতা-রের প্রান্তই তাঁহাদিগের আদিস্থান; আবার কেহ কেহ বলেন,

হিমাদ্রি প্রদেশ হইতে তাঁহারা ভারতের সমতল ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। এ সকল অনুমান ও সিদ্ধান্ত সত্য হউক, আর না হউক, আর্য্যসভ্যতার প্রথম বিকাশ স্থান যে ভারতবর্ষ, এবং সেই আর্য্যসভ্যতারই আলোকপাতে যে প্রাচীন মিশর কৃতার্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রাচীন মিশরের গৌরব-সূর্য্য, অনেক কাল হইল, অস্তমিত হইয়াছে। মিশরের সেই প্রাচীন বীরত্ব, কীর্ত্তি, জ্ঞানবৈভব বা গুণ-গরিমার কিছুই এক্ষণ নাই। কিন্তু স্মৃতির বিলোপ সহজে ঘটে না। মানুষ মানুষকে ভালবাসে। ভালবাসে বলিয়াই কখনও ভুলিয়া থাকিতে পারে না। এইজন্য, ইতিহাস, অতি যত্নের সহিত, যেন মানুষের শিক্ষার নিমিত্তই, মানুষের কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তি উভয়ই যথাশক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। ভারতীয় পুরাতন সভ্যতা ও মিশরীয় সভ্যতা প্রায় সমসাময়িক এবং একই গোমুখী-নিসৃত ভিন্ন পথবাহিনী দুইটি প্রবাহিনী। একটি স্ফটিক-ধবলা নির্ম্মলা গঙ্গা,—আর একটি নীল-আবিল-কালিন্দী। সুতরাং, মূলে এক হইলেও, দেশ, কাল ও পাত্রভেদে একজাতীয় বস্তু নহে। ভারতীয় সভ্যতার অন্যতর গৌরব-সম্পদ একদিকে অযোধ্যার প্রফুল্লসরোজিনী রাম-মহিষী সীতা,—অন্যদিকে হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ-রাজেশ্বরী নীলোৎপলবরণী পাণ্ডব-দয়িতা দ্রৌপদী; আর মিশরীয় সভ্যতার চরম পরিণতি,—প্রস্ফুট লিলী (Lily) বা লীলা-নলিনী মায়াচতুরা রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা। এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই উভয় দেশীয় সভ্যতার প্রকার ও প্রকৃতিতে কিরূপ পার্থক্য, পাঠকের তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে। সীতা ও দ্রৌপদীর বিষয় এদেশে নিত্যশ্রুত ও নিত্য-পরিজ্ঞাত কথা; কিন্তু ক্লিওপেট্রার কাহিনী তদ্রূপ নহে।

রাজ্ঞীর বিষয় ও তাঁহাদিগের সমসাময়িক কতকগুলি কথা, এস্থলে বিবৃত হইতেছে। আশা করি, ইহা পাঠক পাঠিকা-দিগের নিকট অপ্রীতিকর হইবে না।

মিশর ইতিহাসে, টলিমি রাজবংশে, ক্লিওপেট্রা নাম্নী ছয়টি রাজ্ঞীর উল্লেখ আছে। টলিমি রাজ-সিংহাসন, এই ষট্-সরোজিনীর বিলাস-কান্তি, রমণী-সুলভ-চতুর-চাতুরি, ও দুরাকাঙ্ক্ষার ক্রূরনীতিতে, কখনও অলঙ্কৃত, কখনও ধিকৃকৃত, কখনও বা আতঙ্কিত হইয়া বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকিলেও, ষষ্ঠ ক্লিও-পেট্রাই এ অংশে সর্ব্বাগ্রগণ্যা। ইংলণ্ডের অতুলকীর্ত্তি মহাকবি সেক্ষপীরের অমর তুলিকা-লাঞ্ছনে কৃতার্থ হইয়া, রোমক বীর এণ্টনীর মনোমোহিনী, অনিন্দ্য-সুন্দরী, মায়াকলা-নিপুণা, কুহকিনী ক্লিওপেট্রাই, অন্য সমস্ত ক্লিওপেট্রাকে অন্ধকারে ফেলিয়া, পৃথিবীর চক্ষু সবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। কেহ কেহ আজিও এই ক্লিওপেট্রার নামেই, কি যেন এক রূপের মোহিনী শক্তিতে মোহিত হইয়া, কল্পনাবলে সেই রূপের বেদীতে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইতেছে; এবং কেহ কেহ বা তাঁহার কুহক-লীলার বিচিত্র চাতুরি ভেদ করিয়া, সুষমার শোভন আবরণের অন্তরালে লুকান কালীয় নাগের ফণ-বিস্ফারণ ও বিষোদ্গার দেখিতে পাইয়া, সবিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিতেছে! মিশরের এই বিশ্ব-বিশ্রুত রাণী এণ্টনীর প্রণয়িনী ক্লিওপেট্রা টলিমি অলিথসের দুহিতা এবং ক্লিওপেট্রা নাম্নী রাজ্ঞীদিগের মধ্যে ষষ্ঠস্থানীয়া। ইঁহার কথা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ক্লিওপেট্রা নাম্নী পঞ্চ রাজ-মহিষীর কথা, যথাসম্ভব বিবৃত করিয়া লওয়া আবশ্যক।

টলিমি রাজবংশ যখন মিশরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন বিধি-বিড়ম্বনায় মিশরের অদৃষ্ট ও অবস্থা অন্যরূপ। যে মিশর,

সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া, ইউরোপের শিক্ষাগুরুরূপে দণ্ডায়মান ছিল, এবং প্রাচীন গ্রীস ও রোম দীক্ষার্থী শিষ্যের প্রাণে, শ্রদ্ধার সহিত একতান-নয়নে, যাহার পানে তাকাইতেছিল, সে মিশর তখন নাই।

মিশরের স্বদেশীয় পুরাতন রাজবংশ তখন সিংহাসনচ্যুত। মিশর পারস্যের যুগযুগান্তব্যাপী দাসত্বে হীনতেজ, হতবল, নিষ্পেষিত ও বিড়ম্বিত। এই সময়ে, মাসিডনের ভুবন-বিখ্যাত দিগ্‌বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার মিশরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। মিশর, ইহাতে বিন্দু মাত্র ভীত, ত্রস্ত বা উদ্বিগ্ন হইল না; বরং দুঃসহ পারসিক দাসত্ব-মোচনের পক্ষে, ইহা বিধি-প্রেরিত উৎকৃষ্ট সুযোগ মনে করিয়া, যেন উৎফুল্ল প্রীতির অভিনন্দনেই, "অত্রাগচ্ছ ভবান্"— বলিয়া তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতে অগ্রসর হইল। দুরদৃষ্টবশে বিপন্ন শিক্ষক, আজি এইরূপে ক্ষমতাপন্ন শিষ্যের শরণাপন্ন হইলেন। আলেকজাণ্ডার মিশরে প্রবেশ করিয়া, অনায়াসে মিশর জয় করিলেন। রাজধানী মেম্ফিসে মাসিডনীয় বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইল। এখনও ভূমধ্য-সাগরের তটে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া নামক প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-নগর আলেক্‌জাণ্ডারের সেই বীর-কীর্ত্তির ঘোষণা করিতেছে।

মিশর পর-পদানত ও দাসত্বের কিণাঙ্কে চিহ্নিত হইয়া থাকিলেও, তখন পর্য্যন্ত আপনার জাতীয় অস্তিত্ব অনেকটা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। সুতরাং আলেক্‌জাণ্ডার মিশর জয় করিয়াও, উহাকে গ্রীস বা মাসিডনিয়ার প্রদেশবিশেষে পরিণত করিতে পারিলেন না; বরং আপনিই যেন, একটু প্রীতির সহিত, মিশরের রেজেষ্টারীতে আপনার "দিগ্‌বিজয়ী" নাম লিখিয়া রাখিতে আনন্দ অনুভব করিলেন। তিনি বিস্তীর্ণ মরু পার হইয়া,

'আমন' দেবের মন্দিরে যাইয়া, মিশরের রাজধর্ম্মে দীক্ষিত এবং মৈশরী প্রথার অনুশাসনে রাজারূপে মৈশরীয় দেবতাবিশেষের নামে নামাঙ্কিত হইলেন।

আলেক্জাণ্ডারের অধীনে সেট্রাপ (Satrap) বা গবর্ণর দ্বারা মিশরের রাজকার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা হইল। টলিমি, আলেক্‌জাণ্ডারের একজন প্রিয় পারিষদ ও দক্ষ সেনাপতি ছিলেন। আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যুর পরে, তিনি প্রথম মিশরের সেট্রাপ বা গবর্ণর হইলেন, এবং কালক্রমে, একবারে মৈশরীয় ভাবাপন্ন মিশরবাসী হইয়া, স্বয়ংই মিশরের স্বাধীন রাজা হইয়া বসিলেন। ইনিই মিশরের টলিমিবংশীয় আদি রাজা। টলিমি যেমন মিশরীয় হইলেন, তেমন তাঁহার গ্রীক সভ্যতারও কিঞ্চিৎ তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মিশরীয় শাসন-ব্যবস্থা ও জাতীয় রীতি-নীতির সহিত সম্মিলিত হইয়া গেল। ইহার পর, কালে আলেক্‌জাণ্ডারের প্রতিষ্ঠিত আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া নগরই মিশর-সিংহাসনের অদ্বিতীয় নিয়ামক হইয়া উঠিল।

প্রথম ক্লিওপেট্রা।

প্রথম ক্লিওপেট্রা সিরিয়াধিপতি তৃতীয় এণ্টিওকাস্ দি গ্রেটের দুহিতা। ক্লিওপেট্রা সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা এবং শিশুকাল হইতেই একান্ত স্নেহশীলা ও প্রকৃত রাজ-নন্দিনীর ন্যায় কর্ত্তব্য-পরায়ণা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি মিশরের পঞ্চম টলিমি এপিফেইনেসের মহিষী। এই বিবাহদ্বারা সিরিয়ার শোণিত, মাসিডনীয় শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া, মিশরীয় টলিমি রাজবংশে এক অভিনব ভাবের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল।

ক্লিওপেট্রা-পতি পঞ্চম টলিমি এপিফেইনেসের পিতা চতুর্থ

ছিলেন। তাঁহার সময়ে মিশরের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। ভাগ্যে আরসিনুর ন্যায় চরিত্রবতী তেজস্বিনী রমণী তাঁহার মহিষী এবং সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্য-শাসন-সংরক্ষণের অর্দ্ধভাগিনী ছিলেন, তাই সিংহাসন পরকীয় শক্তি-সংঘর্ষে টলটলায়মান হইয়াও, ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে নাই। আরসিনু ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্বামীকে সকল সময়ে সংযতচিত্ত রাখিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সুমন্ত্রণা ও তেজস্বিতার রাজ্য-রক্ষণ কার্য্যে প্রভূত সাহায্য হইয়াছিল।

আর্সিনু টলিমি ফিলোপিটারের শুধু পত্নী নহেন,—ফিলোপেটার ও আর্সিনু, শোণিতসম্বন্ধে, পরস্পর ভ্রাতা ও ভগিনী। একই মাতৃগর্ভে জন্মধারণ করিয়া, একই মায়ের কোলে একই স্তন্যদুগ্ধে লালিত পালিত হইয়া, উভয়ে সুখে শৈশব অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যিনি, জন্মাবধি কিশোর বয়স পর্য্যন্ত, আদরের সহোদরা, তিনিই যৌবনে সিংহাসনের অর্দ্ধভাগিনী প্রিয়তমা প্রেয়সী! এইরূপ বৈবাহিক সম্বন্ধ, অন্য দেশীয়ের চক্ষে একান্ত অস্বাভাবিক ও রোমহর্ষকর মহাপাপ রূপে গণ্য হইলেও, মিশরীদিগের মধ্যে ইহা নিত্য-চলিত প্রথারূপে সম্মানিত ছিল। মিশর শক্তিসামর্থ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ও সভ্যতার বিবিধ বৈভবে, এক সময়ে পৃথিবীর আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই অদ্ভুত বৈবাহিক রীতিতে, চিরদিনই মনুষ্য-সমাজে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঘৃণ্য ও অপাংক্তেয় ছিল। মিশরবাসীরা পশুপক্ষীর পূজা করিত। ঈদৃশ বিবাহ-প্রণালীর প্রথম প্রবর্ত্তন, সম্ভবতঃ, তাঁহাদিকের উপাস্য দেবতা,—পক্ষী জাতিরই অনুকরণে। একই পক্ষিণীর ডিম্ব হইতে উদ্ভূত পুং ও স্ত্রী শাবক, জনক-পক্ষী ও জননী-পক্ষিণীর চঞ্চুবাহিত ধান্য-কণা ও কীট পতঙ্গাদি দ্বারা একই নীড়ে পরিবর্দ্ধিত হয়; এবং

যুগল সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া, পক্ষী-মিথুনরূপে উড়িয়া যায়। সম্ভবতঃ, ইহা দেখিয়াই, মিশরবাসীরা আপনাদিগের মধ্যে ভগিনী বিবাহের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছিলেন। মিশরবাসী, কিন্তু এ অংশে, পক্ষী জাতিরও একসিঁড়ী নীচে নামিয়া পড়িয়াছিলেন। মিশরে যিনি শৈশবে সহোদরা, তিনিই যৌবনে দারা, এবং হয়ত অবস্থা-চক্রে প্রৌঢ়বয়সে আবার তিনিই শাশুড়ীরূপে প্রণম্যা! প্রাচীন মিশরের কুলজী ব্যাখ্যা ও সম্বন্ধ-নির্ণয়, এই হেতু, বড়ই দুরূহ ব্যাপার ও যার-পর-নাই কঠোর সমস্যাপূর্ণ।

আর্‌সিহুর সহিত ক্লিওপেট্রার বিবাহ হইবার বহুকাল পরে, পঞ্চম টলিমি এপিফেইনেসের জন্ম হয়। চতুর্থ টলিমি ফিলোপিটার যখন পরলোকগত হন, তখন পঞ্চম টলিমি এপি-ফেইনেস্‌ অপোগণ্ড শিশু;—রাজ্যের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শত্রু। একদিকে রোমের সাধারণ তন্ত্র, অন্যদিকে গ্রীস-মাসিডনের ফীলিপ তৃতীয়,—আর একদিকে সিরিয়ার এণ্টিওকাস্‌ দি গ্রেট্‌। ইঁহাদিগের কেহ শস্ত্রধারী প্রকাশ্য রিপু,—কেহ অভিভাবক বেশে বকরূপী প্রচ্ছন্ন শত্রু!

মৃত্যুসময়ে, ফিলোপেটার শিশু পুত্রকে রোমের তত্ত্বাবধারণে রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া যান। সিরিয়াধিরাজ এণ্টিও-কাসের সহিত রাফিয়াতে ফিলোপেটারের এক ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল; সেই যুদ্ধে এণ্টিওকাস্‌ পরাভূত হন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে, পরাক্রান্ত এণ্টিওকাস্‌ আবার মিশরের অধিকৃত পেলেষ্টাইন অবরোধ করেন। ফিলোপেটারের মৃত্যুসময়ে, বহুস্থান মিশরের অধিকারচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। ফিলিষ্টিয়া ও পেলেষ্টাইন লইয়া এণ্টিওকাসের সহিত সংঘর্ষ চলিয়াছিল।

মিশররাজ শিশু পঞ্চম টলিমির অভিভাবক ক্ষমতাশালী রোম। এণ্টিওকাস দি গ্রেট সম্ভবতঃ এই কারণেই বলপ্রয়োগে

ফিলিষ্টিয়া ও পেলেষ্টাইন আত্ম অধিকারভুক্ত রাখা, সম্ভবপর মনে করেন নাই। সুতরাং বলের পরিবর্ত্তে কৌশলের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি মিশরের সহিত সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া চিরস্থায়ী সৌহার্দ্দ-স্থাপন মানসে, স্বীয় কন্যা ক্লিওপেট্রাকে তরুণবয়স্ক পঞ্চম টলিমিরাজের সহিত বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। খৃঃ পূঃ ১৯৮ অব্দে বাগ্দান-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বাগ্দানের পর, পাঁচ ছয়বৎসর অতিবাহিত হইলে, পঞ্চম টলিমির বয়ক্রম সপ্তদশ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, তৃতীয় এন্টিওকাস্ দি গ্রেট্ মহাসমারোহের সহিত তাঁহার কন্যা প্রথম ক্লিওপেট্রাকে পঞ্চম টলিমির সহিত বিবাহ-বন্ধনে সম্বদ্ধ করিলেন। মিশর ও সিরিয়া, এই উভয় রাজ্যের সীমান্ত-রেখায় অবস্থিত রাফিয়াতে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সিরিয়ার রাজপুত্রী মিশরের রাজমহিষী হইয়া, পরস্পর বিবদমান মিশর ও সিরিয়াকে চিরসৌহার্দ্দ-সূত্রে বদ্ধ করিলেন।

কলিসিরিয়া ও পেলেষ্টাইনের যে কর আদায় হইত, এন্টিওকাস্ তাঁহার কন্যাকে তাহা যৌতুক স্বরূপ দান করিলেন। ঐ সকল প্রদেশ পূর্ব্বে মিশরের অধিকারে ছিল। এই বিবাহ দ্বারা মিশরীয় কোন লুপ্ত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার হইল না। ক্লিওপেট্রা যৌতুক স্বরূপ ঐ সকল স্থানের কর মাত্র প্রাপ্ত হইলেন,—ভূমি সিরিয়ারাজের অধিকারেই রহিয়া গেল।

ক্লিওপেট্রা পতিপরায়ণা, পতি-অনুরাগিণী ও বুদ্ধিমতী রাণী ছিলেন। তিনি পতিকুলের সহিত পিতৃকুলের সংঘর্ষ যাহাতে না ঘটে, তৎপক্ষে যথাশক্তি যত্ন করিতেন। তিনি বুদ্ধিকৌশলে, ছয় সাত বৎসর ব্যাপিনী শান্তির সময়ে, পেলেষ্টাইন ও লোয়ার সিরিয়াতে মিশরের আধিপত্য ও প্রভুত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় অনেক-

এণ্টিওকাসের সহিত এই প্রীতিসম্বন্ধ স্থাপনের পরে, পঞ্চম টলিমি, লুপ্ত রাজ্য উদ্ধারের কোনই চেষ্টা করেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে, এণ্টিওকাস্ যখন রোমের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন অক্লেশে পেলেষ্টাইন এবং সিরিয়া প্রভৃতি অবরোধ করিয়া লইতে পারিতেন। সম্ভবতঃ প্রিয়তমা মহিষী ক্লিওপেট্রার মুখের দিকে চাহিয়াই তিনি ইহা করেন নাই।

নীতি-পরায়ণা প্রথম ক্লিওপেট্রা, পিতৃ-রাজ্যের সহিত যখন পতি-রাজ্য মিশরের কোনরূপ বিগ্রহ ঘটিত, তখন পতিপক্ষ-পাতিনী হইয়া, কায়মনঃপ্রাণে পতি পঞ্চম টলিমিরই মঙ্গল কামনা করিতেন।

রাণী প্রথম ক্লিওপেট্রা, অমন তেজস্বিনী, বুদ্ধিমতী এবং স্বয়ং চরিত্রবতী হইয়াও, মিশরের বৈবাহিক পাপ-পদ্ধতির বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন নাই। এই প্রথানুসারে, পরস্পর ঘনিষ্ঠ রক্ত-মাংসের সম্পর্ক স্থলে, বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন-হেতু, মিশর রাজ-বংশ ক্রমশঃ হতশ্রী হইয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল; তিনি এই রীতির পরিবর্ত্তন কল্পে কিছুই করেন নাই। কিন্তু সিরীয় শোণিতের সহিত মিশরীয় রাজ-শোণিতের মিশ্রণ হেতু, নূতন শক্তি-সঞ্চারে, সম্ভাবিত অধঃপাতকে একটু দূরে অপসারিত করিবার উপায় যে তৎকর্তৃক পরোক্ষভাবে বিহিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

টলিমি এপিফেইনেস্ দীর্ঘজীবী হন নাই। তাঁহার মৃত্যু হইলে, রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী পুত্র টলিমি ফিলোমেটারের রিজেণ্ট (Regent) বা প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। পুত্র তখন সাত বৎসরের শিশু। তিনি পুত্রের প্রতিনিধি বা অভিভাবিকারূপে সাত বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া, খৃঃ পূঃ ১৭৪ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন।

মৃত্যু-সময়ে, তদীয় পরিবারভুক্ত অলেইয়াস্ (Eulaeus) এবং সিরিয়া-নিবাসী লিনেয়াস্ নামক দুইটি বিশ্বস্ত খোজার হাতে কিশোরবয়স্ক পুত্র দু'টি ও কন্যাটিকে সমর্পণ করিয়া যান। তিনি অন্য বিষয়ে বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয় দিয়া থাকিলেও, দুই পুত্রেরই এক নাম 'টলিমি' রাখিয়াছিলেন, এবং কন্যাটিকেও 'ক্লিওপেট্রা' বলিয়া, আত্মনামেই অভিহিত করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রা।

কি ক্ষণেই, সিরিয়ার রাজপুত্রী ক্লিওপেট্রা মিশরীয় টলিমি রাজ-কুলের বংশবর্দ্ধিনীরূপে মিশরের সিংহাসনে সংবর্দ্ধিত হই-লেন, আর অমনি ক্লিওপেট্রার পর ক্লিওপেট্রার ফুল ফুটিয়া টলিমি বংশটিকে ক্লিওপেট্রা-সৌরভে সুরভি করিয়া তুলিল। ক্লিওপেট্রা-দিগের কেহ, ভগিনীরূপে রাজমহিষী, কেহ কিষ্কিন্ধ্যার পদ্ধতি অনুসারে ভ্রাতৃবধূরূপিণী রাজরাণী, কেহ ভ্রাতুষ্পুত্রীরূপেও রাজ্যে-শ্বরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইলেন! প্রথম ক্লিওপেট্রা, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দু'টি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র টমিলি ফিলোমেটর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। কন্যা দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রা জ্যেষ্ঠ সহোদরকে পতিত্বে বরণ করিয়া রাজপুত্রীর পরিবর্ত্তে রাজ-মহিষীরূপে মিশরের শাসন-কার্য্যের সহিত সম্পৃক্ত হইয়া পড়িলেন। 'ব'দ্বীপের মুখে রোজেটা শাখার নিকটে ১৮৯১ খৃঃ অব্দে যে প্রস্তর-লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, প্রথম ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, তদীয় তরুণবয়স্ক ও রাজ-পদে সমাসীন পুত্র সপ্তম টলিমি ভগিনী দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রার পাণিগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ এই পরিণয়-কার্য্য খৃঃ পূঃ ১৭৩ অব্দে সম্পন্ন হইয়াছিল।

তেমনই তেজস্বিনী ও বুদ্ধিশালিনী। রাজ-দম্পতির কেহই, কোন অংশে, রাজকীয় গুণগ্রামে হীন ছিলেন না।

প্রথম ক্লিওপেট্রার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হইলেন,—কন্যা হইলেন রাণী। দ্বিতীয় পুত্র ইউয়ার্‌জেটিস একবারেই ফাঁকে পড়িয়া গেলেন। ইহা তাঁহার প্রাণে সহ্য হইল না। প্রভুত্ব উন্মাদন মদ্য বিশেষ। তাদৃশ মদ্যের ঢাকনী খুলিয়া দিলে, তাহার গন্ধে ঘুমন্ত কুম্ভকর্ণেরও অকালে নিদ্রাভঙ্গ হয়,—জাগন্ত ও লুব্ধ ইউয়ার্‌জেটিস্ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবেন, বিচিত্র কি? তিনি আর ভ্রাতার মুখপ্রেক্ষী হইয়া রাজগৃহের গলগ্রহরূপে রহিতে পারিলেন না। ভ্রাতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। ভ্রাতার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে ইউয়ার্‌জেটিস সম্পূর্ণ-রূপে পরাভূত হইলেন। কিন্তু উদারাশয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজা ফিলোমেটর পরাজিত ভ্রাতার প্রতি বিন্দুমাত্রও অসদ্ব্যবহার করিলেন না। তাঁহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, তাঁহাকে ভ্রাতৃস্নেহে আবরিয়া লইলেন। এই স্নেহ, দয়া ও মহত্ত্বের প্রতিদানে সর্পের ন্যায় খলপ্রকৃতি, ক্রূরমতি ইউয়ার্‌জেটিস যাহা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে, পাষাণের প্রাণও শিহরিয়া উঠে!

দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রার গর্ভে, টলিমি ফিলোমেটরের দুইটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। টলিমি ফিলোমেটরের মৃত্যু হইলে, রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রা আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার স্থানীয় ইহুদিগণ কর্ত্তৃক পোষকতা প্রাপ্ত হইয়া, তদীয়, জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজ-সিংহাসনে বসাইয়া, টলিমি নিয়স্ বা দ্বিতীয় ফিলোপেটর নামে বিঘোষিত করিলেন। সাইপ্রাসে যে প্রস্তর-লিপি পাওয়া যায়, তাহাতে বস্তুতই দৃষ্ট হয় যে, দ্বিতীয় ফিলোপেটর সেখানে রাজা বলিয়া

দ্বিতীয় ফিলোপেটরের রাজত্ব নাম মাত্র। এই সময়ে মিশরের সৈন্যদল সিরিয়ার সমর-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। এদিকে ইউয়ারজেটিস্ ফিস্কন সাইরিণ, হইতে ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্য আক্রমণার্থ আয়োজন উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি, সিরিয়া হইতে মিশরীয় সৈন্য ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই, সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া আলেকজেণ্ড্রিয়া আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষ পরাভূত হইল। ইউয়ারজেটিস ভগিনীরূপিণী বিধবা ভ্রাতৃবধূ দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রার রূপে বা বৈভবে তৎপ্রতি মনে প্রাণে বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি, ভ্রাতার সিংহাসনের সহিত বিধবা ভ্রাতৃবধূর পাণি-পীড়ন প্রত্যাশায় সাধারণের সহানুভূতি লাভের অভিসন্ধিতে, যাঁহারা বিধবা রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা ও তাঁহার পুত্র টলিমি নিয়স বা দ্বিতীয় ফিলোপেটরের সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদিগকে কিছুই বলিলেন না। তাহারা তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করাতেই, তিনি পরিতৃপ্ত রহিলেন; এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের পরিবর্ত্তে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াদিলেন।

দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রা ঘোরতর স্বার্থপর, নিষ্ঠুরস্বভাব, দুর্বৃত্ত ভ্রাতার, বা দেবরের প্রতি অন্তরে অনুরাগিণী ছিলেন কি না, সন্দেহ। তিনি নিতান্ত বিপদে পড়িয়া, চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন; এবং সম্ভবতঃ এই নিষ্ঠুর রাক্ষসের করাল গ্রাস হইতে প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণরক্ষার্থই ভ্রাতা ও দেবর ইউয়ারজেটিসের প্রার্থিত দ্বিতীয় বার বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু পুত্রবৎসলা দুঃখিনী জননীর আশা সফল হইল না।

ইউয়ারজেটিস্ ফিস্কন্ বরবেশে দণ্ডায়মান। দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রা বিধবার শোক-পরিচ্ছদ দূরে ফেলিয়া দিয়া, আজি

হের শুভক্ষণ উপস্থিত। চারিদিকে জাঁকজমক ও বৈবাহিক আমোদ প্রমোদের দেশব্যাপী আনন্দ-হিল্লোল চলিয়াছে। ঠিক এই সময়ে, ক্লিওপেট্রার স্নেহের পুতুল প্রাণধন পুত্র দ্বিতীয় ফিলোপেটর নির্দ্দয় ও নৃশংস ইউয়ার্‌জেটিসের ইঙ্গিতক্রমে, জননীর নয়ন-সান্নিধ্যে, প্রকাশ্যভাবে, যার-পর-নাই নিষ্ঠুরতার সহিত নিহত হইল! বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তথাপি, এই জঘন্য বিবাহ প্রস্তাবের ব্যত্যয় ঘটিতে পারিল না।

যেখানে বিবাহে সম্পর্ক-বিচার নাই; পরিণয়ের সহিত প্রণয়, প্রীতি, অনুরাগ বা দয়াধর্ম্ম প্রভৃতি উচ্চ মানবীয় ভাবের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ নাই; বিবাহ যেখানে চিরভঙ্গপ্রবণ সাময়িক চুক্তি মাত্র; যেখানে দাম্পত্যবন্ধন নাই,—আছে কেবল মানব-মিথুনের যুগল মিলন এবং ভোগতৃষ্ণা ও নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিতর্পণ; ক্ষতিলাভ গণনা ও স্বার্থমাত্র যেখানে বিবাহের মূলসূত্র; সেখানে, বিবাহের নামে এইরূপ পাশব-বিড়ম্বনা, এইরূপ অস্বাভাবিক রোমহর্ষণ নিষ্ঠুরতা, কিছুতেই অসম্ভব কথা নহে। সেখানে বর, মার্জ্জারের প্রাণে, ভাবী পত্নীর বক্ষ হইতে শাবকটিকে কাড়িয়া নিয়া, তাহারই চক্ষের উপর কবলিত করিবে, এবং পত্নীও মার্জ্জারীর হৃদয়ে তাহা সহিয়া লইয়া, অনায়াসে সেই নির্দ্দয় রাক্ষস ও নিষ্ঠুর পিশাচেরই শয্যাসঙ্গিনী হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

এই নিহত বালক বা যুবকের চরিত্র সম্বন্ধে ইতিহাসে বিশেষ কিছুই উল্লিখিত হয় নাই। ইউয়ার্‌জেটিস ফিস্‌কন্‌ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত যার-পর-নাই, দুর্ব্যবহার করিয়াও, জ্যেষ্ঠের ভ্রাতৃ-স্নেহ ও দয়ায়, শুধু অক্ষতদেহে অব্যাহতি পাইয়া ছিলেন, এমন নহে,—জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া তাঁহার সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে স্নেহে ও প্রীতিতে ...

ছিলেন। আজি ফিস্‌কন্ সেই স্নেহশীল উদারপ্রকৃতি ভ্রাতার পুত্রটিকে এইরূপে নিহত করিয়া, সেই মহত্ত্বেরই উচিত প্রতিদান করিলেন! এইরূপ প্রতিদান ও প্রত্যুপকার অধঃপতিত মানব-সমাজে দুর্লভ নহে। কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠা যে ইহাতে চিরকলঙ্কিত হইয়া রহে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

মানুষ, সাময়িক শক্তিবলে, বুদ্ধি-কৌশলে অথবা মানুষের কাপুরুষতায়, দুষ্কর্ম্ম করিয়া, লৌকিক প্রতিশোধ হইতে কিছু-দিনের জন্য অব্যাহত থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু যে অনন্ত-দেবের ন্যায়দণ্ডের সহিত অনন্তকালের সম্পর্ক, তাঁহার সেই অমোঘ ন্যায়দণ্ড হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। ইউয়ার্‌-জেটিস্ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সাধের ক্লিওপেট্রাও পত্নীরূপে তাঁহার বামে বিরাজিত হইলেন। কিন্তু রাজ্যসুখ দীর্ঘকাল তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল না। তিনি পনর বৎসরকাল আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ায় রাজত্ব করিলেন। তদীয় রাজত্ব নিষ্ঠুরতার এক সুদীর্ঘ কাহিনী। তাঁহার নিষ্ঠুর অত্যাচারে প্রজাবর্গ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সকলেই তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। তিনি অবশেষে, খৃঃ পূঃ ১৩০ অব্দে গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কায়, চতুর্দ্দশ বৎসরবয়স্ক পুত্র মেম্‌ফ্রেনেসরকে সঙ্গে লইয়া সাইপ্রাসে পলায়ন করিলেন।

ইউয়ার্‌জেটিস্ পলায়ন করিলে, আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া-বাসিগণ ইউয়ার্‌জেটিস্ কর্তৃক জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় পরিত্যক্তা, ভগিনী, ভ্রাতৃ-বধূ ও রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রার হস্তেই রাজ্যের ভারার্পণ করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া সাইপ্রাসে লুক্কায়িত ফিস্‌কন্-সর্প প্রতিহিংসা বহ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল! তাঁহার প্রতিহিংসা ও নিষ্ঠুরতা যার-পর-নাই অদ্ভুত, বিচিত্র ও বিস্ময়াবহ। তিনি

হত্যা করিলেন। তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া একটা সুন্দর বাক্সে বন্ধ করিয়া, দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রার জন্মদিনের উৎসব উপলক্ষে, সেই বাক্স তাঁহার নিকট উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন! বাক্স খুলিয়া হতভাগিনী রাজ্ঞীর যে অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। এরূপ দৃশ্যে পুতনার প্রাণ শিহরিয়া উঠে,—তারকা রাক্ষসীর চক্ষেও জল ঝরে! রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা, টলিমিকুলের সন্তান, টলিমি রাজকুলের কুলবধূ এবং মিশরের সিংহাসনারূঢ়া রাজ্যেশ্বরী হইলেও, সন্তানের মা; তিনি যে ইহা দেখিয়াও জীবিত রহিতে পারিলেন, ইহাই যথেষ্ট।

এই অমানুষিক নিষ্ঠুরতায়ও ফিস্‌কনের প্রতিহিংসা-বৃত্তির তৃপ্তি হইল না। ফিস্‌কন্ অচিরেই সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, সিরিয়ার পথে, মিশর আক্রমণের জন্য মিশরের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা, ইহার পরে আর, পত্নীরূপে আত্ম-সমর্পণের বুদ্ধি করিতে পারিলেন না। সৈন্যসামন্ত লইয়া, ফিস্‌কনের গতিরোধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। যুদ্ধ হইল। বিধাতার বজ্র এখনও দুর্ম্মতি ফিস্‌কনের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হয় নাই। ফিস্‌কন্ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। ডিমেট্রিয়াস্ নিপেটার নামক একব্যক্তি, এই সময়ে, সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ডিমেট্রিয়াস্ বড়ই শক্তিশালী ও প্রতাপান্বিত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পরাজিতা দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রা তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অদৃষ্টে মিশরে অবস্থান ঘটিয়া উঠিল না। অবশেষে, তিনি মিশর পরিত্যাগ করিয়া একবারে সিরিয়াতে চলিয়া গিয়া, ডেমিট্রিয়াসের শরণাপন্ন হইলেন।

এস্থলে, মিশরের কদর্য্য বৈবাহিক সম্বন্ধ নির্ণয় প্রসঙ্গে পুনরায় কিছু বলিয়া লওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রার গর্ভে, ভ্রাতা ও প্রথম পতি টলিমি ফিলোমেটরের ঔরসে দুইটি পুত্র ও একটি

কন্যা জন্মে। ভ্রাতা, দেবর ও দ্বিতীয় পতি ইউয়ার্জেটিস্ ফিস্কনের হাতে পুত্র দুইটির যে শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বাকি ছিল কন্যা। কন্যার নাম ক্লিওপেট্রা। ইনিই মিশর ইতিহাসে তৃতীয় ক্লিওপেট্রা নামে পরিচিতা। তৃতীয় ক্লিওপেট্রা মাতৃসম্পর্কে ফিস্কনের ভাগিনেয়ী, পিতৃসম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং ফিস্কনের আত্মসম্পর্কে ক্ষেত্রজ কন্যা। দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রা মিশর ত্যাগ করিয়া সিরিয়ায় চলিয়া গেলেন। কন্যা ক্লিওপেট্রা মিশরেই রহিলেন। এক্ষণ ইউয়ার্জেটিস্ এই তৃতীয় ক্লিওপেট্রাকে প্রাণে না মারিয়া, মানে মারিবার উদ্যোগ করিলেন। ইন্দ্রিয়পরায়ণ পশু-প্রকৃতি ইউয়ার্জেটিস্, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী ও ক্ষেত্রজকন্যা যুবতী ক্লিওপেট্রাকে অসহায় অবস্থায় মিশরে পাইয়া, তাঁহার ধর্ম্মনষ্ট করিলেন! অন্য দেশে হইলে, ইহা হত্যা অপেক্ষাও অধিকতর মারাত্মক অনিষ্টের কারণ হইত। মিশরে তাহা হইল না। কিছুদিন পরে, ইউয়ার্জেটিস্ দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রাকে পত্নীত্ব হইতে অপসারিত করিয়া, তাঁহার এই বল-বিড়ম্বিতা কন্যা তৃতীয় ক্লিওপেট্রার পাণি-গ্রহণ করিলেন। সুতরাং মাতা যখন দেশান্তরে, কন্যা তখন নারীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াও, মিশরের পাশব, বৈবাহিক পদ্ধতির প্রাসাদে, আদরের আদরিণী গৃহিণী ও রাজ্যেশ্বরী রাণীরূপে, মাতার পতি, খুল্লতাত, মাতুলের বামে বসিয়া, সকল কলঙ্ক অপসারণ করিয়া ফেলিলেন!

ইহার পরে, এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিল যে, দ্বিতীয় ক্লিও-পেট্রা আর সিরিয়ায় রহিতে পারিলেন না। তিনি ইউয়ার্-জেটিস্ ফিস্কনের সমস্ত দুর্ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া, এমন কি, তৎকর্ত্তৃক প্রিয়তম-পুত্র-হত্যারূপ সেই আমর্জ্জনীয় দুঃসহ অত্যা-

আসিলেন ; এবং ফিসকন্ ও মিশরের রাণী তাঁহার কন্যা তৃতীয় ক্লিওপেট্রার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন। কন্যা তৃতীয় ক্লিওপেট্রা তখন মিশরের রাজরাণী; সুতরাং খুবই আড়ম্বরের সহিত দিন যাপন করিতেছিলেন। দুঃখিনী ও বিপন্না জননী দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রা তাঁহার দুই চক্ষের বিষ হইয়া পড়িলেন! মাতা ও পুত্রী হইলে হইবে কি? বিবাহের অদ্ভুত ব্যবস্থায় উভয়ের মধ্যে এক প্রকার সপত্নী সম্বন্ধ, হইয়াছিল! সদ্ভাব আর থাকিবে কিরূপে? কিছু দিন পরে, মিশরেই দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রার পরলোক প্রাপ্তি ঘটিল।

তৃতীয় ক্লিওপেট্রা।

তৃতীয় ক্লিওপেট্রা কোন অংশেও তেমন মানসিক শক্তিসম্পন্না বা কোন বিষয়েই তেমন প্রশংসনীয় প্রকৃতির রমণী ছিলেন না। রাণীরূপে তিনি একদিকে বাঘিনী, অন্য দিকে সাপিনীর ন্যায় ভয়ঙ্করী ছিলেন। সম্ভবতঃ, ইহা কিঞ্চিৎমাত্রায় নিষ্ঠুর ও লুব্ধ-স্বভাব, ইউয়ার্জেটিসের মত স্বামীসাহচর্য্যেরই ফল। যাহা হউক, রাজকার্য্যে প্রথমতঃ তাঁহার বেশী আধিপত্য ছিল না। ইউয়ার্জেটিস্ ফিস্কনের জীবনের শেষভাগে কএক বৎসর তিনি প্রকৃত রাণীর ক্ষমতায় কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি পতির পূর্ব্ব সম্পর্কে ভাগিনেয়ী ছিলেন। সুতরাং, তাঁহার বয়স, ফিস্কনের তুলনায় অনেক কম ছিল। ফিস্কন্ হইতে তাঁহার পাঁচটি সন্তান জন্মিয়াছিল। দুইটি পুত্র ও তিনটি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দ্বিতীয় সোটার বা লেথিরাস্, কনিষ্ঠের নাম আলেক্জাণ্ডার। প্রথমা কন্যার নাম চতুর্থ ক্লিওপেট্রা, মধ্যমার নাম সেলিন্, কনিষ্ঠা ট্রিফিনিয়া। পুত্র আলেক্জাণ্ডারই তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। ফিস্কনের মৃত্যু সময়ে, আলেক্জাণ্ডার অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। মাতার কনিষ্ঠ পুত্রের উপরেই প্রাণের

জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় সোটার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। সোটার কৃতদার, প্রাপ্তযৌবন ও বয়স্থ। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা চতুর্থ ক্লিওপেট্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেন, মাতা তৃতীয় ক্লিওপেট্রা জ্যেষ্ঠ পুত্র সোটারের তত পক্ষপাতিনী ছিলেন না, তাহা জানা যায় না। জ্যেষ্ঠা কন্যা চতুর্থ ক্লিওপেট্রার প্রতিও তাঁহার মনের ভাব ভাল ছিল না।

স্বামী ফিস্কনের যখন আসন্ন অবস্থা, তখন তিনি তাঁহার নিকট হইতে, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে স্থানান্তরে গবর্ণর করিয়া পাঠাইবার অনুমতি গ্রহণ করেন। অনুমতি গ্রহণের অব্যবহিত পরেই, ফিস্কনের মৃত্যু হওয়াতে, তখন ইহা কার্য্যে পরিণত হইল না। লোকে বুঝিল উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু তৃতীয় ক্লিওপেট্রার অন্তরে একটা গভীর দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত ছিল। ফিস্কনের মৃত্যুর পরে, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। যদিও জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় সোটার রাজসিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী হইলেন, তথাপি প্রকৃত রাজক্ষমতা, মাতা তৃতীয় ক্লিওপেট্রার হস্তেই রহিয়া গেল। দেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে রাজমাতার এই ক্ষমতা চির-অক্ষুণ্ণ। রাণীর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি কৌশলে আলেক্জেণ্ড্রিয়াবাসীদিগের মত জন্মাইয়া, প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র আলেক্জাণ্ডারকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন; এবং জ্যেষ্ঠকে সাইপ্রাসের শাসনকর্ত্তারূপে দূরে পাঠাইয়া দেন। তিনি বহুচেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার এই অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। আলেক্জেণ্ড্রিয়াবাসী, ইহাতে সম্পূর্ণ অমত করিল। বলা বাহুল্য যে, এই সময়ে, সমগ্র মিশর রাজ্যের মধ্যে আলেক্জেণ্ড্রিয়া নগরেরই প্রভাব ও প্রতিপত্তি

নিমিত্ত কনিষ্ঠ পুত্র আলেক্জাণ্ডারকেই সাইপ্রাসে পাঠাইয়া দিলেন; এবং জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় সোটার বা লেথিরাস্কে এই সর্ত্তে ভাবী রাজা বলিয়া গ্রহণ করিলেন যে, সে তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও স্ত্রী চতুর্থ ক্লিওপেট্রাকে পরিত্যাগ করিয়া, তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী সেলিনকে বিবাহ করিবে। সুতরাং, অচিরেই দ্বিতীয় সোটার কনিষ্ঠা ভগিনী সেলিনের পাণিগ্রহণ করিলেন। জ্যেষ্ঠা চতুর্থ ক্লিওপেট্রা, মায়ের অভিপ্রায় অনুসারে, পতিত্যক্তা ও তাড়িতা হইলেন।

দ্বিতীয় সোটার ও তদীয় মাতা তৃতীয় ক্লিওপেট্রার যুক্ত-শাসন সময়ে, ইহুদিগণ অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিল। দেশের সর্ব্বত্র তাহাদিগের প্রভাব ও প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়া পড়িল। হির্কেনিয়াস্ সেমেরিয়া অবরোধ করিলেন। দ্বিতীয় সোটার বা লেথিরাস, সেই সঙ্কুল আক্রমণ হইতে সেমেরিয়ার উদ্ধার-কামনায় এণ্টিওকাস্ সাইজিছিনাসের সাহায্যার্থ ছয় সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সূত্রে মাতা পুত্রে ঘোরতর বিসংবাদের সূত্রপাত হইল।

রাণীমাতা তৃতীয় ক্লিওপেট্রা ইহুদিদিগের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। হির্কেনিয়াস্ ইহুদি। দ্বিতীয় সোটার্ বা লেথিরাস্ সেই ইহুদি বীরের বিরুদ্ধে সৈন্য সাহায্য প্রেরণ করিয়া রাণীমাতার মতবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলেন। রাণীমাতা পুত্রের এই ব্যবহারে যার-পর-নাই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইলেন। অতএব রাণী তাঁহার পেলেষ্টাইন স্থিত ক্ষমতাপন্ন ইহুদি সেনাধ্যক্ষ চেল্কিয়াস্ ও এনানিয়াস্কে হির্কেনিয়াসের সাহায্য করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সুতরাং লেথিরাসের সৈন্য-সাহায্য দানে কোন ফল হইল না। ইহুদিগণ সেমেরিয়া অধিকার করিয়া ধূলিসাৎ

তেই বিভীষিকার সঞ্চার করিতেছিল। পেলেষ্টাইনে ইহুদি-দিগের প্রতিকূলে ঐরূপে হস্তক্ষেপ করাতে, আলেক্জাণ্ডি্রয়াতে রাণীমাতার সহিত প্রকাশ্য ভাবে দ্বিতীয় সোটারের মতান্তর ও গোলযোগ ঘটিয়া উঠিল। এই সময়ে, দ্বিতীয় সোটার বা লেথি-রাস্ পূর্ণশক্তিতে সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তদানীন্তন মৈশরীয় মুদ্রায় সোটারের নাম অঙ্কিত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ক্ষমতাপ্রয়াসিনী লুব্ধস্বভাবা রাণীমাতা সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহেন। তিনি পুত্রের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্নবতী হইলেন। রাণীর যত্ন সফল হইল। তিনি কতক ষড়যন্ত্রে, কতক বা বল-প্রয়োগে আলেকজেণ্ডি্রয়ার জনসাধারণকে পুত্র দ্বিতীয় সোটারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। দ্বিতীয় সোটার বা লেথিরাস্, গত্যন্তর অভাবে, মিশর পরিত্যাগ করিয়া, সাইপ্রাসে প্রস্থান করিতে বাধ্য হই-লেন। এতদিনে মাতার মনোভীষ্ট পূর্ণ হইল। সোটার যেই মিশর ত্যাগ করিলেন, অমনই টলিমি আলেক্জাণ্ডার মিশরে ফিরিয়া আসিয়া, জননীর আনুকূল্যে মিশরের সিংহাসন অধি-রোহণ করিলেন।

রাজমাতা তৃতীয় ক্লিওপেট্রা চিরবিদ্বেষভাজন ও মিশর হইতে বিতাড়িত জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় সোটারকে সাইপ্রাস হইতেও তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সোটার মাতার বিদ্বেষে বিপন্ন হইলেও, বিবিধ রাজগুণে অলঙ্কৃত এবং প্রকৃতই ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পেলেষ্টাইনে পুনঃ মিশরের অধিকার ও আধিপত্য স্থাপনের পূর্ণ আয়োজন করিয়া লইলেন। স্থানীয় জনসাধারণ যদিও তাঁহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করে নাই, তথাপি তিনি, কিছুদিন বল বিক্রম ও কল কৌশলে ইহুদিদিগের উপর আপন প্রাধান্য, অনেকাংশে রক্ষা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনিই সর্ব্বশেষ

টলিমি রাজা—যিনি পেলেষ্টাইনকে পুনর্ব্বার সর্ব্বতোভাবে মিশরের আজ্ঞাধীন ও আয়ত্ত করিতে যত্ন করেন। কিন্তু যখন রাণী তৃতীয় ক্লিওপেট্রা অসংখ্য সৈন্য সামন্ত সহকারে স্থলপথে এবং আলেক্জাণ্ডার নৌসৈন্য সহ জলপথে তাঁহাকে যুগপৎ আক্রমণ করিলেন, তখন দ্বিতীয় সোটার বা লেথিরাসের সমস্ত রণ-কৌশলই ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত, পরাভূত ও একান্ত হীনশক্তি হইয়া পড়িলেন। ইহার পরে দীর্ঘকাল তিনি কিভাবে কোথায় অবস্থিত ছিলেন, ইতিহাসে তাহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না।

পেলেষ্টাইন পূর্ব্বে মিশরের অধিকারে ছিল। মিশর-রাজের শক্তিহীনতা হেতু উহা হস্তচ্যুত হইয়া যায়। দ্বিতীয় সোটারের যত্ন সফল হইলে, একাংশে প্রকারান্তরে মৈশরীয় হৃত রাজ্যেরই একাংশের পুনরুদ্ধার হইত। রাণী মাতা, তৃতীয় ক্লিওপেট্রা, পুত্রবিদ্বেষে অন্ধীভূত হইয়া, মিশরের এই গৌরব বৃদ্ধির কথা গণনায় আনিলেন না। পুত্র পাছে পেলেষ্টাইনে রাজ্য স্থাপন করিয়া সুখে থাকিতে সমর্থ হয়, এই আশঙ্কায় আকুল হইয়া পড়িলেন; সুতরাং, পেলেষ্টাইন অধিকারে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া রহিলেন। তিনি পুত্রকে শুধু রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াই তৃপ্ত হইলেন না, তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা,—লেথিরাজের দ্বিতীয় পত্নী সেলিনকে কি কৌশলে কাড়িয়া আনিয়া কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে এন্টিওকাস্ গ্রীপাসের সহিত পুনরায় তাহার উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণের নিকট তৃতীয় বেরিনিক নামে পরিচিতা, একটি যুবতী রাজ্ঞীর কথা, খৃঃ পূঃ ১০০—৯৮ অব্দ পর্য্যন্ত, কখনও রাণীমাতার সহিত, কখনও বা রাণীমাতার নাম ব্যতীতই উল্লিখিত হইয়াছে। এই যুবতী দ্বিতীয় সোটারের দুহিতা ও তাঁহার একমাত্র ঔরসজাত সন্তান। আলেকজাণ্ডার

ভ্রাতুষ্পুত্রী বেরিনিকের পাণিগ্রহণ করেন। আলেক্জাণ্ডারের মৃত্যুর পর, তাঁহার অন্য পত্নীর গর্ভসম্ভূত পুত্র দ্বিতীয় আলেক্জাণ্ডার, রোমানদিগের অনুমতি অনুসারে, এই বিমাতা বেরিনিককে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই পুরাতন সময়ে, ধিক্কারজনক ঘৃণার্হ সামাজিক পদ্ধতি অনুসারে, বিধবা বিমাতা পর্য্যন্ত সপত্নী-পুত্র কর্তৃক পরিণীতা হইতে পারিতেন! হিন্দুজাতির নিকট এ কদর্য্য কথা মুখে আনাও কঠোর চান্দ্রায়ণ-প্রায়শ্চিত্তার্হ—মহাপাপ!

রাণী তৃতীয় ক্লিওপেট্রা যৌবনে জননীকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন করিয়াছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে, জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি যেরূপ সন্তান-বাৎসল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, পূর্ব্বেই তাহা বিবৃত হইয়াছে। তিনি মাতা জানিতেন না, পতি বুঝিতেন না, পুত্র কন্যার ধার ধারিতেন না; তাঁহার এক উপাস্য রাজবৈভব,—অন্য আরাধ্য বস্তু রাজ-ক্ষমতা ও প্রভুত্ব। তদীয় প্রভুত্বের পথে পরপন্থীরূপে দণ্ডায়মান হইয়া, সদয়হৃদয় ক্ষমাশীল জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইলেন। দ্বিতীয় পুত্র আলেক্জাণ্ডার অনেক দিন মাতার দুঃসহ ও দুর্দ্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষার অনলে আহুতি দিয়া, প্রীতিভাজন ছিলেন। কিন্তু ক্রমে ইহা অসাধ্য হইয়া উঠিল; সুতরাং সে প্রীতিও দীর্ঘস্থায়িনী হইল না।

তৃতীয় ক্লিওপেট্রা এক্ষণ বর্ষীয়সী ও প্রাচীনা। কিন্তু তথাপি তাঁহার উদ্ধত নিষ্ঠুর ব্যবহারের বিন্দুমাত্র প্রশমন হইল না। সমগ্র সৈন্যদল, ক্ষমতাপন্ন ইহুদি সম্প্রদায় এবং আলেক্জেণ্ড্রিয়ার জনসাধারণ রাণীমাতার একান্ত পক্ষপাতী; ইহার উপরে রাণীমাতার অবিরাম নির্দ্দয় ব্যবহার; প্রিয়পুত্র আলেক্জাণ্ডারের পক্ষেও ক্রমে রাজাজ্ঞার দুর্ব্বহ ও দুঃসহ হইয়া পড়িল

মাতা পুত্রে ঘোরতর কলহ উপস্থিত হইল। এই কলহ-প্রসঙ্গেই ইতিহাসে রাণী বেরিনিকের কথা বারংবার উল্লিখিত হইতে দেখা যায়।

আলেক্‌জাণ্ডার, মিশরে অবস্থান, অবশেষে, এই পরিমাণ ক্লেশকর বোধ করিলেন যে, তিনি মিশর ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহই তাহা ঠিক করিতে পারিল না। তিনি শান্তিলাভের প্রত্যাশায় এইরূপে লুকাইয়াছেন, সাধারণতঃ লোকের ইহাই ধারণা হইল। কিন্তু রাণীমাতা ক্লিওপেট্রা ঈদৃশ সহজ বিশ্বাসের মোহে নয়ন মুদ্রিত করিয়া, চুপ করিয়া থাকিবার ব্যক্তি নহেন। তিনি মনে করিলেন, পুত্র শান্তির জন্য যায় নাই। সম্ভবতঃ সে উচ্চ মিশরের থিবিস্‌ প্রদেশে অবস্থিত আছে ; এবং সেই স্থানে শান্তির আবরণে গা-ঢাকা দিয়া, নিভৃতে ঝটিকার বীজ বপন করিতেছে। সে হয়ত, নীরবে থিবিসে রহিয়া, একটা বিপ্লবকারী জাতি গঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুযোগ পাইলেই সেই সৈন্যদল লইয়া, তাঁহার ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত ভীষণ মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হইবে। এই সন্দেহে, রাণীমাতা পুত্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যার-পর-নাই অধীর হইয়া উঠিলেন। পুত্র বুঝিলেন, মায়ের এই আহ্বান আদরের আবদার বা স্নেহের অত্যাচার নহে,—সর্ব্বনাশের অভিসন্ধি !

রাণীমাতা আলেক্‌জাণ্ডারকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, আলেক্‌জাণ্ডারও, প্রত্যুত্তরে, রাণীর প্রতিকূলে, অন্যরূপ ষড়যন্ত্রের বন্দোবস্ত করিলেন। এই সময়ে, রাণীমাতা তৃতীয় ক্লিওপেট্রার মৃত্যু হইল। সম্ভবতঃ রাণীর মৃত্যু হইল, স্বাভাবিক কারণে। কিন্তু লোকের ধারণা হইল যে, আলেক্‌জাণ্ডারের কল্পিত কোন কৌশলে বা ষড়যন্ত্রে

বাৎসল্য, সেখানে পুত্রের এইরূপ মাতৃভক্তি একবারেই অসম্ভাবিত কথা নহে। ধন্য প্রভুত্বের উন্মাদিনী মদিরা! ধন্য ক্ষমতার মধু-মাখা হলাহল! উহার বাতাসে দাম্পত্য-বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়,—সৌভ্রাত্রের অমৃতফল খসিয়া পড়ে,—স্নেহের সমুদ্র শুকাইয়া উঠে,—ভক্তির উৎস, সুখ-শীতল জাহ্নবীর পরিবর্ত্তে, জ্বালা-করাল অনল-ধারা উদ্গিরণ করে! এরূপ ধন-গর্ব্বিতের সম্পদ্-হাস্য-বিলসিত অনন উচ্চ প্রাসাদের চরণে কোটি নমস্কার! স্নেহ, প্রীতি ও প্রেমের বিনিময়ে হৃদয়, মন ও প্রাণটা পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া দিয়া, কাঙ্গালের কুটীরে শাকান্নে জীবন যাপনও, ইহা অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর ও শ্লাঘ্য।

আলেক্‌জাণ্ডারের মন্ত্রণায়ই রাণীমাতার হত্যা হইয়াছে, এই সন্দেহে, এবং আলেক্‌জাণ্ডার থিবিসে বসিয়া, ঘোরতর বিপ্লবের উদ্দেশ্যে সৈন্য-সঞ্চয় করিতেছেন, এই বিশ্বাসে, আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ার জনতা ক্ষিপ্তবৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা আলেক্‌-জাণ্ডারকে আর সময় দেওয়া সঙ্গত নহে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া, দ্বিতীয় সোটার বা লেথিরাস্‌কে সাদরে আহ্বান করিল। লেথিরাস্‌ও সাইপ্রাস হইতে অবিলম্বে মিশরে উপস্থিত হইলেন। এ'দিকে উত্তর মিশরে বিদ্রোহের অনল জ্বলিয়া উঠিল!

চঞ্চল-মতি জনসাধারণ, লেথিরাস্‌কে, আদর করিয়া, "ইপ্সিত" নামে সংবর্দ্ধনা করিল। আলেক্‌জাণ্ডারের অনুসরণে, পীর্‌হাসের (Pyrrhus) নায়কতায় মিশরে সৈন্যদল প্রেরিত হইল। পীর্‌হাস প্রথমতঃ আলেক্‌জাণ্ডারকে নৌ-যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। আলেক্‌জাণ্ডার প্রথমতঃ স্ত্রী ও কন্যা সমভিব্যাহারে তাড়িত হইয়া, লিসিয়ার অন্তর্গত থিরাতে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সেখানেও তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিলেন না।

ন্তই যেন, নিয়তির তাড়নায়, থিব্রা পরিত্যাগ করিয়া, সমুদ্র পার হইয়া, সাইপ্রাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। টলিমি রাজগণ সাধারণতঃ স্থূলতনু বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু আলেক্জাণ্ডার এমনই প্রকাণ্ড মাংসপিণ্ড ছিলেন যে, দুটি লোক দুদিকে আশ্রয় স্বরূপ না থাকিলে, তিনি তাঁহার বিশাল বপুর ভার বহন করিয়া, একপদও চলিতে পারিতেন না।

অন্য কোন সভ্য সমাজে এই দুঃসাহসিনী রাণী মাতা তৃতীয় ক্লিওপেট্রার ন্যায় দীর্ঘ-জীবিনী রাজমহিলা দৃষ্টিগোচর হন নাই। ইটালীতে শিল্প-বিজ্ঞানের পুনঃ সংস্কার যে যুগে হইয়াছিল, সেই যুগের প্রজাপীড়ক শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে, এরূপ ষড়যন্ত্র-নিপুণা, অপরিণাম-দর্শীনী, সাহসিকা রাণী থাকিলেও থাকিতে পারেন, কিন্তু কেহই ক্রমান্বয়ে পঁয়তাল্লিশ বৎসর ব্যাপিয়া, সিংহাসনারূঢ় রাজা ও রাণীদিগকে কর-ধৃত ক্রীড়া-পুত্তলের ন্যায় যথেচ্ছ পরিচালনা করিয়া, তাঁহার ন্যায়, কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

চতুর্থ ক্লিওপেট্রা।

চতুর্থ ক্লিওপেট্রা টলিমি দশমের ভগিনী ও রাণী ছিলেন। তিনি কিরূপে দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া, জননীরূপিণী শাশুড়ীর নিদেশে স্বামী দ্বিতীয় সোটার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন, পূর্ব্বেই তাহা সবিস্তর উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় সোটার বা লেথিরাস্ তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী সেলিন্‌কে বিবাহ করেন। এই হইতে চতুর্থ ক্লিওপেট্রার প্রাণে ভগিনীর প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষের ভাব উত্তেজিত হইয়া উঠে। তিনি স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা ও মাতাকর্ত্তৃক নিগৃহীতা হইয়া, সিরিয়ার রাজ-পদ-প্রার্থী এণ্টিওকাস্ সাইজিছেনাসের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া, তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিলেন ; এবং আপনার বিপুল অর্থবলে সাইপ্রাসে

এন্টিওকাস্ সাইজিছেনাসের ভ্রাতার নাম এন্টিওকাস্ গ্রিপাস্। গ্রিপাস্ চতুর্থ ক্লিওপেট্রার ভগিনী ট্রিফেনিয়াকে বিবাহ করেন। চতুর্থ ক্লিওপেট্রা ইহাঁদিগের দলভুক্ত হইয়াছিলেন। অবস্থা-চক্রে অবিলম্বেই, জানা যায় না কেন, চতুর্থ ক্লিওপেট্রা এন্টিওকাস্ গ্রিপাসের হাতে পড়িয়া নিহত হইলেন। ইহার পর, ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হেতু, এন্টিওকাস্ গ্রিপাসের স্ত্রী ট্রেফিনিয়া এন্টিওকাস্ সাইজিছেনাসের ক্ষমতার অধীন হইয়া পড়েন। এই সময়, চতুর্থ ক্লিওপেট্রার দ্বিতীয় স্বামী এন্টিওকাস্ সাইজিছেনাস্ ট্রেফিনিয়াকে বধ করিয়া, পত্নী-হত্যার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

পঞ্চম ক্লিওপেট্রা।

পঞ্চম ক্লিওপেট্রার ডাক নাম ট্রিফেইনা। টলিমি লেথিরাসের অবৈধ পুত্র টলিমি অলিথাস্ পঞ্চম ক্লিওপেট্রার পাণিগ্রহণ করেন। পঞ্চম ক্লিওপেট্রার গর্ভজাতা কন্যা চতুর্থ বেরিনিকা টলিমি অলিথাসের উত্তরাধিকারিণীরূপে মিশরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চম ক্লিওপেট্রা, টলিমি অলিথাসের কন্যা ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার জননী নহেন, ইহাই অধিকাংশ ঐতিহাসিকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। চতুর্থ বেরিনিকার জন্মের অনেক বৎসর পরে, অলিথাসের আবার সন্তান হইয়াছিল। এই হেতু অনেকে মনে করেন যে, টলিমি অলিথাস্ দুইবার দারপরিগ্রহ করেন। অলিথাস্ পূর্ণ একবৎসর মিশরে অনুপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে পঞ্চম ক্লিওপেট্রা রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহার পরেই পঞ্চম ক্লিওপেট্রার মৃত্যু হয়। এট্‌কুতে একটা বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইতেছিল। টলিমি ইউয়ারজেটিস্ ফিস্‌কন্ এই

এই মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্যে সহায়তা করিয়া আসিতেছিলেন। টলিমি অলিথাসের সময়ে, এই মন্দিরের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। অলিথাস্ এই মন্দিরে তাঁহার ও তদীয় পত্নী পঞ্চম ক্লিওপেট্রা ট্রিফেইনার নামে উৎসর্গ পত্র (Dedication) খোদিত করিয়া রাখেন। আগামী বারে ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার কাহিনী প্রকটিত হইবে।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

চেতনা।

কোমল কুসুম সম নিভৃত কামনা,
অতীতের স্মৃতি হ'তে কে আনিল তুলি' ?
কে জাগাল পরাণের অজানা বাসনা ?—
কার গানে প্রাণ মম উঠিল ব্যাকুলি' ?
নির্ব্বাক্ কঠোর তব অলস সাধনা,
কোথা ছিল এতকাল নিঠুর নিদ্রায় ?
আশার সায়াহ্নে কেন বাজাইলে বীণা ?—
গাহিলে প্রভাত-গান দুর্ব্বোধ্য ভাষায় ?
নির্ম্মল প্রেমের ফুল,—নিসর্গ কোমল,
প্রভাতে ফুটিয়াছিল ; গেছে সারাদিন,
চাহি তব মুখ পানে, আবেগ-বিহ্বল,—
দিন শেষে নিরাশায় হয়েছে মলিন !
চাহি না শুনিতে গান, ঝ'রে গেছে ফুল ;
চেতনা ! এসো না কাছে নির্ম্মম কঠিন !

শ্রীউমেশচন্দ্র চাকলাদার।

উপাধি-ব্যাধির মুষ্টিযোগ।

বিগত আষাঢ় ও শ্রাবণের যুগ্মসংখ্যক ধূমকেতুতে "উপাধি—না ব্যাধি?" নামে একটি সার-গর্ভ প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে। উপাধি একরূপ ব্যাধি, একথা ঠিক। প্রবন্ধলেখক নিদানবেত্তা,—বিজ্ঞ নাড়ী-জ্ঞানী; তিনি এই ব্যাধির যে নিদান নির্দ্দেশ বা "ডাইয়াগ্‌-নোসিস্" করিয়াছেন, তাহাও অক্ষরে অক্ষরে যুক্তিসম্মত ও সুষ্ঠু। কিন্তু বোধ হয়, তিনি আজীবন ধনী বড় লোকের গৃহ-প্রতিষ্ঠিত ভুক্তভোগী, অথবা তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ধনী-সম্প্রদায়েই সীমাবদ্ধ। তাই, তিনি বাহিরের খবর লইবার তত সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই; —ধনী জমিদারদিগের মধ্যে এই ব্যাধিতে যে মারাত্মক উপসর্গ ফুটিয়া উঠিয়াছে, বিশেষভাবে কেবল তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং তাহা লইয়া, বিচার করিয়াই পরিতৃপ্ত রহিয়াছেন। এই সংক্রামক ব্যাধি যে অধুনা সাম্র মধ্যবিত্ত, নিরন্ন দরিদ্র, এমন কি ভিক্ষাজীবী কাঙ্গালের পর্ণকুটীরে পর্য্যন্ত যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তৎপ্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। আমি এই অভাব পূরণ মানসে, বিজ্ঞ প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের আদেশ অনুসারে, তাঁহার সেই সরস ও উপাদেয় প্রবন্ধের উন্নত নামের সহিত আমার এই নীরস, অনুপাদেয় 'জের' বা ক্রোড়পত্র খানি যোজনা করিতে সাহসী হইলাম। ইহা, 'চটি-সওয়ার', পোর্টা-বাহী, ফেরিওয়ালা গ্রাম্য কবিরাজের উক্তি হইলেও, আশা করি, আপনারা কথাটিকে একবারে অবহেলায় উড়াইয়া দিবেন না। কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সহিত সম্পৃক্ত, সুতরাং সত্য। সত্য-গঙ্গোদক চর্ম্মকার-স্পৃষ্ট হইলেও পবিত্র; এবং ডোমের ডোঙ্গায় বাহিত হইলেও ব্রাহ্মণের ব্যবহার্য্য। সত্য কখনও উপেক্ষার সামগ্রী নহে।

ধন, মান ও যশ-অর্জ্জন-স্পৃহা চিরদিনই সাংসারিক জীবের পক্ষে স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়। সকলেই ধন, মান ও যশ চায়; সকলেই, আপনার কর্ম্ম বা অদৃষ্টের অনুরূপ, অল্পাধিক পরিমাণে, ঐ সকল পায়; এবং ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ সকলেই ঐ সকল পাইতে অধিকারী। ধন, মান ও যশ সর্ব্বাংশে স্পৃহণীয় হইলেও, ঐ গুলির জন্য মত্ততা এবং ধন, মান ও যশকেই জীবনের একমাত্র সারসম্বল উপাস্য জ্ঞানে, উহাদের উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ, কোন অংশেও প্রার্থনীয় নহে। এই শ্রেণীর মত্ততা এবং আত্মোৎসর্গই নানা দোষের আকর,—মারাত্মক ব্যাধি-বিশেষ। উপাধি ব্যাধিও যশ ও মানার্জ্জনের অসঙ্গত লালসা হইতেই উদ্ভূত।

ধন চাও, সাধুপথে থাকিয়া অর্থকর কর্ম্মে পরিশ্রম কর;—শ্রমক্লিষ্ট স্বেদার্দ্র ললাটই কমলার প্রসাদ-পুষ্প-চন্দনে অলঙ্কৃত হইবার যোগ্য। বড় হইতে চাও,—মানলাভে অভিলাষ কর;—প্রাণটাকে উন্নত ও হৃদয়টাকে বড় করিয়া লইতে যত্ন কর;—মানের পুষ্পাঞ্জলি আপনি আসিয়া পায়ে গড়াইয়া পড়িবে। যশ পাইতে ইচ্ছা হয়, লোকহিতকর যশস্য কর্ম্মে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দাও,—যশের জয়মাল্য আপনি গ্রথিত হইয়া, তোমার কণ্ঠে বিলম্বিত হইবে। কিন্তু, ধন-লালসায় উন্মাদ কখন চুরি করিয়া ধনী হইতে পারিয়াছে কি? মানের লোভে মাতাল হইলে, আপনি বড় হইয়া মানের উচ্চ মঞ্চে আরোহণের উপযোগী, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা বা অবসর থাকে না। ঈদৃশ মানার্থী মানী মানেও প্রাণে আহত হইয়া, অযথা নিন্দাবাদ বা অলীক কলঙ্ক রটনা দ্বারা বড়কে ছোট বানাইয়া, আপনি বড় হইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু একের মান-নাশে অন্যের মান একবিন্দুও

অবতরণ করিয়া, অশেষ-বিশেষ বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। যশো লোভে ক্ষিপ্ত গলায় ঢাক লইয়া, দ্বারে দ্বারে অহোরাত্র আপনার ঢাক আপনি বাজাইয়া ফিরিলেও, যশের মুখ দেখিতে পায় না; কেহই তাহাকে যশস্বী বলিয়া নমস্কার করিতে চাহে না;—লাভ হয়, অকাণ্ডে পরিশ্রম ও উপহাসের টিট্‌কারী! বস্তুতঃ, এখন ঈদৃশ যশ তৃষাতুর ক্ষেপার ক্ষিপ্ততায়, দেশের সমস্ত অঙ্গই আক্রান্ত।

উপাধি,—মানের বিজয়পতাকা,—যশের জয়ঢাক। কাজে কাজেই এই পতাকা ও জয়ঢাকের 'আড়তে' আজি কালি লোকের এত ভিড়;—খরিদদারের এইরূপ গড্ডলিকা প্রবাহ। যাহার শক্তি আছে, সে ক্রয় করিয়া লইতেছে। যাহার সে শক্তি নাই, কিন্তু নয়নে অশ্রু ও হাঁড়ীতে কিঞ্চিৎ তৈল আছে, সেও অশ্রুজলে তৈলতর্পণ করিয়া, দুই একটা ছিন্ন ও জীর্ণ পতাকা অথবা পরোপভুক্ত বা Second-hand গোছের দুই একটা জয়ঢাক আয়ত্ত করিয়া লইতে সমর্থ হইতেছে! যাহার এ সকলের কোনটিই নাই, সে জাল জুয়াচুরি, হাতের জোর বা কল-কৌশল-পূর্ণ চাতুরির আশ্রয় লইয়া, মনের সখ মিটাইতে চেষ্টা করিতেছে।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর অতীত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে এক্ষণ কলিযুগের অধিকার। কিন্তু বাঙ্গালার কলিযুগকে উপাধি-যুগ বলিলেই মানায় ভাল। তালে হউক, বেতালে হউক, উপাধির জন্য কাহার প্রাণ না নাচিয়া উঠে? কোন্ অরুচি-গ্রস্ত জরৎ-জিহ্বায় উপাধির নামে, লালা না ঝরে? বস্তুতঃ বিলাসের মণি-মন্দির হইতে ভিখারীর কুটীরে পর্য্যন্ত, আজি সমস্ত স্থানই, উপাধির জন্য আলোড়িত, বিলোড়িত ও

পূর্ব্বে, এদেশে, শাস্ত্রীয় ব্যায়ামের কঠোর পরিশ্রমে জীবনের একার্দ্ধ অতিবাহিত করিয়া; টোলের কৃতী ছাত্র নবদ্বীপে গমন করিতেন ; এবং নবদ্বীপের টোলে প্রসিদ্ধনামা প্রবীণ অধ্যাপকের অন্তেবাসীরূপে, দীর্ঘদিনব্যাপি তপস্যার পরে, উপাধি প্রাপ্ত পণ্ডিত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেন। তাঁহাদের কাহারও নাম 'পীতাম্বর', কাহারও নাম 'কালীকান্ত', কাহারও নাম 'সারদাচরণ', কাহারও নাম 'প্রসন্নচন্দ্র', কাহারও নাম 'চন্দ্রকুমার', কাহারও নাম 'রামধন'।

এখন আর সে পাঠ নাই। এখন এক দিকে গবর্ণমেণ্ট, "তীর্থের" মালা গাঁথিয়া নির্দ্দিষ্ট নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্র নিবহের কণ্ঠে উহা পরাইয়া দিতেছেন,—অন্যদিকে সারস্বত-সমাজ প্রভৃতি অসংখ্য পণ্ডিত-সভা উপাধির 'পশরা' সাজাইয়া পরস্পর প্রতিযোগিতার গলায় "চাই উপাধি চাই" হাকিতেছেন ; এবং যাহাকে পরীক্ষার বৈতরণী পার করাইয়া লইতে পারিতেছেন, তাহারই নামের পশ্চাতে তাঁহার পসন্দমত একটা উপাধির 'রাখী' বাঁধিয়া দিয়া পণ্ডিত বানাইয়া ছাড়িয়া দিতেছেন। ইহাতে যেমন বাড়িতেছে, উপাধিধারীর সংখ্যা,—তেমন বৃদ্ধি পাইতেছে উপাধির নূতন নূতন রঙ -দার রকম। যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে, আর কএক বৎসর এইভাবে চলিলে, উপাধি-ব্যাধি-শূন্য নিখুঁত ব্রাহ্মণ খুঁজিয়াও কোন স্থানে পাওয়া যাইবে কি না, সন্দেহ। দ্বিজনামাঙ্কিত যজ্ঞসূত্রধারী মাত্রই উপাধিধারী হইয়া উঠিবেন !

সত্যের অনুরোধে ইহা বলা আবশ্যক যে, এই সকল উপাধি-পরীক্ষার সহিত কিছুদিনব্যাপি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে ; সুতরাং ইহাতে অল্লাধিক মাত্রায় পরিশ্রম ও সাধনারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু ইহা ছাড়া, বিনা পরিশ্রমে

ও বিনা অধ্যয়নে, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ নির্ব্বিশেষে, সকল শ্রেণীস্থ লোকই, না জানি কি সন্ধানে, এখন ইচ্ছা করিলেই, উপাধি-গ্রস্ত হইতে পারিতেছেন!

এই শ্রেণীর অনায়াসলব্ধ শাস্ত্রীয় উপাধির কতকগুলি সাময়িক,—কতকগুলি চিরস্থায়ী। কতকগুলি "আটপরে"—কতকগুলি 'পোষাকী'। পোষাকীগুলি, প্রায়শঃই জাল-জুয়াচুরি-লব্ধ চোরা-মাল। চোরা-মালের বে-হিসাবী ব্যবহারে বিপদের আশঙ্কা আছে। চৌকীদার ও পুলিশের ভয়ে উহা লুকাইয়া ভোগ করিতে হয়; একটু ঢাকিয়া রাখিয়া সামলাইয়া ব্যবহার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। সাধারণের চক্ষে, প্রবন্ধের গৌরব বাড়াইবার নিমিত্ত, লেখকের নামে, সহৃদয় প্রচারক, সময় সময়, দয়া করিয়া, উপাধির পুচ্ছ যোজনা করিয়া দেন; কখন কখন বা লেখক নিজেই উহা হাতের জোরে পরিগ্রহ করিয়া লন! ইহাতে কখন কখন প্রবেশিকায় অপ্রবিষ্ট বিদ্যালয়ের 'নাম-কাটা' সিপাহীর ঘাড়েও উপাধির বোঝা চাপিয়া পড়ে; কখনও বা বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের মস্তকেও 'বিদ্যালঙ্কার' বা 'বিদ্যানন্দের' নূতন মুকুট আসিয়া যুড়িয়া বসে! এই উপায়ে লব্ধ উপাধির বোঝা লইয়া, সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ান নিরাপদ নহে। সুতরাং, সাময়িক ব্যবহারের জন্য উহাকে 'পোষাকী' বস্ত্ররূপে 'তাকে' তুলিয়া রাখাই সঙ্গত ও সমীচীন। কিন্তু 'বিদ্যানন্দ' বা 'বিদ্যালঙ্কারের' উপরে গবর্ণমেণ্ট বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন দাবী-দাওয়া নাই; সুতরাং, উহা অনায়াসেই চিরস্থায়িরূপে পাকা "আটপরে" আভরণের শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইতে পারে।

শারদীয় পূজার পূর্ব্বে, এদেশের অধ্যাপকবর্গ যখন ধনীলোকের দরবার হইতে বার্ষিক আদায়ের জন্য দলে দলে 'ফিরায়'

হাত-গড়া "শিরোমণি" উপাধিযোগে আত্ম-পরিচয় দিয়া, 'প্রণামী' সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া থাকেন! যে "শিরোমণি" উপাধি, এক দিন রঘুনাথের মত ঘন-গভীর জ্বলন্ত প্রতিভার আভরণরূপে সম্মানিত হইয়াছিল, 'হাতা-নাড়া' নিরক্ষর ব্রাহ্মণ আজি গায়ের জোরে সেই অলঙ্কার কাড়িয়া নিয়া, পাচক 'শিরোমণি' সাজিতেছেন! এটিও অবশ্যই সাময়িক। ইদৃশ "পাচক শিরোমণি" বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে, অথবা পরিচিত লোকের সহিত তাঁহার চারি চক্ষে দেখা সাক্ষাৎ হইলেই, এ উপাধি, অমনি লাজে ভয়ে জড়সর হইয়া, তাড়াতাড়ি পুছিয়া বা উড়িয়া যায়, এবং নেড়া-নেংটা 'চক্রবর্ত্তী' বা 'দেবশর্ম্মার' সেই পুরাতন-কঙ্কালই পশ্চাতে পড়িয়া থাকে!

কোন দিন কোন টোলের ত্রিসীমায় পদার্পণ করা ঘটে নাই,—জীবনে নবদ্বীপ নয়ন-পথেও পতিত হয় নাই,—গবর্ণমেণ্ট বা কোন পণ্ডিত সভার উপাধি পরীক্ষায় প্রার্থী হওয়াও অদৃষ্টে যুটে নাই;—অথবা কোন সম্প্রদায়ের কোন গুণগ্রাহী নায়ক, চালক বা অধ্যক্ষও কোন গুণ বা শক্তি লক্ষ্য করিয়া, সাদরে কোন উপাধি প্রদান করেন নাই; তথাপি বুঝা যায় না, কি কৌশলে বা মন্ত্র-বলে, কেহ 'কাব্যবিনোদ' বা 'কাব্যবিশারদ', কেহ 'কাব্যানন্দ' বা 'প্রেমানন্দ', কেহ 'কবিরত্ন' বা 'বিদ্যানন্দ' বা 'তর্কচূড়ামণি' সাজিয়া, আসর মাতাইয়া লইতেছেন! এই সকল উপাধি, সময় সময় এতদূর পাকা ও স্থায়ী হইয়া যাইতেছে যে, লোক-সমাজে পরিচয়ের সময়, নাম, ধাম ও কুল-শীলকে পিছনে ঢাকিয়া রাখিয়া, ঐ উপাধিই আগে গলা বাড়াইয়া কথা কহিতেছে! এদেশে এখন ঘাটে পথে, যেথানে, সেথানে "তত্ত্বনিধি" বা "ভক্তিনিধি" ইত্যাদি "নিধির" দল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। "জ্ঞানা-

ও "পঞ্চানন্দের" অবিরাম-প্রবাহে আনন্দের বাজার মিলিয়াছে। সম্ভবতঃ, অচিরেই এই বাজারে 'গঞ্জিকানন্দ', 'মদিরানন্দ', 'আফিঙ্-আনন্দ' এবং 'ক্যাটলেট্' বা 'কোর্মানন্দের'ও আমদানী হইবে। উপাধি, বলিতে কি, এখন সার্ট, কোট বা কুর্ত্তার ন্যায়, অঙ্গে অঙ্গে রঙ্-বিরঙে লম্বমান!

বঙ্গভূমি চিরদিনই কবির দেশ। বঙ্গে 'কাব্যবিশারদ' বা 'কাব্যানন্দ' প্রভৃতি উপাধি, আত্ম-কৃত ব্যাধি হইলেও, তত বিসদৃশ বা বিপ্লবজনক নহে। এদেশে যে কলম ধরে, সে-ই কবি হয়; সে-ই চাঁদের জ্যোৎস্না ও ফুলের মধু লইয়া, কেলি করিতে কস্রৎ করে; সে-ই ভ্রমর-গুঞ্জনে প্রেমের কূজন শুনিয়া চমকিয়া উঠে,—এবং কোকিলের কুহরবে উহু করিয়া, মূর্চ্ছা যাইতে শিখিয়া লয়! কবি হইতে বেশী কষ্ট নাই,—রমণীর রূপ, চটুল নেত্রের চারু চাহনি, বিম্বাধরের চপলা-চমক এবং উহার সহিত প্রেমের হা-হুতাশ ও বিচ্ছেদের একটুকু উচ্ছ্বাস মিশাইয়া লইয়া, কতকগুলি বাঁধা-বোলের বুকনি ভরিয়া, মিল ঘুটাইয়া একটা কিছু লিখিতে পারিলেই, লেখক কবি হইতে পারেন। এদেশে মাইকেলও কবি,—আর ঐ যে কবির আসরের 'জাম্বুবান্' নাক, মুখ, চোখ ও বাহু নাচাইয়া, লম্ফ ঝম্ফ দিয়া, ছড়া কাটিয়া প্রতিপক্ষের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিতেছে, সেও কবি! এ অবস্থায় ভদ্রলোকের সন্তান, যদি কলম-পেশায় জীবন উৎসর্গ করিয়া, কাব্যের নামে আপনা-আপনি 'বিনোদ', 'বিশারদ' বা 'আনন্দ' হইতে ইচ্ছা করেন, হউন, তাহাতে অতটা আশঙ্কা বা আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু আত্মকৃত 'সরস্বতী', 'ভারতী', 'তত্ত্বনিধি' ও 'ভক্তিনিধির' ছড়াছড়ি দেখিলে, ভয় হয়,—বস্তুতই মন প্রাণ শিহরিয়া উঠে! যোগ্য জনের যোগ্যতায় অনাদর, গুণবানের গুণবত্তায় অবহেলা

সংবর্দ্ধনা, অগুণীর 'গুণাকর' আখ্যা, ব্রাহ্মণের অর্ঘ্যে চণ্ডালের অভ্যর্থনাও তেমনই ভাবী অধঃপাতেরই পূর্ব্বাভাস।

'ভারতী' উপাধিতে, একদিন, এদেশে 'কেশব ভারতী' প্রভৃতির ন্যায় মহাপুরুষ সম্মানিত হইতেন। কেশবভারতী গৌরাঙ্গের গুরু,—নবদ্বীপের সেই বঙ্গ-প্লাবিনী শতমুখী গঙ্গা,—সেই উচ্ছল-তরঙ্গা ভাগীরথীর ভগীরথ। আর আজি বঙ্গে, জমিদারী সেরেস্তার জমা-নবীশ, কালেক্টারির কেরাণী, অথবা ছাপাখানার প্রুফ্ রিডার্ও 'ভারতী' উপাধির ধ্বজা উড়াইয়া, ভাবের কীর্ত্তনে গা ফুলাইয়া গড়াগড়ি দিতেছেন! এখন শুধু 'ভারতীতে' হই-তেছে না; 'ভারতীর' মাথায় 'মহা' চড়াইয়া, আরাব ও সংরাবের গল-গর্জ্জনে উহাকে আরও গুল্জার করিয়া লওয়া হইতেছে!

যাঁহার প্রচুর ধনসম্পত্তি বা অর্থসঙ্গতি আছে, বিধাতার অনুগৃহীত সেই ভাগ্যবান্, আত্ম কৃতিত্বে বা আশ্রিত বা পোষ্য-বর্গের অনুগ্রহে, 'রত্ননিধি', 'স্বর্ণ বা রৌপ্যনিধি', 'মুক্তানিধি' বা 'পান্নানিধি' হউন, আপত্তি নাই। কিন্তু 'তত্ত্বনিধি' ও 'ভক্তিনিধি' বস্তুতই বড় উচ্চ শ্রেণীর কথা। ঈদৃশ উপাধি লাভের উপযোগী স্বনামধন্য পুরুষ লোক-সমাজে সচরাচর দৃষ্টি গোচর হন না। দেশের বা সমাজের সৌভাগ্যক্রমে কদাচিৎ কখন কখন এই শ্রেণীর মহারথীর আবির্ভাব বা জন্ম হইয়া থাকে। যাঁহারা জগতের তত্ত্ব-সমুদ্রে ডুবরীর ন্যায় আজীবন ডুবিয়া রহিয়া, মানব-জগতে প্রকৃত তাত্ত্বিকরূপে সম্মানিত হইয়াছেন, তাদৃশ জ্ঞান-গুরু স্পেন্সার প্রভৃতির ন্যায় মহামহোপাধ্যায়ও, বোধ হয়, "তত্ত্ব-নিধি"র মত উচ্চ উপাধি গ্রহণে সঙ্কুচিত না হইয়া পারেন না। কিন্তু, আমাদিগের উপাধি-উন্মাদ বাঙ্গালার কথা অন্যরূপ! যাঁহারা, গৃহিণীর গঞ্জনা, নথ-নাড়া, বাহু-নাড়া ও কঙ্কণ-ঝণ্ঝণা

গুলির বিনিময়ে উদরান্নের সংস্থান ভিন্ন, যাঁহারা আর কোন বার্ত্তার ভাবনা ভাবেন না;—হয়ত, তাঁহাদিগের কেহ কেহই আজি বুকে টুকি দিয়া, মাথার উপর 'তত্ত্বনিধির' নিশান উড়াইয়া দিগ্-বিজয়ে বহির্গত হইতেছেন! ভক্তি-বিগ্রহ, গৌরাঙ্গদেবের, সঙ্গী, সহচর ও পারিষদদিগের মধ্যে প্রকৃত ভক্তি-নিধিরূপে পূজা পাইবার যোগ্য ব্যক্তি বহু ছিলেন। সে শুভযুগের,—সেই মাহেন্দ্র ক্ষণের পরে, অমন ভক্তি-জীবন জীব এদেশের মনুষ্য-সমাজে আর কোথাও ফুটিয়াছে কিনা, সন্দেহ। 'বাইশ বাজারে' বেত খাইয়াও যাঁহার জড়-শরীর বিন্দুমাত্র ব্যথিত হয় নাই,—যাঁহার অন্তরাত্মা, সেই দুঃসহ শারীর-যন্ত্রণার মধ্যেও, হরিনামের বিমল আনন্দে বিভোর ও বিশ্রব্ধ রহিতে পারিয়াছে, তাদৃশ মহাপুরুষও আপনাকে কাঙ্গালের প্রাণে, 'দাসানুদাস' ভিন্ন অন্য কোন উচ্চ নামে পরিচিত করিতে ভাল বাসেন নাই। কিন্তু আজি বঙ্গে ভাগবতের দুটি শ্লোক মুখস্থ করিতে পারিলেই, এক একজন এক একটা অবতার সাজিয়া, 'ভক্তিনিধি' বা 'ভক্তরত্ন' নামে বাহ্বাস্ফোটন করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং গর্ব্বে গলা বাড়াইয়া, লড়কের মোরগের মত, পাথ-সাটে প্রতিপক্ষকে উড়াইয়া দেওয়ার উদ্যোগ করিতে থাকে! উপাধির ইহা অপেক্ষা অন্য আর কি বিড়ম্বনা সম্ভবে?

আর এক উপাধি,—'স্বামী'। এদেশে অন্তঃপুর-রাজ্যের রাণী স্ত্রীর অনুগ্রহে এই উপাধি সকলেরই প্রাপ্য ও ভোগ্য বটে। তবে অবশ্যই, যেখানে স্বামী, নব্য যুগের নূতন সমীকরণে, স্বামীর তালিকা হইতে নাম খারিজ করিয়া, প্রাণের আবেগে, 'প্রিয়তম' সাজিয়াছেন; পূর্ব্বে প্রাণের স্বামী ছিলেন, এক্ষণ সাধ করিয়া, এক সিঁড়ী নীচে নামিয়া, শুধু 'প্রাণ' হইয়াই সন্তুষ্ট আছেন। অথবা

(Husband) হইয়া বসিয়াছেন, এবং দুদিন পরে, একবারে "হাজ্‌ব্যাণ্ড্‌ম্যান" (Husbandman) হইয়া নিড়ানী-করে ক্ষেতে নামিবার পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছেন ; তাঁহাদিগের সম্বন্ধে পৃথক্‌ কথা। তাঁহারা অবশ্যই সকলের ভোগ্য এই 'স্বামী' উপাধিতে বঞ্চিত। এতদ্‌ব্যতীত অন্য সকলেই আপন আপন ঘরে অবাধে ও অপ্রতিহত ভাবে স্বামী ! কিন্তু এইরূপ লুপ্ত-প্রায় গুপ্ত উপাধিতে উপাধি-কামুকের তৃপ্তি হইবে কেন ? শুধু 'স্বামী' হইলে হইবে না, 'স্বামীজি' হওয়া আবশ্যক। শুধু স্ত্রী স্বামী বলিলে কি হইল, সর্ব্বসাধারণ পুরুষ ও স্ত্রীলোক সম্মিলিত হইয়া, 'স্বামী' বলিয়া নমস্কার না করিলে, মনের সাধ মিটে কৈ ?

'তত্ত্বনিধি' প্রভৃতির ন্যায় এই শ্রেণীর 'স্বামী' উপাধিও উচ্চ শ্রেণীর বস্তু। এ উপাধি নির্লিপ্ত যোগী, ও ভোগ-রাগ-বিমুখ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরই প্রাপ্য। যাঁহারা জড়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, অধ্যাত্ম-জগতে অতি উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছেন এবং আপনাদিগের ক্ষুদ্র খালের মুখ খুলিয়া দিয়া, মহাসমুদ্রের অনন্ত বিস্তারের সহিত সংযুক্ত করিয়া লইয়াছেন ও আত্মপর পার্থক্য ভুলিয়া গিয়াছেন, এইরূপে জগৎস্বামীর সহিত যাঁহাদিগের চির জাগন্ত একত্ব সম্বন্ধ স্থির প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারাই 'স্বামী' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য পাত্র। এরূপ দুর্লভ জন মনুষ্য-লোকে যেখানে সেখানে, 'ওমেদোয়ারের' মত, ঘুরিয়া বেড়ান কি ? কিন্তু এদেশের উর্ব্বর মাটীর গুণে, এক্ষণ 'স্বামীজির' বাজার বড়ই শস্তা। যাহার গায়ে ভগবান্‌-বস্ত্র, ললাটে ভস্ম, ও হাতে দণ্ড-কমণ্ডলু, সেই এখন এক এক দিকের এক একটা প্রবীণ 'স্বামীজি' ! এ 'স্বামী' উপাধি কে দেয়, কেন দেয়,

দুই একটি স্বামীজির সাক্ষাৎকার লাভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে এই শ্রেণীস্থ স্বামীজির ভস্ম-ভূষা, জটা-জুট ও দণ্ড-কমণ্ডলু দেখিয়া, যেমন একদিকে নির্জ্জন পঞ্চবটী-বাসিনী সীতা-সতীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠে,—তেমন অন্যদিকে হীরা মেলেনীর মত জীবও, ভয়ে বিস্ময়ে আপনার হাব-ভাব ও ছটা-নটাটুকু সম্বরিয়া লইয়া, চাউনি দেখিয়াই, বড়গলায় 'বাবা' বলিয়া, পায় পাইবার পথ দেখে! ইহা কি?

উপাধি গুণবাচক বিশেষণ;—নামের পরিচায়ক চিহ্ন;—ব্যক্তিগত গৌরববর্দ্ধক আভরণ। কিন্তু দেশের দুরদৃষ্ট বশতঃ, উহা, এক্ষণ অনেক স্থলেই, গুণের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া, নিরবচ্ছিন্ন ভিত্তিবিহীন অলীক অভিমানেরই সৃষ্টি, পুষ্টি ও তুষ্টি সম্পাদনে নিরত হইয়া পড়িয়াছে। উপাধির নেশায় সমগ্র দেশ উন্মত্ত! এ অবস্থায় শুধু ধন-কুবের ও ভূস্বামী বেচারীদিগের অপরাধ কি? যাহার তহবিলে বিদ্যার একটা 'কাণা-কড়া'ও সঞ্চিত নাই, সেও এখন হাতের 'সাফাই' বা কলে কৌশলে 'বিদ্যাবাগীশ' বা 'বিদ্যানিধি' হইয়া, অবাধে পার পাইয়া যাইতে পারে,—'খেউড়-ওয়ালা'ও যখন কবির দলে মিশিয়া, সময় সময়, 'কাব্য-বিনোদ' বা 'কবিরত্ন' নামে অনায়াসে তরিয়া যাইতে সমর্থ হয়, তখন যাঁহার ভূমি আছে,—জমি আছে, আপনার লোক জনের মধ্যে অপরিসীম প্রতাপ প্রতিপত্তি, প্রভাব ও প্রভুত্ব আছে, তিনি যদি আশ্রিত, অনুচর ও পার্শ্বচরদিগকে দুইটি রজত-চক্র বা কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন বিতরণ দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, গবর্ণমেণ্টের বিনা 'পাসে' এবং পিতা, পিতামহ প্রভৃতি কাহারও 'মহারাজা' বা 'রাজা' উপাধি না থাকা সত্ত্বেও, 'কুমার' নামে অভিহিত হইতে পারেন, কিংবা 'রায়বাহাদুর', 'রাজাবাহাদুর', 'মহারাজা'

বা সাহেব-সুবার উপাসনায় একটু অতিরিক্ত মনোযোগী হন, তাহা তেমন একটা গুরুতর দোষের বিষয় কি?

উপাধি বস্তুতঃই ব্যাধি,—দুরূহ দুশ্চিকিস্য ব্যাধি। এদেশে এখন আর উহা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিতে বা সম্প্রদায়বিশেষে ব্যক্তিগত ভাবে বা Sporadic অবস্থায় সীমাবদ্ধ নহে। একবারে ভয়াবহ সংক্রামক মূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত! সুতরাং ব্যক্তিগত ভাবে ইহার চিকিৎসা অনাবশ্যক। ইহার জন্য ব্যাপক মুষ্টিযোগ বা বসন্ত, ওলাউঠা বা প্লেগের টীকার ন্যায় বিশেষ কোন প্রতিষেধ-প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। বসন্ত, ওলাউঠা, ও প্লেগের বিষ বা বীজ মৃদু মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে, মৃদু মূর্ত্তিতে ঐ রোগের বিকাশ ঘটে ও সহজেই সারিয়া যায়। কিন্তু এই উপায়ে টীকার 'মার্কা-মারা' দেহে ঐ রোগের বহিস্থ বিষ আর তেমন সাংঘাতিক মূর্ত্তিতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। উপাধি-ব্যাধি সম্বন্ধেও ঐরূপ একটা টীকার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে ভাল হয় না কি? বস্তুতঃ, ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও অনুরোধ।

একদা কোন মহারাজের 'সোল্‌তানত' দেখিয়া নগণ্য এক গ্রাম্য চণ্ডালের মাথা ঘুরিয়া গেল;—তাহার বড়ই সখ হইল যে, সে মহারাজের 'বাপ' হইবে। সে একবারে বিকারের রোগীর মত ক্ষেপিয়া উঠিল! সে জানিত তাহার রাজ্য নাই, সম্পত্তি নাই, তাহাকে কাঠ কাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহার পুত্র কখনও মহারাজ হইবে, ইহা অসম্ভব কথা। ইহা সে বুঝিত; কিন্তু তথাপি সে তাহার এই দুরাকাঙ্ক্ষাকে কিছুতেই দমন রাখিতে পারিত না। কালক্রমে তাহার একটি পুত্র জন্মিল। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া আর কোন পথ না পাইয়া,

লোকে তাচ্ছল্য করিয়া উহাকে "মহারাইজা" বলিত বটে,—কিন্তু ভালমুখে আদর করিয়া ডাকিতে হইলে, আর গত্যন্তর ছিল না, তখন 'মহারাজ' বলিয়াই সম্ভাষণ করিতে হইত। ঐ সম্ভাষণ শুনিলে বৃদ্ধ চণ্ডালের প্রাণটা আনন্দে নাচিয়া উঠিত। এইরূপে উহার 'মহারাজের' 'বাপ' হওয়ার সাধ এক প্রকার পূর্ণ হইয়া গেল। দুরাকাঙ্ক্ষার সেই নিদারুণ অন্তর্জ্বালাও ক্রমে প্রশমিত হইয়া আসিল।

আমার বিবেচনায় এদেশের সমস্ত পিতা মাতা ও অভিভাবকদিগেরই, এই চণ্ডালের অনুকরণে, গো-বীজে বসন্তের টীকার ন্যায়, শৈশবেই শিশুদিগকে 'উপাধির বীজে' টীকা দিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, শেষে এই রোগের বহিস্থ বিষে তেমন সাংঘাতিক উপদ্রব ঘটাইতে পারিবে না। শিশুদিগের নামকরণ সময়ে, যদি 'চারু', 'চুণি' ও 'মতি' ইত্যাদির পরিবর্ত্তে, 'মহারাজ', 'রাজাবাহাদুর', 'রায়বাহাদুর', 'কাব্যবিশারদ', 'তত্ত্বনিধি,' 'ভক্তিনিধি', 'প্রেমানন্দ', ও 'জ্ঞানানন্দ' প্রভৃতি নাম রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেই সমস্ত লেঠা চুকিয়া যাইতে পারে। নামে গুণের মুখাপেক্ষা করে না। তাহা করিলে, কখনও সুশীল নামে দুর্বৃত্ত, রসিক নামে মুক, গৌরাঙ্গ নামে 'পাথরে গোপাল' সমাজে নৃত্য করিয়া বেড়াইত না! উপাধিগুলি 'নামকরণের' নাম হইয়া গেলে, গুণদর্শী কোন শ্রোতার কাণেও বাধিবে না; ঐ সকল উপাদেয় অক্ষরে অভিহিত ও আহূত হইবার সুখ ও সখটুকুও ক্রমে মিটিয়া আসিবে। গ্রাম্য হাতুড়ের এই সামান্য মুষ্টিযোগের প্রতি মহামহোপাধ্যায় ধন্বন্তরিদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে কি?

শ্রীঃ—

নাই।

ভুলা'তে আমার কিছু ছিল না,—
দয়া ক'রে ভালবেসেছ ;
কি শক্তি আমার, তোমা' ডাকিব,—
দয়া ক'রে তুমি এসেছ।

অধরে আমার নাই অমিয়া,
বিলাসিতা নাই আঁখিতে ;
কি দিয়ে তোমার মন তুষিব ?—
কি শক্তি তোমায় রাখিতে ?

হৃদয়ে নাহিক প্রেম মদিরা,
রসিক! কি তুমি দেখিছ ?
তোমায় করিব মুগ্ধ, কি আছে ?—
হৃদয়ে টানিয়া রাখিছ।

এসেছ ভুলিয়া,—যদি যাওহে,
এ হৃদি আঁধার করিয়া,
জীবন-কুসুম ধীরে শুকা'বে,
পরশ তোমার স্মরিয়া।

শ্রীমহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রাচীন সুবর্ণগ্রাম। *

সুবর্ণগ্রাম পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন রাজধানী। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণও ইহার প্রাচীনত্বের প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই, যে সুবর্ণগ্রাম এক সময়ে সর্ব্বত্র সমাদৃত, সুপরিচিত ও সম্পূজিত ছিল, কাল-মাহাত্ম্যে আজ উহার অবস্থান, বিস্তৃতি এবং বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় কোন সহৃদয় ব্যক্তিই জানিতে অবসর পাইতেছেন না। "ধূমকেতুর" পাঠকপাঠিকাগণের অবগতির জন্য আমরা বহু কষ্টে ও বহু আয়াসে সুবর্ণগ্রামের ঐতিহাসিক তথ্যাদি যথাসম্ভব সংগ্রহ করতঃ প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। ভ্রম-প্রমাদ মনুষ্যের স্বাভাবিক। অতএব যদি কুত্রাপি ভ্রম-প্রমাদ পরিলক্ষিত হয়, কিংবা প্রবন্ধের কোন অংশ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, তবে তৎসম্পর্কে কোন সহৃদয় ব্যক্তি প্রকৃত তথ্য জানাইলে, যথেষ্ট উপকৃত ও বাধিত হইব।

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ মার্সম্যান্ বলেন,—"পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁও বর্ত্তমান ঢাকা নগর হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে অবস্থিত।" † তাঁহার লিখানুসারে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শীতলাক্ষার পূর্ব্বপাড় হইতে মেঘনাদের পশ্চিমপাড় পর্য্যন্ত সুবর্ণগ্রাম বিস্তৃত ছিল। ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য গবেষণ-তৎপর মিঃ রাল্ফফিছ ইসা-

---

* কোন কোন গ্রন্থে "স্বর্ণগ্রাম" বা "সোনারগাঁও" বলিয়াও লিখিত আছে। প্রঃ লেঃ।

† "The capital of East Bengal was Sonargong or Soovarnagram about eight miles from the modern city of Dacca."—Marshman's History of Bengal.

খাঁর রাজধানী সুবর্ণগ্রামে সমুপস্থিত হন। বর্ত্তমান বন্দরের নিকটবর্ত্তী শীতলাক্ষার পূর্ব্বকূলে খিজিরপুর নামক স্থানে ইসা-খাঁর রাজধানী ছিল। অতএব দেখা যায়, শীতলাক্ষার পূর্ব্ব-তীরবর্ত্তী খিজিরপুর, বন্দর প্রভৃতি স্থান প্রাচীন কাল হইতেই সুবর্ণগ্রাম বলিয়া পরিচিত। এই ইসা খাঁ জঙ্গলবাড়ীর খ্যাতনামা দেওয়ান ইসা খাঁ মস্‌নদ আলি কি না, এবিষয়ে অনেক মতদ্বৈধ আছে। আমরা পশ্চাৎ এবিষয়ের মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইব।

যখন বঙ্গদেশ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, গৌড় ও সুবর্ণগ্রাম রাজধানী দ্বয়ের অধীনরূপে পৃথক্ পৃথক্ শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল, তখন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন লিখিয়াছেন,—"লোহিত্য (ব্রহ্মপুত্রনদের সর্ব্বপশ্চিমস্থ স্রোত) নদের পূর্ব্বদিকে বঙ্গদেশ; সেই বঙ্গদেশে স্বর্ণগ্রাম প্রভৃতি অবস্থিত আছে।"*

* "লোহিত্যাৎ পূর্ব্বতো বঙ্গঃ।
বঙ্গে স্বর্ণগ্রামাদয়ঃ॥" —রঘুনন্দন।

এস্থলে লোহিত্যের অর্থে লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমীঘাটের পূর্ব্ব-দিগস্থ ব্রহ্মপুত্রকে লক্ষ্য করিলে, ইহার পশ্চিম তীরবর্ত্তী ভূভাগ গৌড়ের ছত্রাধীন হইয়া পড়ে। পুরাকাল হইতেই পূর্ব্ববঙ্গের পশ্চিম সীমা, ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট রহি-য়াছে। সুবর্ণগ্রাম রাজধানীর অধীন থাকিয়া ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ও শ্রীহট্ট শাসিত হইত। আইন-আকবরীতে লিখিত সুবর্ণগ্রাম রাজধানীর অধীনস্থ মহা-লাদির আয় দেখিলেও, তাহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। বাঙ্গালার প্রাচীন মানচিত্র দেখিলেও রঘুনন্দনের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি

এসিয়াটিক রিসার্চ্চে দৃষ্ট হয়,—“নিষাদ, রাক্ষস, উপবঙ্গ, ধীবর, রিষিক, নীলমুখ, কেরল, ওষ্ঠকর্ণ, কিরাত, কালোদর, বিবর্ণ, কুমার, এবং স্বর্ণভূষিতজাতি যে দেশে বাস করিত, তাহার মধ্যদিয়া, হ্লাদিনী বা ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত।” স্বর্ণভূষিতজাতি ঢাকার নিকটবর্ত্তী “স্বর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁও” এর নিকটে বাস করিত। * কেহ কেহ বলেন, স্বর্ণভূষিতজাতির বাসস্থান বলিয়াই ইহার “স্বর্ণগ্রাম বা সোনারগাও” নামকরণ হইয়াছে। আমরা আজও প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, স্বর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁও এর দক্ষিণ সীমায়ই ব্রহ্মপুত্রের “ব্রহ্মপুত্র” নাম শেষ হইয়াছে। তৎপর উহা অপর নামে কথিত হয়। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, পুরাকালে নিষাদাদি স্বর্ণভূষিতজাতি অধ্যুষিত দেশ-প্রবাহী স্রোতই ব্রহ্মপুত্রের প্রধান স্রোত ছিল।

বর্ত্তমান সুসভ্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টও পূর্ব্ববঙ্গের মানচিত্রে নারায়ণগঞ্জের অপর পাড়ে শীতলাক্ষার পূর্ব্বস্থ, মেঘনাদের পশ্চিমস্থ ভূভাগের উপরে স্পষ্টাক্ষরে “Sonargong” অর্থাৎ “সোনারগাঁও” চিহ্নিত করিয়া, কোন্ স্থান প্রকৃত সোনারগাঁও, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। ফল কথা, লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমীঘাটের পূর্ব্বদিগস্থ ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় তীরবর্ত্তী বিস্তৃত ভূখণ্ডের সাধারণ নাম যে সুবর্ণগ্রাম, তাহা আবহমান কাল হইতেই সর্ব্বত্র

---

* “The Hladini or Brahmaputra goes through the Nishadas, Racshas, Upa Bangas (or near-Bengal), the Dhivaras (or boat-men), Rishicas, Nilamuchas, Ceralas, Ostacarnas, Ciratas, Caladaras, Vivarnas, Cumaras, and Swarnabhushitas (living near Swarnagram or Sonargaum near Dhacca.)”—Asiatic Research Vol. VIII. P. P.

স্বীকৃত ও ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। ব্লক্ম্যান সাহেব বলেন, —"সরকার সোনারগাঁও মেঘনাদ ও ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় কূলে অবস্থিত"। আইন-আকবরী পাঠেও জানা যায়, মোগল-সম্রাট্‌-শিরোমণি মহাত্মা আকবর বাদশাহের প্রধান হিন্দু-মন্ত্রী রাজা তোড়লমল, মুসলমানাধিকৃত সমস্ত ভারতবর্ষ জরীপ করিয়া, পনরটি 'সুবায়' বিভক্ত করেন। প্রতি সুবার শাসন-সৌকার্য্যার্থ আবার তাহা কতিপয় "সরকারে" বিভক্ত হয় *। "সরকার সোনারারগাঁ"ও ঐরূপ একটি বিভাগ। উহা আবার বায়াম্ন 'মহালে' বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত উক্ত মহালগুলি আবার বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'পরগণায়' বিভক্ত হইয়া ছিল।

সরকার সোনারগাঁর উত্তরসীমা পূর্ব্বশ্রীহট্ট, পূর্ব্বসীমা স্বাধীন ত্রিপুরা, পশ্চিম সীমা লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্রের বর্ত্তমান প্রধান স্রোত যিনাই,—যাহা গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে) এবং দক্ষিণ সীমা সমুদ্র। সুবর্ণগ্রাম ও সরকার সোনারগাঁ এক কথা নহে। কতকগুলি 'মহালের' সমষ্টি যেমন সরকার সোনারগাঁ,—সেইরূপ কতকগুলি সরকারের সমষ্টি সুবর্ণগ্রাম। শীতলাক্ষার পশ্চিমদিক হইতে বর্ত্তমান ঢাকা-নগর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান দ্বাদশ সরকার বা বাজুহা বিভাগের অন্তর্গত। ¶

---

* রাজা তোড়লমল সমগ্র বাঙ্গলা ১৯ সরকারে ও ৬৮২ মহালে বিভক্ত করেন। ইহাতে বঙ্গের রাজস্ব ১০৬৮৫৯৪৪ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। এই হিসাবের নাম "ওয়াশীল তুমারজমা"। —আইন-আকবরী।

¶ কোন কোন পুস্তকে ঢাকা সপ্তম সরকার বাজুহার অন্তর্গত বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু লক্ষ্ণৌতে মুদ্রিত "আইন-আকবরী"

"আইন-আকবরী" পাঠে জানা যায়, সরকার বাজুহার অন্তর্গত "মন্‌মণিসিংহ" নামক স্থান, মুসলমান অধিকৃত হইয়া, "নোছ্‌-রাৎসাহী" নামে অভিহিত হয়। বোধ হয়, কোন প্রবল-প্রতা-পান্বিত মন্‌মণিসিংহ নামধেয় ক্ষত্রিয় বীর যে ভূখণ্ডের অধিপতি ছিলেন, তাহাই তন্নামানুসারে "মন্‌মণিসিংহ" নামে খ্যাত ছিল। * তাহা হইতেই, খুব সম্ভবতঃ, বর্ত্তমান "ময়মনসিংহ" নামের উৎ-পত্তি হইয়াছে। এই মন্‌মণিসিংহের পরবর্ত্তী ভূস্বামিগণ 'দশশালা' বন্দোবস্তের সময়, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতির অন্তর্গত যে সকল স্থানে তাঁহাদের অধিকার ছিল, তৎসমুদায় '১নং নোছরাৎসাহীর' ভুক্ত করিয়া বন্দোবস্ত করেন। দশশালা বন্দোবস্তের সময় এরূপ কার্য্য অনেক স্থলেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তজ্জন্যই বর্ত্তমানে, প্রাচীন এক বিভাগের জমি অন্য বিভাগে,—এক জিলার এক তালুকের এলাকায়, বহুদূরস্থিত অপর এক জিলার,—কুত্রাপি অন্য

---

* মন্‌মণিসিংহ যে প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, "আইন-আকবরীতে" তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মন্‌মণিসিংহ উক্ত গ্রন্থে "বদ্‌মার" (ক্রূর সর্প) বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। "নোছরাৎ" অর্থ,—"যো জঙ্গমে হাসিল হো"—আর "সাহী" অর্থ —"সোলতানাৎ", অর্থাৎ যুদ্ধে জিত। অতএব "নোছরাৎ সাহীর" অর্থ হইতেছে,—"যুদ্ধে জিত বাদশাহের রাজ্য।" সামান্য দুঃখে ও ক্রোধে মন্‌মণিসিংহকে "বদ্‌মার" বলা হয় নাই, এবং সামান্য প্রতাপ প্রকাশের পর "নোছরাৎসাহী" নামকরণ হয় নাই। "আইন-আকবরীতে" আরও লিখিত আছে, নোছরাৎসাহীর কোনও মুসলমান অধিপতি তদীয় স্ত্রীকে 'মোহরাণা' স্বরূপ বহুসংখ্যক গ্রাম সমন্বিত পাঁচটি মহাল দান করেন। এই মুসলমান অধিপতি কে, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। — প্রঃ লেঃ।

প্রদেশস্থ জমিও ভুক্ত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। মনমথি-সিংহ এগারসিন্ধুর উত্তরস্থ ভূভাগের অধিপতি ছিলেন।

আইন-আকবরীতে "মহেশ্বরদী" নাম দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইহা প্রাচীন নাম নহে। কথিত আছে, মহেশ্বর * নামক জনৈক বৈদ্যবংশোদ্ভব ব্যক্তি প্রাচীন সুবর্ণগ্রাম ও তদ্‌বহিস্থ অনেক স্থান স্বীয় নামে "১নং নম্বর পরগণা" ভুক্ত করতঃ বন্দোবস্ত করেন। বোধ হয়, তাহাই ক্রমশঃ "মহেশ্বরদী" নামে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। সরকার সোনারগাঁর অনতিদূরেও কোন কোন প্রসিদ্ধ গ্রাম "তপে মহেশ্বরদীর" অন্তর্গত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, এসকল পরগণা, তপা প্রভৃতিও যে সুবর্ণগ্রামের এলাকাধীন ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ বলেন, মুসলমানদের সময়ের রাজধানী "মোগড়াপার" ও তৎসন্নিহিত কতটুকু ভূমির নামই সুবর্ণগ্রাম। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। একটি সুবিস্তৃত সুবিখ্যাত প্রাচীন ভূখণ্ডের সাধারণ সংজ্ঞা—সুবর্ণগ্রাম। "মোগড়াপার" বা তন্নিকটস্থ কোন স্থান বিশেষের নাম পূর্ব্ব হইতে সুবর্ণগ্রাম নাই। ‡

---

* মহেশ্বর ইসা খাঁর পরবর্ত্তী বংশধরের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর নামে তালুক ও জমিদারীর বন্দোবস্তও অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। প্রঃ লেঃ।

‡ মুসলমানগণ যেস্থানে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন, তাহার নামকরণ হয়,—"মোগড়াপার"। 'মোগড়াপার' দ্বিতীয় বল্লালের সময়ে 'রথ-খলা' নামে পরিচিত ছিল। আজও 'পোড়ারাজার' প্রস্তরময় রথের ভগ্নাবশেষ তন্নিকটে পতিত রহিয়াছে। মুসলমান-গণ 'মোগড়াপার' ও 'একডালা', এই উভয় স্থানেই বাস করিতেন। 'একডালায়' এক দুর্গও ছিল; 'একডালার' পূর্ব্ব দিকে যে স্থান ছিল, তাহাই পরিশেষে "আমিনগর" বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। প্রঃ লেঃ।

সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁ মুসলমান-প্রদত্ত নাম নহে। কোন স্থান জয় করিয়া, তাহার নামকরণ করিতে হইলে, মুসলমানগণ স্বীয় ভাষা, ধর্ম্ম কিংবা আধিপত্য-সূচক শব্দেই অভিহিত করিতেন। যখন মুসলমানগণ বঙ্গে,—বঙ্গে কেন, ভারতেও পদার্পণ করেন নাই, তখনও সুবর্ণগ্রাম স্বনামে সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিল। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের বন্দোবস্তের (দশশালা বন্দো-বস্তের) পূর্ব্বে স্থায়ীরূপে প্রায় কাহারও হস্তে ভূমি থাকে নাই। আজ যিনি জমিদার, পাঁচবৎসর পরে হয়ত, তিনি আর জমিদার নহেন! সংযোজনে ও বিয়োজনে, একে অন্যের জমিদারী লইয়া যাইত। সুতরাং কোন প্রাচীন ভূভাগের সীমা নির্দ্দেশ বহু কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে।

কামরূপ রাজ্য চারিভাগে বিভক্ত,—সৌমারপীঠ, রত্নপীঠ, কামপীঠ ও সুবর্ণপীঠ। এই রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশে লিখিত আছে,—"উত্তরে কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়া, পূর্ব্বে দিক্ষুনদী, এবং দক্ষিণে লাক্ষার সহিত ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম-স্থল পর্য্যন্ত কামরূপ রাজ্য বিস্তৃত। ইহার বিস্তৃতি ত্রিংশ যোজন, দৈর্ঘ্য শত যোজন এবং ইহার আকার ত্রিকোণ"।* বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকৃত মানচিত্রেও

---

* "উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াতু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে॥
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি।
কামরূপ ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ॥
ত্রিংশদ্ যোজন বিস্তীর্ণং দীর্ঘেণ শত যোজনং।
কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকারমুত্তমম্॥"
—যোগিনীতন্ত্রম্।

সকল তন্ত্রই আধুনিক, এমন নহে। সুতরাং ইহাও সুবর্ণ-

দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও আকৃতির সাম্য দৃষ্ট হয়। কে বলিতে পারে যে, চিরপ্রসিদ্ধ প্রাচীন সুবর্ণগ্রামের নাম "সুবর্ণপীঠ" কল্পিত হয় নাই?

ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমকূলে স্নান করিলে, গঙ্গা স্নানের ফল হয়।* বিশেষতঃ অশোকাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র "তীর্থরাজ" হন †; সেজন্য অদ্যাপিও পুণ্যার্থিগণ অশোকাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রে স্নান তর্পণাদি করিয়া থাকেন।

---

* "লৌহিত্যে পশ্চিমে ভাগে সদা বহতি জাহ্নবী।"—তন্ত্রশাস্ত্রম্।

† "কথিত আছে, পরশুরাম মাতৃবধের পাপ বিমোচনার্থ, বহু তপস্যার পর, হস্তস্থ পরশুর (কুঠারের) আঘাতে ব্রহ্মকুণ্ড হইতে ব্রহ্মপুত্রকে নিম্ন আসাম, রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ ইত্যাদির মধ্য দিয়া, লাঙ্গলবন্ধ পর্য্যন্ত আনয়ন করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, শীতলাক্ষার সহিত বিবাহ দিয়া, ব্রহ্মপুত্রকে "তীর্থরাজ" রূপে জগতে শ্রেষ্ঠ করিবেন। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র, পরশুরামের অজ্ঞাতসারে, শীতলাক্ষার দর্শনাভিলাষে গমন করেন। এদিকে শীতলাক্ষা আগন্তুকের আগমন সংবাদ শ্রবণে, বৃদ্ধার বেশে বসিয়া ছিলেন। ব্রহ্মপুত্র এই বৃদ্ধাকে দেখিয়া, পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই বলিলেন,—"মাতঃ! শীতলাক্ষা কতদূরে?" বৃদ্ধা বলিলেন,—"আমারই নাম শীতলাক্ষা।" ব্রহ্মপুত্র লজ্জিত হইলেন,—আর এক পদও সরিলেন না; অপ্রতিভ হইয়া লাঙ্গলবন্ধে প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে পরশুরাম সমস্ত জানিতে পারিয়া, ক্রোধ-বশে ব্রহ্মপুত্রকে অভিশাপ দিলেন। ব্রহ্মপুত্রের বহু অনুনয় বিনয়ের পর, জামদগ্ন্য সুপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—'প্রত্যহ তীর্থরাজ না হইয়া, বৎসরের মধ্যে এক অশোকাষ্টমীতে তীর্থরাজ হইবে। এতদ্ব্যতীত গঙ্গায় স্নান করিলে যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় হয়, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমকূলে স্নান করিলেও তেমন পুণ্যসঞ্চয় হইবে'।"

জনশ্রুতি আছে, অতি প্রাচীনকালে আকাশ হইতে উক্ত বিস্তৃত ভূভাগের উপর সুবর্ণ বর্ষিত হইয়াছিল; সুতরাং ইহার "সুবর্ণগ্রাম" নামকরণ হইয়াছে।* এমনও শুনা যায়, মহারাজ জয়ধ্বজের সময়ে "সুবর্ণগ্রাম" নামের প্রথম সৃষ্টি। এই মহারাজ জয়ধ্বজ দ্রুহ্যুর † উত্তরপুরুষ ও ত্রিপুরের পূর্ব্বপুরুষ হইবেন বলিয়া অনুমিত হয়। তৎপূর্ব্বে উহা কিরাতাধিকৃত দেশ বলিয়া অভিহিত ছিল। ‡

সুবর্ণগ্রামের অনেক স্থানের ভূমি রক্তবর্ণ। জনশ্রুতি যে, দেবাসুরের যুদ্ধকালে যে সকল স্থানে শোণিত-পাত হইয়াছিল, তত্তৎস্থানের ভূমিই রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে লয়, ভারতের অনার্য্য আদিমবাসীদের সহিত আর্য্যদিগের যে ভীষণ সংগ্রাম হয়, তাহাই "দেবাসুরের" যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত

---

* স্বর্ণ বা স্বর্ণবৎ কোন পদার্থের বর্ষণ অসম্ভব নহে। ১৮১০ খৃঃ অব্দে হাঙ্গেরী দেশে রক্ত-বর্ষণ হইয়াছিল; ১৭৭৪ শকের ১৪ই হইতে ১৭ই চৈত্র পর্য্যন্ত চীনদেশে বালুকা বর্ষিত হইয়াছিল; ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ১১ই আগষ্ট বোম্বাই সহরে প্লাটিনাম-বর্ষণ হইয়া গিয়াছে। ঐশ্বরিক কার্য্যে কাহারও হাত নাই! সুবর্ণ-বর্ষণ প্রযুক্তই হউক, বা "সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা" বলিয়াই হউক, সুবর্ণগ্রাম আধুনিক যাবনিক নাম নহে। প্রঃ লেঃ।

† মহারাজ দ্রুহ্যু ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থ ত্রিবেগ বা ত্রিবেণীতে রাজধানী সংস্থাপন করিয়া, কিরাতগণকে বশে আনিয়াছিলেন। —(ত্রিপুরার রাজমালা দ্রষ্টব্য)।

‡ "তপ্তং কুণ্ডং সমারভ্য রামক্ষেত্রান্তকং শিবে।
কিরাতদেশো দেবেশি!" * * * —তন্ত্রশাস্ত্রম্।
"ভারতস্য পূর্ব্বস্যাং দিশি কিরাতভূমিঃ।"

হইয়াছে। বহুকালব্যাপি যুদ্ধের পর আর্য্যগণ এদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।* আর্য্যগণ ভারতের আদিমবাসী নহেন। তাঁহারা আর্য্য—দেব †, এবং আদিম-বাসিগণ—অনার্য্য, শূদ্র, অসুর ‡ ও দাস বলিয়া অভিহিত।

বনবাস কালে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমীঘাট পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন, ইহা নিঃসংশয়িত কথা। § এজন্যই পূর্ব্ববঙ্গের অপর কোন কোন স্থানকে "পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ" বলিয়া থাকে। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, সুবর্ণগ্রামের বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, মৃত্তিকাদির স্তর ও কীর্ত্তি-কলাপের ভগ্নাবশেষ পরীক্ষান্তে, সহৃদয় ডাঃ ওয়াইজ (Dr. Wise) ইহার প্রাচীনত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে সুবর্ণগ্রামের সীমা নির্দ্দেশকল্পে আমরা বলিতেছি,—যাহার পূর্ব্বদিকে মেঘনাদ, পশ্চিমে শীতলাক্ষা, উত্তর সীমায়

---

* "দেবাসুরমভূদ্যুদ্ধং পূর্ণমব্দ শতংপুরা।" —চণ্ডীপুরাণম্।

পুরাণে আছে, - মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন-দণ্ড করিয়া, দেবাসুর-গণ সমুদ্র-মন্থন করিয়াছিলেন। "মন্দর-গিরি" রাজমহলের দক্ষিণ-পশ্চিম গিরি-সঙ্কটের একটি শিখর বিশেষ। অতএব বোধ হয়, উক্ত শৈলের পাদদেশে বঙ্গোপসাগর তরঙ্গ-রঙ্গে খেলা করিত। উহারই একপার্শ্বে আর্য্যগণ (দেবগণ),—অপর পার্শ্বে অনার্য্যগণ (অসুরগণ) অবস্থান করিতেন। পরে ক্রমশঃ সাগরোদ্ভূত দেশ সমুদায় দেবগণের (আর্য্যগণের) অধীন হইয়াছিল। প্রঃ লেঃ।

† "দৈব্যো বৈ বর্ণো ব্রাহ্মণঃ অসূর্য্য শূদ্রঃ।"

—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণম্।

‡ "দাসং বর্ণং শূদ্রাদিকং যদ্বা দাসমুপক্ষপয়িতারম্ অধরং নিকৃষ্টমসুরম্।"—ঋগ্বেদ ভাষ্যে সায়নাচার্য্য।

এগারসিন্ধুর দুর্গ * ও দক্ষিণে শীতলাক্ষা এবং ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম-স্থল,—এই বিস্তৃত প্রাচীন ভূভাগের নামই "সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁ।" ফল কথা, সুবর্ণগ্রাম, সুহ্ম ও প্রাচীন বঙ্গের মধ্য-বর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ অতি পুরাতন স্থান।

আধুনিক নামাদি দ্বারা সুবর্ণগ্রামের সীমা নির্দ্দেশিত হইলে, ইহার দক্ষিণ সীমা মেঘনাদ ও আইরল খাঁ (এই নদী বেলাব নামক স্থানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র হইতে বহির্গত হইয়া মেঘ-নাদে পতিত হইয়াছে), পশ্চিম সীমায় বানার নদী ও শীতলাক্ষা, দক্ষিণসীমা মেঘনাদ, শীতলাক্ষা, ব্রহ্মপুত্র ও ধলেশ্বরীর সঙ্গমস্থল, এবং উত্তর সীমা সিংহশ্রী, নয়ানবাজার, রামপুরহাট, ও বেলাবর উত্তরস্থ ব্রহ্মপুত্র। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৮ মাইল, প্রস্থ ১০ মাইল; তদনুসারে ক্ষেত্রফল ৪৮০ বর্গ মাইল।

শ্রীকামিনীকুমার দে রায়।

চিরবসন্ত।

১

আমি নব নীলিমার অরুণ-প্রভাতে
প্রথম কিরণ;
কুয়াসার ঘোরে-ঘোরে,
নামিয়া এসেছি ভোরে,
নীলিমা-পুলিন,—
আমি জাগরণ!

---

* এই স্থান বর্ত্তমানে ময়মনসিংহ জিলার এলাকাধীন প্রসিদ্ধ মঠখলা-বাজারের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। অধুনা এখানে দুর্গের ভগ্নাবশেষ কিছুই দৃষ্ট হয় না। প্রঃ লেঃ।

২

আমি আনিয়াছি হাসি,—
মালতী, কেতকী রাশি,
শ্যাম কুঞ্জলতা ;
আনিয়াছি চূত-গন্ধ,
আকুল মধুপ বৃন্দ,
মরম-বারতা—
আমি নবীনতা !

৩

আমি রাঙ্গিয়াছি লাজে,
সাজা'য়েছি শ্যাম সাজে,
নিখিল ভুবন ;
আমি আনিয়াছি ভাষা,
কত ছবি—কত আশা,
সঙ্গীত-প্লাবন,—
পিকের কূজন !

৪

আমি নীরব সন্ধ্যার,
নব অমল কোমল
জ্যোছনার ধারা ;
নন্দনের বন হ'তে,
রচিয়া এনেছি সাথে,
স্বপনের কারা,—

৫

গন্ধে ভরি' চারিধার,
আনিয়াছি ফুল-ভার,—
অযুত তারকা;
আনিয়াছি সুখালস,
মদির তন্দ্রার রস,
সুপ্তি-যবনিকা—
আমি মরীচিকা!

৬

আনিয়াছি গুপ্তহর্ষ,—
প্রিয়ার কোমল-স্পর্শ,
সুখ-শিহরণ!
আনিয়াছি লুকাইয়া,
নিশীথে আঁধার দিয়া,
প্রিয়ার চুম্বন—
আমি নিরঞ্জন!

৭

তোমার লাগিয়া প্রিয়ে!
আনিয়াছে কবি, হের,
তন্দ্রা-তৃপ্তি-ভরা
সৌন্দর্য্যের স্বর্ণ-স্বপ্ন,—
ছানিয়া ছাঁকিয়া অই—
মোহের মদিরা!—
অয়ি তৃষ্ণাতুরা!

৮

মোহের মাধুরী ভরি',
হৃদের তুহিন-বারি,
ঢালিয়া ধারায়,
তিয়াসা-তৃপতি-ভরা,
সুখের সে তীব্র সুরা,
পিয়া'ব তোমায়,—
তব তৃষিত কণ্ঠায়!

কুমার সুরেশচন্দ্র সিংহ বি, এ।

সহযোগী সাহিত্য।

(মরুভূমিস্থ জীবগণের কথা)

মরুভূমি সাধারণতঃ দ্বিবিধ,—শীতল ও উষ্ণ। শীত-প্রধান দেশে যেসকল মরুভূমি দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ই "শীতল মরুভূমি" (cold deserts) বলিয়া অভিহিত হয়; আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সচরাচর যেসমস্ত মরুভূমি দৃষ্ট হয়, সে সমুদায়ই "উষ্ণ মরুভূমি" (hot deserts) বলিয়া খ্যাত। এই উভয়বিধ মরুই বালুকা রাশিতে পরিপূর্ণ; তবে স্থানীয় জল-বায়ুর প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে মাত্র। "শীতল মরুভূমিতে'' জীবগণের কোন চিহ্নাদিই প্রায়শঃ পরিলক্ষিত হয় না; খুব সম্ভবতঃ শীতাধিক্যই ইহার মূল কারণ। কিন্তু পক্ষান্তরে "উষ্ণ মরুভূমিতেই'' সাধারণতঃ প্রাণীমণ্ডলীর

সূর্য্যের কিরণ-প্রাখর্য্য যতই বেশী হউক না কেন,—বালুকা-রাশি যতই জল-শূন্য হউক না কেন, পৃথিবীতে এমন কোন "উষ্ণ মরুভূমি" নাই, যাহাতে কোন না কোন অদ্ভুতাকৃতি-বিশিষ্ট প্রাণীর অস্তিত্ব উপলব্ধি না হয়। সীমান্ত-প্রদেশে যাইবার সময়, "আফ্গান ডিলিমিটেশন্ কমিশনকে" (Afghan Delimitation Commission) একদা উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ জ্বালাময়ী এক মরুভূমি অতিক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল। সেই ভয়ঙ্করী মরুভূমিতে বিবিধ বৃহদাকার সর্প দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ!

"এরিজোনার" (Arizona) জল-শূন্য সমতল ভূখণ্ডগুলিও বিবিধ সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণীতে এবং নানা জাতীয় কীট-পতঙ্গে পরিপূর্ণ বলিয়া জানা গিয়াছে! এতাদৃশ উষ্ণ বালুকা-স্তূপে কিরূপে উপরোক্ত জীবমণ্ডলী বাস করিয়া থাকে,—কি পদার্থ আহার করিয়া, উহারা জীবনধারণ করে, সে সকল আমরা পরিজ্ঞাত নহি; সুতরাং বুঝাইয়া বলিতে সম্যক্ অসমর্থ। তবে এইটুকু বুঝা যায় যে, স্থানভেদে,—অবস্থাভেদে, জীবগণের প্রকৃতিও বিভিন্ন হইয়া থাকে। বোধ হয়, কোন মরুজ পদার্থ আহার করিয়াই উহারা বাঁচিয়া থাকে।

খুব সম্ভবতঃ "সাহারার" (Great Shahara) মত এত বড় মরুভূমি পৃথিবীতে আর নাই। উহার কেন্দ্রস্থলস্থ মরূদ্যান-গুলিতে (oases) হিংস্র-স্বভাব-সম্পন্ন, পরাক্রমশালী কতিপয় অসভ্যজাতি বাস করিয়া থাকে। উহাদের ফরাসী-বিদ্বেষ পাগলের প্রলাপ বাক্যের ন্যায়! ফরাসীদের উপর উহারা এতই হাড়ে-হাড়ে চটা যে, ফরাসীর নাম শুনিলেই তাহারা রাগে অন্ধ হইয়া যায়,—উন্মত্তের ন্যায় যাহা মুখে আসে, তাহাই বলিয়া থাকে!

সাহারার উত্তর সীমায় দুই জাতীয় প্রাণী দৃষ্ট হইয়া থাকে, যাহা এই "অভিশপ্ত ভূমিতে"ও (forbidden land) জীবন ধারণ করিতে সম্যক্‌রূপে সমর্থ। উপরোক্ত জীবদ্বয়ের নাম— "এডেক্‌স্‌" ও "লডারস্‌ গেজেল্‌" (Addax and Loder's Gazelle)। উহারা উভয়ই কৃষ্ণসারজাতীয় জীব। "এডেক্‌স্‌" বৃহদাকার হইলেও, দেখিতে নিতান্ত কুৎসিত। উহার সুতীক্ষ্ণ বঙ্কিম শৃঙ্গ আছে; এবং পায়ের খুর এত বড় যে, তৎসাহায্যে উত্তপ্ত বালুকাময় মরুর উপর দিয়া, সে একদমে বহুদূর চলিয়া যাইতে সক্ষম। জীব-বিদ্যাবিশারদ মিঃ প্লিনীও (Mr. Pliny) ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, এবং ইহার সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও দক্ষিণ আফ্রিকা লোক-লোচনের অন্তরালে রহিয়াছিল,—পর্য্যটকগণ তথায় যাইবার সুযোগ পাইতেন না; সুতরাং এ সকল জন্তুর কথা প্রাচীনগণ জানিতেন না।

"ডঙ্গলা"র (Dongola) মরুভূমির সন্নিকটে মিঃ রাপেল্‌ (Ruppel) এক প্রকার কৃষ্ণসার দেখিতে পান। উহাও বৃহদাকার এবং দেখিতে নিতান্ত কুশ্রী ছিল বলিয়া প্রকাশ। উহার আকার যেরূপ বৃহৎ, খাদ্যের পরিমাণও তদনুরূপ হওয়া উচিত। অতএব সেই তৃণাঙ্কুরবিহীন অনন্ত বালুকাপূর্ণ বিশাল মরুভূমিতে কি ভক্ষণ করিয়া, এত বড় একটা প্রাণী জীবন ধারণ করিত, তাহা বলা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কেহ কেহ বলেন, ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় যখন সাময়িক বৃষ্টিপাত হয়, তখন উহা আহারান্বেষণে অনেকদূর চলিয়া যায়; আহার্য্য সংগ্রহান্তে যথাসময়ে পুনঃ ফিরিয়া আসে।

উত্তর আফ্রিকার সুবিশাল মরুভূমির সম্পর্কে একথা প্রযুজ্য

বলা যায় না। কারণ, তথাকার ভূমির গুণাগুণ আমরা পরিজ্ঞাত নহি; সুতরাং তত্রত্য মরু-সীমায় প্রায়শঃ বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, —একথা বলা সমীচীন নহে। অতএব সে সকল তৃণহীন, জ্বালাময় মরুতে পূর্ব্বোক্ত জীবমণ্ডলী কিরূপে প্রাণধারণ করে, তাহা বলা সুকঠিন।

গেজেলগুলি (Gazelles) প্রধানতঃ মরু-বাসী জন্তু; কিন্তু "লডারস্ গেজেল্" (Loder's Gazelle) মরুভূমির প্রাণী নয় বলিয়াই অনেকে অনুমান করেন। উক্ত মরুভূমির সীমান্ত-প্রদেশে আর এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় কৃষ্ণসার দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণসার ও উহার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ঐ জন্তুকে মরুভূমি ব্যতীত, সভ্য জগতের সীমাভ্যন্তরে কদাপি দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ঐ জন্তু কোথায়—কি অবস্থায় বাস করে, তাহা স্থিরীকরণার্থ একদা বহুলোক সমবেত হইয়া, তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে যেস্থানে উহাকে পাওয়া গেল,—দেখা গেল, সেস্থান একেবারে জল-বিহীন নহে; বরঞ্চ অৰ্দ্ধ-দগ্ধ-তৃণ-সমাকুল-পার-বিশিষ্ট একটি কূপের সন্নিকটেই উহা অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু কূপস্থ জলরাশি উহার অধিগম্য ছিল না; সুতরাং জলপান করা, তাহার পক্ষে সুদূরপরাহত ছিল। অপিচ, কূপের চারিদিকে বায়ু-সঞ্চালিত উত্তপ্ত বালুকা-তরঙ্গ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া, জীব মাত্রেরই হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছিল।

দক্ষিণ কেন্‌সিংটনের (Kensington) বালুকাময়ী মরুভূমিতে খাকী রঙ্গের একজাতীয় প্রাণীপুঞ্জ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাদের শরীরের বর্ণ ও বালুকার বর্ণে কোন প্রভেদ নাই। তন্মধ্যে "সিরাস্টিস্" (Cleopatra's Asp), দুই তিন প্রকারের বল্মীক-টিকটিকি (Sand-lizards), লম্ফন-পটু ইঁদুর

(Jumping Mice), মরুজ-পাখী (Desert-Birds), বল্মীক-মোরগ (Sand-Fowl), এবং বল্মীক-সর্প (Sand-Vipers) প্রভৃতিরই নাম উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত জীবগুলী উত্তর আফ্রিকায়, দক্ষিণ পূর্ব্ব ইউরোপে এবং দক্ষিণ এসিয়ায় প্রায়শঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহারা সাধারণতঃ বালুকাপূর্ণ মরুভূমিতেই বাস করিয়া থাকে। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ইউরোপের মরুতে যে সকল বল্মীক-সর্প দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের নাসিকাগ্রে এক একটি সূক্ষ্ম শৃঙ্গ আছে ; ইহা উহাদের কি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা জানা যায় নাই। যখন উহারা বালুকা-স্তূপের নীচে স্বীয় শরীর লুকাইয়া রাখে, তখন উক্ত শৃঙ্গটি বালুকার উপরই থাকে।

"স্কিঙ্ক" (Skink) নামক একজাতীয় প্রাণী মরুভূমিতে সচরাচর দৃষ্ট হয়। তাহারা বালুকার স্তরে স্তরে শয়ন করিয়া থাকে, এবং যাহাতে কেহ দেখিতে না পায়, তদুদ্দেশ্যে শরীরের উপর বালুকারাশি ছড়াইয়া রাখে,—মাত্র দুইটি চক্ষুই অনাবৃত থাকে। উহাদের চক্ষে পাতা নাই। প্লিনীর (Pliny) সময় উহা একটি বাণিজ্য দ্রব্য স্বরূপ রোম নগরে নীত হইয়াছিল। পরীক্ষান্তে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, উহা শারীরিক দুর্ব্বলতার একটি মহৌষধ। অনেকদিন পর্য্যন্ত " স্কিঙ্কের " ব্যবসায় চলিয়াছিল ; কথিত আছে, ১৫৮১ খৃঃ অব্দেই উক্ত ব্যবসায় পূর্ণমাত্রায় উঠিয়াছিল। আরববাসিগণ শুষ্ক " স্কিঙ্ক " এখনও ঔষধরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং অতি উপাদেয় খাদ্য বলিয়া আহার করিয়া কৃতার্থ হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে বল্মীক ইঁদুর প্রভৃতি আরও কতিপয় জন্তু দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাদের অবস্থা দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীয়-

সোমালীলেণ্ডের মরুতেও তদ্রূপ ইঁদুর প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহাদিগকে ইঁদুর বলিয়া চিনিবার যো নাই; উহাদের দেহ প্রায় লোমহীন,—কর্ণ নাই বলিলেও হয় এবং চক্ষুদ্বয়ও তদবস্থ।

মরুভূমিতে এক প্রকার মোরগ জাতীয় পক্ষীও দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগকে "সেণ্ড-গ্রাউজ" (Sand-grouse) বলা হয়। উহাদের শরীরের বর্ণও বালুকার বর্ণের ন্যায়; সুতরাং উহাদিগকে বালুকারাশির মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করা দুরূহ ব্যাপার। উহাদের ডানায় খুব জোর আছে; সুতরাং অনায়াসে অনেক দূর উড়িয়া যাইতে পারে।

চিলি (Chile) ও করডিলেরার (Cordiller) মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য মরুভূমিতে শম্বুক জাতীয় এক প্রকার প্রাণী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও তথায় অপরাপর কোন প্রাণীর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না, তথাপি উপরোক্ত জীব পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ডারুইন (Darwin) বলেন,—"One humble little plant sends out a few leaves in spring, and on these, the snails feed."—অর্থাৎ বসন্ত কালে ক্ষুদ্র চারাগাছের যে দুই চারিটি পত্রোদ্গম হয়, তাহা ভক্ষণ করিয়াই উহারা প্রাণধারণ করিয়া থাকে।

কর্ণওয়ালে (Cornwall) সমুদ্র-তীরে গান্‌ওয়ালোরের (Gunwallore) নিকটে টাউয়ান্‌স্ (Towans) নামক একটি স্থান আছে। কর্ণওয়ালের ভাষায় "টাউয়ান্‌স্" অর্থ,—বালুকার পাহাড়। যদিও স্থানটি শ্যামল-শষ্প-সমাবৃত, তথাপি সমুদ্রের তীরদেশ হইতে এতাধিক বালুকারাশি পবন-হিল্লোলে তদুপরি সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে যে, বালুকার জন্য তৃণাদি আদৌ

শ্বেত-কৃষ্ণ শম্বুক (Black and white shells) দেখিতে পাওয়া যায়। পেটাগনিয়ায় (Patagonia) জলশূন্য মরুতেও এক প্রকার মূষিক পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ডারুইনের মতে, টিকটিকি ব্যতীত, জীবগণের মধ্যে একমাত্র, মূষিকই বারিবিহীন উত্তপ্ত বালুকাময়ী মরুভূমিতে বাস করিতে সক্ষম।

যে স্থানে কোন প্রাণীর বসতি আছে, তথায় তাহার জীবন রক্ষার উপযোগি কোন না কোন আহার্য্যেরও সংস্থান রহিয়াছে। কেহ কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন যে,—এতাদৃশ তৃণহীন, জলহীন, অগ্নিময় বালুকাপূর্ণ মরুতে প্রাণিগণ কি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে? বাস্তবিক এরূপ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া সুকঠিন। মিঃ পল্ ফাউণ্টেইন্ (Mr. Poul Fountain) তৎপ্রণীত "দি গ্রেট্ ডেজার্টস্ এণ্ড ফরেষ্টস্ অব্ নর্থ এমেরিকা" (The Great deserts and Forests of North America) নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন,—"There are places which are deserts pure and simple, where death seems to reign supreme. There were no insects, no flies, no mosquitoes, and not even a moss or lichen to be discovered, —a region of absolute silence; and whereas their was no rain, there were no clouds, and a dry, thin air, odourless and utterly devoid of atmosphere as absolute ether."—অর্থাৎ অনেক মরুভূমি আছে, যাহাতে মৃত্যুই সর্ব্বময় অধিপতি! কীট, পতঙ্গাদি কোন প্রাণীই তথায় দেখিতে পাওয়া যায় না,—উহা যেন গভীর নীরবতার রাজ্য! তথায় বৃষ্টিপাত হয় না বলিয়া, আকাশও মেঘাচ্ছন্ন নহে। বায়ুমণ্ডল শুষ্ক, লঘু, নির্গন্ধ ও "ইথার" (Ether) বিবর্জ্জিত।

শ্রী:—

কবি-প্রিয়ার প্রতি কবি।

শ্রীহীন নিকুঞ্জ আজি তোমারি প্রসাদে,
অপূর্ব্ব নন্দন-শোভা ধরিয়াছে দেবি!
সংসারের কশাঘাতে,—কামনার তাপে
ছিল শুষ্ক এ হৃদয়;—কুসুম-মুকুল
ঢলিয়া পড়িয়াছিল বৃন্তচ্যুত হ'য়ে
অকালে,—যখন তুমি সুষমার ছবি,—
আশার সান্ত্বনারূপে, গৃহ-লক্ষ্মী-সাজে,
সিঞ্চিয়া অমৃত-বারি এদগ্ধ হৃদয়ে,
হাসি-মুখে প্রবেশিলে এ দীন-কুটীরে;
ফুল-হার ভূষা তব কুঞ্চিত কুন্তলে,
মাখিয়াছ ফুল-রেণু অমল আননে;
রক্তিম অলক্ত-রাগ চরণ যুগলে,
মন-উন্মাদন তব ও স্বর-লহরী,
হৃদয় তোমার দেবি! প্রীতি-পারাবার;
স্বচ্ছ—স্থির আঁখি দু'টি আবেশ-বিহ্বল,
বুঝি মু'দে আসে অই;—কি ভাবিছ প্রিয়ে?—
তুমি ভাব,—আমি ভাষা; তব গৃহ-কবি
বসি' মুগ্ধ চিত্তে তব প্রীতি-হাসি-তলে,
তোমারি চয়িত ফুলে গাঁথিয়া মালিকা,
তোমাকে পরা'তে চা'বে, সরলা বালিকা!

শ্রীকামিনীকুমার দে রায়।

প্রত্যাবর্ত্তন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রায় আড়াই বৎসর হইল, আমার বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু একাদিক্রমে কখনও দুইমাস ভাল থাকিতে পারি নাই। প্রায়ই অসুখে ভুগি। স্বামী সর্ব্বদাই বলিতেন,—"এ দেশের জলবায়ু এত সকালে তোমার সহ্য হইবে না"। প্রত্যুত্তরে আমি বলিতাম,—"কেন আমি কি বিলাতী মেম যে, এদেশের জল-হাওয়া আমার সহিবে না?" আমাদের মধ্যে এইরূপ তর্ক মাঝে মাঝে হইত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বামী আমার বিদেশে যাওয়া সম্পর্কে উৎসাহের সহিত যুক্তি প্রয়োগ করিতেন, আমিও ততক্ষণ তাহার প্রতিবাদ করিতে নিরস্ত থাকিতাম না। যখন তিনি আমার সঙ্গে যুক্তি তর্কে না পারিয়া, বিষণ্ন মুখে চুপ করিয়া রহিতে বাধ্য হইতেন, তখন আমার আর আত্ম-রক্ষার উপায় থাকিত না;—আমি তখন তাঁহার নিকট পরাস্ত হইতাম, এবং বলিতাম,—"তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, কর"। যদিও প্রতিদিন তর্কের শেষ ফল, তাঁহার উপর আত্ম-সমর্পণ ভিন্ন অন্য কিছুই হইত না, তবু আমার জল-বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বিদেশ-যাত্রার এপর্য্যন্ত কিছুই হইয়া উঠে নাই।

আমি অনেক সময়, আমার অসুখের কথা তাঁহার নিকট গোপন করিয়া চলিতাম। মনে হইত, তাঁহাকে আর কত জ্বালাতন করিব। আড়াই বৎসর যাবৎ বিবাহ হইয়াছে; কোথায় তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়া এ জন্ম সার্থক করিয়া লইব,— না, তাঁহাকেই আমার জন্য কষ্টের একশেষ ভুগিতে হইতেছে। ব্যারামের মধ্যেও আমার সুখ ছিল; সে সুখ, সর্ব্বদা স্বামীকে

ঔষধ অপেক্ষাও অধিক শান্তি আনয়ন করিত। আমাদের সংসারের অবস্থা মন্দ ছিল না। কাজ করিবার লোকেরও বড় একটা অভাব ছিল না। তবু সময় মত ঔষধ ও পথ্য খাওয়ান এবং আবশ্যক মতে সময় সময় "থারমোমিটার" দ্বারা জ্বর পরীক্ষা করা, এ সকলই তিনি নিজ হস্তে করিতেন।

একদিন রাত্রে আমার অল্প অল্প জ্বর হইল। কাহাকেও এ কথা আর বলিলাম না। রাত্রে স্বামী আসিয়া, আমার গায় হাত দিয়া বলিলেন,—"হেম! তোমার জ্বর হইয়াছে! কিন্তু এতক্ষণ এ সংবাদ আমাকে দাও নাই কেন?" আমি বলিলাম, —"এই কতক্ষণ যাবৎ শরীর খারাপ বোধ করিতেছি; তুমি এখনই আসিবে, এই মনে করিয়া, আর তোমাকে সংবাদ দেই নাই"। তিনি আমার পাশে বসিয়া, ধীরে ধীরে আমার কপালে হাত বুলাইতে লাগিলেন এবং খুব অবসন্ন হইয়া যেন বলিলেন,—"হেম! তুমি আর আপত্তি করিও না; আমি কাকার নিকট আমাদের পশ্চিমে যাওয়ার কথা বলি"। আমি বলিলাম, —"সকলকে ছাড়িয়া তোমাকে নিয়া দূরদেশে থাকিতে আমার বড় লজ্জা করে। নতুবা আমার আর কোন আপত্তির কারণই নাই"। তিনি বলিলেন,—"না, হেম! এখানে থাকিলে, তুমি ভাল হইতে পারিবে না; ডাক্তার বাবুও জল-বায়ু পরিবর্ত্তনের একান্ত পক্ষপাতী। সেদিন খুড়ীমা বলিয়াছেন যে, 'তুই কি হেমকে এখানে রাখিয়া মারিবি? বাড়ীতে ত কোনই কাজ নাই, একবার হাওয়া পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিলে, দোষ কি?' তিনি আবার বলিলেন,—'আমি যাওয়ার উদ্যোগ করি, তোমার যেন কোন আপত্তি শুনি না'—এই বলিয়া, স্বামী আমার রোগশীর্ণ ওষ্ঠাধরে চুম্বন করিলেন। আমি আর কোন কথা বলিতে পারিলাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি কিরূপে শৈশবে বর্দ্ধিত হইয়াছি, এখানে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতে চাই। নতুবা আমার জীবনের কাহিনী বিসদৃশ বোধ হইতে পারে।

কর্ম্মোপলক্ষে আমার পিতা লাহোরে বাস করিতেন। দেশে আসিবার তাঁহার বড় একটা সুবিধা ছিল না। একেত বৎসরান্তে একমাস ছুটি পাইতেন; দ্বিতীয়তঃ দেশে আসাও বিস্তর ব্যয়সাধ্য ছিল। আমার বিবাহের পূর্ব্বে আমি একবার মাত্র দেশে আসিয়াছিলাম। একমাস বিদায় নিয়া দেশে আসিয়া বাবা দিদির বিবাহ দিয়া যান। আমার স্বদেশ সম্বন্ধে এই কয়দিনেরই যা' কিছু অভিজ্ঞতা। লাহোরে অনেক প্রবাসী বাঙ্গালী আছেন। অনেকের সহিত আমাদের জানা-শুনা ছিল। কিন্তু তেমন মেশামেশির অভাবে তাহাদের প্রভাব আমার জীবনে বিশেষ ভাবে কার্য্যকর হয় নাই।

আমি সকলের ছোট; কাজেই সকলের আদরের। দাদারা মাঝে মাঝে আমাকে পড়ার জন্য তাড়না করিতেন; কিন্তু বাবা সে বিষয়ে বড় একটা শাসন করিতেন না। বোধ হয়, দাদাদের উপর ভার দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। পড়াশুনা অপেক্ষা ছোট দাদা যে ব্যায়াম-চর্চ্চা করিতেন, তাহাতেই আমার মনোযোগ বেশী যাইত। দাদা 'ডাম্বেল' লইয়া যে ভাবে পরিশ্রম করিতেন, আমি তাহা মনেযোগ পূর্ব্বক লক্ষ্য করিতাম; এবং দাদার অজ্ঞাতসারে তাহার 'ডাম্বেল' লইয়া ঐরূপ পরিশ্রম করিতাম। ছোট কাল হইতেই দাদাদের দেখা-দেখি পুরুষের মত কাপড় পরিতাম। প্রথমে আমার কাপড়-পরা দেখিয়া, সকলেই হাসিত। একটু বড় হইলেও আমার সে অভ্যাস দূর হইল না। মা কত মন্দ বলিতেন,—আমি অবহেলে তাহা

অগ্রাহ্য করিয়া, ছুটিয়া পালাইতাম। আমাকে ব্যায়াম করিতে দেখিয়া, ছোট দাদা কখনও মন্দ বলেন নাই; বরং উৎসাহ দিতেন। তাঁহার ফলে, দশ বৎসরের সময়, আমার শরীর খুব সবল হইয়া উঠিল। তখনও যদি কেহ আমাকে মেয়ে মানুষের মত কাপড় পরিতে বলিত, আমি তাহার সহিত খুব রাগা-রাগি করিতাম। সুদূর প্রবাসে "সমাজ" নামক ক্ষুদ্র দেবতাটির ভয় ছিল না। কাজেই, আমার স্বেচ্ছাচারিতার উপর কোন বাধা পড়িতে পারে নাই। আমাদের বাসার নিকটেই একটা "ডন-খানা" ছিল। দেখিতাম, বিভিন্ন বয়সের অনেক লোক আসিয়া, এখানে 'ডন্' শিক্ষা করিত। মনে মনে ভাবিতাম, আমিও যদি 'কুস্তি' অভ্যাস করিতে পারিতাম, তবে বেস হইত। বাল্যকালের কথা মনে হইলে, এখনও হাসি পায়। আমিও একদিন আমাদের ভোলাকে বলিলাম,—"আয় তোর সঙ্গে আমি কুস্তি করিব।" ভোলা আমাদের দাসীর ছেলে। ছোটকালে উহার মা মারা যায়; আমার মা-ই উহাকে লালন পালন করিয়া এতটা বড় করিয়াছেন। ভোলা আমার ছ'মাসের বড়।

আমাদের যে ঘরটায় রান্না করিবার জন্য কাঠ থাকিত, তাহারই অর্দ্ধাংশ ভোলার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ভোলা সেটাকে বেড়া দিয়া, একটা দুর্গের মত করিয়া তুলিয়াছিল। আমি মাঝে মাঝে সেখানে যাইয়া, ভোলার সহিত বল-পরীক্ষা করিতাম। তাহাকে ভূমিসাৎ করিতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগিত না। শেষে ভোলা আমাকে দেখিলেই, তাহার ক্ষুদ্র দুর্গ ছাড়িয়া পলাইত। আমি ভোলাকে ভাল বাসিতাম; কারণ সে ভিন্ন আমার "কিল-চাপড়" সহ্য করিবার আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না।

বিবাহের ছ'মাস পর,—তখনও বালিকা-বুদ্ধি দূর হয় নাই,—একজনের সহিত বল-পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ফল কি হইয়াছিল শুনিলে, আমার বঙ্গীয় ভ্রাতৃবৃন্দের মুখমণ্ডল নিশ্চয়ই লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিবে।

একদিন মা আমার রুক্ষ কেশদাম তৈল সংযোগে বিন্যাস করিতে লাগিলেন। কপালে 'টিপ' পরাইলেন। শুনিলাম, কে নাকি আমাকে দেখিতে আসিবে। মা আমাকে একখানা বোম্বাই সাড়ী পরাইয়া দিলেন। দাদা আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"আমার সঙ্গে ধীরে ধীরে আয়।"

বাহিরের ঘরে তিন চারি জন লোক বসা ছিল। দাদা আমাকে সেইখানে লইয়া গেলেন। তাঁহাদের কেহ আমার হস্ত-রেখা,—কেহ চুলের দৈর্ঘ্য,—কেহ বা পাদক্ষেপ লক্ষ্য করিলেন।

আমি চলিয়া আসিব, এমন সময়, একজন অপরের কানে কানে কি বলিলেন। অমনি ঐ লোকটি দাদার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"একটু হাতের লেখা দেখিতে চাই"।

একখণ্ড কাগজে নিজের নাম লিখিয়া দিলাম। আমার হস্তাক্ষর দেখিয়া তাঁহারা প্রীত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না যে, নিজের নামটি যেমন সুন্দর করিয়া লিখিতে পারি, আর কিছু তেমন সুন্দর করিয়া লেখা কষ্টকর।

কয়দিন পর, দেখিলাম, বাবা একখানা চিঠি হাতে করিয়া মার নিকট বলিলেন,—হেমকে দেখিয়াত বরের পছন্দ হইয়াছে; আজ চিঠি পাইলাম। দুর্দান্ত মেয়েটার যে, এমন একটা ভাল বর যুটিবে, সে বিষয়ে, মা ও বাবার উভয়েরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। দেখিলাম, মার চক্ষু-প্রান্তে আনন্দাশ্রু বাহির হইয়াছে।

যাহারা প্রথম পরিচ্ছেদে আমার কথা পড়িয়াছেন, তাহারা

হয়ত আমার শৈশবের বর্ণনা শুনিয়া মনে করিতেছেন যে, সমাজ-ধর্ম্মে অশিক্ষিতা এই মেয়েটার কি করিয়া এত সকালে চক্ষু ফুটিল! যাহারা বিবাহিত তাহাদিগকে, বোধ হয়, ইহার কারণ বলিয়া দিতে হইবে না। আর যাহারা এখনও অবিবাহিত, তাহাদের নিকট হঠাৎ "নব-জীবন" লাভের কারণটা না বলাই ভাল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মধুপুরে আসিয়াছি পর, এখানকার ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ বসুর পরিবারের সহিত আমাদের বেস জানা-শুনা হইল। নবীন বাবু আমার খুড়তাত শ্বশুরের নিকট পরিচিত ছিলেন। আমরা যখন মধুপুরে আসি, তখন বিদেশে আমাদের একটু তত্ত্বাবধান করেন, এই অনুরোধ করিয়া, তিনি ডাক্তার বাবুর নিকট এক পত্র দিয়াছিলেন। ডাক্তার বাবু মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় আসিয়া, আমার স্বামীর সহিত গল্প করিয়া যাইতেন। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী প্রায়ই মেয়েদের সহিত আমাদের বাড়ী আসিতেন; কখনও বা তাঁহার মেয়েরাই শুধু আসিত। আমাদের বাসা হইতে তাঁহাদের বাড়ী বেসী দূর ছিল না। আমার অসুস্থ শরীর নিয়া, আমি কোথাও যাইতে পারিতাম না।

এখানেও আমার স্বামী, সাধ্যমত আমার অনেক কাজ নিজ হস্তেই করিতেন। ঔষধ খাওয়ান, আর কাহাকে দিয়াও বিশ্বাস করিতেন না। আমি মাঝে মাঝে বলিতাম,—"তুমি যে অত খাটুনী আরম্ভ করিয়াছ, ইহা বড় ভাল নয়; এখানে তোমার অসুখ হইয়া পড়িলে ত বেস হইবে! লাবণ্যও ত আমার অনেক কাজ করিতে পারে।" লাবণ্য খুড়ীমার দূর

সম্পর্কীয়া আত্মীয়-কন্যা। পিতৃ-মাতৃহীনা বলিয়া, তিনি তাহাকে আপন সংসারে আনিয়া রাখিয়াছেন। আমার বিবাহের পরই লাবণ্যকে এ সংসারে দেখিয়াছি। লাবণ্য আমার অল্প ছোট ছিল। তবে যে এ পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই, বোধ হয়, কেহ "বর-নিলামে" তাহার জন্য এ পর্য্যন্ত উচ্চ 'ডাক' দিতে অগ্রসর হয় নাই।

একদিন দু'প্রহরে, স্বামী আমার শয্যায় বসিয়া আছেন; সহসা তিনি ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তোমায় দু'প্রহরের ঔষধ দিতে আজ ভুলিয়া গিয়াছি"। আমি বলিলাম,—"এখন ঔষধ বন্ধ করিলে কি হয় না? আমি নিজ হইতেই ভাল হইব। আর তুমি কষ্ট করিও না।"

একদিন তাহাকে বলিলাম,—"তুমি আমাকে দিয়ে কি করিবে?—এ চিররুগ্ন, কখনও কি তোমার প্রয়োজনে আসিবে? তুমি আবার বিবাহ কর; আমাকে বিবাহ করিয়া যন্ত্রণা ভিন্ন ত আর কিছু লাভ করিতে পার নাই?"

তিনি আমার কপোলে একটি চুম্বন-রেখা মুদ্রিত করিয়া, কহিলেন,—"হেম! বল, আর কখনও এরূপ বলিবে না"।

আমি হাসিয়া কহিলাম,—"কেন রোগীর শুশ্রূষা করিয়া, বুঝি তোমার আর আশা মেটে না?"

তিনি বলিলেন,—"তুমি ত অনেকটা ভাল হইয়াছ। আর দু'এক মাসেই সম্পূর্ণরূপে অসুখ সারিয়া, শরীর ভাল হইবে।"

আমি বলিলাম,—"এখন ভাল হইলে কি হয়? হয়ত দেশে ফিরিলেই আবার অসুখ করিবে।"

"বেসত, যদি দেশে ফিরিলেই তোমার অসুখ করে, তবে বরং এখানেই বরাবর থাকিব। দেশে রাখিয়া কি তোমাকে

আমি বলিলাম,—"তাই ত, তোমার কিনা আর কোন কাজ নাই; সারা জীবন বাড়ী ঘর ফেলিয়া, এখন আমাকে নিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াও।"

এমন সময় ডাক্তার বাবুর স্ত্রী তাঁহার বড় মেয়ে অমলাকে সঙ্গে করিয়া, আমাদের বাড়ী আসিলেন। আমার স্বামী অন্য ঘরে উঠিয়া গেলেন। আমাকে দেখিয়া, ডাক্তার বাবুর স্ত্রী বলিলেন,—"তুমি অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছ বাছা!"

ডাক্তার বাবুর স্ত্রী বেস সরল প্রকৃতির লোক। তিনি সহজে লোককে "আপন" করিতে পারিতেন। আমার স্বামীকেও তিনি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। আমার নিকট যতক্ষণ ছিলেন, ততক্ষণ অমলা অন্য ঘরে আমার স্বামীর সহিত কি গল্প করিতেছিল।

বাড়ী ফিরিবার সময়, তিনি আমার স্বামীকে বলিলেন,—"তুমি আমাদের বাড়ী বড় একটা যাও না; তোমার কাকার সহিত তাঁহার কত বান্ধবতা,—আর তুমি এতটা লজ্জা কর এ'টা ভাল দেখায় না।"

অমলা বলিয়া গেল,—"ধীরেন্ বাবু! আজ বৈকালে আপনার চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ রহিল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যে রমণী একবার স্বামীর প্রেম বুঝিতে পারিয়াছে, কখনও সেই প্রেম-প্রবাহ মন্দীভূত হইলে, সে তাহা অক্লেশে বুঝিতে পারে। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি; কাজেই স্বামী সর্ব্বদা আমার নিকট থাকা আবশ্যক মনে করিতেন না। আমিও তাহাতে অসুখী হইলাম না। এতদিন তিনি যেন আমার ভারে আপন্ন ছিলেন; এখন তাহাকে মুক্ত দেখিয়া আমি আনন্দ বোধ করিতাম। তিনি প্রায়ই ডাক্তার বাবুর

বাড়ী বেড়াইতে যাইতেন,—প্রায়ই সেখানে তাঁহার চা' খাওয়ার নিমন্ত্রণ থাকিত। অমলা প্রায় প্রত্যহই দু'পুর বেলা এখানে আসিত। কত কি গল্প করিত,—কখন আমার স্বামীর নিকট বা দুই একটা "হারমোনিয়ামের গৎ" শিখিত।

আমি একদিন স্বামীর নিকট বলিলাম—"আমিত এখন ভাল হইয়াছি, আর এখানে থাকিয়া লাভ কি?" তিনি উত্তর করিলেন,—"ডাক্তার বাবু বলেন, আরও কিছু দিন তোমার এখানে থাকা উচিত; এত শীঘ্র বাড়ী ফিরিলে, আবার তোমার অসুখ করিতে পারে।"

ডাক্তার বাবুর বাড়ী চা' খাওয়াটা এখন আমার স্বামীর দৈনিক কার্য্য হইয়া পড়িল। আমি বলিলাম,—"তুমিত চা' খাইতে না, জানি; তবে এখন রোজ রোজ চা' খাওয়ার নিমন্ত্রণ আবার কেন?" তিনি বলিলেন,—"কি করিব, তাদের অনুরোধ ফেলিতে না পারিয়া, সময় সময় একটু আধটু খাইতে হয়।"

আর অমলার "হারমোনিয়াম্" শিখিবার খুব ইচ্ছা,—সন্ধ্যার পর গেলে, আমার নিকট "হারমোনিয়াম"'ও একটু একটু শিখে; এই জন্যই প্রত্যহ যাইতে বলে,—নিমন্ত্রণ উপলক্ষ মাত্র।

আমি ক্রমশঃ স্বামীর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। এখন অমলার নাম করিলে, তিনি আর সে বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া, বিষয়ান্তরে যাইতে চেষ্টা করিতেন।

আমি তাঁহাকে একদিন বলিলাম,—"ডাক্তার বাবুর বাড়ীর নিমন্ত্রণটা সকাল সকাল সারিয়া আসিতে পার না,—প্রত্যহই যে তোমার ৯টা কি ১০টা রাত হয় দেখি!" প্রত্যুত্তরে তিনি

ত বিরক্তি বোধ নাই।” আমাকে নিয়া সারাদিন থাকিতে তাঁহার বিরক্তি বোধ হয়, এই প্রথম শুনিলাম।

এখন হইতে স্বামী আমার সাম্‌নে বড় একটা অমলার নাম করিতেন না। যদিই বা বলিতে হইত, তবে অতিশয় অবহেলার সহিত যেন বলিয়া ফেলিতেন। অমলাও পূর্ব্বের মত আমাদের বাড়ী আসিত না।

লাবণ্য আমাকে বলিল,—“বৌদিদি! ডাক্তার বাবুর মেয়েত দেখি বড় বেহায়া! এত বড় মেয়ে, সে যেন পারিলে দাদাবাবুর ঘাড়ে চড়ে! সেদিন ফুলের মালা দিয়া দাদা বাবুর মাথাটা ঘেরিয়া দিল!” আমি বলিলাম,—“তোর দাদা একটা চুম খেলেন না?” লাবণ্য বলিল,—“তুমি আবার একি বল?” আমি বলিলাম,—“কেন, এতে দোষ কি? তোর দাদার সঙ্গে অমলার একটা বিবাহের যোগাড় কর্ দেখি; কেমন বেস মানাবে,—না?”

লাবণ্য হাসিয়া বলিল,—“তবে তোমার উপায়?” আমি বলিলাম,—“আমার উপায় তোর চিন্তা করিতে হইবে না।” লাবণ্য বলিল, “না বৌদিদি! দাদা বাবুকে তেমনটি মনে করিও না।”—

লাবণ্যের সন্দেহ করার অভ্যাসটা বেস প্রবল ছিল; তবে পরের দিকে যত, ঘরের দিকে তত নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

লাবণ্য কি জানি কি কৌশলে অমলার সহিত বেস একটু মেশামেশি করিয়া লইল। এখন মাঝে মাঝে অমলা লাবণ্যের নিকট আসিয়া গল্প করিত। বলা বাহুল্য, আমার স্বামীও তখন গৃহে থাকিতেন। লাবণ্য আমাকে বলিল,—“বৌদিদি! মেয়েটার দুষ্টামি বুঝিতে পারিয়াছি। আমার সঙ্গে অতটা ভাব

করার উদ্দেশ্য যে, ওতে দাদা বাবুর সহিত মেশামেশি করিবার একটা সুবিধা হয়।" আমি বলিলাম, "আমার আর বুঝিবার দরকার নাই।" লাবণ্য হাসিয়া বলিল, "বেহায়া মেয়েটা তোমার জিনিসটি হাত-ছাড়া করিতে চায়, আর তুমি চুপ করিয়া বসিয়া থাক!" আমি বলিলাম,—"ভাই! এ জীবনে কখনও একদিনের জন্যও স্বামীকে সুখী করিতে পারি নাই। তিনি পরিচর্য্যা করিয়াছেন ব্যতীত কখন পরিচর্য্যা পান নাই। ভালবাসা দেখাইবার তাঁহার যত সুবিধা হইয়াছে, ভালবাসা পাইবার তাঁহার তত সুবিধা হয় নাই। আমি দুর্ভাগিনী, কি করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিব।"

লাবণ্য বলিল,—"বৌদিদি! তুমি হতাশ হইও না; দেখ, বেহায়া মেয়েটাকে আমি কেমন জব্দ করি। তুমি অত চিন্তা করিও না। তোমার অপ্রসন্ন মুখ দেখিলে, আমার আর উৎসাহ থাকে না।"

লাবণ্য একটা মতলব আঁটিল। আমি বলিলাম,—"পারিলে মন্দ কি; কিন্তু তুমি বা শেষে সব দিক্ নষ্ট কর।" লাবণ্য হাসিয়া বলিল,—"বৌদিদি! তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

এখন হইতে স্বামী অমলার সহিত দেখা করার কথাও আমার নিকট গোপন করিতে লাগিলেন। আমি বুঝিলাম, তিনি যেন বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার ব্যবহারটা ভাল হইতেছে না, নতুবা আমার নিকট গোপন করিবেন কেন?

লাবণ্য বলিল,—"বৌদিদি! আমাদের গ্রামে একবার থিয়েটার হইয়াছিল; দাদা তাহার ড্রেসিং মাষ্টার ছিলেন। তিনি কেমন সুন্দর করিয়া, সাজাইতে পারিতেন, আমি দেখিয়া শুনিয়া সে বিদ্যাটা কতক শিখিয়াছি। আজ তোমাকে পুরুষ সাজাইব, দেখি কেমন মানায়।"

আমি বলিলাম,—"দূর পোড়ামুখী এবয়সে কি আর সাজ দেওয়া যায়?"

সন্ধ্যার সময় বসিয়া রহিয়াছি। লাবণ্য বা ঝি কেহই ছিল না। চতুর্থীর ক্ষীণ জোৎস্না উঠিয়াছে। বনরাজী-বিমণ্ডিত অনতিদূরবর্ত্তী শৈল-শিখরে আলো ও ছায়ার মিশ্রণে কি এক মধুর আবরণ পড়িয়াছে!

এই বিজন-প্রবাসে,—এই মুক্ত বায়ুতে প্রকৃতির স্নিগ্ধোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া, আমারও বাল্যপ্রকৃতির একটা মনোহর সরল-স্মৃতি ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় মানস-পথে বিচরণ করিতেছিল। রোগের যাতনায়, এবং বঙ্গ-রমণীর বধূত্বে, আমার বাল্য প্রকৃতির অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। মধুপুরের জলবায়ুতে নষ্ট স্বাস্থ্য আবার ফিরিয়া পাইয়াছি; কিন্তু বাল্যের মানসিক প্রফুল্লতা যাহা হারাইয়াছি, মধুপুরে আসিয়াও তাহা আর ফিরিয়া পাইলাম না।

বাহিরে কে ডাকিল,—"ধীরেন্ বাবু! বাসায় আছেন?" বরাবরকার অভ্যাস মত তিনি তখন বাসায় ছিলেন না। নিকটে কেহ নাই, নিজেই উত্তর করিলাম,—"তিনি বাসায় নাই।" আমার শব্দ শুনিয়াই আগন্তুক একবারে আমাদের বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি কিঞ্চিৎ ভীত হইলেও, একবার তাহাকে দেখিয়া লইলাম। দেখিয়া বোধ হইল, তিনি একটি নবতন্ত্রের বাবু; চসমা, ছড়ি, ঘড়ি, সকলই ছিল। শারীরিক গঠন মানান-সই হাল্কা। কাল কোটের উপর সিল্কের চাদর উচ্ছৃঙ্খলভাবে পড়িয়া আছে; কোঁকড়ান চুলগুলি এমনি সুন্দরভাবে পড়িয়াছে,—প্রথম দেখিলে, মেয়ে মানুষের মুখের মত মনে হয়!

আমি তাহাকে দেখিয়া বারান্দার পাশের ঘরে প্রবেশ করিতে

ছিলাম; আগন্তুক হঠাৎ আমার বামহাত ধরিয়া ফেলিল। আমি উচ্চৈঃস্বরে লাবণ্য ও ঝিকে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য কেহ আমার ডাক শুনিতে পাইল না। রোষে ও ক্ষোভে উপস্থিত বিপদের কথাও যেন বিস্মৃত হইলাম, সজোরে হাত টানিয়া লইলাম,—আগন্তুক আমার হস্ত ধারণ করিবার জন্য আবার হস্ত বাড়াইতেই এমন জোরে উহাকে এক ধাক্কা দিলাম যে, তাহাতে সে দশ হাত দূরে সরিয়া বারন্দায় মেজের উপর পড়িয়া গেল। মেজের খুব সজোরে পড়িয়া যাওয়াতে, মাথার পর চুলা খসিয়া পড়িল। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম,—আগন্তুক স্ত্রীলোক,—আমাদের লাবণ্য! তখন সে হাসিতে হাসিতে বলিল, —"কেমন! এ বয়সে নাকি পুরুষ সাজা যায় না?—এখন ত দেখিলে?"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"আমি ত একটুও চিনিতে পারি নাই। গলার স্বরটা কি করিয়া বদলাইলে ভাই?" লাবণ্য বলিল—"তাহারও ঔষধ আছে"।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি ৯টার সময়, যখন আমার স্বামী বাসায় আসিলেন, তখন আমাদের খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছে। এইদিন আর নিজকে সামলাইতে পারিলাম না,—বলিলাম "তোমাদের বড় লোকের বন্ধুত্বে ত আমরা গরীব মানুষ মারা যাই, তুমি রোজই এমনি দেরী করে আসিবে না কি?" তিনি কহিলেন,—"সে বন্ধুত্বে তোমার কোনও ভয়ের কারণ নাই।" আমি বিরক্তির সহিত বলিলাম,—"অমন একটা বেহায়া মেয়ের সহিত তোমার এত মেশামেশি আমার ভাল লাগে না। যদি তুমি মনে কর, যে তোমার উপর আমার কোনও অধিকার আছে, তবে তুমি

স্বামী এবার একটু উত্তপ্ত হইলেন ;—বলিলেন, "অমলার মত ভাল মেয়ে খুব কম দেখিয়াছি ; মিছামিছি তুমি তাহাকে মন্দ বলিতেছ।" আমি আর সহিতে পারিলাম না,—বলিলাম "অত বড় বয়স্থা মেয়ে হইয়া যে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সহিত এমন উচ্ছৃঙ্খল ভাবে মিশিতে পারে, তাহার মুখ দেখাও পাপ।" সে রাত্রে আমার সহিত তাঁহার আর কোন কথা হইল না।

এই ঘটনার সাত দিন পর দেখিলাম, এক দিন তিনি অতি সকালেই বাসায় আসিয়াছেন। বলিলেন,—"ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে আজ একটি অল্পবয়স্ক ভদ্র লোক আসিয়াছেন, তাহার যেমন সুন্দর চেহারা,—তিনি তেমনই সুন্দর গান করিতে পারেন।"

পর দিন সকাল বেলা দেখিলাম,—অমলা লাবণ্যকে পত্র লিখিয়াছে। লিখিয়াছে,—"ভাই! তুমি যে লোকটিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলে, তাহার গান শুনিয়া এত সুখী হইয়াছি যে, বলিতে পারি না। এমন গান আমি শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তাহাকে বহু অনুনয় বিনয় করাতে তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর এখানে আসিতে স্বীকার করিয়াগিয়াছেন। এবার যদি দুই একটা গান শিখিতে পারি। তোমার—অঃ।"

লাবণ্য হাসিয়া, আমাকে পত্র খানা দেখাইল।

তার পর দিন স্বামী অমলাদের বাড়ী হইতে সকালে ফিরিলেন ; বলিলেন,—"আজ ও সেই বাবুটি আসিয়াছিলেন। লোকটি গায় মন্দ না, যদি একটু তাল বোধ থাকিত তবেই বেস হইত। মেয়ে মানুষ বলিয়াই অমলা ঐ গান শুনিতে এতটা ভালবাসে।"

এই রূপ প্রত্যহই নবাগত ভদ্রলোকটির গান সম্বন্ধে দুই

অমলার অনুচিত পক্ষ পাতিতার কথাও তিনি মাঝে মাঝে উল্লেখ করিতে লাগিলেন।

আর এক দিন বলিলেন,—"লোকটা কি বা গায়, কিন্তু অহঙ্কার এত যে, ছোঁয়া যায় না।" এইরূপ সমালোচনা সম্বন্ধে আমি কখনও কোন মতামত প্রকাশ করিতাম না। আজও নীরবে শুনিলাম। লোকটির চেহারা সম্বন্ধে দুই এক কথা মাঝে মাঝে শুনিতে পাইতাম। এক দিন বলিলেন,—"মেয়ে মানুষের মত কতগুলি কোঁকড়ান চুল দিয়া মুখ সাজাইয়াছে,—মুখের যে শ্রী!"

একদিন লাবণ্য বলিল, "ভাই! আজ তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।" আমি বলিলাম—"না, ভাই! আমাদ্বারা সে কাজ হইবে না; বরং ধরা পড়িয়া একটা গোলমাল সৃষ্টি করিয়া বসিব।" কিন্তু শেষে লাবণ্যের কথা রাখিতেই হইল। স্বামী বাহির হইলে, লাবণ্য বলিল,—"আমরা দু'জনে একটু পাড়া বেড়াইয়া আসি; ঝি, তুমি একটু সতর্ক হইয়া থাকিও।"

ডাক্তার বাবুর বাড়ী যাইয়া দেখিলাম—স্বামী হারমোনিয়মের একটা 'রিড' সমান করিতেছেন। আমাদিগকে দেখিয়াই যেন একটু অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। লাবণ্য অমলার নিকট বলিল,—"আমার একটি বন্ধু সঙ্গে আছেন, উনি বারান্দায় বসুন্।" আমি একখানা চেয়ার নিয়া এমন জায়গায় বসিলাম যে, ঘরের সব দৃষ্ট হয়।

লাবণ্য গান ধরিল। লাবণ্য এত সুন্দর গাইতে পারে, আমি পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। গান তুলিতেই স্বামী 'হারমোনিয়াম' ধরিলেন। আমি দেখিলাম, লাবণ্য অমলার কানে কানে কি কহিল। অমলা বলিল,—"ধীরেন্ বাবু!

হারমোনিয়াম রাখিয়া দিলেন। গান শেষ হইল, লাবণ্য অমলাকে বলিল,—"ঘরে বড় গরম, বাহিরে চলুন।" অমলা দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহিরে চলিল; আমার স্বামী ঘরেই নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। আমার স্বামীর প্রতি এতাদৃশ অবহেলা ও ব্যঙ্গোক্তি আমার প্রাণে বিষম বাজিতেছিল, আমি চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলাম। ইত্যবসরে বাহিরে যাইবার সময়, লাবণ্য আমাকে বলিল,—"আপনি তবে বাসায় যান, আমার একটু দেরী হইবে।"

আমি বাড়ী আসিবার অল্প পরেই আমার স্বামী বাসায় আসিলেন। তাহার মুখে যেন কেহ কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে। অতঃপর তিনি দুই দিন আর অমলাদের বাড়ী গেলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমি বুঝিতে পারিলাম, লাবণ্যের প্রভাবে অমলা ও আমার স্বামীর মধ্যে ক্রমশঃ একটু দূরত্ব ঘটিতেছিল।

আবার এক দিন তিনি অমলাদের বাড়ী গেলেন। লাবণ্য বলিল—"বৌ-দিদি! চল, আজও একটু মজা দেখিয়া আসিবে; আমি বলিলাম—"আর দরকার নাই।" কিন্তু দুরন্ত মেয়েটা কিছুতেই আমাকে ছাড়িল না। ঐ দিন অমলাদের বাড়ী গিয়া দেখি, আমার স্বামী বসিয়া আছেন; অমলার ছোট বোন্ সুধা তাহার সহিত গল্প করিতেছিল। অমলা উপরে ছিল; আমি সেই পূর্ব্বের মত বারান্দায় বসিলাম। —লাবণ্য যাইয়াই বলিল,—"সুধা তোর দিদিকে বল্, সুরেন্ বাবু আসিয়াছে।" সুধা খবর পৌঁচাইতেই অমলা আসিয়া উপস্থিত হইল—লাবণ্য পকেট হইতে একটা বেল ফুলের মালা লইয়া, অমলার—মাথা বেষ্টন করিয়া খোপার চারি দিক

হইবে।" অমলা বাক্স হইতে এক খানা সিল্কের রুমাল লইয়া বলিল,—"প্রতিদান মনে করিবেন না,—এখানা নিতেই হইবে।" অমলা আর কথা বলিবার অবসর না দিয়া রুমাল খানা নিজেই পকেটে দিবার উদ্যোগ করিল। লাবণ্য রুমাল খানা অমলার হাত হইতে লইয়া বলিল,—আপনার এত পরিশ্রম করিতে হইবে না।" এই বলিয়া নিজেই আপনার নামাঙ্কিত রুমাল পকেটে রাখিয়া দিল।

রাত দুপ্রহর হইয়াছে। অনেকক্ষণ হয় আমি বাড়ী ফিরিয়াছি, লাবণ্যও অনেকক্ষণ হয় বাড়ী ফিরিয়াছে। কিন্তু, স্বামী এখনও বাড়ী আসিতেছেন না দেখিয়া, চিন্তিত হইলাম। লাবণ্য বলিল,—"আজ অমলার সহিত বড়ই বেহায়াপনা করিয়াছি।"

অনেকক্ষণ পর দুয়ারে কাহার পদ শব্দ হইল। বুঝিলাম তিনিই আসিতেছেন। স্বামীর মুখমণ্ডল আজ তেমন বড় বিষণ্ণ দেখিলাম না। আমাকে বলিলেন,—"আজ আমি খাইব না, শরীরটা বড় ভাল না।" এই বলিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন।

আমরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, কি করিয়া জাগিলাম বলিতে পারি না। জাগিয়া দেখি, আমার স্বামী আমার পাশে বসিয়া আছেন।—খোলা জানালা দিয়া ঘরে চন্দ্র-কিরণ প্রবেশ করিয়াছিল; আমি বলিলাম,—তোমার কি ঘুম হয় নাই?" তিনি বলিলেন, "না" আমাকে বলিলেন,—"তুমিও একটু ওঠ।" আমি উঠিয়া বসিতেই আমার দুইটি হাত তাহার দুই হাতে ধরিয়া বলিলেন,—"হেম! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি অধঃপাতে যাইতেছিলাম; ভগবান্ আমায় রক্ষা করিয়াছেন।" বহুদিন পর, অত আদর সহিতে পারিলাম না; তিনি আমার অশ্রু জল মুছাইতে লাগিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে

আমি বলিলাম,—"তুমি আমার দেবতা! তুমি ওকথা বলিলে, আমার পাপ হয়।"

পরদিন ১১টার সময় বম্বে মেলে চড়িয়া, মধুপুর ছাড়িয়া, বাড়ীর দিকে চলিলাম।

বাড়ী আসার পর, স্বামীর সহিত আমার যে সকল কথা হইয়াছিল; তাহা এখানে বলিবার দরকার নাই। আমি লাবণ্যের নিকট হইতে সিল্কের রুমালখানা লইয়া বলিলাম,—"দেখ সিল্কের কাপড়ে কেমন সুন্দর ভাবে আগুন ধরে।" এই বলিয়া একটি দেশলাই আনিয়া, স্বামীর সম্মুখেই রুমাল খানিতে আগুন ধরাইলাম। স্বামী আমাদিকের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। ইহার পর হইতে তিনি লাবণ্যকে কখনও বা সুরেন্ বাবু, কখনও বা সুর-লাবণ্য বলিয়া ডাকিতেন।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

প্রেমের প্রথম স্বপ্ন।

সেই প্রিয়ে! আমাদের নব অনুরাগে,
প্রথম মিলন যবে হইল মধুর,
কি এক স্বপন যেন মদির উল্লাসে,
শত বসন্তের শোভা ফুটাইল আনি'!
চাহিলাম চারিদিকে,—স্বপ্ন জাগরণ
নারিনু বুঝিতে কিছু; অস্থির পরাণে,
তোমায় টানিয়া সখি! লইতে হৃদয়ে,
আবেশে অবশ দেহ, হ'ল কণ্টকিত!
মঞ্জু কুঞ্জ মাঝে ডাকিল পাপিয়া শ্যামা,

মেদুর দখিণানিল আনিল বহিয়া,
নন্দনের পারিজাত-গন্ধ সুমধুর,—
দশদিক ভরে গেল স্বর্গীয় সৌরভে!
বিতত কুন্তল মাঝে ফুল্ল মুখখানি,
ঈষৎ কুঞ্চিত লাজে,—ভাঙ্গা মেঘে যথা
আবৃত সুনীলাকাশে শরতের শশী!
সযতনে তা'য় তুলিতে চিবুকে ধরি,
অমনি হৃদয়ে, কি যেন রাগিণী এক
বীণার ঝঙ্কারে উঠিল বাজিয়া মরি!—
বাজে যথা কল-কণ্ঠে প্রভাত মধুর!
ধীরে ধীরে—অতিধীরে জানি না কখন,
অধরে অধর প্রিয়ে! হ'ল সম্মিলিত!—
জানিব কেমনে তাহা?—আমি যে তখন
আত্ম-হারা দিশাহারা,—বিহ্বল—বেহোঁস্,—
মরতে স্বরগে কিংবা স্বর্গরাজ্যে কোন,
আপনা ভুলিয়া গিয়া রয়েছি পড়িয়া!
প্রণয়ের প্রীতি-পূজা, প্রথম চুম্বন
এরূপে করিতে শেষ, হাসা'য়ে কাঁদা'য়ে
চমকি প্রাবৃটাকাশে গেল সৌদামিনী,
প্রথম প্রণয়ে মুগ্ধ করিয়া ভুবন!
বিরাট বিগ্রহরূপে এবিশ্বে তোমায়
হেরিলাম মনোরমে! অস্তিত্ব আমার
পাইল তোমার মাঝে লয় একবারে!

শ্রীভুবনমোহন দাস গুপ্ত।

মহত্ত্ব।

সকল মানুষই এক। মানুষ মাত্রই শোণিত, শুক্র, অস্থি, মজ্জা, মেদ ও মাংসের পিঞ্জর-নিরুদ্ধ একই উপাদানে গঠিত জীব। কিন্তু মূলে এক হইলেও, পরস্পরে পার্থক্য ও বৈচিত্র্য এত বেশী যে, একটি হইতে অন্যটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন-প্রকৃতিক ভিন্ন বিগ্রহ, দর্শন মাত্রেই ইহা উপলব্ধ হইয়া থাকে। সংসারে মনুষ্য এইরূপ বিভিন্ন প্রকার স্বভাবের বীজ হৃদয়ে ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করিলেও, কতকগুলি গুণ ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান আছে। সকলেই উহা পাইতে আকাঙ্ক্ষা করে, এবং অল্পাধিক পরিমাণে লাভ করিয়া, প্রাণে পরিতৃপ্ত রহে।

মানুষ যে পরিমাণে আপনার স্বার্থ-প্রবৃত্তি ও স্বাভাবিক তৃষ্ণাগুলিকে অতিক্রম করিয়া, পরকীয় স্বার্থ ও তৃষ্ণার বিষয় চিন্তা করিতে অবসর প্রাপ্ত, ও যে পরিমাণে আত্মপ্রয়োজনের ন্যায় পরকীয় প্রয়োজনের গৌরব ও গুরুত্ব বোধ করিতে সমর্থ হয়, এবং যে পরিমাণে পরকীয় স্বার্থে, আত্ম-স্বার্থত্যাগ ও আত্মসেবা ভুলিয়া, পরকীয় সেবায় আনন্দ অনুভব করিতে শিক্ষালাভ করে, তাহার মনুষ্যত্ব চরিত্রেরও সেই পরিমাণে বিকাশ ঘটিয়া থাকে। উচ্চকল্পের মনুষ্যত্ব ও যথার্থ চরিত-মহিমারই অন্য নাম মহত্ত্ব। মহত্ত্বের জলন্ত যজ্ঞীয় বেদী, যেখানে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত পুণ্য আহুতিতে নিত্য সংবর্দ্ধিত, যেখানে চারিত্র-সম্পদ্ মহত্ত্বের দিব্যজ্যোতিতে নিত্য বিলসিত, সেই স্থানেই আনন্দের অভিনন্দন, সেখানেই ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি। বস্তুতঃ যিনি যে পরিমাণ হৃদয়িক শক্তি ও সাধুতার সহিত কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তিনি সেই পরিমাণে মহত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইয়া, সকলের পূজাস্পদ হইয়া থাকেন। মহত্ত্বের পরিসর

অনন্ত বিস্তৃত ; এবং মঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরে মিলিত হওয়াই উহার চরম লক্ষ্য এবং উহাতেই উহার পূর্ণত্ব। ইহা মনুষ্য মাত্রেরই একটি সর্ব্বপ্রধান সাধনার বিষয় এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বলকর ঔষধের ন্যায়, প্রাপ্তবয়স্ক যুবকদিগের হৃদয়ে এবং মনে প্রভূত বলবত্তার সঞ্চারক। জগতে উন্নতির সোপান বহুপ্রকার এবং আকাঙ্ক্ষাও অনন্ত। মহত্বই এই সোপান-শ্রেণীর একমাত্র শেষ মঞ্চ এবং এই স্থানেই মানুষ একত্র সম্মিলিত হয়। আমরা যখন কোন লোকের জীবন-চরিত পাঠ করিবার জন্য উৎসুক হই, তখন কোন পাপাসক্ত, ঘৃণ্য বা নীচাশয় ব্যক্তির জীবন-চরিত পাঠ না করিয়া, যিনি মনুষ্য দেহেই দেবত্ব লাভ করিয়া, মানবজাতির অজস্র ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি পাইয়াছেন, অতি আগ্রহের সহিত তাঁহারই জীবন-চরিত পাঠ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া থাকি। জগতে এইরূপ লোকের জীবন-চরিত অতি মূল্যবান্ ও আদরের সামগ্রী।

আমরা, যখন সাধারণভাবে চিন্তা করি, তখন মনে লয়, আলেক্‌জাণ্ডার ও বোনাপার্টি প্রভৃতির ন্যায় যে অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ, কেবলই নিজেদের রাজ্য, সাম্রাজ্য ও সম্পদ প্রভৃতি বৃদ্ধির জন্য, এক এক মহাদেশকে নরশোণিতে প্লাবিত করিয়া, মানবের মনে ভয়ের সঞ্চার করিয়াছেন, এবং তদ্দেশবাসিগণ ভীতি-বিহ্বল-চিত্তে যাঁহাদের চরণ-তলে আশ্রয় লইয়া, আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিয়াছে, তাঁহারাই জগতে মহান্। কিন্তু আবার সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করিলে, এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, ইঁহাদিগকেই মহান্ বলিব,—না যে চৈতন্য, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, জ্ঞান ধর্ম্ম ও প্রেম-ভক্তির অবতার রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া, জগতের অশেষ

তেও কুণ্ঠিত হন নাই, এবং যাঁহারা ধর্ম্মের অমল আভায় এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতির জড়জাতিকেও একদিন কাঁপাইয়া, নাচাইয়া, সেই একমাত্র মঙ্গলময়ী মহাশক্তির দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই মহান্ বলিব?

মহত্ত্বের নামে বুদ্ধি যাহা বুঝিতেছে, তাহাতে বলিতে পারি,—মহান্ তাঁহারাও,—ইহাঁরাও। যাঁহারা অসাধারণ কর্ম্মবীর বা ধর্ম্মবীর রূপে জগতে পূজা পাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেই উচ্চকল্পের উন্নত জীব। সাধারণতঃ তাঁহারা মানবীয় অভিধানে মহান্ নামেই অভিহিত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সমস্ত কর্ম্মের সহিতই মহত্ত্বের সম্পর্ক আছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। বুদ্ধ, চৈতন্য, খৃষ্ট ও মহম্মদ প্রভৃতির কর্ম্মক্ষেত্র ধর্ম্ম,—লক্ষ্য মুক্তি। ইহার সহিত মহত্ত্বের এক প্রকার অভিন্ন সম্বন্ধ। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের সকল অনুষ্ঠানই সমানরূপে মহত্ত্বের পরিচায়ক বা মহত্ত্বের দেব-প্রভায় প্রভান্বিত ইহা বলা যাইতে পারে না। চৈতন্যদেব এবং তাঁহার সঙ্গী, সহকারী ও সহচরদিগের মধুমাখা "হরিনামের" অমিয় উচ্ছ্বাসে, যখন নবদ্বীপ উদ্বেলিত হইত, প্রেমের সমুদ্র যখন উছল তরঙ্গে উথলিয়া উঠিত, তখন লোকে ভক্তির জীবন্ত মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে ডগ-মগ হইত; যীশুখৃষ্ট যখন গ্যালিলিওর ধীবরদিগের নিকটে তাঁহার প্রাণ-নিহিত স্বর্গীয় সম্পদের শুভ সংবাদ ব্যক্ত করিতেন, তখন তাহারা আত্মহারা ও মন্ত্রমুগ্ধবৎ তন্ময় হইয়া রহিত; কিন্তু উহাতে মহত্ত্বের আত্মোৎসর্গ,—সেই মহাবলির মহামন্ত্র উচ্চারিত হইত কি? পরোক্ষভাবে উহার সহিত মহত্ত্বের সম্পর্ক থাকিলেও, প্রত্যক্ষভাবে তখন উহার বহিঃ-স্ফুরণ ঘটে নাই। কিন্তু নিত্যানন্দ যখন মাধাই

শোণিত-সিক্ত ললাটে "মেরেছিস্ মেরেছিস্ মাধাই, তবু একবার আয়; হরি ব'লে কোল দেরে ভাই"—বলিয়া বাহু প্রসারিয়া, অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন প্রকৃতই লোকে মহত্ত্বের মহান্ কণ্ঠধ্বনি সুস্পষ্ট শুনিতে পাইয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। যীশু যখন ক্রুশ-দণ্ডে লম্বিত হইয়া, আপনার সেই প্রাণান্তকর দুঃসহ দৈহিক ক্লেশেও সম্পূর্ণ অবিচলিত রহিয়া, ঊর্দ্ধ-নেত্রে,—"পিতঃ ইহাদিগকে ক্ষমা কর। ইহারা কি দুষ্কর্ম্ম করিতেছে, তাহা ইহারা জানে না। দয়াময়, অজ্ঞের এই অপরাধ লইও না,"—এই বলিয়া কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন আর একবার মহত্ত্বের ভুবন-ভুলানো আরাবে জগতের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। পৃথিবী এখনও সেই কণ্ঠধ্বনিতে বিস্মিত ও বিমোহিত।

মানসিক শক্তি ও হৃদয়িক মহত্ত্ব এক কথা নহে। যেখানে শক্তি, সেইখানেই মহত্ত্ব,—এ সিদ্ধান্তও ভ্রমাত্মক। শক্তিহীনের শত-তালি জীর্ণকন্থাও যেমন মহত্ত্বের মহাপীঠরূপে, সময় সময়, পূজা পাইয়া থাকে, তেমন শক্তির স্বর্ণ-সিংহাসনও আবার অসুরের অধিষ্ঠানে আতঙ্কের আস্পদ হইতে পারে। কিন্তু মহত্ত্বের সংস্পর্শে, আসুরশক্তিও যে দেবত্বলাভে কৃতার্থ হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শক্তি, অঙ্গুষ্ঠ-তাড়নে হিমাদ্রির মস্তক অবনত করে,—ফুৎকারে আল্‌পস্ পর্ব্বতকে তৃণের ন্যায় উড়াইয়া দেয়,—এবং চক্ষের পলকে বজ্রধরকেও বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করিয়া, বৈজয়ন্ত হইতে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হয়! শক্তিসাধ্য এই সমস্তই কিন্তু আবার অবস্থা বিশেষে অন্যপ্রকারে মহত্ত্বের আয়ত্ত। বিশেষ এই যে, শক্তি যেখানে অশক্ত, মহত্ত্ব সেখানেও শক্তিমান্। শক্তি সর্ব্বঘাতী শত্রুর হৃদয়-শোণিত পান করিবার নিমিত্ত অসি উত্তোলন করিতে পারে, এবং সেই অসির আঘাতে, চক্ষের পলকে, তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেও সক্ষম হয়; কিন্তু শত্রুকে

হাতে পাইয়াও সেই উত্তোলিত অসির সংহরণ, শক্তির সাধ্য নহে। শত্রু যখন নিরস্ত্র ও বিপন্ন, মহত্ত্বই তখন শক্তির সে অস্ত্র দূরে ফেলিয়া দিয়া, দেবতার প্রাণে ক্ষমার করুণ-কর বাড়াইয়া দিতে সমর্থ হয়। রাবণ হেন দুর্দ্দান্ত রিপুর মুখে কাতরতা ও চক্ষে জল দেখিলে, যাঁহার হাতের ধনু খসিয়া পড়ে, তাঁহার নাম রাম। আর শত্রুর বীর-শিবিরকে নিদ্রিত দেখিয়া, কটিতে অসি আঁটিয়া, নৈশ অন্ধকারে গা ঢাকিয়া, যে বীর-দর্পে উল্লম্ফন করে, তাহার নাম অশ্বত্থামা। রামও শক্তিমান্—অশ্বত্থামাও শক্তিমান্। রামের শক্তি মহত্ত্বের দেবপ্রভায় দেব-শক্তি, এবং রাম ভগবানের অবতাররূপে জগৎপূজ্য; আর মহত্ত্বের সংস্পর্শশূন্য অশ্বত্থামার শক্তি, আসুর-শক্তি এবং অশ্বত্থামা ছিন্নমণি সর্পের ন্যায়, কৌরব শ্মশানের নিস্তেজ ও নির্ঘৃণ্য প্রহরী। সেনাপতি যখন আপনার প্রাণে উপেক্ষা করিয়া, অজস্র গোলাবৃষ্টির অভ্যন্তরে নির্ভয়ে প্রবিষ্ট হন, এবং মুহূর্ত্তেকে অনল-উদ্গারী তোপের মুখে সহস্র সহস্র শস্ত্রধারীকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন, তখন তিনি শক্তিশালী মহাবীর। কিন্তু তিনি যখন আহত, অশক্ত, ও দুঃসহ পিপাসায় কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়াও, বহু আয়াসে লব্ধ হস্তস্থিত দুর্ল্লভ জলটুকু অধিকতর তৃষাতুর পরপক্ষের মুমূর্ষু পদাতিকের শুষ্কমুখে প্রফুল্লচিত্তে তুলিয়া দিয়া, স্বয়ং অতৃপ্ত পিপাসায়ও শান্তি অনুভব করেন, তখন তিনি মহান্। আলেক্‌জাণ্ডার দিগ্‌বিজয়ী বীররূপে, অস্ত্রের প্রভাবে দেশের পর দেশে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, আবার মহত্ত্বের উচ্চগ্রামে আরোহণ করিয়া, পরাভূত ও বন্দীকৃত বীরপুরুষকে, শিষ্টাচারপূর্ণ মিষ্টকথায় তুষ্ট করিয়া, সসম্মানে ও সগৌরবে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। নেপোলিয়ান্ যখন ইরম্মদ-গতিতে সমবেত ইউরোপের অজেয় ব্যূহ ভেদ

করিয়া, লক্ষ লক্ষ লোকের শোণিতে রণক্ষেত্র প্লাবিত করিয়াছেন, তখন তিনি অদ্বিতীয় বীর বা দুর্দ্ধর্ষ দানব-বিগ্রহরূপে ভীতি ও বিস্ময়ের আস্পদ; কিন্তু যখন তিনি ঘুমন্ত প্রহরীর কাঁধের বন্দুক কাড়িয়া লইয়া, সেই নিদ্রাতুর ক্লান্ত সৈনিককে ক্ষণকাল ঘুমাইবার অবসর দিয়া, স্বয়ং তাহার স্থলবর্ত্তীরূপে প্রহরীর কার্য্য করিয়াছেন,—যখন তিনি সামান্য পদাতিকের পথ-শ্রমে স্পৃষ্ট হইয়া, অশ্ব প্রভৃতি যান-বাহনে উপেক্ষা দেখাইয়া, প্রতপ্ত পাষাণের পথে স্বয়ং পাদচারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং সম্রাট-ভোগ্য উপাদেয় খাদ্য সরাইয়া রাখিয়া, নগণ্য পদাতিকের রুক্ষ রুটি বা শুষ্ক মাংস চর্ব্বণ দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া, সমপ্রাণতার ভাবে আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, তখন তিনি মহান্,—তখন তিনি মানবদেহে দেবতা। তাই বলিতেছিলাম, মহান্ তাঁহারাও,—ইঁহারাও।

আমরা এতক্ষণ যে মহত্ত্বের কথা কহিলাম, তাহা একপ্রকার অলৌকিক, অপ্রমেয় ও অসামান্য ; সুতরাং সকলের অধিগম্য নহে। কিন্তু মহত্ত্বের যেমন উচ্চ, তেমনই নিম্নতর গ্রাম আছে। নিত্যব্যবহৃত গৃহ-কন্নার সামগ্রীর মত, জীবনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত ব্যাপারে, এমন কি মুখের কথা ও নয়নের ইঙ্গিতেও মহত্ত্বের স্থান ও বিকাশের অবকাশ আছে। এক্ষণ ইহারই কথা বলিব।

আত্ম-সম্মান সকলেরই অবলম্ব। এই আত্ম-সম্মানের উপরই মহত্ত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। অতি সাধারণ ব্যক্তিদিগের মধ্যেও আত্ম সম্মানের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপও দেখা যায় যে, বিনিময়ে কাজকরা কিংবা অর্থ উপার্জ্জন করাই যাহাদের ব্যবসায়, তাহারাও যদি কোন জলমগ্ন ব্যক্তিকে নদী-বক্ষ হইতে উত্তোলন করিয়া জীবনরক্ষা করে, এবং স্বেচ্ছায় প্রদত্ত পুরস্কার গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয়, তবে ইহা হইতেও

ঐ ব্যক্তিগণের নৈতিক উন্নতি ও প্রাণগত মহত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। অনেক লোক আছে, তাহাদের হৃদয় এত দুর্ব্বল যে, তাহারা শুধু অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, একবারে লক্ষ্য-হীন অবস্থায় বৃথা জীবন অতিবাহিত করে। তাহাদের কথা পৃথক্। কিন্তু যাহাদের উচ্চ লক্ষ্য আছে,—যাহারা জানে যে, তাহাদের হৃদয়াভ্যন্তরে নিহিত লুক্কায়িত শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিলে, সেই লক্ষ্যস্থানে নিশ্চিতই পঁহুছিতে পারিবে, তাহারাই সংসারে উন্নত হইয়া, মহত্ত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয়। সূর্য্যের মধ্যে যেমন কেন্দ্রীভূত শক্তি আছে এবং সেই শক্তির সংপ্রসারণ দ্বারা যেমন জগৎ আলোকিত হয়, মনুষ্য-হৃদয়েও সেইরূপ কেন্দ্রী-ভূত এক শক্তি নিহিত আছে। মনুষ্য যদি আত্মনির্ভর দ্বারা সেই শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ হয়, তবে তাহা হইতেও ধর্ম্মের বিমল কিরণ রাশি বিকীর্ণ হইয়া, জগৎকে আলোকিত করিতে পারে। অতএব ব্যক্তি, সমাজ, কি জাতিগত পাপে কলু-ষিত না হইয়া, সৌরজগৎস্থিত ছায়া-পথে যেমন ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ দেহ অবসানে বিচরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ সকলেরই এই সংসারে প্রতিভাবান্ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পথ অনুসরণ করিয়া, হৃদয়ে লুক্কা-য়িত শক্তির উৎকর্ষ বিধান করা কর্ত্তব্য। তাহা করিলে, জড়-জগৎ হইতে তাহাদের আসন ক্রমেই উচ্চে অবস্থিত ও উন্নত হইতে থাকিবে।

সংসারে জ্ঞানীলোকের সংখ্যা অতি অল্প। তাঁহারা তাঁহা-দের কৃতকর্ম্মের জন্য কখনও জনসমাজে গর্ব্ব করিয়া বেড়ান না। এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা সর্ব্বদা নিজের কার্য্যা-বলীর অজস্র প্রশংসা করিয়া বেড়ায়। ইহা নিতান্তই দূষ্য এবং আত্মোৎকর্ষ সাধনের পক্ষে এক বিষম অন্তরায়। আত্ম-প্রশংসা

এতদূর নিন্দনীয় ও জঘন্য কর্ম্ম যে, আত্ম-শ্লাঘা ও আত্ম-হত্যা শাস্ত্রে একই শ্রেণীর মহাপাতকরূপে পরিগণিত। এই হেতুই শ্রীকৃষ্ণ প্রকারান্তরে আত্মহত্যা বিধানের নিমিত্ত অর্জ্জুনকে আত্ম-প্রশংসা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সে উপদেশটি এই :—

"হতাত্মানমাত্মনা প্রাপ্নুয়াস্ত্বং
বধাদ্ ভ্রাতুর্নরকাঞ্চাতিঘোরম্॥ ২৮
ব্রবীহি বাচাদ্য গুণানিহাত্মন-
স্তথা হতাত্মাভবিতাসি পার্থ।" ২৯

—মহাভারত, কর্ণপর্ব্ব।

অর্থাৎ তুমি আপনাকে হনন করিয়া, ভ্রাতৃহত্যারূপ ঘোর পাপ হইতে যদি নিষ্কৃতি লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাক, তাহা হইলে আত্ম-প্রশংসা কর, তবেই তোমার আত্মাকে হনন করা হইবে। বস্তুতঃ, জন-সমাজে বক্তৃতা করিয়া নিজের কার্য্যাবলীর প্রশংসা করা অপেক্ষা, তাহাদের কৃতকর্ম্মদ্বারা লোককে বুঝিতে দেওয়া উচিত যে, তাহারা প্রকৃতই সর্ব্বসাধারণের প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি পাইবার যোগ্য।

প্রথমেই বলিয়াছি যে, মনুষ্যের স্বভাব বিভিন্ন প্রকার। কেহ ভূ-তত্ত্ব-বিদ্যা, কেহ উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালোচনায় অনুরক্ত। কেহ দুরারোহ পর্ব্বতমালায় আরোহণ করিয়া, তাহার শোভা ও নানাপ্রকার বৈচিত্র্য দেখিতে লালায়িত,—কেহবা বাতক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে উত্তাল তরঙ্গমালা নিরীক্ষণ করিয়া, মনে প্রাণে প্রসন্ন,—কেহ সৌরজগতে নক্ষত্র-মালার গতিবিধি সন্দর্শনে, তদ্গতচিত্তে তাহারই অনুধাবনে যত্নপর,—কেহবা ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থের আলোচনায় আমোদিত ও পরিতৃপ্ত। কেহ চিত্রকর কেহ ঐন্দ্রজাল [illegible]

সক, কেহবা কবি। মনুষ্য স্ব স্ব রুচির অনুমোদিত এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত। জগতে মনুষ্যের এইরূপ বিভিন্ন কার্য্যের উপযোগিতা, ইহার প্রত্যেক অংশ, এমন কি, প্রত্যেক অণু পর্য্যন্ত অতি যত্ন ও আগ্রহের সহিত নিরীক্ষণ করা উচিত।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন মহানগরীর রাজকীয় বিদ্যালয়ের সুযোগ্য এবং খ্যাতনামা অধ্যাপক ফ্যারাডে সাহেব (Faraday) ছাত্রদিগকে রাসায়নিক পরীক্ষাদ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে, লৌহ চৌম্বকাকর্ষণী শক্তি প্রাপ্ত হইলে, স্বভাবতঃই উত্তর-দক্ষিণাভিমুখী হইয়া থাকে। তিনি দ্বিতীয়বার অন্য প্রকার উপাদানের সাহায্যে ইহাও দেখাইয়াছিলেন যে, শুধু উত্তর দক্ষিণ কেন, পূর্ব্ব পশ্চিমাভিমুখীও হইতে পারে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের ভিন্ন ভিন্ন শক্তিতে পদার্থ সমূহের গতিও বিভিন্ন দিকে নীত হইয়া থাকে। মনুষ্য হৃদয়েও এইরূপ যে নৈসর্গিক গুণ আছে, উহা ভিন্ন ভিন্ন লোকের সংমিশ্রণের বৈচিত্র্যে সম্যক্‌রূপে প্রস্ফুটিত হইতে না পারিয়া, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। মনুষ্য মাত্রেরই স্ব স্ব স্বাধীন ইচ্ছা আছে, এবং উহাই মনুষ্য-হৃদয়ে চৌম্বকাকর্ষণী শক্তি বিশিষ্ট সূচি স্বরূপ। ইহার এক একটা নির্দ্দিষ্ট দিক্ বা লক্ষ্য আছে। মানসিক আকর্ষণী শক্তিতে উহার গতিও সেই দিকে নীত হইয়া থাকে। কার্য্য করার এই অপ্রতিহত ইচ্ছা-শক্তিই—নৈতিক অনুষ্ঠানে পথ-প্রদর্শিকা, বুদ্ধিমানের বুদ্ধিমত্তায় প্রতিভা,—এবং আচারনিষ্ঠের আচার ব্যবহারে ক্ষমতারূপে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিলে, কাজটি অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়, এবং অশিক্ষিত লোকেরা—উহার মর্ম্মো-

বলিয়া মনে করে। ফ্রান্সের প্রধান সেনাপতি মণ্ট্লাক্ (Montluc) জিনোয়ার রণপোত-নেতা এন্ড্রি ডরিয়া (Andrea Doria) সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে,—"It seemed, as if the sea stood in awe of this man."—অর্থাৎ "এন্ড্রি ডরিয়ার কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া, বোধ হইয়াছিল, সাগরও যেন তাঁহার প্রতি ভক্তিমিশ্রিত ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া নিশ্চল থাকিত!" সেই সম-জাতীয় প্রতিভাবান্ নেল্সন্ (Nelson) একস্থলে বলিয়াছেন,—"I feel that I am fitter to do the action than to describe it."—অর্থাৎ "আমি লোকের নিকট কাজের বর্ণনা করা অপেক্ষা, নিজে সেই কাজ করার জন্যই আপনাকে অধিকতর উপযুক্ত মনে করি।" অতএব নৈপুণ্য এবং নমনীয়তা মহত্ত্ব লাভের অন্য প্রকার উপাদান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্ম-সম্মানের উপরই মহত্ত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এখন বুঝিতে হইবে যে, আত্মসম্মান কি? মনুষ্যের ভিতরে দেবত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতির নামই আত্ম-সম্মান। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন:—

> "অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
> বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥"

অর্থাৎ—"হে ধনঞ্জয়! এইরূপ পৃথগ্বিধ বহুজ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি? আমি এই সমুদায় জগৎ একাংশে ধরিয়া অবস্থিত আছি"। আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই—এই তত্ত্বে যাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহাতেই আত্মসম্মান পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। ইহার গভীর ভিত্তি ধর্ম্মে নিহিত। ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের সদন্তঃকরণই, ধর্ম্ম বা সেই করুণাময়ী মহাশক্তিতে বিশ্বাসের মূল প্রস্রবণ।

মানুষ মানুষের নিকট হইতে কিংবা পুস্তক পাঠ করিয়া উপ

দেশ লাভ করে; কিন্তু মানুষের ভিতরে অলক্ষিতভাবে যে ঐশী শক্তি নিহিত আছে, নির্জ্জন সাধনায় মানুষ উহা হইতে ততোধিক শিক্ষা এবং উপদেশ লাভ করিতে পারে। মহত্ত্ব লাভের ইহাও অন্যতম উৎকৃষ্ট উপায়। অতএব যদি মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাধীন প্রবৃত্তিই সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদনের প্রথম প্রবর্ত্তনা হয়, তবে উহার সৎপথে গতি ও সেই গতি বিষয়ে একাগ্রতাই দ্বিতীয় প্ররোচনা এবং উহাই প্রকৃত বলবত্তার জনয়িত্রী।

সংসারে কর্ম্মক্ষম এবং উন্নত হইতে হইলে, কঠোর সাধনার আবশ্যক। শুধু সুখের কোলে ঘুমাইয়া, কিংবা হাসিয়া খেলিয়া মানুষ উন্নত হইতে পারে না। মিঃ বেণ্ট্‌লি (Bently), গিবন (Gibbon), কিউভিয়ার্ (Cuvier), ল্যাপ্‌লেস্ (Laplace) প্রভৃতি অসামান্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের কৃতকর্ম্মের কাহিনী এবং জীবন চরিত পাঠ করিলেই এবিষয়ের যাথার্থ্য সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। সংসারে যাহার লক্ষ্য যত উচ্চ হইবে, সে সেই পরিমাণে উন্নত হইতে পারিবে। যদি কেহ প্লেটো (Plato), নিউটন্ (Newton), ল্যাপ্‌লেস্ (Laplace), ডারউইন্ (Darwin), ক্যাণ্ট্ (Kant) প্রভৃতি মহা মনীষিগণের শুধু জীবন চরিত পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত রহে, এবং যদি অন্য কেহ প্লেটোকে ওজন করিতে শিক্ষা করে,—ল্যাপ্‌লেস্, ডারউইনকে বিচার করিতে সক্ষম হয়,—নিউটন্‌কে চিনিতে ও বুঝিতে পারে, এবং ক্যাণ্ট্, সুইডেন্‌বর্গের সমালোচনা করিতে সমর্থ হয়, তবেই দেখিতে পাইবে যে, প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা শেষোক্ত ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ শক্তির পরিসর কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মই এই যে, যাহা যে পরিমাণ

মস্তিষ্কে সেই পরিমাণ শক্তির সংযোজনা করিয়া, তাহাকে তত উন্নত করিবেন।

মহত্ত্বের জগদুজ্জ্বল কণারাশি বিভিন্ন স্বভাবের লোকের মধ্যেই দৃষ্ট হয়; কিন্তু শিক্ষিত নৈতিক জীবনে উহা অবরুদ্ধ অবস্থায় না থাকিয়া, কখনও কখনও বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টি বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতিতে অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার আত্ম-নির্ভরতা অত্যন্ত বেসী ছিল। তিনি কোন কার্য্যই নিজে না দেখিয়া করেন নাই এবং যখন যে কাজই করিতেন, তাহার অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া, কার্য্যের গতিবিধি বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতেন। তিনি তাঁহার লাইব্রেরীতে বহুতথ্য এবং গভীর উপদেশপূর্ণ বহু সংখ্যক জ্ঞাতব্য বিষয় হাতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি যদি তাঁহার কোনও একটি কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইতেন, অমনি দ্বিগুণ উদ্যম ও উৎসাহের সহিত সেই কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইতেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা স্পেনের রাজা জোসেফ্‌কে (Joseph) উপদেশ দিয়াছিলেন,—"I have only one counsel to you,—"Be Master."—অর্থাৎ "তোমার নিকট মাত্র এই এক উপদেশ যে, যখনই যে কাজ করিবে, তাহাতে মাষ্টার হওয়া চাই।" গভীরতম জ্ঞানের স্নিগ্ধ জগদুজ্জ্বল আলোকে কঠোর পাপের কালিমাকেও বিদূরিত করে। ফ্রান্সে ডিডারো (Diderot) অতি সৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজে অতি কষ্ট স্বীকার করিয়াও গরীবদিগের উপকার করিতেন। তাঁহার মনুষ্যত্বের সীমা অবধারণ করা দুঃসাধ্য ছিল। একবার একজন নিতান্ত হীনাবস্থাপন্ন লোক, ডিডারোর বিরুদ্ধে মানহানিজনক কোন কথা লিখিয়া, ধর্ম্মনিষ্ঠ ডাচেচ ডিওর্লিয়ে-

স্‌কে (Duc d'orleans) উৎসর্গ করার মনন করিয়া, ডিডারোর নিকট আসিয়াছিল। ডিডারো সেই ব্যক্তির প্রতি নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়া, নিজেই তাহাকে উৎসর্গ পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, এবং ইহাতে সে প্রচুর অর্থলাভ করিয়া, দুরবস্থার কঠোর যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল।

মহৎ ও মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। কিন্তু, নেপোলিয়ান্ কর্ম্মক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সহস্র ঘটনায় মহত্ত্বের প্রচুর অনুষ্ঠান করিয়াও, প্রাণে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। এই হেতুই তিনি, সেণ্ট্‌হেলেনার নির্দ্দয় কারাগৃহে, আসন্ন সময়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে, কহিয়াছিলেন,—"হায়! আমি আমার সমস্ত জীবন ও মন উৎসর্গ করিয়া, শক্তির উদ্বোধনে যে ভয়ের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, আমার এই স্বল্পায়তন ক্ষুদ্র জীবনের অবসান হইতে না হইতেই, তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; আর তুমি যীশাস্, হৃদয়ের শোণিত দিয়া যে, প্রেমের রাজ্য গঠন করিয়া গিয়াছ, অনন্তকালেও তাহার বিলয় বা বিনাশ নাই।" বস্তুতঃ, বিশ্বজনীন প্রেমে ও ধর্ম্মে, যে মহত্ত্বের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, সেই মহত্ত্বই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—উহাই স্বর্গের সম্পদ্‌,—উহাই ত্রিদিবের অমৃত। সে অমৃতের বিন্দুবর্ষণেও মনুষ্যলোক ধন্য এবং মনুষ্য-নিবাস দেব-নিবাসের অপার্থিব গৌরবলাভে কৃতার্থ।

মনুষ্য, বুদ্ধির প্রাচুর্য্য, সুনীতির সম্যক্ অনুষ্ঠান ও সর্ব্বোপরি হৃদয়িক সম্পদেই উন্নত হয়। এই সমস্ত গুণই পরস্পর সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ এবং ইঙ্গিতে আহূত হইয়া, মহান্ ব্যক্তির হৃদয়ে একত্র সম্মিলিত হইয়া থাকে। কিন্তু এ সকলের মধ্যে স্বভাব বা হৃদয়ের আধিপত্য আবার সর্ব্বাপেক্ষা বেসী। বুদ্ধি উহার সম্মুখীন

যায়। সুতরাং স্বভাব বা হৃদয়টিকে গড়াইয়া লওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কারণ, অসংযত স্বভাব বা অগঠিত হৃদয়, মহত্ব লাভের পক্ষে এক বিষম পরিপন্থী।

সংসারে জীব মাত্রই ভ্রান্ত। পল্লীগ্রামে লোকের মুখে অনেক সময়ই শুনা যায়,—"কোন সমৃদ্ধিশালিনী মহানগরীতে, অথবা কোন সুবিস্তৃত সহরে যদি আমাদের বাসস্থান থাকিত, তবে উন্নত ও উপযুক্ত সামাজিক লোকের সংমিশ্রণে জীবনকে গঠন করিতে সক্ষম হইতাম।" এই সমস্ত কথা নিতান্তই অন্তঃসারবিহীন সন্দেহ নাই। কারণ, যে ব্যক্তি যে চক্ষে যাহা দেখিবে, তাহা তদনুরূপই প্রতিপন্ন হইবে। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনির সমষ্টি বিশেষ। আমরা যখন যাহা বলি, তাহাই জগতে প্রতিধ্বনিত হইয়া, পুনরায় আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। অতিনিপুণ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদগণ পাকা রাস্তা কিংবা ঘরের মেজেরও পুষ্প উৎপাদনে সমর্থ হন। সাধক কবি রামপ্রসাদ গাইয়াছিলেন,—

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত, চাষ করিলে ফল্‌তো সোনা।"

বস্তুতঃ কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। গৃহে, প্রান্তরে বা বনে থাক,—নগরে বন্দরে বা গ্রামে বাস কর, মানব-মনোরূপ জমি চাষ করিলে, সেই খানেই সোনা ফলিতে পারে।

সকল ব্যক্তির হৃদয়েই সচ্চিন্তা, ও তাহা লাভ করিবার প্রবলা ইচ্ছা-শক্তি বর্ত্তমান আছে। সে যেস্থানেই কেন না যাউক, সকল স্থানেই সৎপথ ও সৎআদর্শ লাভ করিতে সমর্থ হয়। প্রতিভা এবং চরিত্রবান্ ব্যক্তির হৃদয়, অনুরূপ আদর্শ লাভের চুম্বক সদৃশ। মনুষ্য হৃদয়ের অসমতা হেতুই, কেহ রাগী, কেহ ক্রোধী, কেহবা কবি, এইরূপ বিভিন্ন লোক

দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের যখন আত্ম-সম্মান বোধ জন্মে, তখন তাহাদের মধ্যে সহৃদয়তা এবং মনুষ্যত্বের প্রকৃত স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং উহাই তাহাদের চালক ও প্রতিনিধি-স্বরূপ তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে উন্নত, উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। তাহারা বাগ্মী হউক, মূক হউক, ক্রোধী হউক, বোধী হউক, কবি হউক বা অকবি হউক, তখন সকলেই চারিত্র-সম্পদে সম্পন্ন হইয়া, আপনার সেই পরিধির মধ্যেই আপন ভাবের অনুরূপ মহত্বলাভে কৃতার্থ হইয়া থাকে।

সংসারে যাঁহাদের আত্মসম্মান বোধ আছে,—যাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মের প্রকৃত উপাসক,—যাঁহারা নিজকে শাসন করিয়া, অপরকে শাসন করিতে জানেন,—যাঁহাদের প্রকৃতি সরল, কিন্তু কার্য্যে কঠিন,—যাঁহারা নিজেদের যত্নে ও সদাচরণে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছেন;—যাঁহারা নানাপ্রকার কষ্ট ও শ্রমস্বীকার করিয়া, স্বীয় ক্ষমতাবলে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন,—যাঁহারা তাঁহাদের ভাবী অদৃষ্টলিপির প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি সম্মুখে দর্শন করিতে সক্ষম হন,—তাঁহারাই মহত্ব লাভ করিয়া, জন-সমাজে প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকেন, এবং মঙ্গলময় বিশ্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বরের এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগতে আমরা প্রত্যেক শুভ মুহূর্ত্তেই এই আকাঙ্ক্ষা করি, যেন ইহলোকে এবং পরলোকে এইরূপ সংসর্গে জীবন অতিবাহিত হয়।

গ্রন্থ সমালোচনা।

সাবিত্রী।—টাঙ্গাইল, সাধন-সমিতি হইতে শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য।০ চারি আনা। যেদেশে পিতা কন্যাকে, শ্বশুর পুত্রবধূকে এবং গুরুজন মাত্রই

করিতেছেন, সেদেশে, সাবিত্রীর উপাখ্যান লিখিয়া, কেহই উপন্যাস রচনার যশঃপ্রত্যাশা করিতে পারেন না। কিন্তু সাবিত্রীর চরিত্র-সম্পদের এমনই একটা অলৌকিক মহিমা আছে যে, পাঁচ লক্ষ বার পাঠ করিলেও, উহা পুরাতন বা একবারে নীরস হইয়া পড়ে না। যখনই পড়া যায়, পড়িতে ইচ্ছা হয়। যাহা হউক, গ্রন্থকাররূপে যশস্বী হইবার আকাঙ্ক্ষায়, কেহই এক্ষণ সাবিত্রীর কাহিনী লিখিবার শ্রমস্বীকার করেন না। সাবিত্রীর পুণ্যময় পবিত্র কথা, বঙ্গীয় নারীসমাজে বিস্তৃতভাবে পঠিত, পাঠিত ও আলোচিত হউক, ঈদৃশ গ্রন্থ প্রচারের ইহাই এক্ষণ মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে। টাঙ্গাইলের সাধন-সমিতিও, বলা বাহুল্য যে, এই উদ্দেশ্যেই, সাবিত্রী-চরিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। সাধন-সমিতির ক্ষুদ্র পুস্তিকায়, যে প্রণালীতে কাহিনীটির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা একটু নূতন রকমের। প্রণালীটি আমাদিগের নিকট মন্দ লাগিল না। পুস্তিকার ভাষাও বেস প্রাঞ্জল ও মধুর। কিন্তু লেখকের অনবধানতা হেতু, স্থানে স্থানে একটু ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। যথা :—

"সত্যবান্ অমত করিতে পারিলেন না। সাবিত্রীর সুন্দর মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তিতে অমত হয় না।"

"কেহই সাবিত্রীর ইচ্ছায় বাধা দিতে পারিলেন না। সে দেবীমূর্ত্তিতে বাধা হয় না।"

লেখকের মনের ভাব সুন্দর। কিন্তু বাক্য বিন্যাসের ত্রুটিতে সেভাব ফোটে নাই। রচনাগত এইরূপ ত্রুটি যে দুই চারিটি আছে, ভরসা করি, সমিতি দ্বিতীয় সংস্করণে, তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন।

সাধন-সমিতির সাবিত্রী মহিমা সমাজে যথোচিত আদর পাইলে

আরাধ্যা ও নিত্য প্রাণ-প্রিয় জীবন-সঙ্গিনী হইয়া থাকুন, ইহা সাবিত্রী গ্রন্থপ্রণেতা ও উহার "ধূমকেতু"রূপী সমালোচক, উভয়ের যুগপৎ আকাঙ্ক্ষা ও অনুরোধ।

"নারীধর্ম্ম।—৺ পণ্ডিত নবীনচন্দ্র রায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।" প্রকাশিকা শ্রীমতী হেমন্তকুমারী, স্বর্গগত গ্রন্থকার নবীনচন্দ্র রায়ের কন্যা। নারীজাতি সম্পর্কে ইহা একখানি প্রয়োজনীয় সুপাঠ্য গ্রন্থ। গ্রন্থকার, মনু ও মহাভারত হইতে নারীধর্ম্ম বিষয়ক এক একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, প্রথমতঃ বাঙ্গালায় উহার অর্থ করিয়াছেন; তৎপর ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, নারী-জীবনের কর্ত্তব্য বিষয়ে স্বাধীনভাবে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায়, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে শুধু সখ করিয়া, ইহা পড়িলেই যথেষ্ট হইল না, একবারে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা সঙ্গত। গ্রন্থখানি কণ্ঠস্থ হইয়া এবং ইহার উপদেশ নিচয় প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠানে পরিণতি পাইয়া নারী-জীবনের অঙ্গীভূত হইলেই, ইহার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার হয়।

গ্রন্থখানি বিষয়াংশে উৎকৃষ্ট হইলেও, ইহার ভাষাতে বড়ই গলৎ রহিয়া গিয়াছে। এগলৎ গ্রন্থকারের ত্রুটি নহে,—মুদ্রাকরের অত্যাচার। মুদ্রণ-সময়ে ইহার প্রুফ সংশোধন, বোধ হয়, কেহই মনঃসন্নিবেশ বা দায়িত্ব সহকারে করেন নাই। অন্য ত্রুটি রচনা প্রণালীর। ইহা পড়িতে আরম্ভ করিলে, পদে পদেই পাঠকের মনে এই ধারণা হয় যে, এই হিন্দু শাস্ত্রোক্ত উপদেশ নিচয়, ব্রাহ্মধর্ম্মে রীতিমত দীক্ষাগ্রহণ না করিয়া থাকিলেও, ইহাদিগের ললাটে যেন ব্রাহ্ম সমাজের মার্কা লাগাইয়া

প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইয়াছে। নারীধর্ম্মের উপদেশ,—পতি-ব্রতা-ব্রত সকল ধর্ম্ম ও সকল সমাজের পক্ষেই তুল্যরূপে আদরণীয়। ভরসা করি, এই গ্রন্থের পুনঃ সংস্করণে, প্রকাশিকা মহোদয়া, যতদূর সম্ভব, এই বিশেষত্বটুকু পুছিয়া ফেলিতে ও ইহার ভাষাগত ভ্রম প্রমাদ দূর করিতে যথাশক্তি যত্ন করিবেন।

"দুর্গাদাস দপ্তর। মাসিক-হাসি ও রঙ্গরস। প্রথম খাতা—শ্রীমতী বসুমতী—দপ্তরের দপ্তরী। শ্রীদুর্গাদাস দে।" আমরা দপ্তর খুলিয়া আগা-গোড়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম, ইহার পাতায় পাতায়, তেরিজে বারিজে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ হইলাম, কিন্তু কোথাও "মাসিক-হাসি" বা "রঙ্গ-রসের" সাক্ষাৎ পাইলাম না। "মাসিক-হাসি" দূরের কথা, দৈনিক বা ক্ষণিক হাসিও আমাদিগের ভাগ্যে ঘটিল না। দপ্তরে শব্দের বিচিত্র বুনন ও ভাবের সেই অদ্ভুত ধুনন দেখিলে মনে লয়, হাসিবার ও হাসাইবার জন্য অনেক কল কৌশল, অনেক কারিকুরি ও বহু জোর জবরদস্তি করা হইয়াছে। কিন্তু স্বভাবের হাসি কলে বা বলে ফুটিতে চাহে না, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ কথা।

ঢাকায় ছিল সদানন্দ! সদানন্দও হাসাইতে চাহিত এবং নিজে হাসিতে হাসিতে ধূলি কর্দ্দমে গড়াগড়ি দিত। কিন্তু তাহার হাসিতে পাঠকের হাসি পাইত না,—পাঠকের আসিত কান্না। দপ্তরের জোর জবরদস্তিতেও, হাসি আইসে না,—আইসে ক্রোধ। এদোষ দপ্তরেরও নহে, বহিস্থ পাঠকেরও নহে। দোষ অবস্থার হাসি বা রঙ্গ-রসের সহিত সম্পর্ক, official secret বা দপ্তরের গুপ্ত রহস্যের। বাহিরের লোকে সে রহস্য ভেদে অসমর্থ, তাই হাসির স্ফুরণে দন্ত বিকাশ না করিয়া, বসুমতীর কথা ভাবিয়া, ক্রোধের সঞ্চারে ভ্রূকুটি বিন্যাস করিয়াই নিরস্ত হয়। দপ্তরের মহাফেজ, মুহুরী, কেরাণী ও দপ্তরী অব-

শ্যই দপ্তরের প্রকৃত রহস্যে অভিজ্ঞ, তাঁহারা হয়ত তাঁহাদের দপ্তরের নামেই হাসিয়া গলিয়া পড়েন ও রঙ্গ-রসে উদ্বেল হইয়া উঠেন। আমাদিগের তাহা হইল না। আমরা কি করিব,—নাচাড়।

—০—

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

"প্রবাসী" ও "প্রদীপ"—আমরা যথারীতি পাইতেছি। সময়ান্তরে উহাদের সমালোচনা হইবে। বাহ্যিক আড়ম্বরে আজি কালি "প্রবাসী" মাসিক পত্রিকার ক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

অর্চ্চনা।—(প্রথম বর্ষ)। শ্রাবণ, ১৩১১। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, সম্পাদিত, এবং ২৯নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেনস্থ "অর্চ্চনা কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশিত। আমরা মাত্র "অর্চ্চনার" শ্রাবণের সংখ্যাই প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় কএকটি ক্রমপ্রকাশ্য প্রবন্ধ ও কতিপয় কবিতা আছে। আমাদের নবীন সহযোগী দীর্ঘ জীবন লাভ করতঃ মাতৃভাষার অর্চ্চনা করুন।

প্রকৃতি।—আষাঢ়, ১৩১১। এপর্য্যন্ত "প্রকৃতির" দুই-সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। "প্রকৃতির" কাগজ ও ছাপা ভাল; এবং টাইটেল্ পেজ্ টি অতি সুন্দর,—"কুন্তলীন প্রেসের" ছাপা। "প্রকৃতির" প্রকাশক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু।

বসুধা।—আষাঢ়, ১৩১১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ

আমরা পাইয়াছি। ভগবান্ আমাদের সহযোগীকে বঙ্গভাষার সেবায় নিরত রাখুন।

যোগি-সখা।—(প্রথমবর্ষ) ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩১১। শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র নাথ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। উক্ত মাসিক পত্রখানি "নাথ" বা "যোগি" সম্প্রদায় হইতে প্রকাশিত হয় বলিয়াই, বোধ হয়, ইহার নামকরণ হইয়াছে—"যোগি-সখা"। "যোগি-সখা"র দুইসংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

মিত্র-গোষ্ঠী পত্রিকা।—(প্রথমবর্ষ) ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩১১। এই খানি মাসিক সংস্কৃত পত্রিকা,—দেবনাগর অক্ষরে ছাপা,—৺ কাশীধাম হইতে প্রকাশিত,—এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামাবতার শর্ম্মা সাহিত্যাচার্য্য কাব্যতীর্থ এম্, এ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ শাস্ত্রী মহাশয়গণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আমাদের দেবভাষার উন্নতিকল্পে যাঁহারা ব্রতী, তাঁহারা আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। আমরা এই পত্রিকা খানির দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

কোহিনুর।—আষাঢ়, ১৩১১। শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ রওশন আলি চৌধুরী সম্পাদিত, এবং পাংশা (ফরিদপুর) "কোহিনুর-সাহিত্য-সমিতি" হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দেশের ধনী সন্তানদিগকে সাহিত্য-চর্চ্চায় অগ্রসর হইতে দেখিলে, আশায় প্রাণ ভরিয়া যায়। পাংশার মুসলমান জমিদার মহাশয়দিগের এই সাধু উদ্দেশ্য সফল হউক।

নবপ্রভা।—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১। আমরা যথারীতি 'নবপ্রভা' পাইতেছি। ইহার ছাপা, কাগজ, প্রশংসনীয়। 'নবপ্রভায়' বঙ্গভাষা নূতন আলোকে আলোকিত হউক।

নবনূর।—ভাদ্র, ১৩১১। বঙ্গীয় হিন্দু ও মুসলমানের

লিখিত। আমরা জানি,—সাধু যাহার ইচ্ছা, ভগবান্ তাহার সহায় হন। 'নবনূরের' কর্ম্মব্রত সুচারুরূপে উদ্যাপিত হউক।

নববিকাশ।—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩১১। শ্রীযুক্ত হর-কুমার সাহা এম্, এ, বি, এল, সম্পাদিত, এবং 'সাহা-সমিতি' কর্ত্তৃক ঢাকা সাচিপান্দরিপাস্থ "নব-বিকাশ কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশিত। আমরা 'নববিকাশের' তিন সংখ্যাই মাত্র পাই-য়াছি। সর্ব্বাগ্রে আমরা এই নবীন সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আর্থিক অসচ্ছলতায় 'নববিকাশ' কখনও মারা যাইবে না। বিশেষতঃ সাহা-সম্প্রদায়ে যে সকল ধনীসন্তান রহিয়াছেন, তাঁহারা যদি দীনা বঙ্গভাষার কল্যাণ-কামনায় এবং স্বদেশ ও সমাজের উন্নতিকল্পে এদিকে একটুকু কৃপা কটাক্ষপাত করেন, তবে "নব-বিকাশের" দীর্ঘজীবন অবশ্যম্ভাবী।

হানিফী।—বৈশাখ, ১৩১১। এম্, এস্, নুরুলহোসেন কাশিমপুরী সম্পাদিত, এবং ময়মনসিংহ ইস্‌লামপুর "হানিফী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। আমরা "হানিফীর" দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

নব্যভারত।—শ্রাবণ, ১৩১১। বর্ত্তমান সংখ্যায় "হিন্দু ও মুসলমান" পাঠ-যোগ্য প্রবন্ধ। "উপনিষদের উপদেশ" ক্রমশঃ প্রকাশ্য; সুতরাং সমালোচনা অবিধেয়। উপনিষদের পদ্যানুবাদ আমাদের নিকট একঘেঁয়ে লাগিয়াছে; তবে বঙ্গভাষায় ইহার অনুবাদ হইতে দেখিলে, আমাদের আশা হয়। "ভারতে দুর্ভি-ক্ষের" আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস কালোচিত সুপাঠ্য প্রবন্ধ। "প্রাচীন ভারতে বাণিজ্য" প্রবন্ধটি আশানুরূপ নহে। "চণ্ডী-দাসে" বেশী কিছুই নূতনত্ব পাওয়া গেল না। "বাঙ্গা

যায় আছে; কিন্তু লেখক তাহা দেখাইতে পারেন নাই। "পৃথিবী কি অচলা নয়?"—এই প্রবন্ধের প্রতিবাদগুলি যুক্তি-সঙ্গত; বোধ হয়, ইহাতেই মহেশ বাবু বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং সমালোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়। "হিমালয়" (পদ্য) শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিএ। কবিতাখানি আকারে "হিমালয়ের" অনুরূপ না হইলেও, কম নহে। তবে হিমগিরিতে যে সকল নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে, এই আক্ষরিক "হিমালয়ে" সেই সৌন্দর্য্য সম্ভার আদৌ ফুটে নাই। "আত্মবলি ও আত্মবিলি" প্রবন্ধটি মন্দ হয় নাই।

সাহিত্য।—ভাদ্র, ১৩১১। "রামচন্দ্র কবি ভারতী"—সারগর্ভ প্রবন্ধ। "ভারতচন্দ্রের যুগে" অনেক নূতন কথা আছে। হেমেন্দ্র বাবুর এই প্রবন্ধটি বেস হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত "ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ" প্রবন্ধটি বিবিধ তথ্যে ও ভাষা-গরিমায় অতি উপাদেয় হইয়াছে। "প্রতিষ্ঠা"—একটি গল্প। গল্পটি মোটের উপর মন্দ হয় নাই। "রেডিয়ম" প্রবন্ধ অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি এতাদৃশ সরল ভাষায় লিখিত হইলে, সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে। "সন্ধ্যায়" একটি কবিতা। কবিতাটি বড়ই মর্ম্মস্পর্শিনী হইয়াছে। লেখিকার —লেখায় লালিত্য আছে —এবং ভাবে গভীরতা আছে। "দেশীয় চুনীতে" বঙ্গীয় গৃহিণী ও কুলবধূগণ অনেক নূতন তথ্য পাইবেন। "সহযোগী সাহিত্য" বেস চলিতেছে।

ভারতী।—ভাদ্র, ১৩১১। বিজয় বাবুর "প্রকৃতি" শীর্ষক কবিতা খানি ভাবে ও ভাষায় বেস হইয়াছে। "প্রতিজ্ঞা পূরণ" একটি গল্প। গল্পটি তত জমাট বাঁধে নাই,—চলন-সই হইয়াছে। দীনেশ বাবুর "কাবুলীওয়ালাতে" ২। ৪টী নূতন কথা

পাওয়া যায়; কিন্তু দীনেশ বাবুর লেখনীর যেন সেই মাধুরী টুকু আর নাই। "বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ" সুখ-পাঠ্য ও সারগর্ভ প্রবন্ধ। "বোম্বায়ের বোবাজাতি" প্রবন্ধে মিঃ তায়েবজী মহাশয় আমাদিগকে অনেক নূতন কথা উপহার দিয়াছেন। "আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডারে" এই সংখ্যা "ভারতীতে" অমরা যে রত্নটি দেখিলাম, তাহা সর্ব্বথা শ্লাঘনীয়। "রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ" —মন্দ হয় নাই। "উর্ব্বশী ও তুকারামের' যবনিকা পড়িলে, সমালোচনা হইবে।

"উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ।"

ক্লিওপেট্রা ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা।

ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা টলিমি সিংহাসনের পৃথ্বী-প্রসিদ্ধ অন্তিম বিগ্রহ;—মৈশরীয় মিশ্র-সভ্যতার চরম-বিকাশ বা শেষ ফল। ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা ভুলিবার বস্তু নহে। কোষ্ঠীর গণনায়, দশা পরিচ্ছেদে ষড়দশার স্থান যেখানে, মিশরের টলিমি ইতিহাসেও ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার স্থান সেই খানে;—ইহাই ক্লিওপেট্রা ও টলিমি কাহিনীর এক প্রকার শেষ পরিচ্ছেদ।

প্রথম কথা,—ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা, ক্লিওপেট্রা-পংক্তিতে ষষ্ঠস্থানীয়া ও ক্লিওপেট্রা নামিকা অন্তিম দীপ-বর্ত্তির শেষ-রশ্মি হইয়াও, তীব্র আলোকের অমন উজ্জ্বল উচ্ছ্বাসে, পৃথিবীর চক্ষু আকর্ষণ করিলেন কিরূপে? ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা রূপসী। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কোন্ ক্লিওপেট্রা না, রূপের তেমনই উচ্ছলিত ছটায়, টলিমি সিংহাসনের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন? ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা রাজ্য-কামুকী; প্রতাপ, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার দুঃসহ পিপাসায় উন্মাদিনী;—রণরঙ্গিণীর প্রাণে রণ-ক্ষেত্রে, আত্ম-বিভূতি স্বরূপ, অসংখ্য সেনা প্রেরণে চির উৎসাহিনী এবং অবস্থা বিশেষে দৃক্‌পাতশূন্যা ও নির্ভীকা ছিলেন। কিন্তু কোন্ ক্লিওপেট্রা এই সকল আসুরসম্পদে হীনপ্রভা?—ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা ভ্রাতৃ-ঘাতিনী। এ অংশেও তিনি অদ্বিতীয়া নহেন। ক্লিওপেট্রা-দিগের অনেকেই, প্রয়োজন পড়িলে, ভ্রাতা বা ভ্রাতৃরূপী পতি

হননে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না! ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার আর এক আভরণ দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়-লালসা। ইহাতেও পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চ ক্লিওপেট্রা,—টলিমি পুরাবৃত্তের চিরস্মরণীয়া পঞ্চকন্যা, একবারেই গণনার অযোগ্যা বা অপ্রসিদ্ধা ছিলেন, এমন নহে। বস্তুতঃ ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা এমন এক রাজবংশ হইতে উদ্ভূত হইয়া ছিলেন যে, সেই বংশের সিংহাসনারূঢ়া প্রায় সকল রাণী বা রাজকন্যাই, গত দুই শত বৎসর কাল, অসংযত ইন্দ্রিয়ের প্রলয়-বাত্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছেন; এবং মনুষ্যোচিত স্বাভাবিক দয়াধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, স্বজনহত্যাদিরূপ রোমহর্ষণ দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। টলিমি রাজবংশের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, কোন আরসিনু বা কোন ক্লিওপেট্রাই স্বীয় অভি-সন্ধি সাধন উদ্দেশ্যে, স্বামী কিংবা ভ্রাতৃহত্যা করিতে,—বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিতে,—কিংবা কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত সৈন্য সংগ্রহ কিংবা উহার পরিচালনা করিতে,—কোন গূঢ় অভিপ্রায় সাধন হেতু সিংহাসনের কোন ভাবী উত্তরাধি-কারী গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। তথাপি এই সর্ব্বশেষ বা ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার এত বিশেষত্ব কিসে?—তাঁহার অমন জগৎ-যোড়া নাম ও খ্যাতি কোন্ মন্ত্র বলে?

কাঙ্গালের পর্ণকুটীরে, সময় সময়, সীতা সাবিত্রীর মত কত সতী অন্ধকারে বিকশিত হইয়া অন্ধকারে লয়প্রাপ্ত হয়; পৃথিবীর কোন বাল্মীকি বা ব্যাস, তাঁহাদের সংবাদ লইবার সুযোগ প্রাপ্ত হন না। কত মণি খনির অন্ধকারে নীরবে জ্বলিয়া নীরবে নিবিয়া যায়, কত পারিজাত জনশূন্য অরণ্যে ফুটিয়া নির্জ্জনে ঝরিয়া পড়ে, কেহ তাহার খবর লয় না। কিন্তু, পারিজাত যখন ইন্দ্রের কণ্ঠভূষণ, তখন তাহার সৌরভে ত্রিলোক মুগ্ধ। মণিকুলের কহিনুর যখন ইংলণ্ডীয় রাজমুকুটের মধ্যমণি, তখন

পৃথিবী তাহার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। সীতা যখন পৃথিবীর অতুল কীর্ত্তি, আত্মোৎসর্গের অভাবনীয় বিগ্রহ,—রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের প্রেয়সী ও অযোধ্যার রাজ-লক্ষ্মীরূপে সিংহাসনে আসীনা, বাল্মীকির মত কবিও তখন রামায়ণী বীণায় তাঁহার গুণ গাইয়া কৃতার্থ, ও স্বনামধন্য, এবং তখনই জগৎ যুড়িয়া লোক-ললাম-ভূতা সীতা সতীর অনন্তকালব্যাপী জয়ধ্বনি।

পৃথিবীর এইরূপ পুণ্যপুঞ্জময় সুখশীতল অপার্থিব দুর্লভ ধন সম্বন্ধে যে কথা, সর্ব্বত্রসুলভ প্রাণাতঙ্ক নরকানল বা ভয়াবহ ও মর্ম্মভেদী শল্যগুলি সম্বন্ধেও সেই কথা। কত ক্যাথেরিন্ বা শোণিত-শোষিণী রাক্ষসী, কত পিশাচী বা ত্রিকুলমর্দ্দিনী কুলটা অন্ধকারে মাথা গুজিয়া স্বজন-শোণিতে লালসার তর্পণ করে, অথবা দরিদ্রের ভাঙ্গাকুড়েয় আগুন ধরাইয়া দিয়া হি-হি করিয়া পৈশাচিক হাসি হাসিয়া লয়, কোন্ ইতিহাস তাহার সংবাদ লইতে পারে? কোন্ কবির প্রাণ সে দৃশ্যে ব্যথিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়? কত কাল-নাগিনী মূষিকের গর্ত্তে তনু ঢাকিয়া অন্ধকারে কালকূট উদ্গিরণ করে, এবং কত নগণ্য রাখাল ও কৃষক সেই বিষে লোকচক্ষুর অগোচরে ঢলিয়া পড়ে, কে তাহার খবর লয়? কিন্তু সেই নাগিনী যখন, ধূর্জ্জটির জটায় নাগমালা রূপে জড়াইয়া রহিয়া, মণিভূষণা ফণা বিস্তার করিয়া হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করে, তখন সে ধন্বন্তরির মত অদ্বিতীয় বৈদ্যরাজেরও ব্রহ্মরন্ধ্রে দংশন করিতে সমর্থ হয়। পাতালের তক্ষক যখন ঊর্দ্ধলোক স্বর্গে স্থান পাইয়া, ইন্দ্রের দেবসিংহাসনের আভরণ রূপে, পুচ্ছবন্ধনে সিংহাসন বাঁধিয়া গর্জ্জন করে এবং জন্মেজয়ের মন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া ইন্দ্রসহ যজ্ঞানলে পুড়িবার নিমিত্ত শূন্যপথে আন্দোলিত হইতে থাকে, তখনই ভীত ও বিস্মিত পৃথিবী ঊর্দ্ধনেত্রে তাকা-

ইয়া সভয়ে নমস্কার করে, তখনই পৃথিবীর পূজনীয় আস্তিকও ক্ষণকালের তরে, সসম্ভ্রমে দৃষ্টিপাত করিয়া, সেই মারাত্মক পাপ-বিগ্রহকেও, "তিষ্ঠ" বলিয়া অমর বর প্রদানে প্রস্তুত হন।

ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রাও এই শ্রেণীর অবস্থাপন্ন ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে এই শ্রেণীর বস্তু। ক্লিওপেট্রা কখন তদানীন্তন অদ্বিতীয় বীর রোমান সাম্রাজ্যের ধূর্জ্জটিরূপী সীজারের ন্যায় পুরুষসিংহের কণ্ঠদেশে মণিমালার মত দোদুল্যমানা রহিয়াছেন,—কখনও বা ইন্দ্রপ্রতিম বীর এণ্টনীকে পুচ্ছে বাঁধিয়া জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা ও লালসার প্রলয়-বহ্নির দিকে ধাবমানা হইয়াছেন। এমন সুদূর লক্ষ্যে শরচালনা, এমন উন্নত গিরিশৃঙ্গে শক্তিসঞ্চালন, মিশরের অন্য কোন আর্‌সিনু বা ক্লিওপেট্রার ভাগ্যেই ঘটে নাই। ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার বিশেষত্বের ইহাই প্রধান কারণ।

কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। টলিমি যখন মিশরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, পূর্ব্বেই একবার ইহা দেখান হইয়াছে যে, তখন 'ফেরেও'র সেই পুরাতন মিশর বিলুপ্ত প্রায়। পারস্যের দাসত্ব-লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত মিশর তখন মাসিডনীয় প্রতাপ-বিগ্রহের চরণতলে লোটাইয়া পড়িয়া, গ্রীক-শক্তিকে করপুটে নমস্কার করিতেছিল। এই অবধি মিশর, গ্রীস ও মাসিডনীয় সভ্যতার বিদেশীয় সৌরভে আংশিক সুরভিত। টলিমি সিংহাসন যখন টলটলায়মান, তখন ঘটনাচক্রে, রোম মিশরের অদ্বিতীয় অভিভাবকরূপে দণ্ডায়মান হইল। রোমের প্রজাতন্ত্র তখন অর্দ্ধপৃথিবীর অধিপতি। তদানীন্তন সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জগতের অধিকাংশই রোমসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, রোমীয় শক্তির নিকট অবনত, অথবা উহার পদাশ্রিত বা পদানুগত। মিশরও তখন এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। মিশর, এইরূপে

হইয়া থাকিলেও, এই সময়ে, পৃথিবীর প্রভুপদে যাঁহারা আসীন ছিলেন, ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া পড়ে; সুতরাং অত্যাদ্ভুত দৃশ্য বা ক্রিয়ার রঙ্গভূমি বা রঙ্গমঞ্চরূপে, অন্য প্রকারে পুরাতন ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া উঠে।

ঈদৃশ অবস্থার অবশ্যম্ভাবি আবরণ-পরিধির মধ্যে ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার অভ্যুদয়। পৃথিবী ভগবানের এক বিচিত্র নাট্যশালা। মানুষ উহার অভিনেতা। যাঁহারা মিশর ইতিহাসের এই অংশ পাঠ করিতে একটু শ্রমস্বীকার করিবেন, তাঁহাদের অনেকেই, এই রূপ-কুসুম-বিলসিতা পীযূষ-ভাষিণী বিলাসিনী, এই ভ্রাতৃঘাতিনী করালী ক্লিওপেট্রার বিলাস-চল-চল অতুলনীয় সাজসজ্জা ও দুর্দ্দম ভোগাসক্তি দেখিয়া, প্রাণে কিছু নূতনত্ব অনুভব এবং মনে বিস্ময়ের ভাব পোষণ করিতে বাধ্য হইবেন। কারণ, যাহা কিছু বিরল, বিচিত্র বা অভাবনীয়, মানুষ তাহাতেই আশ্চর্য্য বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার উপর আরও একটি কথা আছে। স্বভাবের উল্লিখিত বৈচিত্র্যে পূর্ব্ববর্ত্তী ক্লিওপেট্রা বা টলিমি রাজমহিষীদিগের তুলনায় ষষ্ঠ-ক্লিওপেট্রার খুব বেসী পার্থক্য না থাকিলেও, সময়-ধর্ম্মে এবং ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনাক্রমে অন্যবিধ আবরণ-পরিধির কেন্দ্রস্থানে অবস্থান নিবন্ধন, ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার উপরেই তদানীন্তন ভাব-জগতের আলোক-রশ্মি সমধিকরূপে ও বিশেষ ভাবে নিপতিত হইয়াছিল;—মানুষ অবস্থারই কর-ধৃত পুত্তলী-মাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী রাণীগণ জীবন ও রাজ্য পণ করিয়া, প্রতি-নিয়তই ভয়াবহ অক্ষক্রীড়ায় নিরত হইয়াছেন সত্য,—কিন্তু সে ক্রীড়া মিশর কিংবা সিরিয়ার রাজপুত্র বা রাজ্যেশ্বরদিগের সহিতই হইয়াছে। তাঁহাদের ক্রীড়াক্ষেত্র মিশর ও সিরিয়ার

মধ্যস্থরূপে ব্যবস্থা করিয়াছেন, কখনও বা উদাসীনভাবে অদূরে দাঁড়াইয়া ক্রীড়ার শেষ ফলাফল পরিদর্শন করিয়াছেন মাত্র।

ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার সময়, এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রাকে মিশর ও সিরিয়ার গণ্ডী পার হইয়া রাজনৈতিক অক্ষক্রীড়ায় রোমের ভুবন-বিখ্যাত প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়দিগের সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করিতে হইয়াছিল। তিনি রূপের তনু কুহক-কলার বিচিত্র বর্ম্মে আবরিয়া লইয়া, কখনও অস্ত্র ঝন্‌ঝনায়, বীর-বপুর উপর আধিপত্য ফলাইতে চেষ্টা করিতেন, কখনও বা বাহ্যিক সম্ভ্রমের আবরণে, নিজ রূপলাবণ্যে প্রচুর আত্মনির্ভরজনিত বিশ্বমোহন মধুর শ্লেষাত্মক হাসি অধরে ফুটাইয়া কৌশলময় বাক্‌চাতুরীর মনোমদ ঝঙ্কারে, ও মদির নয়নের স্বাভিলাষসঙ্কিনী অসাধারণ শক্তিতে অনায়াসে বীর-বক্ষ ভেদ করিয়া মনের দুর্গ জয় করিয়া লইতেন। রোমান্ খেলোয়াড়গণ অন্য দেশীয় খেলোয়াড় অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বী, বিক্রমশালী ও ক্ষমতাপন্ন; তাঁহারা খেলায় সহজেই উত্তেজিত ও উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। এ অক্ষক্রীড়ার পণও বড় গুরুতর ছিল। খেলায় জয়লাভ করিলে, দ্বিগুণিত খ্যাতি ও গৌরবে দেশ ভরিয়া যাইত; এবং হারিলেও আবার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি ও বিপদের আশঙ্কা ঘটিত; এই সকল কারণেই, সম্ভবতঃ ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা প্রায় সমগ্র পৃথিবীর কল্পনা রাজ্যে সেই এক বিস্ময়কর ও বিচিত্রভাবে অদ্বিতীয় আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং বোধহয়, চিরকালই তিনি এই বিশ্ববিশ্রুত নামে জগতে পরিচিত থাকিবেন।

ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার পিতা টলিমি অলিথস্ মৃত্যুশয্যায় শয়ান আছেন। রোমের জয়ডঙ্কায় পৃথিবী কম্পিত হইতেছে।

রাজ্যেরও অভিভাবক। অলিথস্ রোম প্রজাতন্ত্রের তদানীন্তন কর্ণধার ও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ প্রসিদ্ধনামা পম্পের একান্ত কৃপাভাজন ও স্নেহপাত্র। কিন্তু রাজনৈতিক গগনে ধীরে ধীরে কাল-মেঘের সঞ্চার হইতেছে। অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর, রণ-পণ্ডিত সিংহ-বিক্রম সীজারের উদীয়মান প্রতিভার পানে রোমবাসী প্রাণের অনুরাগে সসম্ভ্রমে দৃষ্টিপাত করিতেছে। সময় সময়, পম্পের সহিত তাঁহার ক্রুদ্ধ কটাক্ষের নীরব বিনিময় চলিয়াছে। এই সময়ে মিশররাজ টলিমি অলিথসের অন্তিম সময় উপস্থিত হইল। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে, সদয় অভিভাবক পম্পের অবস্থা ও সীজারের অভ্যুদয় বিষয়ে চিন্তা করিয়া, আপন রাজ্যের ভবিষ্যৎ বিষয়ে একটুকু উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং তাঁহার রেহানী সম্পত্তি, যাহাতে রোমান্ উত্তমর্ণগণের হস্তগত না হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সতর্কতার আশ্রয় লইলেন। তিনি মিশরীয় চিরন্তন রাজকীয় রীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া একখানি উইল প্রস্তুত করিলেন।

টলিমি অলিথসের দুটি পুত্র ও দুটি কন্যা তখন জীবিত ছিল। জীবিত সন্তানদিগের মধ্যে ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রাই বয়সে সকলের বড়। সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ক্লিওপেট্রার বয়স, এই সময়, ষোল বৎসরের বেশী নহে। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স দশবৎসর মাত্র। কনিষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠা কন্যা উভয়েই দুগ্ধপোষ্য শিশু। কনিষ্ঠ পুত্র অপেক্ষা কনিষ্ঠা কন্যার বয়স কিছু বেসী। টলিমি অলিথস্ উইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যা ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রাকে যুগপৎ সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিলেন।

মিশরে এই রীতি চলিত ছিল যে, রাজা, উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন সময়ে, কতিপয় জাতীয় দেবতার যথাবিধি পূজা করিতেন। এদেশে যেমন বিবাহাদি ব্যাপার অগ্নি সাক্ষী করিয়া

সম্পন্ন করা হয়; প্রাচীন মিশরেও সেইরূপ নানা কার্য্যেই দেবতা সাক্ষী করিয়া লওয়ার নিয়ম প্রচলিত ছিল। দেবতা সাক্ষী করিয়া যে কর্ম্ম করা হইত, তাহা রেজেষ্টারী করা দলিল অপেক্ষাও অধিকতর পাকা হইত। কাহারও তাহার অন্যথা করিবার সাধ্য ছিল না। অন্যথা করিলে সমগ্র জাতির প্রাণে আঘাত লাগিত। সমগ্র মিশর তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। অলিথস্ তাঁহার উইল খানিকে, অমোঘ ও অব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে, উইল সম্পাদন ব্যাপারে, দেবতাদিগের যথা-বিধি অর্চ্চনা করিয়া, দেবতাদিগকে সাক্ষী করিয়া রাখিলেন। তিনি রোমের সহিত যে সকল সন্ধি করিয়াছিলেন, সেই সকল সন্ধির কাগজ পত্র 'যাঁচাই' করিয়া যাহাতে সন্ধির সর্ত্ত সকল অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাও করিয়া লইলেন। এই সমস্তের একখণ্ড প্রতিলিপি রাজদূতের যোগে রোমে প্রেরিত হইল। উহা যে পম্পের হস্তগত হইল, তিনি তাহারও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। দলিলের আর একখণ্ড প্রতিলিপি তাঁহার নামাঙ্কিত মোহরযোগে আলেকজেণ্ড্রিয়াতে রাখা হইল। জনসাধারণের মন বা দৃষ্টি ঐ চরমপত্রে সবিশেষ আকৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং উহা যথাস্থানে নিরাপদে সুরক্ষিত হইয়াছিল। মৃত্যু-সময়ে তিনি যাহাতে উক্ত উইলের মর্ম্ম ও তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কর্ম্ম হইতে পারে, তজ্জন্য উত্তরাধিকারিদিগকে বিশেষভাবে বলিয়া গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ক্লিওপেট্রাকে তাঁহার কাছে ডাকিয়া আনিয়া, ইহাও কহিয়াছিলেন,—"মা, তুমি বয়সে সকলের বড়, তুমি আমার শিশু ক'টিকে দেখিও, যাবৎ না উহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তাবৎ তুমি উহাদিগকে যত্নে রক্ষা করিও।"

অলিথসের মৃত্যু হইল। রোমের প্রজাতন্ত্র তখন সমগ্র

পৃথিবী গ্রাস করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত। প্রজাতন্ত্রের শক্তি-সামর্থ্য, বল-বিক্রম ও প্রভাব-প্রতিপত্তি তখন মানবজগতে অদ্বিতীয়। সমগ্র পৃথিবী করায়ত্ত করার চেষ্টাকেও তখন তাহার পক্ষে অসম্ভাব্য দুরাশা বলিয়া, কেহই মনে করে নাই। পৃথিবী জয় করিতে পারিলে, ক্ষুদ্র মিশরের সম্বন্ধে আর কথা কি? তাহা হইলে, মিশর যে প্রজাতন্ত্রের হস্তগত হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রেই যে মিশর রোমের প্রাপ্য, একথা কাহারও কল্পনায় ছিল না।

রোমীয় প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতা এইরূপ দুর্দ্ধর্ষ ও দুরতিক্রম্য হইলেও, তখন রোমের রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছিল; এবং সেই নিবিড়-কৃষ্ণ মেঘরাশি হইতে ক্ষণে ক্ষণে চকিত বিদ্যুৎস্ফুরণ ও দূরশ্রুত ঘনগম্ভীর বজ্রনির্ঘোষে সন্নিহিত প্রলয়-ঝটিকার আভাস প্রদান করিতেছিল। যুদ্ধ বাধে নাই। কিন্তু পৃথ্বী-বিখ্যাত অদ্বিতীয়নামা পুরুষ, রোমের সেই ভীষ্ম-প্রতিম বীর সীজার নব-অভ্যুদিত সূর্য্যের ন্যায় একদিকে প্রতি-ভান্বিত—অন্য দিকে প্রতাপান্বিত পম্পে মধ্যাহ্ণ-মার্ত্তণ্ড-তেজে উদ্ভাসিত। তখন সকলের চক্ষুই এই দুজনের দিকে; সকলের মনই ঐ দুইজনে কেন্দ্রীভূত। সুতরাং, মিশরের ক্ষুদ্র কথায় রোমে কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল না। মিশরে কোনরূপ উপদ্রবের আশঙ্কাও কাহার মনে জাগিল না। দেশপ্রচলিত প্রথা এবং টলিমি অলিথসের অভিপ্রায় ও উইল অনুসারে, ষোড়শী সুন্দরী ক্লিওপেট্রা দশম বর্ষীয় বালক ভ্রাতার সহিত মিশর-সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। আলেকজেণ্ড্রিয়া কোন প্রতিবাদ করিল না। মাসিডনিয়ার দিক হইতেও এবিষয়ে কোনরূপ তর্ক বিতর্ক বা বাদবিতণ্ডা উপস্থিত হইল না। মিশরের সিংহাসন, কিশোরবয়স্ক বালচন্দ্র সদৃশ কমনীয় কান্তি নৃপ-বালক

ও তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী মূর্ত্তিমতী চন্দ্রলেখার ন্যায় ষোড়শী নৃপ-নন্দিনীর মনোমোহন মধুর ছটায় বিলসিত দেখিয়া, সকলেই যেন একবাক্যে ও প্রফুল্ল মনে মস্তক অবনত করিল, ও বাহু তুলিয়া জয় আশীর্ব্বাদে যথোচিত সংবর্দ্ধনা জানাইল।

সূচনায় শুভ সূচিত হইল। কিন্তু এ শুভসূচনার লক্ষণ দীর্ঘ-স্থায়ী হইল না। রাজপরিবারের মধ্যেই গোলযোগের সূত্রপাত ঘটিল।

বালক রাজা ও যুবতী রাণী ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা,—ভ্রাতা ও ভগিনী মিলিয়া কিছুদিন শান্তিতে রাজ্য শাসন করিলেন। বালক রাজার একটি অতিপ্রিয় বাল্যসঙ্গী ছিল। সে রাজা অপেক্ষা বয়সে একটু বড়, স্বভাবতঃ তেজস্বী ও কর্ম্মঠ। তাহার নাম পথিনস্। পথিনস্ খোজা,—পুরাতন রাজাদিগের অন্তঃপুরচারী সেই সর্ব্বত্রপরিচিত হতভাগ্য জীব। পথিনস্ বালক রাজার সহিত, মিশরীয় প্রথা অনুসারে একত্র লালিত পালিত; এবং রাজগৃহে রাজকীয় পদ্ধতি অনুসারেই তাহার শিক্ষা দীক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা হইয়াছিল। সে রাজকুমারের সহিত একত্র অবস্থান ও তাঁহার সহিত খেলা করিত। রাজপুত্র তাহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন, এবং তাহার কথার একান্ত বশবর্ত্তী ছিলেন। সুতরাং বালক রাজার শিক্ষক ও মন্ত্রীদিগের মধ্যে, নৃপ-বালকের বয়োবৃদ্ধি সহকারে, পথিনসের আসন অগ্রগণ্য হইয়া উঠিল।

পথিনসের প্ররোচনায়, বালক রাজা ক্রমশঃই জ্যেষ্ঠা ভগি-নীকে আপনার প্রতাপ ও প্রতিপত্তির পথে গুরুতর অন্তরায় বা কণ্টক মনে করিতে লাগিলেন। ক্রমসঞ্চিত বিদ্বেষ-বিষ অচিরেই বাহিরে ফুটিয়া পড়িল। পথিনসের পরামর্শ ও কৌশলে

করিলেন। আলেক্জেণ্ড্রিয়ার জনসাধারণ রাজার পক্ষ অবলম্বন করিল। ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা রূপের মোহিনীতে আলেক্জেণ্ড্রিয়াকে প্রশান্ত রাখিতে পারিলেন না। খোজা মন্ত্রীর কুহক প্রবলতর হইল। ক্লিওপেট্রা নির্ব্বাসিতার ন্যায় সিরিয়াতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

ক্লিওপেট্রা সিরিয়ায় চলিয়া গেলেও, পথিনস-পরিচালিত তরুণবয়স্ক রাজা নিরুপদ্রব হইতে পারিলেন না। ক্লিওপেট্রা সিরিয়ায় যাইয়া, তপোবনবাসিনী তপস্বিনীর মত, নয়ন-জলে দিবা যামিনীর বুক ভিজাইয়া, তাপস-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রহিবেন, সে শ্রেণীর জীব নহেন। মিশরীয় রাজপুত্রী-গণ রাজাসনে যেমন সিংহ-বিক্রমা, নির্ব্বাসনেও তেমনই সিংহনন্দিনী বা সিংহভামিনীর ন্যায় বিক্রমশালিনী। ইহার উপরে ক্লিওপেট্রার অদ্বিতীয় সম্বল আপনার তরুণ যৌবন ও অতুলন রূপ রাশি। কমল-নয়না ক্লিওপেট্রার নয়ন-জল ও দৃষ্টি-মাধুরীতে, বীর-হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত হইল;—সিরিয়ায় অচিরেই একদল সৈন্য গঠিত হইয়া তাঁহার আজ্ঞায় জীবন বিস-র্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইল। তিনি এই সৈন্যদল সহায় করিয়া আপনার লুপ্ত স্বত্বের পুনরুদ্ধারার্থ পিলুসিয়ামের পথে মিশরে উপস্থিত হইলেন। খৃঃ পূঃ ৪৮ অব্দে এই ঘটনা হয়।

এই সময়, রোমে সীজার ও পম্পের মধ্যে, প্রবল সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। একটা বৃহৎ সাম্রাজ্য লইয়া রোমের এই দুই অদ্বিতীয় দিক্পালের মধ্যে ঘোরতর সংঘর্ষ চলিয়াছিল। সীজারের সহিত এক সম্মুখ সংগ্রামে পম্পে পরাভূত হইলেন। তিনি এই পরাজয়ের পরে সদলবলে, এসিয়ার উপকূলের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু দেখিতে পাইলেন যে, গ্রীকনাগ-রিকগণ যথোচিত আদর অভ্যর্থনার সহিত তাঁহার সংবর্দ্ধনা

করিতেছে না ; বরং তাহারা যেন, বিজয়ী সীজারের আগমন প্রতীক্ষায়ই উৎকণ্ঠিতমনে ও উৎসুক-নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া উদীয়মান সূর্য্যকে নমস্কার করাই মানুষের চির-পরিজ্ঞাত অভ্যাস।

এদিকে কোন প্রত্যাশা নাই বুঝিয়া পম্পে পার্থিয়ার সাহায্য প্রার্থনায় সমুৎসুক হইলেন। কিন্তু সম্পদ-বিপদের সঙ্গী বিশ্বস্ত অনুচর থিওফেনিস্ (Theophanes) ইহাতে একান্তই অমত করিলেন। তিনি বলিলেন, এরূপ বিপন্ন অবস্থায় অমন জীব-নান্তকর মরুময়স্থানে পরিভ্রমণ করিতে সাহসী হওয়া নিতান্তই অপরিণামদর্শী অর্ব্বাচীনের কাজ। সমুদ্রপথে মাত্র তিনটি দিন জাহাজ চালাইলেই মিশরে পহুঁচা যায়। মিশরের রাজা যুবক। তাঁহার পিতা পম্পের একান্ত অনুগত সুহৃদ্ ছিলেন। অমন সেনাবলসম্পন্ন, সিংহাসনারূঢ় সুহৃদ্-পুত্র এত নিকটে থাকিতে অন্যত্র সাহায্যপ্রার্থী হওয়া কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত, বা সমীচীন নহে। পম্পে যেন নিষ্ঠুর নিয়তির বশবর্ত্তী হইয়াই, থিওফেনিসের এই পরামর্শে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় গ্রীক্ উপাদান প্রবল ছিল বলিয়া, তিনি সেদিকে না যাইয়া, পেলুসিয়ামের দিকে যাত্রা করিলেন।

পম্পে যখন সপারিষদ পেলুসিয়ামের উপকূলে আশ্রয়ভিখারী, তখন উহার প্রান্তরে বালক টলিমি ও যুবতী ক্লিওপেট্রার,—ভ্রাতা ও ভগিনীর ব্যূহনিবদ্ধ সেনা, পরস্পরের প্রতি আস্পর্দ্ধা করিয়া, কৃপাণ-করে ভীষণ-মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান! পম্পে বিশ্বস্ত দূত দ্বারা টলিমির শিবিরে তাঁহার আগমন সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তিনি বালক টলিমির কাছে, তদীয় পিতার অভিভাবক ও সুহৃদ্‌রূপে, আজি এই বিপন্ন অবস্থায় আতিথ্য-প্রার্থী হইলেন, এবং এই বিপদে কূল পাইবার নিমিত্ত, কাতর

প্রাণে আশ্রয় ও সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। পম্পের ইঙ্গিতে একদিন শত সহস্র লোক উঠিত বসিত। তাঁহার দৃষ্টিপাতে কৃতার্থ হইবার নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ চক্ষু চাহিয়া থাকিত। কত রাজ রাজড়া তাঁহার কটাক্ষপাতে তরিয়া যাইত। সেই আশ্রয়-পুরুষ, আজি আশ্রিতের বেশে অন্যের কৃপা ভিখারী! মানুষ যখন ক্ষমতাচ্যুত, বিপদাপন্ন,—সুতরাং সাংসারিক হিসাবে দুর্ব্বিহ ভার, তখন বস্তুতঃই সে জগতে একা।

দূত মৈশরীয় শিবিরে উপনীত হইয়া, সেখানে যে সকল রোমান্ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া লইলেন, এবং তাঁহাদিগের যোগে পম্পের আন্তরিক অভিপ্রায় রাজসমীপে যথাযথরূপে বিজ্ঞাপিত করিতে সমর্থ হইলেন। যুবক রাজা পম্পের গৌরব সম্যক্ বুঝিতে সক্ষম ছিলেন কি না, বুঝা যায় না। প্রাচীন মন্ত্রীদিগের কেহই শিবিরে ছিলেন না। পারিষদ ও মন্ত্রিবর্গের মধ্যে তখন এক-মাত্র পথিনস্ই রাজসমীপে উপস্থিত ছিল। তথাপি পম্পের প্রার্থনায় কি উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত রাজ-শিবিরে এক গুপ্ত সমিতি আহূত হইল।

যুবক টলিমি পথিনসের কর-ধৃত পুতুল। পথিনস্ ধূর্ত্ত, চতুর ও স্বার্থপর। সমিতিতে স্থিরীকৃত হইল যে, পম্পেকে আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। পম্পে একদিন, অলিথসের আশ্রয়, অভিভাবক ও বন্ধু ছিলেন, এবং তখন তিনি মিশরের অনেক উপকারও করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এখন তিনি পদচ্যুত ও আপন্ন। এখন আর তাঁহার উপকার করিবার কোন ক্ষমতা নাই; অপকার করিবারও তাঁহার কোন শক্তি আছে, এমত বোধ হয় না। এ অবস্থায় তাঁহার সাহায্য করিতে যাইয়া, ক্ষমতাপন্ন ও শক্তিশালী সীজারের রোষ আকর্ষণ করা কোন

প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে। সীজারের শুধু রোষ অপহার করিলেই চলিবে না, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। সুতরাং গ্রীস, সাহায্যপ্রার্থী পম্পে হইতে কেবল মুখ ফিরাইয়াই নিরস্ত হইয়াছিল,—মিশর ততটুকু মাত্র করিয়াই তৃপ্ত রহিতে পারিল না। মিশর আরও একটু বেসী করিবার নিমিত্ত ভয়ঙ্কর পৈশাচিক বুদ্ধির অনুসরণ করিল। অনেক তর্ক বিতর্কের পর চার্ব্বাক-নীতিদর্শী ভণ্ড থিওডোটস্ (Theodotes) এর নিষ্ঠুর পরামর্শ অনুসারে স্থির হইল যে, মৌখিক সাদর সম্ভাষণদ্বারা পম্পেকে হস্তগত করিয়া লইয়া, গোপনে তাঁহার হত্যার ব্যবস্থা করা হউক। পদভ্রষ্ট পম্পেকে হত্যা করিয়া পদারূঢ় সীজারের চিত্তরঞ্জনই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কর্ম্ম। এ স্বার্থপর খোজা ও নিষ্ঠুর ধূর্ত্তের উপযুক্ত উপদেশই বটে! ইহাই কৃত-উপকারের উপযুক্ত প্রতিদান, সন্দেহ নাই। উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইল না। টলিমির শিবির হইতে আলেক্জেণ্ড্রিয়ার একিলাস্ (Achillas) ও সেপ্টিমিয়াস্ (Septimious) যাইয়া বিশেষ সমাদর ও সংবর্দ্ধনা সহকারে পম্পেকে তীরে অবতরণ করাইল। একিলাস্ ও সেপ্টিমিয়াস্, এক সময়ে, পম্পের অনুগ্রহে তাঁহার অধীন সম্মানার্হ পদে নিযুক্ত ছিল। পম্পে পূর্ব্বপরিচিত ও পূর্ব্বতন অনুগত কর্ম্মচারী একিলাস্ ও সেপ্টিমিয়াসের সহিত সরল মনে ও আশ্বস্তহৃদয়ে টলিমির শিবির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু হায়, পথিমধ্যে ইহারাই হঠাৎ সেই বিশ্বস্তচিত্ত বীরের হৃদয়ে ছুরি বসাইয়া দিয়া রাজকীয় আতিথ্য ও প্রভু-পরিচর্য্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল! পম্পে যার-পর-নাই নির্দ্দয়ভাবে নিহত হইলেন। এইরূপে সীজারের বর্ত্তমান প্রবীণ শত্রু বিলয় প্রাপ্ত হইল।

পম্পের ছিন্নমুণ্ডের শোণিত শুষ্ক হইতে না হইতেই দিগ্-বিজয়ী সীজার তাঁহার স্বভাব-সুলভ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত বহুসংখ্যক পদাতিক, আট শত অশ্বারোহী ও দুইখানি রণতরী সমভিব্যাহারে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যদিগের মধ্যে অনেকে পীড়িত ও আহত ছিল এবং অনেকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছিল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সৈন্যদলের মধ্যে প্রকৃতপ্রস্তাবে মাত্র তিন সহস্র দুই শত লোক কর্ম্মক্ষম। এই মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া মিশর অবতরণে তাঁহার বীর-প্রাণে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বা শঙ্কা হইল না। তিনি জানিতেন, যেস্থানে যে অবস্থায়ই তিনি গমন করুন না কেন, সৈন্যসংখ্যা কমই হউক, আর বেশীই থাকুক, সর্ব্বত্রই তাঁহার বীরকীর্ত্তি, সুনাম ও সুযশ তাঁহার অদ্বিতীয় রক্ষক এবং অব্যর্থ ও অক্ষয় বর্ম্মস্বরূপ হইবে। এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই, বজ্রপুরুষ সীজার নির্ভীকচিত্তে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার বন্দরে প্রবেশ করিলেন।

আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া তাঁহাকে অবনত মস্তকে অভ্যর্থনা করিল। নির্দ্দয় থিওডোটস্ বন্দরের প্রবেশ-পথে, সীজারকে আপ্যায়িত করিবার অভিপ্রায়ে, পম্পের ছিন্নমুণ্ড ও শিরস্ত্রাণ বা শির-ভূষা করে লইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল; এবং সেই ভয়াবহ বিকট রাক্ষসিক উপহার প্রীতির সহিত তাঁহার সম্মুখে রাখিয়াদিল। উদার-প্রকৃতি সীজার পম্পের মুণ্ড দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; এবং তাঁহার হত্যার কাহিনী শুনিয়া তাঁহার বীরহৃদয় ক্রোধে ও ক্ষোভে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি তাঁহার ক্ষীণবল সৈন্যের দিকে তাকাইয়া, নৃশংস হত্যাকারীদিগের প্রতি উপযুক্ত দণ্ড-বিধানে নিরস্ত রহিলেন। বিশেষতঃ, এই হত্যাব্যাপারে রাজমন্ত্রীদিগের অনেকেই লিপ্ত ছিলেন। হঠাৎ এ বিষয়ে তাঁহা

দিলে, যুবক টলিমির পরামর্শদাতাদিগের মধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে, এ দিকেও তাঁহার লক্ষ্য ছিল। অতএব, তিনি দন্তে অধর দংশন করিয়া, নীরবে সেই অনন্ত ক্রোধ চাপিয়া রাখিলেন। হত্যাকারীদিগকে কিছুই বলিলেন না। কিন্তু পম্পের ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণ মিশরে বিড়ম্বিত ও বিধ্বস্ত না হয়, তজ্জন্য যথাশক্তি যত্ন করিয়া হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রদর্শন করিলেন।

সীজার নগরে প্রবেশ করিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, টলিমি কর্তৃক রাজধানী রক্ষার্থ নিয়োজিত সৈন্যদল বিদ্রোহের ভাবে উত্তেজিত। ইহা দেখিয়া তিনি যার-পর-নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সীজারের সশস্ত্র শরীর-রক্ষিগণ তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিল। বিদ্রোহী সৈন্যগণ সীজারের এইরূপ রাজকীয় ভাবে চাল-চলন দেখিয়া, সহসা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা মনে করিল, সীজার রাজা নহেন; তাঁহার পক্ষে এরূপ অনুষ্ঠান, তাহাদের টলিমি রাজার পক্ষে নিতান্তই অপমানসূচক। অতএব তাহারা ভীম-বিক্রমে সীজারকে আক্রমণ করিল। কিন্তু বিশেষ কিছুই করিতে পারিল না। সীজার বল-প্রকাশে ও বুদ্ধি-কৌশলে, ক্ষিপ্ত সৈন্যদলের এই ক্ষিপ্ততা থামাইয়া দিলেন।

এ গোলযোগ সহজেই থামিল বটে, কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল না। নিত্য নূতন গোলযোগের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিল। রাস্তায় গুপ্তহত্যাকারীদিগের দ্বারা প্রতিদিনই সীজারের সৈন্য সকল হত ও আহত হইতে লাগিল। সীজার একটু চিন্তিত হইলেন; এবং এসিয়াতে তিনি যে সকল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে মিশরে লইয়া আসিবার নিমিত্ত

ইত্যবসরে, তিনি মিশরে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, মিশর রাজন্যবর্গের মধ্যে বিবাদের ফল, প্রত্যক্ষ ভাবে না হউক, পরোক্ষভাবেও যখন রোমের জনসাধারণকে ভোগ করিতে হইতেছে, তখন, তিনি সেই রোমীয় জনসাধারণের প্রতিনিধি রূপে মিশরে দণ্ডায়মান থাকিয়া, এবিষয়ে লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ উপেক্ষা প্রদর্শনে অসমর্থ। মিশরের সম্বন্ধেও তিনি অপরিচিত আগন্তুক বা পর নহেন। তিনি পূর্ব্বেও মিশর রাজের সুপরামর্শদাতা বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে পরিচিত ছিলেন,—এখনও তাহাই আছেন। অতএব সীজার স্পষ্টাক্ষরে এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, টলিমি ও ক্লিওপেট্রা স্ব স্ব শিবির হইতে সৈন্য সামন্ত অপসারণ করুন, এবং ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে মিশর-সিংহাসনে ন্যায্য দাবী কাহার, কে উহার প্রকৃত অধিকারী, যুদ্ধের পরিবর্ত্তে, দলিল প্রমাণ যোগে ও উপযুক্ত হেতুবাদ প্রদর্শনে, ন্যায় বিচারে, তাহা নির্ণীত হউক।

সীজারের এই ঘোষণার পরে কোন্ পক্ষ কিরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ডিওকেসিয়াস্ ভিন্ন অন্য সমস্ত ঐতিহাসিকগণই এক বাক্যে বলেন যে, সীজার ক্লিওপেট্রাকে স্বয়ং তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দাবী প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া, তাঁহার সমীপে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। ডিওকেসিয়াস্ বলেন যে, ক্লিওপেট্রা নিজেই যত্নবতী হইয়া সীজারের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সীজার ডাকিয়া ক্লিওপেট্রাকে তাঁহার সমীপে লইয়া গিয়া থাকুন, অথবা ক্লিওপেট্রা স্বয়ং উদ্যোগী হইয়াই যাইয়া

থাকুক, অথবা পৃথিবীই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে যাউক, পরিণাম ফল একই। তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

কুমার-সম্ভব।

তৃতীয় সর্গ।

(১)

এক সঙ্গে, দেবেন্দ্রের সহস্র নয়ন
তাজি দেবদলে দৃষ্টি স্থাপিল মদনে ;—
প্রয়োজন বশে প্রায়(ই) চঞ্চল এমন
প্রভুর আদর আশ্রিত সেবক জনে।

(২)

"বস এইখানে",—কহি সাদরে বাসব,
সিংহাসন-সন্নিধানে স্থান নিরূপিলা ;
স্বামীর এরূপা শিরে ধরি, মনোভব
একান্তে মহেন্দ্রে হেন কহিতে লাগিলা।—

(৩)

"করহ আদেশ, ওহে লোক-জ্ঞাতসার,
ত্রিলোকে তোমার আছে, করণীয় যাহা ;
প্রকাশিলে যে করুণা স্মরণে আমার
নিয়োগ-পালনে চাহি বাড়াইতে তাহা।

(৪)

"স্বর্গ-রাজ্যাকাঙ্ক্ষী কেহ দীর্ঘ তপস্যায়,
জন্মাল কি কহ দেব! অসূয়া তোমার?—

এখনি নিদেশবর্ত্তী করিব তাহার
সন্ধিত-সায়ক এই ধনুর আমার।

(৫)

"জন্ম-মৃত্যু-ভয় হ'তে কিবা কোন জন
লভিয়াছে মুক্তিপথ, তব অনিচ্ছায় ?
চিরবন্ধ হ'য়ে তবে রহুক সে জন
রূপসী-ভ্রূভঙ্গিপটু কটাক্ষ-খেলায়।

(৬)

"শুক্রের শিক্ষায় যদিও সুদৃঢ়মতি,
পীড়িব ধর্ম্মার্থে তবু বল কোন্ অরির,"
পাঠাইয়ে দূতরূপে ভোগ-রাগ-রতি ?
বর্দ্ধিত তরঙ্গে সিন্ধু পীড়ে যথা তীর।

(৭)

"পতিব্রতা-ধর্ম্মে কোন্ দৃঢ়ব্রতা নারী
পশেছে ও চল-চিত্তে চারুকান্তি বশে ?
ইচ্ছা কি সে নিতম্বিনী লজ্জা ভয় ছাড়ি
দোলায় ও কণ্ঠে বাহু সেধে নিজে এসে ?

(৮)

"পদানত তুমি তবু অন্যাসক্তি পাপে,
কে সে কোপনা নারী কৈল তিরস্কার ?
কহ দেব, এই দেখ দৃঢ় অনুতাপে
কিশলয় শয্যাশায়ী করি দেহ তার।

(৯)

"রহ সুপ্রসন্ন ; বজ্র লভুক বিরাম;
সুরারি যে কেহ হ'ক, আমার এশরে,
ব্যর্থ ভুজবীর্য্য তার, ভীত, বলিলাম,
[illegible]

(১০)

"মম পাশে ধনুর্দ্ধর অন্যে কোন্ ছার?
তোমার প্রসাদে, দেব, পিনাকিরো পারি
ধৈরয ভাঙ্গিতে, হয় যদিও আমার
আয়ুধ কুসুম মাত্র, মধু সহকারী।"

(১১)

উরুদেশ হ'তে ধীরে নামায়ে চরণ
পরশনে সম্মানিয়ে পাদপীঠ তল,
সঙ্কল্পিত অর্থে, হেন শকতি বর্ণন,
শুনিয়া কামের, তারে কহে আখণ্ডল।

(১২)

"তোমাতে সম্ভব সখে, জানিহে এসব,
বজ্র আর তুমি,—দু-ই মম প্রহরণ।—
তপোবলে বলীপাশে বজ্র পরাভব।
তুমিহে সর্ব্বত্রগামী সাধক মদন।

(১৩)

"জানি তব সারবত্তা, আত্মনির্বিশেষে,
গুরু কার্য্যোদ্ধারে তাই নিয়োজি তোমায়,—
শরীর বহন কাজে নিয়োজিলা শেষে
ভূ-ধারণ-শক্তি হরি নিরখিয়ে তায়।

(১৪)

"বাখানিয়া বৃষধ্বজে তব বাণগতি,
করিয়াছ আমাদের কার্য্য সিদ্ধপ্রায়;
প্রবল অরাতিকুল যাদের সম্প্রতি
যজ্ঞভুক্ দেবেরো সে এই অভিপ্রায়।

(১৫)

"বিজয় লাভের আশে, এ সুর নিকর,
চাহে ভববীর্য্যজাত সুতে সেনাপতি

তব এক শরপাতে বাধ্য সে শঙ্কর,—
ব্রহ্মমন্ত্রপর ব্রহ্মে নিয়োজিতমতি।

(১৬)

"কর যত্ন হিমাদ্রির সংযতা সুতায়,
জন্মাইতে রুচি তুমি সেই যতাত্মার,
নারীকুল মাঝে; ব্রহ্মা কহিলা সবায়,
হর-তেজ-নিষেকের সে-ই যোগ্যাধার।

(১৭)

"পিতার নিয়োগক্রমে নগেন্দ্র-নন্দিনী
অধিত্যকা মাঝে ভূতনাথে তপঃপর,
করিছে অর্চ্চনা, আমি শুনিনু এ বাণী
অপ্সরার মুখে,—তারা মম গূঢ় চর,

(১৮)

"কর দেবকার্য্য; যাও, এই সাধনায়;
অন্য হেতু সাধ্য, যদিও এ প্রয়োজন,
তবু শ্রেষ্ঠ হেতুরূপে অপেক্ষে তোমায়,
অঙ্কুরণে চাহে বীজ সলিলে যেমন।

(১৯)

"বিজয় উপায়ীভূত দেবের সে হরে,
কৃতী তুমি, সম্ভাবিত তব শরগতি;—
অন্যের অসাধ্য যাহা, পুরুষের তরে,
সামান্য হ'লেও, তাহা যশস্কর অতি।

(২০)

"যাচমান তব পাশে যত দেবগণ,
এ তিন লোকের, কাম, এ কাজ ঈপ্সিত
তব চাপসাধ্য ইহা অনতিহিংসন,
অহো তুমি কি অদ্ভুত পরাক্রমান্বিত!

(২১)

"চির সহচর তব বসন্ত, মদন,
বিনা নিয়োগেও হবে, সে তব সহায় ;—
'অনলের সহকারী হও সমীরণ,'
কেবল সমীরে হেন আদেশ জানায় ?"

(২২)

স্বামী আজ্ঞা কৃপামাল্য সম শিরে ধ'রে,
'তথাস্তু' বলিয়া যাত্রা করিল মদন,
ঐরাবত-তাড়নায় সুকর্কশ করে,
হর্ষে ইন্দ্র করে তার অঙ্গ আমর্ষণ।

(২৩)

প্রিয় সখা মধু আর ভয়ে ভয়ে রতি,
সঙ্গে চলে, তার 'হয় হ'ক' দেহ নাশ
তবু কার্য্যোদ্ধারে কাম অবিচল-মতি
স্থাণুর আশ্রমে যায় হিম-শৈলাবাস।

ক্রমশঃ

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু।

সহযোগী-সাহিত্য।

(পোষ্টকার্ডের কথা।)

এক খানি প্রসিদ্ধ বিলাতী সাময়িক সংবাদ পত্রে জনৈক শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ পুরুষ "পোষ্টকার্ড" সম্বন্ধে বহুতর নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। "ধূমকেতুর" পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য উহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জর্ম্মণীতেই সর্ব্বপ্রথম "পোষ্টকার্ড" প্রস্তুত করিবার কল্পনা

করা হয়। জর্ম্মণীর তদানীন্তন পোষ্টমাষ্টার জেনেরাল্ ডাঃ ভন্ ষ্টিফেন্ ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথম "পোষ্টকার্ড" প্রস্তুত করেন; কিন্তু তৎকৃত "পোষ্টকার্ড" জর্ম্মণীর কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য (rejected) হয়। অতঃপর অষ্ট্রিয়ার ডাকঘর সমূহে উক্ত "পোষ্টকার্ড" প্রচলনের প্রস্তাব হয়, এবং ১৮৬৬ খৃঃ অব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে উক্ত ডাকঘর সমূহে সর্ব্বপ্রথম "পোষ্ট-কার্ড" প্রচলিত হয়। প্রকাশ, তিন মাসের মধ্যে প্রায় তিন-লক্ষ "পোষ্টকার্ড" বিক্রীত হইয়াছিল। তৎপর ১৮৭০ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে জর্ম্মণ সাম্রাজ্যে সর্ব্বপ্রথম "পোষ্টকার্ডের" প্রচলন হয়, এবং উক্ত অব্দের অক্টোবর মাসে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যে "পোষ্টকার্ড" প্রথম প্রচলিত হয়।

উক্ত ১৮৭০ খৃঃ অব্দে সুইজারলেণ্ডেও "পোষ্টকার্ড" প্রচ-লনের প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে বেল্জিয়াম্, হোলেণ্ড, ডেন্মার্ক, সুইডেন্, নরওয়ে এবং কেনাডাতেও "পোষ্ট-কার্ড" প্রচলিত হয়। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে রুষিয়া, ফ্রান্স, ও সিংহলে "পোষ্টকার্ডের" প্রচলন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। অতঃ-পর ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে চিলি, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, সার্ভিয়া, রোমানিয়া ও স্পেনে উহা প্রচলিত হয় এবং ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ইটালীতে প্রথম "পোষ্টকার্ডের" প্রচলন হয়। জাপানে ও গোটামেলাতে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে উহার প্রচলন হয়, এবং গ্রীসে ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে "পোষ্টকার্ড" প্রথম প্রচলিত হয়। উক্ত অব্দে ৬১৩৭০০০০০ খানি "পোষ্টকার্ড" বিক্রীত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। গড় পরতায় হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর হইতে "পোষ্টকার্ড" শতকরা ২৫.৫ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উক্ত বৎসরে অন্যান্য পত্রাদি শতকরা ৭॥০ মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

১৮৭২ খৃঃ অব্দে জর্ম্মণীতে সর্ব্বপ্রথম "রিপ্লাই পোষ্টকার্ডের" প্রচলন হয়। উহার দশবৎসর পর ইংলণ্ডে "রিপ্লাই পোষ্টকার্ড" প্রচলিত হয়। ভারতীয় ডাকঘর সমূহের রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, বৎসরে ২১৮৩৫১৩১৭ খানা "পোষ্টকার্ড" বিক্রীত হয়। রিপোর্টে প্রকাশ যে, "পোষ্টকার্ডের" চিঠিই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

ফটোগ্রাফার পাস্থ সর্ব্বপ্রথম "চিত্র সম্বলিত পোষ্টকার্ডের" প্রচলন করেন। জর্ম্মণীতে প্রতিবৎসর একলক্ষ উক্ত "পোষ্টকার্ড" বিক্রীত হয় বলিয়া প্রকাশ।

(সুইডেনের কথা।)

সম্প্রতি পারিস নগরের কোন সাময়িক পত্রে জনৈকা ফরাসী ভদ্র মহিলা সুইডেন্ দেশের সবিস্তর বিবরণ সম্বলিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত বিবরণ আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিলে, স্বভাবতঃই মনে হয় যে, সুইডেনে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। "ধূমকেতুর" পাঠক পাঠিকাগণের কুতূহল নিবৃত্তির জন্য আমরা উহার সারমর্ম্ম প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইলাম।

যদিও য়ুরোপ খণ্ডে সুইডেন্ দেশটি সুপরিচিত নহে, তথাপি কাল-মাহাত্ম্যে উহা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে। সুইডেনের বিবরণ সম্বলিত উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করিলে, সকলেই একবাক্যে বলিবেন যে, বাস্তবিক য়ুরোপের বড় বড় সাম্রাজ্যও প্রকৃত উন্নতি সম্পর্কে নগণ্য সুইডেনের নিকট নতশির হইতে বাধ্য।

সুইডেনের জমিদারগণ স্ব স্ব আয়ের উপর শতকরা দুই টাকা হারে মাত্র রাজাকে রাজস্ব দিয়া থাকেন। গৃহপালিত

পশুর মধ্যে একমাত্র কুকুরের উপরই কর আছে। জমিদার ব্যতিরেকে অপর কেহই স্বীয় আয়ের উপর কোন টেক্স (Tax) দেয় না। সেখানে আমাদের দেশের ন্যায় "ইন্‌কাম্ টেক্স" (Income Tax) নাই। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির পথে কণ্টকস্বরূপ কোন করও সেখানে প্রচলিত নাই। অধিবাসিগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও শিক্ষার প্রসার-প্রতিপত্তিতে সুইডেনের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বিলাস-ব্যাপারে অর্থের অপব্যয়কে ধনী-সন্তানগণও ঘৃণার চক্ষে দেখেন। সুতরাং দেশের ও দশের উন্নতিকল্পে ধনবানেরা স্ব স্ব আয়ের অধিকাংশই ব্যয় করিয়া কৃতার্থ হন।

সুইডেন্‌বাসীরা মিতব্যয়ী ও মিতাচারী। অপরিমিত মাদক দ্রব্য সেবন তথায় প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। মাদক দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে অতীব কঠোর নিয়ম তথায় প্রচলিত আছে। হতভাগ্য ভারতের মতন সুইডেনে বালকগণের নিকট কেহ তামাক বা চুরুট বিক্রয় করিতে পারে না। তথাকার শাসনকর্ত্তারা অধিবাসীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়া, কখনও স্বীয় পদমর্য্যাদার মূল্য নষ্ট করেন না। সেখানে মামলা মোকদ্দমার সংখ্যাও অতি কম। অধিকাংশ মোকদ্দমাই আদালতে গড়ায় না; "সালিশ" দ্বারাই বিবাদ বিসম্বাদ প্রায়শঃ মিটান হয়। চৌর্য্যাপরাধের কথা আদৌ শুনা যায় না। হত্যা, সতীত্বনাশ প্রভৃতি অপরাধ তথায় অজ্ঞাত বলিলেও হয়।

সুইডেনবাসীরা গো-দুগ্ধ পান করিতেই সমধিক ভালবাসে। অতএব রাজার কঠোর নিয়মানুসারে বাজারে কৃত্রিম বা জলমিশ্রিত দুগ্ধ বিক্রীত হইতে পারে না। প্রত্যহ প্রত্যেক গোশালা চারিবার করিয়া পরিষ্কার করা হয়। বাই বেল গ্রন্থের

স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান স্বত্ব বা অধিকার রহিয়াছে। এজন্য কেহ কেহ সুইডেনকে "Wameu's Paradise"বা "রমণীর স্বর্গ" বলিয়া থাকেন। শ্রীঃ—

পত্রাবলী।*

জীবনের একস্তর মরণের শুভ্র শয্যামাঝে,
তারপর—শবাধারে হায়!
তারপর শ্মশান ভূমিতে; তারপর—কে জানে কোথায়!
—শেলি।

তাম্রবর্ণ, শুষ্ক হ'য়ে লভেছ শয়ন,
শিখায় মোদেরে ইহা—ইহাই মরণ;
শুধুই নিদাঘ-দিবা প্রফুল্ল উজ্জ্বল,
ঝরিতে শরৎ মাঝে নীরবে কেবল!

কোন দিন শাখা'পরে শোভেছ সুন্দর,
বিক্ষিপ্ত রয়েছ এবে ধরণী উপর,
আকাশে বায়ুর স্রোতে ধূলিরাশি মত
তোমরাও ইতস্ততঃ হ'তেছ তাড়িত।

কখনো বা তোমাদের শীতল ছায়ায়
প্রেমিকের কণ্ঠস্বর তুষেছে প্রিয়ায়;
কিন্তু তারা আরবার মিলিবে যখন,
তাহাদের পদতলে রহিবে তখন।

তোমাদের 'পরে ফুল্লা কৌমুদী-কিরণ
ঘুমাত; করিত নিশি করুণ ক্রন্দন,
পরাত উষা তাহার শিশির-রতন,
ছিল যবে তোমাদের প্রথম যৌবন।

---

* Leaves—Derozio.

বিশুষ্ক তোমরা এবে রয়েছ পড়িয়ে
যতদিন সমীরণ নাহি আসে ধেয়ে;
সমীর তুরগ'পরে আরোহিয়া হায়!
তোমরা চলিয়া যাও—কে জানে কোথায়!

ইহাই জীবন—হাসি-অশ্রুজলময়,
আনন্দ, বিষাদরাশি, আশা ও সংশয়;
অদ্য হেথা নব সব, নবীন প্রভায়;
কল্যই যাইবে চলি—কে জানে কোথায়!

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

সুবর্ণগ্রামের হিন্দু রাজন্যবর্গ।

খৃষ্ট জন্মের তৃতীয় শতাব্দী পূর্ব্বে মগধরাজগণ খুব প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ বঙ্গ তখন তাঁহাদেরই অধীনে শাসিত হইত।* এই সময়ে বঙ্গদেশ কতিপয় ছোট বড় রাজ্যে বিভক্ত ছিল; তন্মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, শ্রীহস্ত বা সিলিচটল, § কমলাঙ্ক, † কিরণসুবর্ণ ‡, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতিরই নাম উল্লেখযোগ্য। গৌর বা পাণ্ডুয়া, বগুড়া, দিনাজপুর,

---

* ৩৯৯ খৃঃ অব্দে ও ৬৩৮খৃঃ অব্দে ফাহিয়ান ও হোয়েন্থ-সাঙ্গ নামক চীন পরিব্রাজকদ্বয় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানী কান্যকুব্জ নগরে উপস্থিত হন। তখন উঁহারা হর্ষবর্দ্ধনকে কাম্বোজ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত তাবৎ ভূখণ্ডের অধিপতি পদে অভিষিক্ত দেখেন। মেঘনাদকেও কোন কোন গ্রন্থকার ব্রহ্মপুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব দেখা যায়, তখন সুবর্ণগ্রাম হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যভুক্ত ছিল। প্রঃ লেঃ।

§ শ্রীহট্ট। † কুমিল্লা। ‡ সুবর্ণরেখা।

মালদহ ও রাজসাহী লইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য সংগঠিত ছিল ; সমতট বা রামপাল, চব্বিশপরগণা, যশোহর, সুন্দরবন, বাথরগঞ্জ, ফরিদপুর ও ঢাকা লইয়া সমতট রাজ্য ছিল। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে সুবর্ণগ্রাম সমতট রাজ্যের অধীনে শাসিত হইত।

অতঃপর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণ বঙ্গ ও বিহারের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। রামপালে, মাধবপুরে, কাঠিবাড়ীতে, রঘুরামপুরে ও দিঘলীরছিটু* নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া, তাঁহারা এ অঞ্চলে শাসন সমরক্ষণ করিতেন। এই সময়ে সুবর্ণগ্রাম পালরাজগণেরই অধীনে শাসিত হইত। কিরূপে পালরাজগণের রাজত্বের লোপ হয়, তাহা নির্ণয় করা বড়ই সুকঠিন। সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মে প্রকৃতিপুঞ্জের সমধিক আস্থা স্থাপনই, বোধ হয়, পাল-বংশের রাধত্ব বিলোপের প্রধান কারণ। সেনরাজগণের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই পালরাজগণের রাজত্বের বিলোপ পরি-লক্ষিত হয়। ভাওয়ালের ইতিহাস পাঠেও জানা যায় যে, এক সময়ে সুবর্ণগ্রাম ভাওয়ালের অধীনে শাসিত হইত।

বৌদ্ধরাজগণের আধিপত্য সময়ে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত তাঁহাদের

---

* যে সকল স্থানে পালরাজগণ রাজধানী স্থাপন করিয়া-ছিলেন, তৎসমুদায়ই ঢাকা জিলার অন্তর্ভুক্ত। রঘুরামপুরের একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা এখনও "রাজা হরিশ্চন্দ্রের দীঘি" বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। পালবংশীয় রাজা রামপালের নামানুসারেই বোধ হয় "রামপাল" নাম প্রদত্ত হয়। পরে বল্লালের সময়ে, এই "রামপাল" "বল্লালবাড়ী" নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হয়। দিঘলীরছিটের নিকটবর্ত্তী শৈলাট গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে শিশু-পালের পুষ্পবাটিকা ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। প্রঃ লেঃ।

বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। ইহাতে দক্ষিণাপথের রাজা যথেষ্ট অপমান বোধ করেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার জন্যই দাক্ষিণাত্যরাজ কুলতুঙ্গা বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। *

কুলতুঙ্গার সেনাপতি বিজয়সেন নামক কোন মহাত্মা তৎকর্তৃক গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন; তখন আদিশূর বংশীয়দের সমতটে (রামপালে) রাজধানী ছিল এবং সুবর্ণ-গ্রামও তাঁহাদেরই অধীনে শাসিত হইত। শকাব্দের অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে আদিশূর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন বলিয়া, ইতিহাসে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। আদিশূর পরম শৈব ছিলেন। তিনি সিংহাসনে সমাসীন হইয়া দেখিলেন যে, বৌদ্ধ নৃপতিগণের শাসনে ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ক্রিয়াকলাপে নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং বৈদিকধর্ম্ম ও ক্রিয়াকলাপ পুনঃ প্রতিষ্ঠার মানসেই তিনি কানাকুজ হইতে বেদজ্ঞ পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও যজমান কায়স্থ আনয়ন করেন। §

দক্ষিণাপথনিবাসী গৌড়ের প্রথম সেনরাজ বিজয়সেন, সমতট-রাজ-নন্দিনীর পানিগ্রহণ করেন বলিয়া প্রকাশ। এই কন্যার গর্ভেই মহারাজ বল্লাল সেনের জন্ম হয়। কোন কোন

---

* মিঃ উইলসন্ ও ডাঃ বার্‌নেল চোলরাজ কুলতুঙ্গার বাঙ্গলা-জয়ের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। মিঃ বকননও বলেন, চোলরাজ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ জয় করিয়া, তদীয় আত্মীয় অনুচরগণকে তত্তৎদেশের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করতঃ বৈদিকধর্ম্ম পুনঃ স্থাপন করেন। প্রঃ লেঃ।

§ উক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের যজমান কায়স্থদের বংশধরগণ অধুনা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে "কুলীন" বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রঃ লেঃ।

কুলজী গ্রন্থেও বল্লালকে আদিশূরের দুহিতা-কুলোদ্ভব বলিয়া লিখিত আছে।

মহারাজ বল্লালের জন্ম সম্বন্ধে বিবিধ কিম্বদন্তীও প্রচলিত আছে। মহারাজ বিজয় সেনের দুই মহিষী ছিলেন। কিন্তু মহারাজ কনিষ্ঠা মহিষীতে সমধিক আসক্ত ছিলেন। তদ্ধেতু জ্যেষ্ঠা মহিষী সর্ব্বদা অনুতপ্ত রহিতেন। একদা চৈত্রমাসে লাঙ্গলবন্ধে ব্রহ্মপুত্রবাসে আসিয়া, জ্যেষ্ঠা মহিষী জনৈক তেজস্বী সন্ন্যাসী সন্দর্শন করেন এবং তাঁহার নিকট স্বীয় হতভাগ্যের বিষয় সবিস্তর নিবেদন করেন। রাণীর কাকুতি মিনতিতে সন্ন্যাসী প্রবর তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া, রাণীর হস্তে একটু ঔষধ প্রদান করতঃ বলেন,—"দেখ মা! তুমি দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ইহা মহারাজকে সেবন করাইও।"

অশোকাষ্টমী উপলক্ষে মহারাজ বিজয়সেন তীর্থরাজ ব্রহ্ম-পুত্রে স্নানার্থ আগমন করিলে, রাজমহিষী সন্ন্যাসীর উপদেশানু-সারে দুগ্ধের সহিত ঔষধি মিশ্রিত করেন। কিন্তু ঔষধি মিশ্রণান্তর দুগ্ধ বিবর্ণ হইয়া গেলে, রাণী মনে মনে ভাবিলেন,— "এই দুগ্ধ মহারাজের সম্মুখে ধরিলে আমার জীবন-দণ্ড হইবে, অতএব ইহা ফেলিয়া দেওয়াই উত্তম।" তদ্দণ্ডেই দুগ্ধ ব্রহ্মপুত্র-জলে নিক্ষিপ্ত হইল। সন্ন্যাসীর ঔষধির গুণে ব্রহ্মপুত্র এক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া, রাজমহিষীর নিকট সমুপস্থিত হন। এইরূপে ব্রহ্মপুত্রের ঔরসে ও মহারাজ বিজয়সেনের জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভে মহারাজ বল্লালের জন্ম হয় বলিয়া, এদেশে জনশ্রুতি আছে।

দুর্ভাগ্যবতী বড়রাণীর দুর্ভাগ্য যেন তাঁহার আরও প্রতিকূলে দাঁড়াইল। কারণ, জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, মহারাজ ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বড়রাণী

মহারাজের নিকট গর্ভসঞ্চারের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন বটে ; কিন্তু মহারাজ বিজয়সেন তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া, তদীয় সতীত্বে সন্দিহান হইয়া, তাঁহাকে সেই লাঙ্গলবন্ধের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে নির্ব্বাসন করেন। সেই স্থানটি অদ্যাপিও রাণীজি * নামে অভিহিত হয়। রাজমন্ত্রী গোপনে নির্ব্বাসিতা রাণীর তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। কালক্রমে বল্লাল ভূমিষ্ঠ হইলেন। বনে লালিত পালিত হইয়াছিলেন বলিয়াই ইঁহার "বল্লাল" বা "বন্‌লাল" নামকরণ হয়। বল্লালের অবয়বে রাজলক্ষণ সকল সুস্পষ্ট প্রতিভাত ছিল। বল্লালের শরীরে সপ্তরক্ততা † দেখিয়া মহারাজ বিজয়সেন পুনঃ সপুত্র মহিষীকে সাদরে গ্রহণ করেন।

পৈতৃকসূত্রে গৌড় ও কন্যাকুলোদ্ভব বলিয়া (আদিশূর বংশধরগণের বিলোপ বশতঃ) সমতট (রামপাল) এই উভয় রাজ্যই ১০৬৬ খৃঃ অব্দে যুগপৎ বল্লালের অধীন হয়। রামপাল, গৌড় ও নবদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করিয়া, যথায় ইচ্ছা অবস্থিতি পূর্ব্বক বল্লাল রাজ্যশাসন করিতেন। বল্লাল সেনের রাজত্ব কালেই সমতটরাজ্যের "বিক্রমপুর" নামকরণ হয়। এই সময়ে হইতে সুবর্ণগ্রামও সেনরাজগণের অধীনে শাসিত হইতে থাকে।

সুবর্ণগ্রাম কায়স্থ অধ্যুষিত। আদিশূর যে কায়স্থগণকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন, তাঁহাদের বাসের জন্য যে সকল স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সুবর্ণগ্রামেরও উল্লেখ

---

* জনসাধারণ বল্লালের মাতাকে "রাণীজি" বলিত।

† "পাণিপাদতলে রক্তে নেত্রান্তর নখানি চ।
তালুকাধর জিহ্বাশ্চ প্রশস্তা সপ্তরক্ততা॥"

আছে।* মহারাজ আদিশূরের আনীত কায়স্থ পরিবারের মধ্যে নবগুণ-বিশিষ্ট § অষ্টাবিংশতিজন মাত্র, বল্লাল সেন কর্ত্তৃক কুলীন, মধ্যল্য, মৌলিক বা মহাপাত্র বলিয়া সম্মানিত হন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ সমাজেও কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে যাঁহারা কৌলীন্যাদিরূপ সম্মান লাভে বঞ্চিত হইলেন, তাঁহারা নানাস্থানে চলিয়া গেলেন।

মহারাজ বল্লালসেনের মৃত্যুর পর ১১০৬ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মণ সেন বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব কালে কৌলীন্য প্রথা আরও দৃঢ়ীকৃত হয়। বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের সময়ে বৈদ্যগণও নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন বলিয়া প্রকাশ।‡

বল্লাল-তনয় লক্ষ্মণসেন হইতে অশোকচন্দ্রের রাজত্ব পর্য্যন্ত কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। অতঃপর দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন সিংহাসন আরোহণ করেন। ইনি বড়ই ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন; সুতরাং পূতসলিলা-জাহ্নবী-তীরস্থ নবদ্বীপের রাজধানীতেই বাস করিতেন। চিরদিন কাহারও সমান যায় না। অশীতিপর

---

* ধ্রুবানন্দ কৃত "কায়স্থকারিকা" দ্রষ্টব্য।

§ "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

বল্লালসেন কৃত কুলীন অধ্যুষিত স্থানের সীমা,—পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র (মেঘনাদ), পশ্চিমে বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর, উত্তরে দিনাজপুর ও রঙ্গপুর এবং দক্ষিণে সমুদ্র। প্রঃ লেঃ।

‡ লোকবাহুল্য, রাষ্ট্রবিপ্লব, অন্তর্ব্বিবাদ, দৈবদুর্ব্বিপাক, রাজাজ্ঞা, অরাজকতা, শাসনবৈগুণ্য, কিংবা বিষয়কার্য্যোপলক্ষেই লোক পৈতৃক বা আদিস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। প্রঃ লেঃ।

মহারাজ দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নবদ্বীপ ১২০৩ খৃঃ অব্দে বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়। দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন সপরিবারে পূর্ব্ববঙ্গের সুবর্ণগ্রামে আসিয়া, "কোঙরসুন্দর" নামক স্থানে রাজধানী নির্ম্মাণ করতঃ পূর্ব্ববঙ্গ শাসন করিতে থাকেন।‖

দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন পরম বৈষ্ণব ছিলেন।* তিনি সুষেণ বা সুরসেন নামক এক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। সুষেণ বা সুরসেনের পুত্র দনুজ রায় এক সময়ে সুবর্ণগ্রামের স্বাধীন রাজা ছিলেম। সম্রাট্ বুলবন্ যখন মুঘিসুদ্দিন তুগ্রলের দমনার্থ জাজ নগরে (ত্রিপুরায়) যাইতে ছিলেন, তখন দনুজরায় সম্রাটের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ১২৮২ খৃঃ অব্দে মুঘিসুদ্দিন সুবর্ণগ্রামে অবরুদ্ধ ও নিহত হন।

দনুজ রায়ের পর আরও একজন স্বাধীন হিন্দু রাজা সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনিই সুবর্ণগ্রামের শেষ হিন্দুরাজা ইঁহার নাম দ্বিতীয় বল্লাল ছিল। তিনি কোন কারণে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। † দ্বিতীয় বল্লালের মৃত্যুর পর হইতেই সুবর্ণগ্রামে দিল্লীর আধিপত্য বিস্তার হইতে থাকে। ফিরোজ শার ধাত্রী-পুত্র বাহাদুর শাই প্রথম

‖ এই "কোঙরসুন্দরই" "আইন-আকবরী" গ্রন্থে "কয়ার সুন্দর" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। হিন্দুরাজকুমারগণ সাধরণতঃ "কোঙর" বলিয়া অভিহিত হইতেন; এজন্যই বোধহয় "কোঙর সুন্দর" নামকরণ হইয়াছিল। প্রঃ লেঃ।

* তিনি নবদ্বীপের রাজধানীতে বাস করিতেন; সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্মেই তাঁহার সমধিক আস্থা স্থাপনের কথা। প্রঃ লেঃ।

† অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়াই ইনি এঅঞ্চলে "পোড়ারাজা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রঃ লেঃ।

সুবর্ণগ্রামের তিনটি দুর্গ অবরোধ করিয়া, সুবর্ণগ্রামকে করদ-রাজ্য করেন। অতঃপর ১৩১৮ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় বল্লালের সহিত বাহাদুর শার এক যুদ্ধ হয়। তাহাতেই হিন্দুরাজপরিবার একেবারে লুপ্ত হয়। আনুমানিক ১৩২০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৩২৪ খৃঃ অব্দ মধ্যে সুবর্ণগ্রাম দিল্লীর ছত্রাধীন হইয়া পড়ে।

শ্রীকামিনীকুমার দে রায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচন!

বান্ধব।—শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩১১। অধ্যয়ন-সুখ।—একটি সুলিখিত প্রবন্ধ; কিন্তু সুলিখিত হইলেও ইহাতে একটি বিষয়ে আমাদের মতের অনৈক্য আছে। অধ্যয়নে অতি উচ্চ শ্রেণীর সুখ আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু কর্ম্ম-জীবনে সুফল-প্রসূ অধ্যয়ন-সুখ যে, অন্য-কর্ম্ম-বিহীন,—পৃথিবীর যাবতীয় ক্রন্দনে কিংবা হর্ষে কর্ণপাতশূন্য অধ্যয়ন-সুখ, অথবা নিতান্ত আত্মগত সুখ অপেক্ষা শতগুণে মধুর, প্রবন্ধটিতে এতৎবিষয়ে কিছুই লেখা হয় নাই; বরং স্থানে স্থানে এমন কথা আছে, যাহা ইহার একটু বিশেষ বিরোধী বলিয়াই বোধ হয়; যথা—"গৃহে ভাল একটি বস্তু সংগ্রহের সংস্থান নাই, গৃহিণীর সুকুমার তনুখানি একখানি স্বর্ণাভরণে অলঙ্কৃত করিয়া নয়ন ভরিয়া নিরীক্ষণ করিবার কামনা নাই; এবং সংসারের আমোদ প্রমোদ ও অশেষবিধ উৎসব-হলহলায় কর্ণপাত নাই; আছে শুধুই দেবী বাঙ্‌ময়ীর প্রসাদস্বরূপ পুঞ্জীকৃত গ্রন্থরাশির মধ্যে আপনার পিপাসাকুল প্রাণটা ডুবাইয়া রাখিবার অতৃপ্ত বাসনা।" বলা বাহুল্য, আমরা এতটা উদার ও তন্ময় আত্মসুখ প্রক্রিয়ার অন্ধ সাধনের পক্ষপাতী নহি। যে জীবনের "শুধুই দেবী বাঙ্‌ময়ীর

প্রসাদ স্বরূপ পুঞ্জীকৃত গ্রন্থরাশির মধ্যে আপনার পিপাসাকুল প্রাণটা ডুবাইয়া রাখিবার অতৃপ্ত বাসনা"—পৃথিবীর অন্যান্য কর্ম্মে কর্ণপাত নাই, তাহার পৃথিবীতে বহু উর্দ্ধে স্থিত সম্মানের আসন পাইবার অধিকার আছে কি? যাহাতে "শুধু" আপনার সুখ, শুধু তাহাই কি পৃথ্বী-পূজনীয় ব্যক্তিদের স্পৃহণীয় হইতে পারে? শ্যামল পত্রপল্লবে নিজকে যতই স্নিগ্ধ ও সরস ও নয়ন-প্রীতিকর রাখা হউক না কেন, নিষ্ফলা বৃক্ষের ন্যায় চিরদিনই উহা লোকসমাজে উপেক্ষার বস্তু হইয়া থাকে। আবার অধ্যয়ন-পিপাসু হইয়াও চরিত্র-সম্পদে নিতান্ত হীন, সুতরাং সাধু-সমাজে অপাংক্তেয় এরূপ লোকও সমাজে বিরল নয়। তাহাদের শিক্ষা কুকর্ম্মেরই অধিক পরিমাণে সহায়তা করে, না,—মন্দ প্রবৃত্তিকে দমিত রাখিতে প্রয়াস পায়, তাহা বলা শক্ত। প্রবন্ধটিতে—"পুরীর পথের" কথা এত সুন্দরভাবে বিবৃত থাকিয়াও, "পুরীর রথের" কথা নাই, ইহা বস্তুতঃই পরিতাপের বিষয়। কবিবর আল্‌ফ্রেড্ টেনিস্‌ন তাঁহার "Palace of Art" নামক কবিতায় এই শ্রেণীর কলা-বিদ্যা-পিপাসু জীবনের মানসিক অবস্থা সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। প্রবন্ধটিতে রঘুনাথ, শঙ্কর, হাম্‌বোল্ড ও নিউটন্ প্রভৃতি যে সকল জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, বোধ হয়, তাঁহাদের কর্ম্ম কেবল অধ্যয়ন-সুখে সীমাবদ্ধ থাকিলে, শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধ-লেখক দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহাদের নাম প্রবন্ধটিতে উল্লেখ করিতে কখনই সমর্থ হইতেন না। বোধ হয় "অধ্যয়ন-সুখের" এই দিকটি উল্লিখিত হইলেই প্রবন্ধটি সর্ব্বাংশে উপাদেয় হইত। সঞ্চয়ের পুণ্য যে দানে, এবং জ্ঞানের পুণ্য ও সার্থকতা যে সুকর্ম্মে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

"দার্শনিক" মতের সমন্বয়—৪র্থ প্রস্তাব।—শ্রীকোকিলেশ্বর

ভট্টাচার্য্য। ভট্টাচার্য্য মহাশয় "দর্শন-সমুদ্রে" তাঁহার যে বেড় জাল ফেলিয়াছেন, তাহা এখন ক্রমে টানিয়া ডাঙ্গায় উঠাইবার যোগাড় দেখিতেছেন। মৎস্যগুলি কিন্তু মকর ও তিমি শ্রেণীর। জাল ছিঁড়িয়া কিংবা জালের তল দিয়া না পালাইতে পারিলেই ভাল। তিনি যেরূপ সুবোধ্য প্রণালীতে বিভিন্ন দেশের মনীষী দিগের দার্শনিক মতের ঐক্য ও পার্থক্য দেখাইতেছেন, তাহা প্রশংসনীয়। তাঁহার প্রবন্ধ এখনও শেষ হয় নাই।

ভারত-স্মৃতি,—(কবিতা)।—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী। আজ কালকার অধিকাংশ "ভারত-স্মৃতি"ই কি পদার্থ, তাহা-বোধ হয় পাঠক না পড়িয়াই বুঝিতে পারেন। এই কবিতাটিও সেই একঘেঁয়ে নাকিসুরে কান্নার আর একটি সুর। এখন আমাদের কর্ম্মের যত প্রয়োজন "স্মৃতি"র তত প্রয়োজন নাই। "ভারতস্মৃতি" কবিতায়, কাব্যে, প্রবন্ধে, বক্তৃতার গল-গর্জ্জনে অনেক হইয়াছে,—কিন্তু তদুপযোগি কর্ম্মেরই কিছু বিশেষ অভাব দেখা যায়। কবিতাটিতে মিলের বাহার আছে যথা—

"এই কি সে স্বর্ণ-প্রসূ সোনার ভারত
এ যদি ভারত কোথা সে শোভা তাবৎ"!

ব্রহ্মদেশকাহিনী—(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।—শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত। এ শ্রেণীর কাহিনী সাধারণতঃ যেরূপ হয়, ইহাতে তাহাই হইয়াছে। লেখক মাঝে মাঝে একটু স্থূল রকমের রসিকতার পরিচয়ও দিয়াছেন; যথা—"ইহারাও সুশ্রী ও সুপুরুষ এবং প্রেমকুঞ্জের উপযুক্ত হরবোলা শুকপাখী।" আবার মাঝে মাঝে সমাজের দুর্নীতিপরায়ণতা দেখিয়াই যেন প্রাণে ক্লিষ্ট হইয়া গম্ভীরভাবে শিক্ষকের সুরে বলিয়াছেন,—"কামিনীর কোমল মুখের ন্যায় প্রলোভনীয় ও চিত্তআকর্ষণী বস্তু বোধ হয় জগতে আর নাই; যেস্থানে ইহাদের ছায়াপাত হয় না, সেস্থানে

যেন সকলই ফাঁকা। ফুটন্ত কুসুম বিনা যেমন বাগানের বাহার খুলে না, আজি কালিকার নবীন সভ্যতাও তেমন নবীনা কামিনী ভামিনীর সমাগম বিহনে প্রমোদ-উদ্যানের শোভায় সংবর্দ্ধিত হয় না। প্রেমের ছবি অঙ্কিত করিতে হইলে, অগ্রে কামিনীর ফুটন্ত হাসিমাখা মুখখানি মনে পড়ে। যেদেশে ধর্ম্মের এত কঠোর অনুশাসন ছিল, সেই দেশে আজ মৃত ব্যক্তির সৎকারের সময়েও সেই কামিনী ভামিনী লইয়া আমোদ আহ্লাদ হয়, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মের অধঃপতন ও শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে ?" বলি, সমাজ শিক্ষা লাভ করিবে ত ?

আদর্শ সংস্কারক দয়ানন্দ (৫) শ্রীদেঃ।—সন্ন্যাসীর তদ্গত ভক্ত চেলা দ্বারা সন্ন্যাসীর জীবনী লিখিত হইলে যেমন ভাল হইবারও কথা, তেমন আবার খারাপ হইবারও কথা আছে। তদ্গত ভক্ত চেলা তাহার গুরুজী ব্যতিরেকে পৃথিবীতে আর কোন "আদ্‌মি"ই চোখে দেখেন না, গুরুজীর কোন দোষই তাঁহার চক্ষে পড়ে না। প্রবন্ধ-লেখক দয়ানন্দ-প্রেমে যতই কেন আত্মহারা বা আত্মবিস্মৃত হউন না, পৃথিবীর জনসাধারণ যে প্রকৃতিস্থ আছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় জনসমাজে কিছু বাহির করিতে হইলে, পূর্ব্বেই বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তিনি লিখিয়াছেন,—"বলিতে কি, ভারতের কোন আচার্য্য,—কোন সংস্কারকই,—অথবা কোন হিতৈষীই, দয়ানন্দের মত, সূক্ষ্মভাবে, সমগ্রভাবে ও সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে আমাদিগের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করিয়া যান নাই ; সুতরাং দয়ানন্দ সরস্বতীই যে হিন্দুর আদর্শ-সংস্কারক, তাহাই এখন প্রতিপন্ন হইল।" এ ভারতভূমি ঋষি-পূজিত দেশ, এ পুণ্যভূমিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রচারকের সংখ্যা করা যায় না। এই ভারতভূমির পৃথ্বী-পূজিত জ্ঞান-ধর্ম্মের আলোকপাতে সমস্ত পৃথিবী

একদিন কৃতার্থ হইয়াছিল। এই পুণ্যভূমিতে—এই কোটী কোটী তেজঃপুঞ্জ প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ঋষিদের জন্মভূমিতে,—শঙ্করাচার্য্য চৈতন্য, বুদ্ধ প্রভৃতি অলোক-সাধারণ মহাপুরুষদের এই কর্ম্ম-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, লেখক যে উদ্ধৃত কথাগুলি লিখিতে সাহস পাইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার "দয়ানন্দোন্মত্ততা" রোগের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দয়ানন্দ পূজনীয় ব্যক্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু বাবারও বাবা আছেন। লেখক তাঁহাকে যে আসন দিয়াছেন, তাহার তুলনায় সমালোচনা করিতে গেলে বলিতে হয় "কত মোগল পাঠান হদ্দ গেল ফার্সী পড়েন তাঁতি'। একদেশদর্শিতাই প্রবন্ধটির প্রথম ও প্রধান দোষ, নতুবা ইহা নিতান্ত অনুপাদেয় ছিল না।

মোগলের অধঃপতন।—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত। মন্দ লাগিল না। রামপ্রাণ বাবু এইবার মাসিক পত্রিকার আশ্রয় ছাড়িয়া 'কিতাব' ছাপাইবার চেষ্টা দেখুন।

অভিশাপ।—একাদশ পরিচ্ছেদ।—শ্রীহরিহর শেঠ। এত-দিনে যদি অভিশাপরূপ বাদামের খোসা ভাঙ্গে। কিন্তু ভিতরে যদি পঁচা কিংবা তিক্ত শাঁস বাহির হয়, তাহা হইলেই ত গেলাম;—আমরা নিরাশায় আশা বাঁধিয়া রহিলাম; দেখি, শেষ কি হয়।

কবি-সুক্তি।—উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকের বাঙ্গালায় পদ্যানুবাদ। ইহার সর্ব্বশেষ লাইনটি—'কিন্তু তুষ্ট নাহি হয় দুর্জ্জনের মন'। কবি এতটা উদ্বিগ্ন হইয়াছেন কেন? সয়তানকে বড় পিঁড়ি দিলেই ত সয়তান সুখী হয় বলিয়া জানি—ইহাইত চিরপ্রচলিত কথা।

ভীম।—(কবিতা)—কবিতাটিতে যথেষ্ট উৎকট ভীম-ভাব প্রকটিত হইয়াছে। যথা—আরম্ভেই 'মূর্ত্তিমান্ ক্ষত্রধর্ম্ম, ভীম

রকমের হইয়াছে। বাঙ্গালার জলবায়ুতে ও ক্ষীণ খোরাকিতে এরূপ উৎকট কবিতা দুই একটার বেশী লিখা সঙ্গত না।

সীতা আর শকুন্তলা।—জনকনন্দিনী সীতা আর কণ্ব-দুহিতা শকুন্তলা চরিত্রে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য, অথচ সাদৃশ্য সত্ত্বেও যে সকল বিচিত্র বিসদৃশতা আছে, তাহাই এই প্রবন্ধে অতি বড় বিস্তৃত ও সুন্দর ভাবে সমালোচিত হইয়াছে। আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, পুনঃ প্রচারের পরে, "বান্ধবে" ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রবন্ধ আর পড়ি নাই; এবং দেশীয় অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রেও এই শ্রেণীর প্রবন্ধ কচিৎ দৃষ্ট হয়। ইহাতে যেমনি অতি উচ্চ শ্রেণীর ভাব, তেমনি ভাষা, তেমনি লিখন পারিপাট্য। এইরূপ প্রবন্ধ ভাষার অঙ্গে গ্রথিত থাকিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

ছায়াদর্শন।—এবারের ছায়াদর্শনের কাহিনী অতীব বিস্ময়-জনক।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বোধ হয় ভালই হইতেছে।

বঙ্গদর্শন।—কার্ত্তিক, ১৩১১। সর্ব্বপ্রথমেই সম্পাদকের "নৌকাডুবি" উপন্যাস। একস্থানে দেখিলাম,—"নূতন আঘ্রাণের সকাল বেলার রৌদ্রে...।" কাগজ কলমে "আঘ্রাণ", এই বোধ হয়, প্রথম দেখিলাম। শ্রীযুক্ত দীনেশচরণ সেনের "যাত্রা ও থিয়েটার" একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। একঘেঁয়ে "রামায়ণী কথায়" যাহাদের কান ঝালা-পালা হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা এ প্রবন্ধ পড়িয়া একটু তৃপ্তি লাভ করিবেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "রামায়ণের রচনা কাল" এবারকার বঙ্গদর্শনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। লেখকের অনুসন্ধান নির্ভুল নাও হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, বিলাতী মতের অন্ধ ফেরিওয়ালা বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে তাহা

একটি সময়োপযোগী শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ। বাক্‌সর্ব্বস্ব বাঙ্গালী বাবুর কর্ণে যতীন্দ্রবাবুর কথাগুলি কেমন লাগিবে বলিতে পারি না।

"পূজার পোষাক" একটি ক্ষুদ্র গল্প। নগেন্দ্র বাবুর লেখনীর উপযুক্ত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসুর "হিন্দুদর্শন" সর্ব্বসাধারণের পক্ষে "জাপানী সেলের" ন্যায় ভীতি-প্রদ।

"কেবল কুন্তল মাত্র রয়েছে পড়িয়া"—একটি কবিতা—

"জীবন মরণ তার
মাঝে যেই গুপ্ত দ্বার—
যেন কেহ সেই দ্বারে করে করাঘাত !"

ইহার অর্থ কবি নিজে ভিন্ন বুঝি আর কাহাকেও বুঝিতে দিবেন না। কবিতাটির দুই এক লাইন এইরূপ দুর্ব্বোধ হইলেও কবিতাটি পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি। স্থানে স্থানে কবির অশ্রুসিক্ত হৃদয়ের অমল প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

সাহিত্য।—কার্ত্তিক ১৩১১ "চাঁদরায় ও কেদার" রায় একটি সুখপাঠ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। সম্ভবতঃ ইহার লেখক বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায়। "ইংরাজ বর্জ্জিত ভারতবর্ষ" ভিন্ন মূর্ত্তিতে "সাহিত্য" ও "বঙ্গদর্শনে" দেখা দিয়াছে;—জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর এ রচনাগুলি মন্দ হইতেছে না। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "মৃত্যু-ভয়" নামক গল্পটি নিতান্ত প্রাণহীন বলিয়া বোধ হইল। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কাঠজুড়ি" ও "ভুবনেশ্বর' নামক সনেট দুটি বেস হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের "ভারতচন্দ্রের যুগ' বিবিধ জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ; কিন্তু প্রবন্ধের নাম কি কারণে "ভারতচন্দ্রের যুগ" হইল, এখনও

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের "নিবেদন" একটি কবিতা, যাহাদের চল্লিশ পার হইয়াছে, তাহাদের নিকট ভাল লাগিবে। আমরা "নাম শুনিয়া পাগল হনুরে'" দলের নহি, কাজেই এ কবিতাটির প্রশংসা করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায়ের "ইসলামে বৌদ্ধ প্রভাব" পড়িয়া দেখিলাম, লেখক আজ কালিকার অনেক লেখকের ন্যায় অনর্থক কাগজ কালি খরচ করেন নাই। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া অনেকে উপকৃত হইবেন। "প্রেমের অন্ধতা" লাইলির ভাবানুবাদ। মন্দ হয় নাই। "সহযোগী সাহিত্য" সময়োপযোগী সুখপাঠ্য সঙ্কলন। মাসিক সাহিত্যসমালোচনা বেস চলিতেছে।

প্রদীপ।—আশ্বিন ১৩১১। "তাম্রলিপ্তীতে" কএকটি নূতন তথ্য পাওয়া গেল। লেখার ছাঁচ্ ভাল। "ঘাচ্ এা" একটি চলন-সই খণ্ড কবিতা। আজ কাল কবিতা যেমন হয়, ত্রুটিও তেমন হইয়াছে। "১৪০০ সাল" প্রবন্ধটি মোটের উপর মন্দ হয় নাই। গোস্বামী মহাশয় একটু সংযত ভাবে লেখনী চালাইলে, হয়ত প্রবন্ধের আরও অঙ্গপুষ্টি হইত। "দানব ও দেবী" কবিতাটি মন্দ হয় নাই। কিন্তু একটি স্থানের অর্থ আমাদের বোধগম্য হইল না; আমরা সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিতেছি।—

"ছি! শোভাসিংহ, পাঠানের সখা,
খে'লোনা সতীর হৃদয়-সাত;"

"হৃদয়-সাত" স্থলেরই অর্থ আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইল না। এ কি মুদ্রাকর প্রমাদ, না—ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সৎসাহস? "মুকুট-রায়" প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য হইলেও, নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। পাঠ করিয়া বুঝা গেল যে, লেখকের হাতে উপাদান খুব কমই ছিল। "বিবিধ প্রসঙ্গ" অতিশয় সরস ও সুখ-পাঠ্য হইয়াছে। "পাহাড়ী বাবা" ক্রম-প্রকাশ্য নবন্যাস। "অশোক ও তুন্ত্সন্" প্রবন্ধটি

বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। "কবিতাগুচ্ছের" "প্রভাতে" শীর্ষক কবিতাটি আমাদের নিকট ভাল লাগিয়াছে। "কাব্য-সমালোচনায়" রচনা কৌশল থাকিলেও কবি কবিতার গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছেন। যথা,—

"আমার সৌভাগ্য কথা কি কহিব ভাই!
সপ্তাহে সাপ্তাহে তার একখানা পাই।"

প্রিয়তমার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ কাগজে কলমে না ফলাইলেই ভাল হয়। "কেন?" চলন-সই কবিতা।

পথিক। কার্ত্তিক ১৩১১। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। "প্রতীক্ষায়" শীর্ষক কবিতাটি মোটের উপর মন্দ হয় নাই। "সামান্যাকারে পাশ্চাত্য দর্শনে" পঠন ও দর্শনযোগ্য কিছুই নাই। শুধু রোমন্থন মাত্র। "ইন্দুপ্রভার" প্রথম অংশ আমরা পাঠ করিতে পারি নাই। সুতরাং শেষ অংশ মাত্র পাঠ করিয়া সমালোচনা করা যায় না। "মালঞ্চের" "শ্যামাঙ্গিনী" শীর্ষক কবিতাটি সম্পাদক মহাশয়ের লেখা। এই "শ্যামাঙ্গিনী-কেই" আমরা ইতঃপূর্ব্বে কোন মাসিক পত্রে মুদ্রিত দেখিয়াছি। "শ্যামাঙ্গিনীর" কোন্ গুণে যে, সম্পাদক মহাশয় ইহাকে নিজ পরিচালিত পত্রিকায় পুনঃ মুদ্রিত করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষের "সর্ব্বনাশা ভুল" যে এতদিনে ভাঙ্গিয়াছে, তাহাতে আমরা যথেষ্ট সুখী। লেখক যথার্থই বলিয়াছেন,—

"পাগলের
আবার সেভুল!"—

আমরাও বলিতেছি,—হাঁ, কথাটা ঠিক্ বটে। ভরসা করি, ভবিষ্যতে নবীন কবির আর এমন 'সর্ব্বনাশা ভুল'

লেখিকার এখনও হাত পাকা হয় নাই। 'শনিবারের বারবেলা' একটি চলন-সই গল্প। 'যবন ও মুসলমান জাতি' প্রবন্ধ যতটুক পাঠ করা গেল, তাহাতে বুঝিলাম, লেখকের লিখিবার শক্তি আছে। ইহাতে অনেক নূতন তথ্য আছে।

প্রবাসী।—কার্ত্তিক ১৩১১। 'আওরঙ্গজীবের আদি-লীলা' নিতান্ত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ হইলেও পাঠযোগ্য। 'চিন্তা-সঙ্করণ' একটি গবেষণাপূর্ণ সারগর্ভ প্রবন্ধ; সকলেরই একবার ইহা পাঠ করা উচিত। 'কাজলী পরবে' অনেক নূতন কথা আছে; লেখিকার রচনা-কৌশল মন্দ নহে। 'সাঁওতাল রহস্য' অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। 'কল্যাণী' আখ্যানটি ঐতিহাসিক; পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। 'য়ুরোপ প্রবাসী বাঙ্গালী' সুখ পাঠ্য প্রবন্ধ; প্রবন্ধে অনেক নূতন কথা আছে। জ্ঞানেন্দ্র বাবু এতাদৃশ প্রবন্ধ লিখনে সিদ্ধহস্ত। 'বিজয় নগরের ইতি-বৃত্ত' অতি সুন্দর ও সরস প্রবন্ধ; ইহা পাঠ করিয়া আমরা প্রকৃতই প্রীতিলাভ করিয়াছি। 'কুমারী' ক্রমপ্রকাশ্য নবন্যাস। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিত 'মর্ম্মর প্রস্তরে লক্ষ্মী মূর্ত্তি' প্রবন্ধ প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীরই একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য। নগেন্দ্র বাবুর 'সংগ্রহ' বেস হইয়াছে।

এবারকার—'প্রবাসীতে' কবিতা নাই। ইহা একপ্রকার মন্দ নহে। কারণ, আজি কালি কবিতায় পাঠযোগ্য কিছুই থাকে না। অধুনা কেবল একটানা পঁচা প্রেমের কাহিনীতেই কবিতাগুলি দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে!

নব-বিকাশ।—১৩১১ সন, আশ্বিন ও কার্ত্তিক। "এস মা!"—কবিতা। এই কবিতায় এই যুগ্মসংখ্যক নব-বিকাশের মুখবন্ধ বা বন্দনা। বন্দনা সময়োচিত বটে। ইহাতে শব্দ আছে; ভাবও আছে। ভাবগুলি পুরাতন কালের চলিত ভাবেতা। এইরূপ ভাবেতা

গীতে মার প্রাণ ভিজে কি না, মা-ই তাহা বলিতে পারেন।' "বাসুদেব সার্ব্বভৌম" চলন-সই প্রবন্ধ। ইহা পড়িতে স্থানে স্থানে ভাল লাগিল। "লক্ষ্মী ও সরস্বতী" প্রবন্ধটি সময়-উপযোগী ও সুপাঠ্য। বাঙ্গালায় যাঁহারা বাবু এবং সেই বাবুকুলে যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়াও বিলাস-মদে অন্ধ, এই প্রবন্ধোক্ত বৃহস্পতির বাক্য শুনিয়া যদি তাঁহাদিগের দুই এক জনেরও চোখের কেটারেক্ট বা মতিয়াবিন্দু কাটিয়া যায়, তাহা হইলে লেখকের পরিশ্রম সার্থক হইবে। 'মিনতি', 'মণি' ও 'প্রতারণা' এ তিনটি চুটকি কবিতা। এই শ্রেণীর কবিতায় কি থাকে, নব্য কবিরাই তাহা বলিতে পারেন। কিন্তু এইরূপ "মিনতি," "মণি" ও "প্রতারণা" এক্ষণকার অনেক মাসিক সাহিত্যেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। 'স্বাস্থ্যতত্ত্ব' প্রয়োজনীয় সামগ্রী। দেহ লইয়াযাহার বাস, স্বাস্থ্যতত্ত্বে তাহারই প্রয়োজন।

"প্রাচীন আর্য্যমহিলা-ও রন্ধন' এই প্রবন্ধটি বস্তুতই বড় উপাদেয় হইয়াছে। এই প্রবন্ধের রচয়িত্রী শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী। বঙ্গমহিলা মাত্রেরই এই প্রবন্ধ পাঠ ও আত্ম-জীবনে যথাশক্তি ইহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। এই প্রবন্ধে দেবী শ্যামাসুন্দরী মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী মানকুমারীর লিখিত যে কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কোন কোন নব্যা ভব্যা বাঙ্গালিনী বা বিবিয়ানা বৌর অবিকল ফটো, সন্দেহ নাই।

"আমাদের অভাব ও তন্মোচন উপায়'।—প্রবন্ধটি বেস। কিন্তু শাণিত রসনা ও ঘর্ষিত লেখনীর দেশে, এরূপ ভাবশূন্য শুষ্ক কারবারের হিসাবী কথায় কেহ কান দিতে চাহিবেন কি ?— আর যদি বা কেহ কান দেন, কর্ম্মক্ষেত্রে এই শ্রেণীর উপদেশের সম্মানরক্ষায় তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কি ?

"একটু হাসি" "একটু কাঁদি।"—এদুটিও কবিতা। শিরোনাম দেখিয়াই উহা পড়িলাম। পড়িয়া উদ্দেশ্যে কবিকে বলিলাম;—একটু হাসিতে ইচ্ছা হইয়াছে, আপন মনে আপনি হাসুন,—কাঁদিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, কাঁদিয়া ফেলুন; কিন্তু এমন হাসি কান্নার বিজ্ঞাপন দিয়া পাঠককে জ্বালাতন করিয়া লাভ কি?" কবি কান্নাকে "বিরলের সখী" বলিয়াছেন। বলুন,—জ্যেঠা, খুড়া, বাবা ও মামা প্রভৃতিকে বর্জ্জিত বিধির মধ্যে রাখিয়া, 'আকারান্তা মেইয়া লিঙ্গা'—এই সূত্রের অনুসরণে কান্নাকে 'সখী' বলিতে কবিকুলের অবশ্যই অধিকার আছে। কিন্তু দেখিলাম, এই কান্না আবার স্থানে স্থানে মিলের অনুরোধে 'রোদন' হইয়া গিয়াছেন। রোদন বিরলের সখা, না সখি হইবে, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া অনেক পাঠকই ফাঁপড়ে পড়িবেন।

"মায়া" একটি ক্ষুদ্র গল্প। স্থানে স্থানে সমালোচনার চক্ষে দোষ দৃষ্ট হইলেও, গল্পটি মোটের উপর মন্দ হয় নাই।

'শশ্মান" কবিতাটি বেস হইয়াছে। শব্দ-বিন্যাস অতি সুন্দর। স্থানে স্থানে ভাবুকতা ও কবিত্বও আছে।

"অর্জ্জুনের শোকশান্তি"—এই প্রবন্ধ ক্রমশঃ-প্রকাশ্য। এই ইহার আরম্ভ; সুতরাং ইহাতে আরম্ভের আড়ম্বর মাত্র আছে। বিষয় কেমন দাঁড়ায়, যথাসময়ে তাহা বলা যাইবে। "কৃষ্ণাঙ্গ দ্বীপ"।—এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে, পাঠক আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

"The philanthropic" "ভুবনমোহিনী বীণা"।—প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়াছি। ইহার মূলমন্ত্র—

"যে বিশ্বে তপন জ্বলে"
যে বিশ্বে তারকা থেকে,

সে বিশ্বে কি ঝিকিমিকি
জোনাকীরা জ্বলে না!"

ঈদৃশ গর্ব্বিত বিনয় বা বিনীত গর্ব্ব বড়ই মধুর ও হৃদয়গ্রাহী। "ভুবনমোহিনী বীণার" এই নান্দী বা শিরোণামের ঝঙ্কারটুকু আমাদিগের কাছে ভাল লাগিয়াছে। তাঁহার এই বিনীত গর্ব্ব আগাগোড়া অক্ষুণ্ণ থাকিলে, "ভুবনমোহীনী বীণা," সুধী-সমাজে আদরের বস্তু হইবেন। কিন্তু অনেক অর্ব্বাচীন "জোনাকী" নিবিড় বনের ঘোর অন্ধকারে আপনার ছটায়, সময় সময়, এমনই আত্মহারা হইয়া পড়ে যে, গর্ব্বে ফুলিয়া চাঁদের কলঙ্কে টিট্‌কারী দেয়; এমন কি ভাস্করের অঙ্গেও কৃষ্ণচিহ্ন লক্ষ্য করিতে সাহস পায়। "ভুবনমোহিনী বীণার" এই অবস্থা না ঘটুক, ইহাই আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা ও আশীর্ব্বাদ। "ভুবনমোহিনীর" প্রার্থনা ও নিবেদন শুনিয়া বুঝা যায়, এ "বীণা" ব্রাহ্মসমাজেই বাজিবে। যে সমাজে বাজিতে হয়, বাজুক; গোড়ামির পাশে না ঘেষিয়া, সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে, কোন সমাজের পক্ষেই ইহার গৎ শুনিতে আপত্তি হইবে না। কিন্তু ইহার "ভারতে দুর্গোৎসব" এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সে বিষয়ে মনে সন্দেহ হইতেছে। হিন্দুর দুর্গোৎসব লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিপন্ন"।—এদোষ দুর্গোৎসবের নহে; দোষ দুর্গোৎসব যে জাতির জাতীয় উৎসব, সেই অধঃপতিত জাতির। কিন্তু কালে অধঃপাত না ঘটে, কোন্ ভাল অনুষ্ঠানের? এই কথাটা স্মরণ রাখিয়া প্রবন্ধ লিখিত হইলে, সকলের পক্ষেই ইহা সুখ-পাঠ্য হইত। এই সংখ্যায় ভাষা সম্বন্ধে অনেক গলৎ লক্ষিত হইল। মাত্র প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়াই ভাষাগত দোষগুণ বিচার ন্যায়সঙ্গত নহে। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

নবনূর।—১৩১১, অগ্রহায়ণ মাসের "নবনূর" পাঠ করিলাম। "ক্রুসেড্ বা খৃষ্টান ধর্ম্মযুদ্ধ" সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। "হারুন-আল্-রসিদ" ও "কোরাণ শরীফের ইতিবৃত্ত" সুপাঠ্য প্রবন্ধ। হারুন্-আল্-রসিদের রাজ্য, বোগ্দাদের স্বাধরাজ্য। ইহা পড়িলে, এই মুসলমান সম্রাটের প্রতি ভক্তি হইবে। কোরাণ শরীফের ইতিবৃত্তে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। "রসনাপূজা" প্রবন্ধটিও সুলিখিত। এই প্রবন্ধে রসনার পূজায় স্বাস্থ্যকে বলিদান করা, কিরূপ ভয়াবহ পাতক তাহাই বিশদ অক্ষরে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

"হেমন্তবর্ণন"।—মহাকবি কালিদাস কৃত ঋতুসংহারের অনুবাদ। অনুবাদ মন্দ হয় নাই। কিন্তু ঈদৃশ বস্তুর অনুবাদ পাঠে পাঠকের সাময়িক তুষ্টি হইলেও, কোনরূপ পুষ্টি হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

"ফটোচিত্র"।—এই প্রবন্ধে ফটোগ্রাফের ইতিহাস ও উহার তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ফটোচিত্রে যাহাদের অনুরাগ আছে, তাহাদের কাছে ইহা মন্দ লাগিবে না।

"আমাদের শিক্ষার অন্তরায়।"—খায়রয়েসা খাতুন ইহার রচয়িত্রী। মুসলমান সম্প্রদায়ে স্ত্রীজাতির শিক্ষা বিষয়ে যে সকল অন্তরায় আছে, এই প্রবন্ধে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

"হিন্দু ও মুসলমানের মিলন কি অসম্ভব?"—এ প্রবন্ধটিও সুলিখিত। কিন্তু এই পুরাতন গতের ফাঁকা আওয়াজ এখন আর ভাল লাগে না। হিন্দু ও মুসলমানে মিলন সূত্রানুসারে অসম্ভব নহে, একথা সকলেই জানে,—সকলেই মানে। শুধু জানিলে ও মানিলেই ত আর মিলন, হয় না? কার্য্যতঃ সে অনুষ্ঠান করে কয়জন লোকে? যে দেশে সকলেরই আপ্নাটি কৌপীনটি লইয়া ব্যস্ত থাকাই মজ্জাগত কু-অভ্যাস, যে দেশে

এক সম্প্রদায় বা এক সমাজেরই অঙ্গে অঙ্গে সম্মিলনের সম্ভাবনা নাই, সে দেশে এ উচ্চ ভাবের ধ্রুপদের নাম শুনিয়া কান জুড়াইলেও, সে ধ্রুপদের তানলয়শুদ্ধ সঙ্গত দেখিয়া, প্রাণ জুড়াইবার প্রত্যাশা কম।

"অক্ষম ভিক্ষুক"।—অক্ষম ভিক্ষুক সমাজের একটা মারাত্মক উপসর্গ বটে। কিন্তু প্রবন্ধকার, শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি চক্ষু রাখিয়াই এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। 'কার্য্যক্ষম ভিক্ষুক দলের বৃদ্ধি হওয়ায় চাকর চাকরাণীর অভাব ঘটিতেছে',—এউক্তি মুসলমান সমাজে খাটে। হিন্দু সমাজে ইহা প্রযুজ্য নহে। হিন্দু সমাজেও এখন চাক চাকরাণী দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু ইহা ভিক্ষাবৃত্তির আকর্ষণে নহে,—ইহার আকর্ষণ অন্যবিধ;—প্যায়াদাগিরি, পিয়নি ও মাঝীগিরি ও বাথরখানির ফেরী ইত্যাদি ইত্যাদি।

নবনূরের "কবিতাগুচ্ছে" এমাসে 'শরণে' 'চিন্তা' 'শ্যামাঙ্গিনী' 'সোহাগ' 'ঈশ্বর মহিমা' "লজ্জিতা" এই কএকটি ফুল আছে। এফুলের কএকটি বিলাতী ধরণের, কএকটি দেশী। কোনটিতে গন্ধ আছে;—কোনটিতে নাই; থাকিয়া থাকিলেও, সাধারণ পাঠকের ভোগে তাহা আইসে না। বর্ত্তমান নব্য সাহিত্যের অনেক কবিতাই হিঁয়ালী বিশেষ;—অর্থ অনেক স্থানেই পর্দ্দানিশিন স্ত্রীলোকের মত ঘোমটার উপর ঘোমটা টানিয়া কোন্ কোণে মুখ ঢাকিয়া লুকাইয়া থাকে, খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

"গ্রন্থসমালোচনা" সম্পর্কে কিছু বলিবার নাই।

“উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ।”

ক্লিওপেট্রা ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

চতুরা ক্লিওপেট্রা, রণ-কঠোর বীরপুরুষ সীজারের চারিত্রিক দুর্ব্বলতা,—স্বভাবের রন্ধ্র বা সহজ-ভেদ্য স্থান কোথায়, কি কৌশলে অচিরেই তাহা বুঝিয়া লইলেন। তিনি প্রতিনিধি দ্বারা নিজের কথা ভাল করিয়া বুঝান যায় না, উকীল দ্বারা তাঁহার আপত্তিগুলি বিশদরূপে প্রদর্শিত হইতেছে না, এই হেতুবাদে, স্বয়ং সীজারের নিকট উপস্থিত হইবার নিমিত্ত অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। এই অনুমতি লাভে তাঁহাকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। সীজার আহ্লাদ সহকারে তাঁহার প্রার্থনায় অনুমোদন করিলেন। সীজার অশেষ পৌরুষ-গুণের আধার ও তদানীন্তন পৃথিবীতে দিক্‌পালের ন্যায় অদ্বিতীয় পুরুষরূপে সম্মানিত হইলেও তাঁহার বীর-হৃদয় রমণীরূপের একটু অনুচিত পক্ষপাতী ছিল। সুন্দরীর কুসুমাঞ্জলিস্পর্শে তাঁহার তপোভঙ্গ হইত। কিন্তু তাঁহার তপোভঙ্গে কন্দর্প ভস্মীভূত হইত না, বরং অবস্থা বিশেষে, ভস্মীভূত কন্দর্প সঞ্জীবিত হইয়া উঠিত! ক্লিওপেট্রা যুবতী ও সুন্দরী, সীজার পূর্ব্বেই ইহা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত মনে মনে ঈষৎ একটু লালায়িত ছিলেন। ক্লিওপেট্রা সীজারের এই অরক্ষিত গুপ্তদ্বার দিয়াই তাঁহার দুর্গে প্রবেশ করিবার মনস্থ করিলেন; এবং অবশেষে মুহূর্ত্তেকে সীজারের মনোদুর্গ একবারে জয় করিয়া লইলেন। যথাসময়ে সাক্ষাৎকারের দিন ও সময় অবধারিত হইল।

ক্লিওপেট্রার বয়স বিংশতি বৎসর। ক্লিওপেট্রা এক্ষণ প্রস্ফুট যৌবন-সম্পদে পূর্ণ বিকশিত। তাঁহার লাবণ্য-ঢল-ঢল শরীরে যৌবনের ফুল-বন্যা বা বাসন্ত সুষমা যেন উছলিয়া পড়িতেছিল। রূপসী ক্লিওপেট্রা, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, সীজারের দরবারে, উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্যে, বেশ-বিন্যাসে মনোনিবেশ করিলেন। বেশ-বিন্যাস-নিপুণা পরিচারিকাগণ বেশ-বিন্যাসের বিচিত্র কৌশলে প্রকৃতই তাঁহাকে ভুবনমোহিনী সাজাইয়া তুলিল। অথচ, এই সাজসজ্জার মধ্যে এমনই একটু চতুর-চাতুরি ফলাইয়া লওয়া হইল যে, উহা সর্ব্বাংশে চতুরা ক্লিওপেট্রা নামেরই উপ-যোগী। তাঁহাকে দেখিলেই সীজারের মনে যেন দয়ার উদ্রেক হয়, তিনি যেন স্পষ্ট বুঝিতে পান যে, ক্লিওপেট্রা সিংহাসনারূঢ়া রাণী হইলেও, আশ্রয়হীনা কাঙ্গালিনী। সাজসজ্জায় এই বন্দোবস্ত পূর্ণ মাত্রায় রহিল। তিনি কোন মূল্যবান্ বস্ত্র বা অলঙ্কার পরিধান করিলেন না, স্বল্পমূল্যের সুদৃশ্য বসনে অঙ্গ আবরিয়া লইলেন। সরোবরের পদ্ম ও বনের ফুল আভরণের স্থলবর্ত্তী হইল।

নয়ন-ভঙ্গিতে কিরূপে চপলা-চমক খেলাইলে, বজ্রের মন বিচলিত হয়; অধরে কি ভাবে হাসির জ্যোৎস্না মাখাইলে, যোগীর যোগভঙ্গ ঘটে; ক্লিওপেট্রা, আজি প্রসর মুকুর-সাহায্যে, কুহক-কলার এই অনভ্যস্ত বিদ্যায় পূর্ণ মাত্রায় দীক্ষিত ও অভ্যস্ত হইয়া লইলেন। স্বভাবতঃই তাঁহার কণ্ঠস্বরে অমৃত ক্ষরণ হইত। তাঁহার কথোপকথন-ভঙ্গি ও আলাপ-প্রণালীতে এমনই একটু বিচিত্র মাধুরী ও মোহকর মহিমা ছিল যে, মানুষ যতই কেন, পাষাণ-হৃদয় ও লৌহ-বিগ্রহ হউক না, বার্দ্ধক্যের ছায়াপাতে সে যতই কেন মলিন হইয়া পড়ুক না, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ক্লিওপেট্রা তাহাকে বংশী-মুগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় বশীভূত করিয়া

ফেলিতে পারিতেন। তিনি তাঁহার সেই স্বভাব-মধুর কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতনে, আজ আরও একটু নূতন ভাবের যোজনা করিয়া, করুণ ও প্রীতির নূতন সা-রে-গা-মা একটু ভাল করিয়া সাধিয়া লইলেন। নয়নপ্রান্তে, কোন্ সময়, কি ভাবে অশ্রূদ্গম হইলে, পাষাণের প্রাণ ভিজে, কোন্ সময়ে, হাসির স্ফুরণ হইলে সাহারার বুকে ফুল ফোটে, এবং কোন্ সময়ে হাসি ও কান্নার একত্র সমাবেশ ঘটিলে, বদ্ধ হৃদও উথলিয়া উঠে, তিনি এই সমস্তই তাঁহার উর্ব্বর কল্পনাবলে, যথাযথরূপে ঠিক করিয়া লইয়া প্রস্তুত হইলেন। এইরূপ বিবিধ কৌশলময় সম্মোহন-অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, তিনি নিশ্চিত বুঝিলেন যে, সীজারকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার আত্ম অভীষ্ট সিদ্ধ করাইয়া লইতে, তাঁহাকে তত বেসী কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না।

তিনি রাত্রিকালে গুপ্তভাবে সীজারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। গুপ্তভাবে কেন, বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ, ভ্রাতার মন্ত্রী পথিনসের কোনরূপ চতুর-চালে পাছে তাঁহার যত্ন নিষ্ফল হয়, এই জন্যই এই সাক্ষাৎকার ব্যাপার এত গোপনে সম্পন্ন করিবার মনস্থ করা হইয়াছিল। পথিনসের লোক জন, তাঁহাকে পথে পাইয়া হত্যা করিলেও করিতে পারে, এই আশঙ্কায়, তিনি কোনরূপ প্রকাশ্য যান-বাহনের আশ্রয় না লইয়া, বিশ্বস্ত অনুচর দ্বারা, একটা গালিচার পুঁটলীর মত, বাহিত হইয়া সীজারের প্রাসাদে নীত হইয়াছিলেন। গালিচার পুঁটলী হইতে সহসা মূর্ত্তিমতি রূপময়ীর বিকাশে, না জানি, প্রাসাদে, তখন লোকের চক্ষে কেমন একটা বিচিত্র চমক লাগিয়াছিল। ক্লিওপেট্রার বিশ্বাস ছিল যে, যে মুহূর্ত্তে তিনি সীজারের শরীররক্ষীদিগের সান্নিধ্যে পহুঁচিবেন, সেই মুহূর্ত্তেই নিরাপদ হইবেন। কিন্তু সীজারের প্রাসাদে পদার্পণ করিয়াই তিনি বুঝিতে পাইলেন যে, আপদ

বিপদের আর কথা কি, তিনি এক্ষণে শত সমাদরে সংবর্দ্ধনীয়া ও সর্ব্বপ্রকার আপদ বিপদের বহু উর্দ্ধে অবস্থিতা।

ক্লিওপেট্রার সহিত সীজারের সাক্ষাৎ হইল। সীজার সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে সম্মানার্হ আসনে উপবেশন করাইলেন। প্রথম সম্ভাষণ-সূচক দুই চারিটি কথার পরে বৈষয়িক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। যখন সীজারের সমক্ষে রাজকীয় বিবাদের আলোচনা হইতে লাগিল, তখন ক্লিওপেট্রা অতি ধীরে ও সাবধানে তাঁহার নীরব কুহক-মায়া বিস্তারে এবং তাঁহার সেই হসিত মুখচ্ছবির বিচ্ছুরিত কিরণে সীজারকে এমনই এক মোহিনী শক্তিতে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন, তাঁহার মনপ্রাণের উপরে এমনই একটা আশাতিরিক্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন যে, তিনি প্রার্থিত বৈষয়িক ব্যাপারে জয়লাভ ত করিলেনই, ইহার উপরে আরও কিছু হইল। সিংহ চির জীবনের তরে বাগুরাবদ্ধ হইয়া রহিল। সে প্রেম-বাগুরা বা মোহ-নাগ-পাশ হইতে সীজার বাকি জীবনে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

সীজার, টলিমি অলিথসের 'উইল' অনুসারে বিবাদের নিষ্পত্তি করিলেন। সাইপ্রাসকে মিশরের শাসনাধীন রাখা হইল। কনিষ্ঠ রাজ-সহোদর ও কনিষ্ঠা ভগিনী আরসিনুকে সাইপ্রাস শাসনার্থ পাঠাইয়া দেওয়া স্থিরীকৃত হইয়াগেল। জ্যেষ্ঠা ভগিনী ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা ও জ্যেষ্ঠ রাজকুমার যুগপৎ মিশর সিংহাসনের অধিকারী হইলেন। সীজার, টলিমি অলিথসের নিকট তাঁহার ও তাঁহার পক্ষগণের যাহা প্রাপ্য রহিয়াছে, এই সময়, অন্ততঃ উহার কতেক অংশ পরিশোধ পাইবার নিমিত্ত দৃঢ় বন্দোবস্ত করাইয়া লইলেন।

এই দৃঢ় বন্দোবস্তের ফল এই হইল যে, সীজারের প্রাপ্য পরিশোধের জন্য, মিশররাজকে কিশোরবয়স্ক টলিমির বক্ষস্থলস্থ

রাজচিহ্নাঙ্কিত স্বর্ণপদকটিও বন্ধক দিতে হইয়াছিল। এই ঘটনা, খোজা পথিনসের পক্ষে, সীজারের বিরুদ্ধে লোকের মন উত্তেজিত করিবার পক্ষে একটা বড়ই সুন্দর সুযোগস্বরূপ হইল। ক্লিওপেট্রার ন্যায়, যুবক টলিমিও তখন সীজারের দরবারে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে পথিনস্ স্বর্ণপদক বন্ধক দেওয়ার কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া দিয়া, সীজার অর্থলালসায় কিরূপ নিকৃষ্ট ও নীচপ্রকৃতি, লোকের মনে ঐ ধারণা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত যথাশক্তি যত্ন করিল। রাজার বন্ধুবর্গও পথিনসের উক্তির সমর্থন করিলেন। পথিনস্ তাঁহাদিগের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, মৈশরীয় সৈন্যদিগকে পেলুসিয়াম হইতে উঠাইয়া আনিয়া অবাধে আবার আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াতে সংস্থাপন করিল। একিলাস্ এই সৈন্যদলের অধিনায়ক হইলেন।

পেলুসিয়ামে, ক্লিওপেট্রারও একদল সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ঐসকল সৈন্য কোথায় গেল, উহাদিগের কি অবস্থা ঘটিল, তাহার কোনই উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ইহাতে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ টলিমি সৈন্যের সহিত ক্লিওপেট্রা সৈন্যের পেলুসিয়ামে একটা খণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহাতে ক্লিওপেট্রা পক্ষেরই পরাজয় ঘটিয়াছিল। ক্লিওপেট্রার সমস্ত সৈন্যই বেতনভুক্। সে বেতনেরও, বোধ হয়, প্রচুর বন্দোবস্ত ছিল না। তাদৃশ অর্থমাত্র প্রয়াসী, বিদেশী সেনা পরাজয়ের পরে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে, বিচিত্র নহে। অথবা বিজয়ীদলের পক্ষাবলম্বন করাও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব কথা হইতে পারে না। ক্লিওপেট্রা যখন সীজারের সমীপে, সিংহাসনের উপর আপনার দাবী ও স্বত্বস্বামিত্বের কথা লইয়া বিচার প্রার্থিনী হইয়াছিলেন, তখন তিনি হয়ত, সেনা-বলহীনা ও অর্থসম্বলে পরিক্ষীণা এবং সর্ব্বতোভাবেই বিপন্না হইয়া পড়িয়াছিলেন। পেলুসিয়ামের এই

ব্যাপারে পথিনসের বেস একটু সাহসিকতা ও তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ, পেলুসিয়ামের পর পথিনস্ আলেক্-জেণ্ড্রিয়াতে ফিরিয়া আসিয়াছিল; এবং সে আলেক্জেণ্ড্রিয়ায় চলিয়া আসিবার পরে, ক্লিওপেট্রা আলেক্জেণ্ড্রিয়ায় আসিয়া সীজারের সহিত সাক্ষৎ করিয়াছিলেন।

পথিনস্ কর্ত্তৃক আলেক্জেণ্ড্রিয়াতে সেনা আনীত হইবার পূর্ব্বে, সীজার রাজকীয় পর্ব্বোৎসবের ব্যপদেশে, তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য আলেক্জেণ্ড্রিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই আশায় আগ্রহের সহিত সেই সৈন্যদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি-লেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য আসিল না। আসিল পথিনসের মৈশরীয় সেনা। তিনি পথিনসের এই চতুরতায় একটু বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন, মৈশরীয় সৈন্যদল, কি সংখ্যা, কি সমর-নৈপুণ্য, কোন দিকেই অবহেলার বস্তু নহে। অতএব, তিনি সাবধান হইলেন। বুঝিলেন, নগর-বহির্ভাগে, এই সেনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কোন প্রকারেই জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং, তিনি সত্বরে সৈন্যদল সজ্জিত করিয়া রাজ-প্রাসাদ অধিকার করিয়া লইলেন। উহার প্রবেশ-পথগুলি দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ করা হইল! তিনি ইহার উপরে আরও এই করিলেন যে, একিলাস যাহাতে দ্রুতগতি অগ্রসর হইয়া অসময়ে হানা দিতে সমর্থ না হয়, তজ্জন্য সন্ধির প্রস্তাব সহকারে, রাজদূত পাঠাইয়া দিলেন।

সীজার যাহাদিগকে দূতরূপে প্রেরণ করিলেন, অলিথসের সময়, তাহারা একবার রোমেও রাজদূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিল। সকল দেশে, সকল সময়েই, রাজদূতের একটা বিশেষ সম্মান ও অধিকার আছে। হিন্দুর সমর-ধর্ম্মে রাজদূত সর্ব্বথা রক্ষণীয় ছিল। রাবণ যখন কোপভরে দূতরূপী হনুমানের প্রতি বধ-দণ্ডের

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বিভীষণ, দূতের প্রতি এরূপ ব্যবহার সর্ব্বথা বিধিবিরুদ্ধ, এই কথা বলিয়া, রাবণ হেন রক্ষোরাজকেও তখন, দূতহত্যারূপ পাতক হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। মিশরে এই সময়ে, বোধ হয়, দূত তেমন রক্ষণীয়রূপে পরিগণিত ছিল না। পথিনস্ রাজদূতদ্বয়ের সাক্ষাৎকার মাত্রই, তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সৈন্য দলের প্রতি আদেশ প্রদান করিল। সৈন্যদিগের আক্রমণে দূতদ্বয়ের একজন নিহত হইল, অন্যজন সঙ্গিগণ কর্ত্তৃক মৃতবৎ বাহির হইয়া নগরে প্রত্যানীত হইল। দূতের প্রতি এইরূপ দুর্ব্যবহার দেখিয়া সীজার বুঝিলেন যে, তাহারা প্রকাশ্যভাবেই যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছে। তিনি আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া, যুবক টলিমির পক্ষাবলম্বন করিলেন। যুবক টলিমি তখন আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ তাঁহার দরবারেই উপস্থিত ছিলেন। রক্ষিগণ দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টিত রাখিয়া, যেন সেই দেশীয় রাজার স্বার্থে এবং তাঁহারই ক্ষমতায়, তিনি রণব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, জনসাধারণকে ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

অন্য ঐতিহাসিক ডিও এই ঘটনার আরও একটু বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় এই অবস্থার কারণ, অন্যরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তিনি বলেন, বালক রাজা সীজারের প্রাসাদে আগমন করিয়াই সীজার ও ভগিনী ক্লিওপেট্রাকে একত্র অবস্থিত দেখিয়া, অভিমানে দারুণ আঘাতে প্রাপ্ত হন; এবং ক্রোধে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া, "আমি প্রতারিত হইয়াছি। আমি বিশ্বাসঘাতক কর্ত্তৃক শত্রুহস্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি।"— এই বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সেই স্থান হইতে বেগে বাহির হইয়া আইসেন; এবং মস্তক হইতে মুকুট ছিঁড়িয়া লইয়া ক্রোধভরে মাটীতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন। এই ঘটনায় বিষম

গোলযোগ উপস্থিত হয়। সীজারের কর্মঠ ও চতুর শরীররক্ষিগণ অমনি রাজাকে ঘেরিয়া ফেলে এবং ধরিয়া লইয়া যায়। ইহাতে জনতা অধিকতর বিচলিত হইয়া উঠে; এবং বেগে রাজ-প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই বিদ্রোহী জনতার গতি-রোধ করা যাইতে পারে, সীজারের তথন, তেমন সৈন্যবল ছিল না। বিদ্রোহী দল ইচ্ছা করিলে, তথন অনায়াসেই রাজ-প্রাসাদ অধিকার এবং সীজারকেও অতর্কিত অবস্থায় অক্লেশে বন্দী করিয়া লইতে পারিত। কিন্তু সীজার নামের এমনই একটা অদ্বিতীয় প্রতাপ ও মহিমা ছিল যে, তাহারা ইহা করিতে যেন কোন প্রকারেই সাহস পাইল না। সীজারও সুযোগ পাইয়া ঘটনার গতি আর এক দিকে ফিরাইয়া ফেলিবার জন্য সময়-অনুরূপ ব্যবস্থা করিলেন।

যাঁহারা জনসাধারণের মন যোগাইয়া, জনসাধারণের মতের উপর নির্ভর করিয়া উন্নতির সোপানে আরোহণ করেন; এবং অবশেষে সেই ঝটিকার উপরেই সওয়ার হইয়া সাম্রাজ্যের কর্ণ-ধার-পদে অধিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হন; জনসাধারণরূপ বিগ্রহ কোন্ মন্ত্রের বশ, কোন্ ফুলের কিরূপ পূজায় বা কিরূপ আহু-তিতে এই দেবতার তুষ্টি বা পুষ্টি হয়, তাহা তাঁহাদের নিত্য-অধীত অভ্যস্ত কথা। তাঁহারা সে অভিনয়-চাতুর্য্য ও নট-নৈপুণ্যে স্বভা-বতঃই সিদ্ধহস্ত। অতএব রাজপ্রাসাদ সমীপে ক্রুদ্ধ ও সশস্ত্র জনতার অমন উদ্বেল ও উন্মত্ত কোলাহলে সীজারের নিঃশঙ্ক ও নির্ভীক নয়নে ক্ষণকালের তরেও পলক পড়িল না। তিনি রাজ-প্রাসাদের কোন নিরাপদ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, ক্ষিপ্ত জনতাকে সম্ভাষণ করিয়া, সময়োচিত মন্ত্র প্রয়োগ করিলেন; বলিলেন,—"তোমাদিগের সহিত আমার কোনও বিবাদ নাই।

যাহা চাও, তোমাদিগের যাহাতে ভাল, আমি তাহা সম্পন্ন করিবার নিমিত্তই মিশরে আগমন করিয়াছি।” এইরূপ প্রতিশ্রুতি দ্বারা তিনি তাঁহার অসাধারণ বাগ্‌বিন্যাস-পটুতায় মুহূর্ত্তেকে বিদ্রোহীদিগকে প্রশমিত করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে লোক-বহুলা সভায় উপস্থিত হইয়া, তিনি সর্ব্বজন-সমক্ষে, রাজা ও ক্লিওপেট্রার পিতা পরলোকগত টলিমি অলিথসের ‘উইল’ পাঠ করিলেন। উইলের সর্ত্তানুসারে রাজা ও ক্লিওপেট্রার সিংহাসনে তুল্য অধিকার আছে, ইহা সকলকে বুঝাইয়া দিয়া; মিশরের চিরচলিত প্রথানুসারে রাজা ও ক্লিওপেট্রা,—বালক ভ্রাতা ও যুবতী ভগিনী, পরস্পর দাম্পত্য বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, যুগপৎ রাজত্ব করুন;—এই উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি, ইহাও স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিলেন যে, সিংহাসনের অধিকারী তাঁহারা বটে, কিন্তু রোমান্‌গণ তাঁহাদিগের অভিভাবক থাকিবেন; এবং তিনি রোমান সাম্রাজ্যের ডিক্টেটার (Dictator) রূপে, উইলের সর্ত্তানুসারে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করাইবেন। ইহার পরে, লোকের চিত্তানুরঞ্জন উদ্দেশে, তিনি কনিষ্ঠ রাজপুত্র ও রাজপুত্রী আর্‌সিনুকে সাইপ্রাসের কর্ত্তৃত্বপদ প্রদান করিলেন। সাইপ্রাস্ মিশরের হস্তচ্যুত হইয়াছিল, সীজার তাহা ফিরাইয়া দিয়া, মিশর-সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। জনতা অতঃপর প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। সীজারও একপ্রকার কৃতকার্য্য হইয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

নগর উগ্র মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিল বটে, কিন্তু বাহিরের সেনা-কোলাহল থামিল না। নগর-বহির্ভাগে একিলাসের বিংশতি সহস্র সৈন্য দণ্ডায়মান! ইহাদিগের এক অংশ গেবিনিয়ান জাতীয়। এই অংশই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। একভাগ সিরিয়া, সিলিসিয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের জল ও স্থলদস্যুদিগের দল

হইতে সংগৃহীত। তৃতীয় অংশ ইটালীর কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও নির্ব্বাসীত অপরাধী ও পলাতক ক্রীতদাসগণ কর্ত্তৃক গঠিত। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া অনেক কাল যাবৎ এই শ্রেণীর লোকদিগের প্রধান আশ্রয় স্বরূপ ছিল। এখানে আসিলেই সৈন্যদলভুক্ত হইতে পারিবে, এই আশায় দলে দলে শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইত। কোন ক্রীতদাসের প্রভু আসিয়া দাবী করিলে, সেই ক্রীতদাসকে তাহার সঙ্গীরা সম্মিলিত হইয়া রক্ষা করিত; এবং এইরূপে তাহারা আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় সুখে স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে অবস্থান করিতে পারিত। গেবিনিয়ানেরা রোমীয় শাসন-নীতির সেই সংযত-জীবন ভুলিয়া গিয়া, আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার যথেচ্ছাচারে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অনেকে বিবাহাদি করিয়া আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় সপরিবারে বাস করিতেছিল। এই সৈন্যদলের মধ্যে মিশরের খাটি লোক ছিল কি না, ইতিহাসে তৎসম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

একিলাসের সৈন্যদলভুক্ত এই সকল উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্ধত প্রকৃতির লোকেরাই, কোন রাজমন্ত্রী জনসাধারণের অপ্রীতিভাজন হইলে, তাঁহার সংহার-বাসনায় বল প্রকাশ করিতে উদ্যত হইত। ইহারাই জনসাধারণের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিত; বেতনের হার বাড়াইয়া লইবার নিমিত্ত, অনায়াসে রাজ-প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া বসিত; এবং আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার পুরাতন মাসিডোনীয় দুর্গসংস্থিত সৈনিকদিগের অনুকরণে, যাহাকে ইচ্ছা হইত, তাহাকেই নির্ব্বাসিত করিত ও ইচ্ছা হইলে পুনরায় সেই নির্ব্বাসন হইতে ফিরাইয়া আনিত। ইহাদিগের মধ্যে দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। ইহারাই টলিমি অলিথস্‌কে রাজ-সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহারাই বাইবুলাসের দুই পুত্রকে হত্যা

ও দেশীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া অপরিসীম উপদ্রব ঘটাইয়াছিল। ইহাই এই-ভীষণ সৈন্যদলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

একিলাস্ এই শ্রেণীর আসুর সৈন্যের সাহায্যে সীজারের নগরস্থ বাস-প্রাসাদের চারিদিক ঘেরিয়া ফেলিয়াছিলেন; এবং এইরূপে অবরুদ্ধ স্থানগুলিকে বীর-বিক্রমে বিধ্বস্ত করিয়া, এক-বারে উড়াইয়া দিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হয় নাই।

আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার নিকটবর্ত্তী 'কোল' বা পোতাধিষ্ঠানে সীজারের বায়াত্তর খানি রণপোত সমর-উপকরণে সুসজ্জিত ছিল। একিলাস্ এই রণপোতগুলিকে হস্তগত করিবার নিমিত্ত অশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। সীজার দেখিলেন, রণপোত গুলিকে রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহার তেমন জন-বল বা অস্ত্র-সম্পদ নাই। অথচ এগুলি আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াবাসীর করায়ত্ত হইলে, কি স্থলপথ, কি জলপথ, কোন দিক দিয়াই আর তাঁহার বহির্গমনের পথ থাকিবে না, তাহা হইলে খুব সম্ভবতঃ, তিনি সর্ব্বতোভাবেই পরাজিত ও বন্দীকৃত হইবেন।

সীজার এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আর কি করিবেন; রণপোত-গুলিতে আগুন লাগাইয়া দিয়া নৌ-যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ সহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার অমোঘ আদেশ অচিরেই সাগরের জল জ্বলিয়া উঠিল। প্রলয় অনল শতজিহ্বা মেলিয়া বহু আয়াস ও অর্থব্যয়ে সংগৃহীত রণোপকরণ-সহ রণতরিগুলিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। জাহাজ-খানার নিকটে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার পৃথ্বী-বিখ্যাত পুস্তকা-গার ছিল। এই আগুনে মুহূর্ত্তেকে শতযুগের যত্ন-সঞ্চিত মিশরের জ্ঞান-ভাণ্ডার ভস্মে পরিণত হইয়া গেল!

বিজয়াভিলাষী সীজার আপনার কার্য্যপরতা ও জয়পরাজয়ের

দিকেই চক্ষু রাখিয়া চলিয়াছিলেন ; সুতরাং এই অনিষ্টপাতের কথা ভাবিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে এতদূর মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, সেই মৌনভাব দর্শনে অনেকেই মনে করিয়াছিল, না জানি কি, ঘোরতর বিপদই সংঘটিত হইয়াছে। এই অগ্নিদাহ হইতে যাহা কিছু রক্ষা করা যায়, তাহা যেন রক্ষিত হয়,—তিনি যদি তাঁহার সৈন্যদিগের প্রতি এরূপ আদেশ প্রদান করিতেন, তাহা হইলেও, কথাটা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল, এবং প্রতিকারকল্পে তিনি একটুক কিছু করিয়াছিলেন, এরূপ বলা যাইতে পারিত। কোন ঐতিহাসিকই এই পুস্তকালয় ধ্বংস সম্বন্ধে কোন কথা কহেন নাই। বাগ্মিকুল-চূড়ামণি সিসিরোও এবিষয়ে কোন বাক্যস্ফূর্ত্তি করেন নাই। সেনেকার একটা পংক্তিতে এই দুর্ঘটনার সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

রণপোত ভস্মীভূত হইল। কিন্তু সীজার ইহাতেও নিশ্চিন্ত রহিতে পারিলেন না। প্রাসাদের চতুর্দ্দিক অবরুদ্ধ। অবরোধকারী সেনাদিগেব সহিত প্রত্যহই খণ্ডযুদ্ধ চলিতেছে! ইহাতে তাঁহার বহুতর সৈন্য হতাহত হইয়া পড়িতেছিল। তিনি শত্রুর শক্তিবৃদ্ধির পথে কাঁটা দিবার উদ্দেশ্যে, রোমীয় রণতরির একটা বৃহৎ বহর স্বহস্তে আগুন লাগাইয়া নষ্ট করিলেন, তথাপি অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল না। সেনার অভাব। রসদ যোগাইবার উপায় নাই। বিপদ কম নহে। সীজার অন্যদিকে উপেক্ষা করিয়া কেবল রাজকীয় পোতাধিষ্ঠান বা জাহাজের কোলটি আপনার আয়ত্ত রাখিয়াছিলেন। এই :কোলের সম্মুখভাগে কিয়দ্দূরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল। ঐ দ্বীপের উপরে পরে বাতিঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বীপটির পুরাতন নাম ফেরস্। উহাতে কতগুলি দস্যু বাস করিত। ইহারা সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি করিত। ইহা-

দিগের মধ্যে অতীব পুরাতন রকমের একটা অসভ্যতা বর্ত্তমান ছিল। যে কোন পোত প্রতিকূল-বায়ু-তাড়নে, অথবা কোন প্রতিবন্ধক হেতু, পোতাধিষ্ঠানে পঁহুচিতে না পারিয়া উক্ত দ্বীপের নিকটস্থ পাহাড়ে নঙ্গর করিয়া থাকিত, সে পোতের আর অব্যাহতি ছিল না। এই দ্বীপবাসী অসভ্যগণ উহা আক্রমণ করিয়া লইয়া যাইত। প্রাচীন টলিমিদিগের সময়েও এই উপদ্রব ছিল কি না, সীজার তাহা ঠিক জানিতেন না। যাহা হউক, তিনি এই সময়ে, ঐ দ্বীপটিকে অধিকার করিয়া লইলেন। ইহা দ্বারা সীজারের সৈন্য-সঞ্চয় এবং রসদ-সংগ্রহের পক্ষে এক অভিনব-পথ আবিষ্কৃত হইল।

সর্ব্বকনিষ্ঠা রাজকুমারী আর্‌সিনু ক্লিওপেট্রার তুলনায় একটু হীনপ্রভা হইলেও, পরমা সুন্দরী ছিলেন। যৌবন সমাগমে তিনিও প্রস্ফুট নলিনীর ন্যায়, শোভার আধার হইয়া উঠিলেন। আর্‌সিনু বয়োবৃদ্ধিহেতু ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, সীজার ক্লিওপেট্রাতে অত্যন্ত আসক্ত; এবং তিনি জ্যেষ্ঠা ভগিনী ক্লিওপেট্রার দু'চক্ষের বিষ। ক্লিওপেট্রার ভুবনমোহন রূপ ও মধু-মাখা হাসির অভ্যন্তরে বিদ্বেষের কালকূট বিষ লুকাইত ছিল। তিনি এতদিনে ইহা টের পাইলেন। ইহাও বুঝিলেন যে, সীজারের সদয়দৃষ্টি পাছে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হয়, ক্লিওপেট্রা এই আশঙ্কা ও সন্দেহে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকেন। তিনি বলিয়া কথা কি, যে তাঁহার আশা, আকাঙ্ক্ষা বা প্রেমের পথে প্রতিযোগী, সেই তাঁহার ঘোরতর বিদ্বেষভাজন। জগতে আর কোথাও আর্‌সিনুর আশ্রয় বা অবলম্বন নাই, আর্‌সিনু কাহার মুখের দিকে চাহিবেন?—কে তাঁহাকে আদর করিয়া আবরিয়া রাখিবে? বালিকা বড়ই ভীতা ও শঙ্কিতা হইয়া পড়িলেন। যদিও সীজার তাঁহাকে সাইপ্রাসের রাজ্ঞীপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি

বিশ্বস্তচিত্তে তাঁহাদের কবলে অবস্থিত থাকিতে সাহস পাইলেন না। অতএব তিনি তাঁহার বিশ্বাসভাজন ও প্রতিপালক খোজা চাকরের সাহায্যে গুপ্তভাবে প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিয়া, বিদ্রোহী দলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ক্লিওপেট্রার রূপে মধু, মুখে মধু, কিন্তু অন্তরে শীধুর ভাণ্ডে হলাহল! টলিমিকুলের এই গরল-গর্ত্ত "মাকাল" ফলটিকে ক্রমে অনেকেই চিনিতে পাইয়াছিল। এক্ষণ আর্সিনুও তাহা টের পাইয়াই আপনার পথ আপনি করিয়া লইবার নিমিত্ত নাগিনীর খপ্পর হইতে বহির্গত হইলেন। আর্সিনুর ভিতরে টলিমি বংশের তেজ ও সেই প্রাণ-বল কিঞ্চিৎ পরিমাণে নিহিত ছিল,—তাঁহার এই সাহসিক কর্ম্ম দেখিয়া, অনেকেই ইহা হৃদয়ঙ্গম করিল। কথাটা এখন আর লুকাইবার জিনিষ নহে। এখন আর উহা সতর্ক জিহ্বার মৃদুরবে, অপরিস্ফুট ভাষায় উচ্চারিত হইয়া, লোকের কানে কানে বিচরণ করে না;—প্রকাশ্য স্থলে স্পষ্টকণ্ঠে কথিত ও উচ্চারিত হয় যে, ক্লিওপেট্রা সীজারের উপপত্নী। ক্লিওপেট্রা সীজারের উপপত্নীরূপে দুর্গাভ্যন্তরেই রহিয়া গেলেন। দুটি রাজকুমারও সেইখানে। কিন্তু তাঁহারা এক্ষণ সীজারের নজরবন্দী কএদী। পথিনস্ও সীজার কর্তৃক জনসাধারণী সমিতিতে অলিথসের উইল পঠিত হইবার পর হইতেই, দুর্গাভ্যন্তরে ছিল। কিন্তু সে রাজপ্রাসাদ হইতে গুপ্তভাবে বিদ্রোহীদিগের নিকট চিঠি পত্র লিখিত এবং ভিতরের অনেক গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া ফেলিত। পথিনস্ অবশেষে এই চিঠি-লেখা ব্যাপারে ধরা পড়িয়া, সীজার কর্ত্তৃক মৃত্যুমুখে নিপাতিত হইল।

সীজারের অবস্থা তখনও ঘোর বিপদাপন্ন। একিলাসের বিংশতি সহস্র সৈন্য। তাহার সহিত গেলিমিডগণ সম্মিলিত

হইয়াছে। সীজারের হত্যাসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার উত্তেজিত জনতার একাংশ অন্যদিকে উলঙ্গ কৃপাণ করে ভীষণ মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। শত্রু-ব্যূহের এই বিপুল বাহিনীর গতিরোধার্থ সীজারের সর্ব্বসাকল্যে দুই সহস্র সৈন্যও ছিল কিনা, সন্দেহ। তথাপি তিনি সীজার বলিয়াই যেন তখনও কোন প্রকারে দুর্গরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন।

শত্রুপক্ষীয়গণ দুর্গাভ্যন্তরস্থিত পানীয়জল দূষিত করিবার অভিপ্রায়ে, কৌশলক্রমে সমুদ্রের লবণাক্ত জল উহাতে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল। প্রথমে ইহা কেহই টের পায় নাই। কিন্তু সীজারের সুচতুর সেনানায়কদিগের অনেকে পূর্ব্বেই এবিষয়ে সন্দিহান হইয়াছিলেন। যাহাহউক, দুর্গস্থ পানীয় এইরূপে লবণাক্ত হইলেও, বিশেষ অসুবিধার কারণ ঘটে নাই। অল্প খনন করিলেই ভূগর্ভ হইতে নির্ম্মল জল উত্থিত হইত। সীজারের সৈন্যগণ অসংখ্য কূপ খনন করিয়া, জলের অভাব দূর করিয়া লইয়াছিল।

আলেক্‌জেণ্ড্রীয়গণ ফেরস্ দ্বীপ পুনরায় অধিকার করিয়া লইল। ইহার পরে, তাহারা পশ্চিম দিকের পোতাধিষ্ঠান হইতে সীজারের দগ্ধাবশিষ্ট রণপোত আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল। তাহাদিগের উদ্দেশ্য যে, পোতাধিষ্ঠানে প্রবেশ-পথ অবরোধ করিয়া, তাহারা সীজারের রণতরিগুলিকে বহিঃসমুদ্রে রাখিয়া বিপন্ন করিবে। এই অভিসন্ধিতে তাহারা তাহাদিগের রণ-পোত সহ বহির্গত হইল; এবং প্রাণপণে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু সীজারের পোতাধ্যক্ষ ডমিটিয়াসের গতিরোধ করা,—কিংবা তাঁহাকে পোতাধিষ্ঠানে প্রবেশ করিতে না দেওয়া, সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সাধ্যাতীত হইয়া পড়িল। সীজার তাহাদিগকে পরাভূত করিলেন বটে, কিন্তু তাহারা যখন সমুদ্র-

বক্ষে বিধ্বস্ত হইয়া উপকূলের আশ্রয় গ্রহণ করিল, তখন তাহা-দিগের অনুসরণ করা সীজারের পক্ষেও আবার অসম্ভব হইয়া উঠিল। সীজার ভাবিযুদ্ধে তাঁহার রণ-পোতের পক্ষে এইরূপ অসুবিধা যাহাতে আর না ঘটিতে পারে, তাহার উপায় বিধানার্থ পুনরায় ফেরস্ দ্বীপ বা বাতিঘর অধিকৃত করিলেন।

এই সময়ে সীজারের সাহায্যার্থ জলপথে সৈন্যদল অগ্রসর হইতেছিল। বহর ছাড়া কতকগুলি রণপোত যদিও প্রতারকের কৃত্রিম পতাকার আশ্বাস-চিহ্নে বঞ্চিত হইয়া, শত্রু হস্তে বন্দীকৃত হইয়াছিল, তথাপি জাহাজের প্রধান বহর ক্রমে অপ্রতিহত গতিতে মিশরের সমীপবর্ত্তী হইল। সীজারের অন্যতর নৌ-সেনাপতি প্রসিদ্ধ বীর ইউফ্রেনর, অবরুদ্ধ রণতরির অবরোধ মোচনার্থ আপন রণতরি সহ শত্রুপক্ষের উপর ভীমবেগে আপ-তিত হইলেন। কিন্তু রণতরির বহর, তাঁহার সাহায্যার্থ, যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারিল না। সুতরাং তিনি তাঁহার রণপোত সহ শত্রু কর্তৃক কবলিত ও নিহত হইলেন।

একদিকে সাগর বক্ষে ও উপকূলে রণতরি লইয়া এইরূপ সংঘর্ষ চলিয়াছে, অন্যদিকে সীজারের পরিচিতনামা সুদক্ষ সেনা-নায়ক পার্‌গেমামের মিথ্রেডেইট্‌স্ প্রচুর সৈন্য সামন্ত লইয়া স্থলপথে সীজারের সাহায্যার্থ আগমন করিতেছেন, আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় এই সংবাদ আসিয়া পঁহুছিল। আলেক্-জেণ্ড্রীয় বিপক্ষ পক্ষ, ইহাতে যার-পর-নাই উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা মনে করিল, যদি এসময়ে তাহাদের যুবক রাজা টলিমি, তাহাদের নায়করূপে সৈন্য চালনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, সেনাদল ও জনসাধা-রণের উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইত। তাহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া, সীজারে অবরোধ হইতে টলিমিকে বাহির করিয়া

আনিবার নিমিত্ত, এক নূতন ষড়যন্ত্র উদ্ভাবন করিল। তাহারা বালক-টলিমি সমীপে এই মর্ম্মে সংবাদ প্রেরণ করিল যে, তাহারা আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহে,—তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে সন্ধির জন্যই লালায়িত। টলিমি যদি সন্ধিপত্রের সর্ত্ত অবধারণার্থ স্বয়ং তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হন, তাহা হইলে তাহারা সেই মুহূর্ত্তেই সকল আপত্তি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পদানত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ।

আশা-প্রতিমা।

উষার আলোকে আসি' শিয়রে বসিয়া,
এলোচুলে হাসি-মুখে কাহার প্রতিমা,
কোমল পরশে ধীরে ঘুম ভাঙ্গাইয়া,
সোহাগে সস্নেহে কত দিয়া গেল চুমা ?
হাসিটুকু মেখে দিয়ে নয়নের কোণে,
পরাণে ঢালিয়া স্নিগ্ধ আবেগ-অরুণ,
বলে গেল,—"এসো সাথে পবিত্র পরাণে,
"নিয়া যাব দেব-দেশে ছায়ার মতন।"
প্রভাত গিয়াছে চলি', মধ্যাহ্ন কিরণে
তার সে রূপের জ্যোতি হয়েছে মলিন ;
জনতার কোলাহলে শুনিনা শ্রবণে,
তৃপ্তিহীন কণ্ঠে তার অনন্ত আহ্বান।
অভিমানে চারিদিক করিয়া আঁধার,
আশার প্রতিমা সে যে চলিল আমার !

শ্রীউমেশচন্দ্র চাকলাদার।

কুমার সম্ভব।

তৃতীয় সর্গ।

(২৪)

অবিলম্বে, সে কাননে, সংযমী মুনির
তপঃ সমাধির চির পরিচিত অরি,—
দেখা দিলা ঋতু-রাজ,—মানস-যোনির
গৌরব আস্পদ,—সেই নিজ মূর্ত্তি ধরি'।

(২৫)

সময় লঙ্ঘিয়া দেব দিবাকর যায়,
সম্ভাষিতে উদীচিরে,—কুবের রক্ষিতা;
বহিল মলয়,—দুঃখ-নিশ্বাসের প্রায়,
ক্লিষ্ট আস্যে দক্ষিণার—রবি-বিরহিতা।

(২৬)

নূপুর-ধ্বনিত মৃদু চরণ-তাড়ন,
না অপেক্ষি, সুন্দরীর, সদ্য প্রসরয়,—
স্কন্ধ হ'তে আরম্ভিয়ে অশোকের বন
কুসুম-স্তবক সহ নবকিশলয়।

(২৭)

নবীন পল্লবোদ্গমে চারু-পক্ষ-যুত
গঠিত হইল আম্র-মুকুলের শর
বসন্ত বসা'ল আনি' অলিকুলে যত
সে চূত-সায়কে,—যেন 'কাম'-নামাক্ষর।

(২৮)

চারু বর্ণে সমুজ্জ্বল কর্ণিকার চয়,
করে চিত্ত পরিতপ্ত গন্ধহীন তায়;—
প্রায়শঃ স্রষ্টার ইচ্ছা পরাঙ্মুখী রয়
বিধানিতে একাধারে গুণ-সমবায়।

(২৯)

ফোটেনি, বঙ্কিম তাই বলে চন্দ্র হেন,
লোহিত বরণ ভাতি পলাশ নিচয় ;
বসন্ত-সঙ্গমে সদ্য নখ-ক্ষত যেন
বনস্থলী বক্ষ মাঝে প্রতিভাত হয়।

(৩০)

অঞ্জন-চিত্রের মত লগ্ন অলিগণে
চিত্রিত তিলক ফুলে তিলক রচিয়া,
বাসন্তী সুষমা কম বালার্ক-কিরণে
চুতাঙ্কুর-ওষ্ঠ তার লইল রঞ্জিয়া।

(৩১)

পিয়াল মঞ্জরী হ'তে রেণুকা-স্খলনে
নিপীড়িত দৃষ্টি মদোদ্ধত মৃগ সবে
প্রতিকূল বায়ুমুখে বিহরিছে বনে,—
ঝরে জীর্ণ পত্র যত ঝুর-ঝুর রবে।

(৩২)

কষায়িত কণ্ঠ চুতাঙ্কুর আস্বাদনে
কূজিল মধুর অতি পুংস্কোকিলগণ ;—
সুনিপুণ, মালিনীর মান-নিরসনে,
মদনের বাণী যেন সে কল-কূজন।

(৩৩)

নির্ম্মল প্রস্ফুট ওষ্ঠ, হিম অপচয়ে,
কুঙ্কুম-বর্জ্জন হেতু আপাণ্ডু আনন,
কিম্পুরুষ কামিনীর দেহ চিত্র চয়ে
কণা কণা স্বেদ বিন্দু শোভিল এখন।

(৩৪)

নিরখি' অকাল-প্রাপ্ত বসন্ত-সঞ্চার,
স্থাণু-বনে ব'সে হের তাপস নিকর,

নিরোধি' যতনে অতি মানস-বিকার,
আয়াসে রাখিলা বশে আপন অন্তর।

(৩৫)

বামে রতি সুশোভিনী কুসুম-ধনুকে
গুণ দিয়া দাঁড়াইলে সে বনে মদন ;
পূর্ণোৎকর্ষে প্রেমোচ্ছ্বাস উথলিল বুকে,
প্রকাশে তা, ক্রিয়া-যোগে যত দ্বন্দ্বগণ।

(৩৬)

মধুকর মধুকরী একি ফুলে করে,
মুখা-মুখি মধুপান ; শৃঙ্গে কণ্ডূয়ন
করে মৃগ, প্রেমাবেশে মৃগী-কলেবরে,
মৃগী সে পরশ-সুখে মুদিছে নয়ন।

(৩৭)

করিণী করীন্দ্র-মুখে ঢালে প্রেম-রসে
পঙ্কজ-পরাগ-গন্ধি স্বমুখের জল ;
প্রেয়সীরে চক্রবাক্ আদরে সম্ভাষে,
দিয়ে অর্দ্ধ উপভুক্ত মৃণাল কোমল।

(৩৮)

স্বেদ-জলে অর্দ্ধ-ধৌত ললাট তিলক,
ঢুলু-ঢুলু পুষ্পাসবে মদির নয়ন
নিরখি', প্রিয়ার মুখ কিন্নর যুবক,
সঙ্গীতের মাঝে মাঝে করিছে চুম্বন।

(৩৯)

স্তন হেন স্ফুট, পুষ্প-গুচ্ছ-ভরে নতা,
স্ফুরন্ত প্রবাল-ওষ্ঠে মনোমোহকরী
প্রেমিক পাদপে বাঁধে প্রেমাশ্রিতা লতা,
অবনত শাখারূপ ভুজাবলি ধরি'।

(৪০)

স্বরাঙ্গণা প্রেমগীতি করিলা শ্রবণ,
তবু আত্ম-তত্ত্ব-নিষ্ঠ রহিলা শঙ্কর
সদা আত্ম-বশ যাঁর সংযমিত মন,
বিঘ্ন তার তপোভঙ্গে ব্যর্থ নিরন্তর।

ক্রমশঃ—

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু।

বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমন।

কোন্ সময়ে বঙ্গে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বস-বাস করিতে আরম্ভ করেন, এ প্রবন্ধে উহাই আলোচ্য বিষয়। আর্য্যগণ যখন ব্রহ্মাবর্ত্ত * প্রদেশে থাকিয়া, রাজ্য ও সভ্যতা বিস্তারের জন্য প্রাণপণ করিতেছিলেন, তখন এই বঙ্গদেশ ভয়াবহ বন্য-হিংস্র-জন্তু-সমাকুল নিবিড় অরণ্যানীতে পরিণত ছিল। এমন কি, সে সময় মগধরাজ্যেও আর্য্য-সভ্যতার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ-কণা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং বঙ্গদেশ তখন অসভ্য অনার্য্য-নিবাস বলিয়াই পরিগণিত ছিল। কারণ আর্য্যগণ তখন মগধের যথেষ্ট নিন্দা করিতেন।† তৎকালে "অঙ্গও" অনার্য্যদের বাসভূমি বলিয়া কথিত হইয়াছে।‡ বিশ্বামিত্রের পুত্র পুণ্ড্রগণের আবাসস্থলই "পৌণ্ড্র" নামে অভিহিত হয়; সেই

* সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানই "ব্রহ্মাবর্ত্ত" নামে অভিহিত হইত। প্রঃ লেঃ।

† ঋক্সংহিতা (৩।৫৩।১৪) দ্রষ্টব্য।

‡ অথর্ব্বসংহিতা (৫।২২।১৪) দ্রষ্টব্য।

পুণ্ড্রগণও দস্যু (অনার্য্য) স্বরূপ পরিগণিত ছিলেন। § প্রাচীন অনেক গ্রন্থে বঙ্গও অনার্য্য-নিবাস বলিয়া গণ্য ছিল।¶

ভগবন্ মনু প্রণীত সংহিতা রচনাকালেও বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমন হয় নাই। তখনও অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গাদি স্থানে ব্রাহ্মণ-বাস নিষিদ্ধ ছিল; শুধু তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গেই ব্রাহ্মণগণ উপরোক্ত দেশাদিতে গমনাগমন করিতেন।* রামায়ণ রচনার সময়েই বঙ্গে আর্য্য-সভ্যতার জ্যোতিঃ-কণা ক্রমশঃ প্রবেশ লাভ করে এবং ব্রাহ্মণ-বাসের সূত্রপাত হয়।† চন্দ্রবংশীয় রাজা অমূর্ত্তরজা ধর্ম্মারণ্যের নিকট প্রাক্‌জ্যোতিষপুর (কামরূপ) স্থাপন করেন। প্রাক্‌জ্যোতিষপুর যাইতে হইলে, বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়াই যাইতে হয়; যেহেতু আর্য্য-সভ্যতা ক্রমশঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতেই পূর্ব্বভারতে প্রবর্ত্তিত হয়। মহারাজ অমূর্ত্তরজা প্রাক্‌-জ্যোতিষপুর স্থাপন করিলেন, অথচ মাঝখানে বঙ্গদেশে আর্য্য-উপনিবেশ আদৌ স্থাপিত হইলনা, ইহা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই বোধহয়। যাহা হউক, বঙ্গদেশ নিবিড় অরণ্যপূর্ণ হইলেও, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কোন কোন স্থানে আর্য্য-নিবাস যৎসামান্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মহাভারতের সময় যে বঙ্গদেশ আর্য্যগণের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল, উহার যথেষ্ট প্রমাণই আছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তখন বঙ্গে মহারাজ সমুদ্রসেন রাজত্ব

§ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।১৮) দ্রষ্টব্য।

¶ ঐতরেয় আরণ্যক (২।১।১) দ্রষ্টব্য।

* "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥"—মনুসংহিতা।

† "তথামূর্ত্তরজা বীরশ্চক্রে প্রাক্‌জ্যোতিষং পুরম্।
ধর্ম্মারণ্য সমীপস্থং * * * ॥"—রামায়ণম্।

করিতেছিলেন ; মহাবল ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, বঙ্গরাজ সমুদ্রসেনকে পরাজয় করিয়াছিলেন।* কুরুক্ষেত্রের মহা-যুদ্ধেও বঙ্গের ক্ষত্রিয় বীরগণ যথেষ্ট শৌর্য্য-বীর্য্যপ্রদর্শন করিয়াছিলেন।† অপিচ, তীর্থযাত্রা কালে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্নান করতঃ কলিঙ্গ দেশে বৈতরণী নদীর তীরে সমুপস্থিত হন। যে স্থান মনুসংহিতায় অনার্য্য-নিবাস বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল, পাণ্ডবগণ তথায় "যজ্ঞিয় গিরিশোভিত সতত দ্বিজসেবিত" আর্য্য-নিবাস সন্দর্শন করিয়াছিলেন।‖ মোট কথা, তৎকালে ঋষিগণের যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে বহুতর অনার্য্য-নিবাসও পবিত্র পুণ্য-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

যখন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গে কোন ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান্ বৈদিক আর্য্যগণের বসতি ছিল না,—যখন কেবল অসভ্য ম্লেচ্ছগণের ও বন্য শ্বাপদগণের ভৈরব-নিনাদে এই বিস্তৃত বনভূমি প্রকম্পিত হইত, তখন আর্য্যগণ এতদ্দেশে আগমনে মহা বিপদের আশঙ্কা করিতেন ; কারণ এই প্রদেশে আসিলে, আর্য্য-ধর্ম্মের বিঘ্ন ঘটিবারই সমধিক সম্ভাবনা ছিল। এজন্যই বোধহয় ভগবন্ মনু এই প্রদেশ অনার্য্য-নিবাস বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু মনুর সময়েও তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে এই প্রদেশে যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল না।

মনুর বহুকাল পরে আর্য্যগণ প্রবল পরাক্রমে এতদ্দেশের

---

* "সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥"—মহাভারতম্।

† "ক্ষত্রিয় কাণ্ডের" প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

‖ "এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্॥" —মহাভারতম্।

অনার্য্যগণকে পরাজিত ও বিতারিত করতঃ অরণ্যাদি কাটাইয়া, নূতন নূতন নগর ও রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রভূত পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিতে লাগিলেন। আর্য্য হিন্দুরাজ্য ব্রাহ্মণ শূন্য হইলে চলিত না; ধর্ম্ম-প্রাণ আর্য্যগণ এই প্রদেশে আসিয়া, জাতীয় ধর্ম্ম-কর্ম্ম ভুলিয়া, ম্লেচ্ছাচার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। পুরাকালে ক্ষত্রিয় রাজগণের ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন ক্রিয়াই সম্পাদিত হইত না। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণেরও ক্ষত্রিয় না হইলে চলিত না।* সুতরাং মহাভারতের সময় যে বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল, তাহা আমরা নিঃসন্দেহরূপে স্বীকার করিয়া লইতে পারি। বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া, কলিঙ্গে প্রবেশ করিতে হইত। অপর কোন রাস্তা দিয়া কলিঙ্গে যাইবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। মহারাজ রঘু বঙ্গ অতিক্রম করিয়াই কলিঙ্গে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন।† পুরাকালে কলিঙ্গ রাজ্য বর্ত্তমান মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন বঙ্গে মহারাজ বাসুদেব রাজত্ব করিতে ছিলেন; তাঁহার রাজ্যে কলিঙ্গের পুর্ব্বেই ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখন দেখা যাইতেছে, বহু প্রাচীন পৌরাণিক যুগ হইতেই বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল। কুরু-পাণ্ডবগণের সময়ে এ প্রদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা বড়ই সুকঠিন। বৈদিকযুগে সারস্বত ব্রাহ্মণগণেরই সবিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহারাই প্রথম কোশল, তৎপর বিদেহ বা মিথিলাদেশে উপনিবেশ

* "মনুসংহিতা" (৯।৩।২২) দ্রষ্টব্য।

† "স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদসেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিত পথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ॥"—রঘুবংশম্।

স্থাপন করেন। দেব বৈশ্বানর সদানীরা নদীর পরপাড় দগ্ধ করেন নাই বলিয়া, পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ উক্ত নদীর পরপাড়ে যাইতেন না। অধুনা বহুতর ব্রাহ্মণ সে স্থানে অবস্থান করিতেছেন; যেহেতু ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করায় উহা ব্রাহ্মণ-বাস-যোগ্য হইয়াছে।*

শ্রীকামিনীকুমার দে রায়।

কল্পনার উৎসব

১

কে তুই ছবির মত,
আয় ফিরে আয়;
স্বপনের মেঘ হ'তে
নেমে আয় আঁখি-পাতে,
মিছা শূন্যে ছায়া-বাজি,—
প্রাণে নেমে আয়!

২

আজি যে চাহিছে প্রাণ
স্নেহ, সুধা, সুখ;—
প্রকৃতি নিস্পন্দ সমা,
অশ্রুমুখী প্রিয়তমা,
অবশ প্রাণের শিরা,—
ব্যথা-ভরা বুক!

৩

আয় তুই উন্মাদিনী
কবির কল্পনা;—

---

* "শতপথ ব্রাহ্মণ"—(১।৪।১।১০—১৭) দ্রষ্টব্য।

সজল কাতর হিয়া,
শিহরিয়া, ঝলসিয়া,
ছু'টে আর প্রাণ-পথে
তাড়িতের কণা !

৪

সহেনা এ ধারা-মগ্ন-ধরা,
ছায়া-নম্র প্রাণ ;
অনল-চুম্বন-ভরা,
চাহি অনলের সুরা,
মদির ভ্রান্তির মাঝে
নিদ্রা—অবসান !

৫

হাসাও কল্পনে ! আজি
প্রিয়ারে আমার ;
সে মম বিষণ্ণ-শোভা,
সায়াহ্নের স্বর্ণ-প্রভা,
মুছ তার আঁখি,—আজ
উৎসব অপার !

৬

ছু'টেছে অমিয়-গঙ্গা,
প্রেমে কুল-কুল ;—
মাঝে রাণী—হাসি রাশি,—
বাসন্তী চাঁদনী নিশি,—
কল্পনার সুরা-সার,—
জীবনের ভুল !

কুমার সুরেশচন্দ্র সিংহ, বি, এ।

সহযোগী সাহিত্য।

(তাম্রের গুণাগুণ)।

সম্প্রতি "সেঞ্চুরী মেগেজিন্" নামক সংবাদ পত্রে তাম্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। সুতরাং "ধূমকেতুর" পাঠকপাঠিকাগণের মনোরঞ্জনার্থ আমরা উহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে দিতে প্রয়াস পাইলাম। প্রবন্ধকার মিঃ জি, এইচ্, গ্রস্ভেনর মহোদয় বলেন,—"আমাদের বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ পূর্ব্বপুরুষগণ তাম্র-নির্ম্মিত পাত্রাদিই প্রায়শঃ ব্যবহার করিতেন; আমাদের ন্যায় "ইনামেল্ড" পাত্রাদি আদৌ ব্যবহার করিতেন না। যদিও কোন কোন গুণধর তজ্জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে "অসভ্য" বা "বর্ব্বর" অভিধানে অভিহিত করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করেন না, তথাপি আমি স্পর্দ্ধার সহিত বলিতেছি, তাঁহারা যাদৃশ অভিজ্ঞও বিচক্ষণ ছিলেন, আমরা ততটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি নাই। যদিও আধুনিক "মাকাল"-সভ্যতার খাতিরে আমরা নিত্য নূতন পাত্রাদি ক্রয় ও ব্যবহার করিয়া, 'অসভ্য' বা 'বর্ব্বর' আখ্যার অপনোদন করিবার চেষ্টা পাইতেছি, তথাপি মূলে আমরা "বর্ব্বর" বই কিছুই নহি। কারণ তাম্র-নির্ম্মিত পাত্রাদির কি গুণ, তাহা আমরা আদৌ অবগত নহি; তদ্ধেতুই পূর্ব্বপুরুষগণকে নিরর্থক গালি-গালাজ করিয়া, স্বীয় অর্ব্বাচীনতার ও নীচতার পরিচয় দিয়া থাকি। আমি দৃঢ়তার সহিত পরীক্ষা করিয়া, তাম্রের যে যে গুণের পরিচয় পাইয়াছি, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে, বাস্তবিকই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের স্বর্গীয় নামে অশেষ ধন্যবাদ দিতে হয়, এবং তাঁহাদের অভিজ্ঞতার

মিঃ গ্রস্‌ভেনর বলেন,—তাম্র বিবিধ রোগের বিষাক্ত বীজাণু বিনাশক। জ্বরবিকারে (Typhoid fever), ওলাউঠা (Cholera) এবং তথাবিধ অপরাপর মারাত্মক রোগে তাম্র উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। ইহা কোন নূতন আবিষ্কার নহে। কিন্তু ডাঃ মোর তাম্রের একটি নূতন গুণ আবিষ্কার করিয়াছেন; এবং এজন্য তিনি গত বৎসর "নভেল প্রাইজ্" (The Nobel prize) পাইয়াছেন। জলজ জীবাণু বিনষ্ট করিতে, অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় তাম্রের প্রয়োজন হয়, এবং এত শীঘ্রই জীবাণুগুলি নষ্ট হইয়া যায় যে, সেই জল অনায়াসে পানযোগ্য হয়। যদি জীবাণুময় জলে, একখণ্ড ক্ষুদ্র তাম্রফলক কতক্ষণ ডুবাইয়া রাখা যায়, তবে পরক্ষণেই দেখিবে, জীবাণুসকল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই উপায়ে সহরে বা গ্রামে দূষিত জল অনায়াসে শোধন করা যায়। সহরস্থ জলের কলের জলাধারগুলি (Reservoirs) পরিষ্কৃত করিতে এক্ষণ আর এতাধিক অর্থব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। জলাধারস্থ জলের সহিত (লক্ষভাগে একভাগ) হিরাকস (Copper Sulphate) মিশ্রিত করিয়া দিলেই যথেষ্ট; উহাতেই জল বিবিধ জীবাণু কিংবা অন্যান্য দূষিত খনিজ পদার্থ হইতে মুক্ত হইতে পারে। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে সম্প্রতি উক্ত উপায়েই জলাধার ও জল পরিষ্কৃত হইতেছে। মিঃ গ্রস্‌ভেনর আরও বলেন,—"যে সকল জলাধারের জল এতাদৃশ দুর্গন্ধময় ও অপেয় হইয়াছে যে, গবাদি জন্তুরাও সেই জলপান করিতে চায় না, তৎসমুদায়ের জলের দুর্গন্ধ ও দূষিত পদার্থ সকল, অতি সহজেই সম্যক্‌রূপে উপরোক্ত উপায়ে পরিশোধিত হইয়া, জন্তুগণের পানের উপযোগি হইতে পারে।" মিঃ গ্রস্‌ভেনর কেণ্টাকি নগরস্থ একটি জলাধারের ২৫০০০০০০ গ্যালন্ জলে, মাত্র ৬ গ্যালন হিরাকস দিয়া, সর্ব্বপ্রকার দূষিত পদার্থ হইতে মুক্ত

করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার ব্যয়ও বেসী নহে। মিঃ গ্রস্‌ভেনর বলেন,—"ইণ্ডিয়ানোপলিস্ নগরে যখন ওলাউঠার মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল, তখন কর্তৃপক্ষগণ হিরাকস্ (Blue Vitriol) মিশ্রিত জল দ্বারা সহরস্থ রাস্তাগুলি ও নগরবাসীদের গৃহগুলি প্রায়শঃ বিধৌত করিতেন। উহাতে তাঁহারা মহামারীর হাত হইতে প্রভূত পরিমাণেই রক্ষা পাইয়াছিলেন। স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত মুদ্রার উপর সাধারণতঃই রোগের বিষাক্ত বীজাণু সৃষ্ট হইয়া থাকে। অবএব স্বর্ণ বা রৌপ্য-মুদ্রা মুখের ভিতর দেওয়া নিতান্ত, অকর্ত্তব্য ; হয়ত ইহাতে হিতে বীপরিত হইতে পারে। কিন্তু তাম্র নির্ম্মিত মুদ্রার উপর কোন রোগেরই বীজাণু সৃষ্ট হইতে এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। তাম্রকার কিংবা তাম্র-খনিতে যাহারা কার্য্য করে, তাহাদের কখনও ওলাউঠা (Cholera) হয় না। আমাদের দেশেও যখন ওলাউঠার মহামারী উপস্থিত হয়, তখন তাম্র-নির্ম্মিত পয়সা, বা পোয়া পয়সা কোমরে বাঁধিয়া রাখিতে দেখা যায়। ইহা কি জন্য রাখা হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই পরিজ্ঞাত নহেন। সেই তাম্র-মুদ্রা কোমরে বাঁধিয়া রাখার উপকারিতা বোধ করি, "ধূমকেতুর" পাঠকপাঠিকাগণকে আর বলিয়া বুঝাইতে হইবেনা। আমরা পুর্ব্বে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাই ইহার বিশ্লেষণের পক্ষে যথেষ্ট। চীনাদের মধ্যে অনেকেই ওলাউঠায় মারা না যাওয়ার কারণ, তাহারা তাহাদের পানীয় জল তাম্র-নির্ম্মিত পাত্রে রাখিয়া থাকে। তাহাতে জলজ বীজাণু সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়। সাধারণতঃ পানীয় জল হইতেই বিবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে ; যদি তাহা বিশোধিত করিয়া লওয়া যায়, তবে আর ভয় কি ? অতি-প্রাচীনকাল হইতে অস্মদ্দেশেও তাম্র-পাত্রের প্রচলন ছিল। এখনও

তাম্র-নির্ম্মিত কলসী, ঘটি ইত্যাদি জলাধার অনেকের ঘরে আছে। কিন্তু দারুণ "ফ্যাসন্" আসিয়া, এই সব দূরে ফেলিয়াছে। ভরসা করি, এখন হইতে আমাদের অন্ধ বিশ্বাস বিদূরিত হইবে।

শ্রীঃ—

—*—

উৎসর্গ।*

অযোগ্য এ পুষ্প-গুচ্ছ তব বক্ষঃস্থলে,
অর্দ্ধ এর উপবৃক্ষ-জাত,
মম শ্রমে উৎপাদিত; অবশিষ্ট কালে
সুরম্য মুকুল ছিল; চ্যুত মম হাতে
বীজ প্রাপ্ত গুণ, আর গন্ধ সুবাসিত।
বিচ্ছিন্ন হইয়া আজ জন্মভূমি সাথে,
আদি অধিস্বামী হ'তে পড়িয়াছে স'রে;
যাহা আছে, তাই এবে নেও দয়া ক'রে!
যদি ভবিষ্যতে,—
স্মৃতির উন্মেষকারী সৌরভের প্রায়
অশোভনা ভাষা বা এ ক্ষুদ্র চিন্তা-স্রোত
তব সখা ছবি তব হৃদয়ে জাগায়,
তারি তরে ধর ইহা,—অর্পিতে অক্ষম তোমারে
সেরূপ আনন্দ আর কোমল বেদনা,
যেমন এ শুষ্ক ফুল পত্র-রসহীনা
সুগন্ধি মালতী,—বসন্তে যাহা দিয়াছিলে মোরে;
মূল্যহীন ভাব যদি ইহা, তবু নিজে হয়ে স্নেহবান্
স্বইচ্ছায় মরিতে ইহারে, দিও পায় দয়া করে স্থান।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

* H. G. Keene এর "Dedication" নামক কবিতার ভাবানুবাদ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

সাহিত্য।—অগ্রহায়ণ, ১৩১১। "ফির্‌দউসি ও হোমর্‌"—শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্র। প্রবন্ধটি যদিও ক্রমপ্রকাশ্য এবং "সাহিত্যে" এই প্রথম প্রকটিত হইয়াছে, তথাপি এই সংখ্যায় যাহা পড়িলাম, তাহা আশানুরূপ হয় নাই বলিয়াই বোধ হইল। অৰ্দ্ধ-পরিপক্ক মানসিক শক্তি অপরিপক্ক হস্তে কাব্য-জগতের উচ্চতম বিষয় বর্ণনা করিতে যাইয়া, পদে পদে ব্যর্থ প্রয়াসের পরিচয় দিয়াছে। এক্ষেত্রে প্রাণের আবেগ যদিও প্ররোচক কর্ত্তা, তথাপি ভাব ও ভাষা উহাকে সম্যক্‌রূপে বহন করিয়া পাঠকের চিত্তে পরিস্ফুট করিতে অসমর্থ হইয়াছে। প্রবন্ধটি পুনরুক্তি-দোষে ভয়ানকরূপে আক্রান্ত। যদি "জীবনের ঘটনা-চক্রে ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজের কেন্দ্রস্থল হায়দরাবাদ-প্রবাসে" বঙ্গদেশের সাধারণ পাঠকবর্গের "জীবন অতিবাহিত" হইত, এবং "খাঁটি পারস্য-দেশবাসী মৌলবীর সংসর্গে, পারস্য ভাষার অনুশীলনে, প্রায় প্রত্যহ" তাহাদের "অবকাশ কাল" কাটিত, তাহা হইলে, 'শাহানামা' পাঠ করিয়া মহাত্মা ফির্‌দউসির আলোক-সাধারণ প্রতিভা ও মহিমা স্মরণে লেখক যে একই ভাবে, একই ভাষায় নানাস্থানে এক কথার পঁচিশবার অবতারণা করিয়াছেন এবং ফির্‌দউসির প্রশংসা কালে কবির গুণাবলী লেখক বারংবার চীৎকার করিয়াও তাহার মন-যবনিকার বাহিরে আনিতে অশক্ত হইয়া, এক-টানা প্রশংসার সিংহনাদে "সাহিত্যের" আসর ফা াইয়াছেন, তাহা ক্ষমা করিতে পারিতাম। কারণ তখন গুণের পরিমাণ জানা থাকিত, প্রশংসাচ্ছলে পুনরুক্তি সহজ-সহনীয় হইত। লেখকের আবেগ ভাষায় প্রকাশ হয় নাই, পুনঃ পুনঃ এক কথার চীৎকারে আমরা কেবল তাহা অনুমান করিয়া লইয়াছি। স্বাধীন চিন্তার ঘর দেখিলাম, "চর্ব্বিত-চর্ব্বনে" পূর্ণ!

তবে লেখক যে অনেকগুলি ইংরেজী কেতাব লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়াছেন, তাহার পরিচয় তিনি প্রবন্ধে যথেষ্ট দিয়াছেন। "সাহিত্যে" তাঁহার তস্‌বীর উঠিতে পারে, এবারের প্রবন্ধে আমরা তেমন কিছুই দেখিলাম না। তবে পাছে কি আছে, জানি না। "অপূর্ব্ব বীরাঙ্গণা"—(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুব্জা) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন। কবিতাটি মধুর, তবে একস্থানে একটু বাঁধ-বাঁধ লাগিল। যথা;—

"মগ্ন সদা সুকৈলাসে দেব ত্রিপুরারি।"

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, "সুকৈলাস" শব্দটিতে "সু" কি উত্তমার্থে ব্যবহৃত—না ছন্দপতন-ভয়ে গোঁজা-দেওয়া ভাবে লিখিত? "ইংরেজ বর্জ্জিত ভারতবর্ষ"—(তাল নারিকেলের দেশে) শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। মন্দ লাগিল না। নামটা একটু দৃষ্টি-আকৃষ্টকারী বটে। "সীমাদ্রি-শিখরে"—(কবিতা) শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। দেশী 'কাঠাম' সুন্দর না থাকাতে, মৈথিলি রাংতায়ও তেমন শোভা হয় নাই। "কন্দর্প ও রামচন্দ্র রায়"—ঐতিহাসিক কথা। এইরূপ কাঠ-কঠোর ভাবে, বড় বড় ইতিহাসের "গাইড্‌" মুখস্থকারী বালকের ন্যায় কোন দিকে না তাকাইয়া, 'হা'-করিয়া কেবল চুম্বকভাবে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলির নিশ্বাস-রুদ্ধ করিয়া আবৃত্তি করার ন্যায় ইতিহাস লেখার আমরা আদৌ পক্ষপাতী নহি। আইনের ভাষা হইতে ইতিহাসের ভাষার একটু পার্থক্য থাকা উচিত। আমাদের বিবেচনায় যাহাতে ইতিহাস ঐতিহাসিক সত্যে পূর্ণ রহিয়া, স্থানে স্থানে দার্শনিকের প্রাণে চরিত্র সমালোচিত হইয়া, ভাষার লালিত্যে ও ঝঙ্কারে সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট করিতে পারে, তাহার জন্য সবিশেষ যত্ন নেওয়া কর্ত্তব্য। "ভারতচন্দ্রের যুগ"—(দেশের ও সমাজের অবস্থা)—জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ;—উপাদেয় ও উপভোগ্য।

"চপলা"—(গল্প) শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। আষাঢ় মাসে লিখিলে মন্দ ছিল না। অনেক গল্পে কিংবা নভেলেই দেখা যায় যে, প্রবীণ লেখক গল্পের বালিকার মুখ দিয়া, যে সকল কথা বাহির করেন, তাহা প্রায়শঃই বালিকার উপযোগি কথা না হইয়া, প্রবীণ লেখকেরই সমধিক উপযুক্ত হইয়া পড়ে। বালিকা যখন বড় হইয়া, নায়িকা হয়, তখন ত আর কোন কথাই থাকে না। তখন সে দর্শন, বিজ্ঞান, কতই কি যে প্রেমের হা-হুতাশে বলিয়া ফেলে, তাহার ইয়ত্তা থাকে না। এই গল্পটিতে যদিও বিজয় বাবু অতি সাবধানে "শিং ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে মিশিয়া," চপলার মুখে বালিকার উপযুক্ত কথা বাহির করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তথাপিও দুই এক স্থানে একটু অস্বাভাবিক হইয়াছে। বিজয় বাবু সমুদ্রগুপ্তের যুগ টানিয়া আনিয়া, তখন যে গ্রীকদের সঙ্গে ভারতের খুব আসা-যাওয়া ছিল, তাহা গল্পে দুই এক কথা দ্বারা জানাইয়া এবং আরও আরও দুই একটি এইরূপ লম্বা 'তান' মারিয়া, পুনরায় আবার ঐতিহাসিক সত্যরূপ গানটিকে, "তাল" না কাটিয়া ধরিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাহার একটু বেস উদ্ভাবনী শক্তি ও সতর্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। "সহযোগী সাহিত্য"—(এংগ্লো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়)। আসর-জমকানো কথায় সমাজ-পতি মহাশয় তাঁহার খেয়াল ও রবীন্দ্র বাবুর উপরে একটু ঝাল-ঝাড়া—এই দুই বক এক গুলিতে মারিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গুলি "ছিটা" হইলেও লক্ষ্য বস্তুতে না লাগিয়া, উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে! তবে "আওয়াজে" অনেকে, বিশেষতঃ "দলের লোকে" শিকারি বলিবেন সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রবাবুর কথার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া, সমাজপতি মহাশয় লিখিয়াছেন, —"শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে ভারতহিতৈষীর সন্ধান করিতে যাইয়া

কাহারও সন্ধান পান নাই। সে কথা রবীন্দ্র বাবু 'সাধনা'য় প্রকাশিত 'ইংরাজও ভারতবাসী' শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন। কিন্তু যে মেকলে ইংরেজী-শিক্ষার উপায় করিয়া, আমাদিগকে রাজনৈতিক অধিকারের আস্বাদ বুঝাইয়া ছিলেন, যে ম্যাক্স-মুলার ও ম্যাক্‌ডোনেল, কাওয়েল ও কোলব্রুক, জোন্‌স ও প্রিন্সেপ্‌ ভারতের সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিপাদনে জীবন ব্যয় করিয়াছেন, যে ব্রাড্‌ল, কসেট্, ওয়েডারবার্ণ, কেন, ডিগবী ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকারের জন্য এত চেষ্টা করিয়াছেন, রবীন্দ্র বাবু তাঁহাদের নাম করেন নাই।" বলা বাহুল্য, সমাজপতি মহাশয় বহু চেষ্টার পরে যে সকল নামগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, শুধু তাঁহাদিগকর্ত্তৃকই সমগ্র এংগ্লো ইণ্ডিয়ান সমাজ গঠিত নয়। আমাদের বিশ্বাস, রবীন্দ্র বাবু সম্প্রদায়কে উল্লেখ করিয়াই তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছেন। এংগ্লো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রায় বার আনা লোকের দিকে চাহিলে কি রবিবাবুর কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয় না? এংগ্লো ইণ্ডিয়ান-প্রেমিক সুরেশ বাবু যদি আর একটু বিবেচনা করিয়া লিখিতেন, তাহা হইলে "সমবেত যুবক মণ্ডলীর" ন্যায় "কর-তালি ধ্বানিতে" রবি বাবুর "অভিষেক সম্পন্ন" না করিলেও বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া, এক হাতে "তালি" দিতে চেষ্টা পাই-তেন না। আমরা হা-করিতেই তাঁহার কথা বা উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি। পরিচিত জীবের অঙ্গ-ভঙ্গিই বুঝিয়া লইবার পক্ষে যথেষ্ট,—চীৎকার অনাবশ্যক। "মাসিক সাহিত্য সমালোচন"—'বঙ্গদর্শন' সমালোচনায় দীনেশ বাবুর 'যাত্রা ও থিয়েটার' নামক প্রবন্ধের নিম্নলিখিত সমালোচনা দেখিলাম,—"শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন রামায়ণের চামর ফেলিয়া 'বঙ্গদর্শনের' আসরে 'যাত্রা ও থিয়ে-টার' লইয়া হাজির হইয়াছেন। মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি,

দীনেশ বাবুর এই রচনাটি সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে অনায়াসে প্রহসনের স্থান অধিকার করিবে। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ, অবেস্তা, এমন কি, কাবুলের পেস্তা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দীনেশ চন্দ্রের বিজয়িনী লেখনীর অবাধি-গতি দেখিয়া মনে হয়, 'সর্ব্ব-গ্রাসিনী' প্রতিভার একটি লক্ষণ বিশ্বব্যাপিনী অনধিকার চর্চ্চা।" কিন্তু আমাদের মনে হয়, যখন দীনেশ বাবুর 'সর্ব্বগ্রাসিনী' প্রতিভা 'বিশ্বব্যাপিনী অধিকারচর্চ্চা' না করিয়া, 'সাহিত্য'-ব্যাপিনী নিতান্ত অধিকারচর্চ্চা করিয়া, 'সাহিত্যের' পাঠকদের মাসিক খাদ্য যোগাইত, তবে তখন 'সাহিত্যে'-সম্পাদক মহাশয় দীনেশ বাবু দ্বারা 'কাবুলের পেস্তা' সংগ্রহ না করাইয়া, বঙ্গদেশের উৎকৃষ্ট ছানা-বড়া তৈয়ার করাইয়া, নিজেই ঐ ছানা-বড়ার হাঁড়ি স্কন্ধে লইয়া, পাঠক-সমাজে 'চাই ভাল ছানা-বড়া' বলিয়া হাঁকিতেন। এখন সে দিন নাই, তাই সুরেশ বাবু অকারণে দীনেশ বাবুর উপর 'বাঘাই' করিতেছেন। সমাজপতি মহাশয় আরও লিখিয়াছেন,—"পুনশ্চ, 'আমাদের কৃষ্ণগ্রীবার উপর শুভ্র নেক্‌টাই,' 'অশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ, * * * * * প্রভৃতি,' দীনেশ বাবুর মতে, 'শত শত বিষয়ে বঙ্গীয় প্রহসনগুলিকে পুষ্ট করিতেছে'। এখন প্রশ্ন এই, স্বদেশীয় কণ্ঠে বিজাতীয় ভাষার অশুদ্ধ উচ্চারণে যদি প্রহসনের পুষ্টি হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী লেখকচূড়ামণিগণের হস্তে মাতৃ-ভাষার এই দৈনন্দিন আদ্যশ্রাদ্ধ কিসের বিস্ময় মহা-শয়?" কিন্তু 'সাহিত্য' যে কতগুলি ধামা-ধরা 'দলের লোককে' যদৃচ্ছ লেখনী-চালনা করিতে দিয়া, মাতৃভাষার "দৈনন্দিন আদ্য-শ্রাদ্ধ" সম্পাদন করিতেছেন, তদ্বিষয়ে সমাজপতি মহাশয় এত অন্ধ কেন? দীনেশ বাবুর প্রবন্ধ সমালোচনায়, সমালোচককে 'কবিরদলের সরকার' হইতে বাছিয়া পৃথক করা একটু কষ্টসাধ্য।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সিংহের "সংযম" নামক প্রবন্ধের সমালোচনায়, সমাজপতি মহাশয় বলিয়াছেন,—"লেজা না মুড়া বুঝিতে পারিলাম না।" আমরাও উহা পড়িয়াছি, এবং উহাতে না বুঝিবার কিছুই দেখি নাই; বরং উহাতে অনেক শিক্ষনীয় কথা আছে। সুরেশ বাবু বুঝেন নাই, আশ্চর্য্যের বিষয়। তবে চাণক্য পণ্ডিতের মতে, কেহ কেহ নাকি—"বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে!"

বান্ধব।—কার্ত্তিক, ১৩১১। "আদিম চট্টগ্রাম"—শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত। প্রবন্ধটিতে জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। লেখক যদি স্থানে স্থানে অনাবশ্যক উদ্দীপনার লহরী তুলিতে যাইয়া ভাষা ও ভাবের দুর্দ্দশা না করিতেন, তাহা হইলে প্রবন্ধটি আরও উপভোগ্য হইত। "চারুশীলা"—শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ বি, এল। ক্রমপ্রকাশ্য গল্প কিংবা নভেল। আয়ু না ফুরাইতে, শেষ হইলে, বক্তব্য বলিতে পারিব। "দার্শনিক মতের সমন্বয়"—শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য। সারগর্ভ প্রবন্ধ। লেখকের চিন্তাশীলতা ও সংগ্রহ-শক্তির বেস পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। "যশোগান"—(কবিতা)। কবিতা-রোগে-আক্রান্ত, বান্ধব-অনুগৃহীত জনৈক যশ-লিপ্সু লজ্জাহীনের পদ্যের আকারে মিল-দেওয়া কতকগুলি কথা। পত্রিকায় স্থান পাইতে পারে, ইহাতে এমন কিছুই নাই। "সেই চাঁদ"—ইহাও কবিতা। পৃথ্বী-বিহারী কোন্ চাঁদ এই কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহা কবিতার নিম্নে শুধু "শ্রীঃ—" থাকায়, জানিবার সুযোগ নাই। কবিতাটির একটু নমুনা দেখাইতেছি:—

"কাহার সোনার চাঁদ,—তুমি চাঁদ,
হৃদয়ের চাঁদ তুমিরে কার?
সে'ধে কার প্রাণে, ঢাল চাঁদ আলো
চাঁদপানা মুখ বুঝিবা তার!

"সোহাগ-সূতায়, চাঁদ গেঁথে বুঝি,
গলায় পরে সে চাঁদের মালা—
চাঁদের খেলানা, নিয়ে সে কি খেলে,—
চাঁদ ফুলে ভরে ফুলের ডালা!

"চাঁদ উপবনে, চাঁদের নিকুঞ্জে,
চাঁদের দোলায় সে কি গো দোলে?
চাঁদের শয়নে, চাঁদ উপাদানে,
শু'য়ে থাকে সে কি চাঁদের কোলে?

"চাঁদের আতর গায়ে সে কি মাখে—
চাঁদ লুটোপুটি খায় কি পায়?
চলিতে চরণে চাঁদ ঝরে পড়ে,
চাঁদের পাখার বাতাস খায়!

"চাঁদ গলাইয়া গহনা কি পরে,
চাঁদ কি বসান বসনে তার?
চাঁদে গড়া বীণা, বাজায় কি সুরে,
তারের ঝঙ্কারে অমিয় ধার!"

'চাঁদের মালা,' 'চাঁদের খেলানা', 'চাঁদ ফুল,' 'চাঁদ উপবন,' 'চাঁদের নিকুঞ্জ,' 'চাঁদের দোলা,' 'চাঁদের শয়ন', 'চাঁদের আতর,' 'চাঁদের পাখা,' 'চাঁদ-গলান গহনা,' 'চাঁদে গড়া বীণা' ইত্যাদি অশ্রুতপূর্ব্ব জিনিষ মর্ত্ত্যধামে পাওয়া যায় বলিয়া জানা ছিল না। যদি কাহারও এই সকল জিনিষের প্রয়োজন থাকে, তবে "বান্ধব"-আফিসে লিখিলেই বোধ হয়, তথাকার কর্ম্ম-কর্ত্তারা লেখকের নিকট হইতে তৎসমুদায় সরবরাহ করিতে পারিবেন! কিন্তু যাহার তহবিলে এত "চাঁদের" জিনিষ পত্র, সেই 'চাঁদ' না

জানি কেমন! "মেঘদূতের সপ্ত মুক্তা"—প্রথম মুক্তা বাহির হইয়াছে। দেখিলাম, মুক্তার উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য বাস্তবিকই মনোহারি। "ছায়া-দর্শন'—এবারের ঘটনা বিস্ময়কর বটে।

ভারতী।—পৌষ, ১৩১১। "সম্পদের প্রতি"—(কবিতা) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন। কবিতাটিতে অতিরিক্ত-ভাবে-ভোলা প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতার হিসাবে ইহাতে বিশেষ কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। তবে যাহারা প্রহ্লাদের ন্যায় 'ক' লিখিলে কৃষ্ণ-প্রেমে কাঁদিয়া আকুল হন, তাহারা কিছু রস পাইতে পারেন। "জুলিয়াস্ সীজার"—(দ্বিতীয় অঙ্ক)। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত। ইহা শেক্ষপীর কৃত ইংরেজী "জুলিয়াস্ সীজার" নাটকের বঙ্গানুবাদ। এই সংখ্যায় 'দ্বিতীয় অঙ্কের' সমাপ্তি হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্র বাবু বহু বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক বঙ্গানুবাদ করিয়া, বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন; এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি যদি এখন শেক্ষপীর কৃত মূল ইংরেজী নাটকগুলিকেও তাঁহার অনূদিত বর্ত্তমান "জুলিয়াস্ সীজার" নাটকের ন্যায় অনুবাদ করেন, তাহা হইলে, মাতৃভাষার অভাব-মোচন ও পুষ্টিসাধন একই সঙ্গে সম্পাদিত হয়। তাঁহার অনূদিত 'জুলিয়াস্ সীজার' বস্তুতঃই সুন্দর হইয়াছে। "নির্ঝর"—(কবিতা) শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়। কোন্ দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, ঠিক তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বিংশ শতাব্দীর "নির্ঝর" স্বভাবতঃই কুয়াসাচ্ছন্ন থাকিবার কথা! "পশ্চিম ভারতে নাগ-পূজা"—শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল। মন্দ লাগিল না। সংগ্রহ করিয়াছেন যথেষ্ট। "তৃপ্তি"—(কবিতা) শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী। অতৃপ্তির কিছুই দেখিলাম না। বেস চলন-সই কবিতা। "বেহারী উপকথা"—শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ কাল এই সব বিষয়ে লেখা একটা ফ্যাসন বটে। কিন্তু ইহা

মন্দ লাগিল না। "বার্লিন অবরোধ"—(অনুবাদ) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। "খাচ্ছি", "দিচ্ছি" করিয়া না লিখিলে, মন্দ ছিল না। "শঙ্কর চক্রবর্ত্তী"—শ্রীযতীন্দ্র মোহন রায়। ভাষাটা কট-মট হইলেও,বিষয়টি পঠিতব্য। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রিয় সচিব শঙ্কর সম্বন্ধে প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে। "মথুরা তত্ত্ব",—শ্রীব্রজ সুন্দর সান্ন্যাল। নানা পুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, মথুরা বা মধুপুরীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। "অবসর পাঠ্য-নির্ব্বাচন"—শ্রীজ্ঞানদা ভূষণ চট্টোপাধ্যায়। সময়োচিত প্রবন্ধ ; বেস লাগিল। বিদ্বৎ-সমাজ লেখকের অভাব ও অভিযোগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ভালই হয়। "প্রতীক্ষা"—(কবিতা) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন। বহু প্রতীক্ষার পরেও কিছুই বুঝা গেল না। এই স্থানটুকু সাদা রাখিলেই বোধকরি ভাল ছিল। "গোবিন্দ দাস"—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। এই প্রবন্ধে দীনেশ বাবু বিখ্যাত কবি গোবিন্দ দাস, মৈথিলী—না বঙ্গদেশীয় কবি, তাহার বিচার লইয়া, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে মসী-যুদ্ধ করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু গোবিন্দ দাসকে মৈথিলী কবি বলেন ; এবং তাঁহার এই মত সমর্থনার্থ তিনি যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, দীনেশ বাবু তৎসমুদায় যুক্তি-বলে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "সাময়িক কথা"—"সাময়িক কথায়" দেখিলাম, "সাহিত্য-পরিষদ্ সভার" ১০ই ডিসেম্বরের অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়, বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ইহার পরে নাকি, সহসা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে "শঙ্করাচার্য্যের" আবির্ভাব কাল লইয়া, বিষম বাগ্-যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেন। তাঁহারা নাকি এতটা বিচলিত ভাব ও উত্তেজনা প্রদ-

ভ্রান্ত," ও "ভ্রমাত্মক" বলিয়াছিলেন ! আমাদের বিবেচনায় নিখিল বাবুর টক্করটা কতক পরিমাণে 'দেয়ালের' সঙ্গেই হইয়াছিল। সভাগৃহে, বিদ্বজ্জন-সমাজে অনেকেরই, ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে বাগ্-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, চাণক্যের—"তাবচ্চ শোভতে * * যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে"—কথাটি মনে করা উচিত।

বঙ্গদর্শন—পৌষ, ১৩১১। "নৌকাডুবি"—এখনও চলিতেছে। ক্রমেই যেন একটু বিস্ময়কর হইয়া উঠিতেছে। "রামায়ণের রচনা কাল"—শ্রীঅক্ষয় কুমার মৈত্রের। সূচনায় ভালই বোধ হইতেছে। "মুক্তি বিষয়ে রামানুজ স্বামীর উপদেশ"—শ্রীকালীবর দেবান্তবাগীশ। সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হইবে বলিয়া বোধ হয় না। তবে বিশেষজ্ঞের পক্ষে উপভোগ্য হইতে পারে। "ত্রিবঙ্কুর"—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর। মন্দ লাগিল না। "বিবাহ-যাত্রী"—(ছবি) শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কবিতাটি বেস হইয়াছে। প্রথম অংশটুকু বেস হাস্যরসোদ্দীপক বটে; কিন্তু শেষটুকু সত্য হইলেও, কি ভীষণ! "দীল্লির শিল্প প্রদর্শনী"—শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর। প্রবন্ধটি বেস চিত্তাকর্ষক। "প্রকৃতির প্রতি"—শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। চলন-সই কবিতা।

অন্তঃপুর।—কার্ত্তিক, ১৩১১। শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত। "বালিকাদের শিক্ষার অন্তরায় এবং তদ্দূরীকরণের উপায় কি?"—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী। একটি সুলিখিত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। "হিন্দুর অন্তঃপুর"—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী। নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও একদেশদর্শী; ইহা প্রবন্ধ নামের নিতান্ত অযোগ্য। পাঠক ইহা পাঠ করিলে, অনায়াসেই বুঝিয়া লইবেন, সরস্বতী মহাশয়া "হিন্দুর অন্তঃপুরের" প্রতি হাড়ে-হাড়ে চটা! লেখিকা প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"* * * * স্বামী-পদ-দলিতা রমণীর তপ্তঅশ্রু, অকাল মৃত্যু, দরিদ্রতা প্রভৃতি ভীষণ কণ্টকগুলি হিন্দুর অন্তঃপুর হইতেই প্রকারান্তরে উদ্গত হইয়া থাকে। হিন্দুর অন্তঃপুর মার্জ্জিত হইলে, সমাজ হইতে এ সকল অশান্তি-বিষ বিদূরিত হইবে, তাহা অকপটে বলা যাইতে পারে।" আমরা বলিতেছি,—সকল সমাজই ন্যূনাধিক-রূপে সংস্কারার্হ ; কিন্তু হিন্দু-সমাজ সকল হইতে অল্পরূপে সংস্করণীয়। আবার জিজ্ঞাসা বলেন,—স্বাধীনতা-প্রাপ্ত, সুমার্জ্জিত, ও সুবিবাহিত সমাজে কোন রমণীর নয়ন হইতে এক ফোটা অশ্রুও পতন হয় না কি ?—অকাল মৃত্যু কি সে সমাজে ঘটে না ?—সেই উন্নত শিক্ষিত সমাজের কি সকলই সমৃদ্ধ ?—তন্মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জনকে কি প্রকারান্তরে পরমুখাপেক্ষী হইতে দেখা যায় না ?—তবে পুতিগন্ধময় (?) "হিন্দুর অন্তঃপুরের" দোষ কি ? আমরা বলি, লেখিকার একদেশদর্শীতার প্রতিবিম্ব প্রবন্ধে প্রকটিত না হইলে, প্রবন্ধটি বাস্তবিকই উপভোগ্য হইত। প্রবন্ধের স্থানে স্থানে লেখিকার লিপি-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায় ; কিন্তু প্রবন্ধটি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। "জননী"—শ্রীমতী প্রমলীবালা দেবী। সুলিখিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধ। "নীরদা",—ক্রমপ্রকাশা নবন্যাস বা গল্প। "ওয়ালটেয়ার"ও তথৈবচঃ। এবারকার "অন্তঃপুরে" দুইটি রন্ধন-প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ আছে ; কিন্তু সেগুলি হিন্দু-পরিবারের তেমন উপযুক্ত নহে। "হতাশপ্রাণ"—একটি খণ্ড কবিতা। কবিতাটি আমাদের নিকট ভাল লাগিয়াছে। লেখিকা একস্থানে লিখিয়াছেন :—

"নমস্ত, উপাস্য তুমি মোর,,
মনে মনে করি উপাসনা,
তাই ক'রে সুখে থাকি আমি,
অন্য কিছু নাহিক বাসনা।"

আমরা লেখিকার এই পবিত্র মানস-পূজার সর্ব্বথা পক্ষপাতী। "বিধবা",—চলন-সই খণ্ড কবিতা। "মৃত্যু",—আকারে বড় হইলেও, সরস হয় নাই। ইহা পাঠ করিলে, কাহারও মৃত্যু-ভয় মুহূর্ত্তেকের জন্য হৃদয়ে জাগরিত হইবে বলিয়া, আশা করা যায় না। "টিমুমণি"—একটি সন্তান-শোকাতুরা বঙ্গ রমণীর শোকোচ্ছ্বাস। ইহার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে অশ্রু-কণা দোদল্যমান। কিন্তু সাহিত্যের হিসাবে ইহা ততটা সরস না হইলেও, অন্য হিসাবে পবিত্র। "বিবিধ প্রসঙ্গ"—নিতান্ত সংক্ষিপ্ত।

নবনূর।—পৌষ, ১৩১১।—(ঈদ সংখ্যা)। মুসলমান কবি কায়কোবাদের "ঈদ" শীর্ষক গীতি-কবিতা এবারকার "নবনূরের" মুখবন্ধ বা বন্দনা। কবিতাটি সময়োচিত ও সরস হইয়াছে। পাঠ করিয়া আমরা বাস্তবিকই প্রীতি লাভ করিয়াছি। "ঋষি-কল্প ফজিল আয়াজ",—সুলিখিত প্রবন্ধ। তবে প্রবন্ধটিতে স্থানে স্থানে ভাষাগত প্রমাদ দেখা গেল; যথা—"দস্যুতার দ্বারা"। "তরু-লতা"—একটি সুদীর্ঘ কবিতা। সামান্য বিষয়ের উপর এতগুলি লাইন্ লেখা বিশেষ প্রতিভা, শব্দ-সম্পদ ও ভাব-বিকাশের পরিচায়ক বটে; কিন্তু "তরু-লতায়" ইম্‌দাদুল হক্ সাহেবের কোন প্রতিভা, শব্দ-সম্পদ কিংবা ভাব-বিকাশের পরিচয় পাওয়া গেল না। এমন অসার আবর্জ্জনায় "নবনূর" পরিপূর্ণ হইতে দেখিলে, বাস্তবিকই দুঃখ হয়। "মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত"—ক্রমপ্রকাশ্য প্রবন্ধ হইলেও, যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বুঝিলাম, লেখকের লিখিবার শক্তি আছে, এবং উপাদানও তাঁহার হাতের কাছেই মজুত রহিয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধের সুখ-সমাপ্তি দেখিতে চাই। "কাঞ্চন জঙ্ঘা",—আধুনিক খণ্ড কবিতা হইলেও, স্থানে স্থানে ভাব ও ভাষার পরিচয় পাওয়া

গেল। মুসলমান মহিলা-কবির এতাদৃশ উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংস-নীয়। "বাঁদি ও স্ত্রী",—(গল্প) মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লা। সমা-লোচনার চক্ষে স্থানে স্থানে দোষ দৃষ্ট হইলেও, গল্পটি মোটের উপর মন্দ হয় নাই। কিন্তু 'তারিণীর' পাপ-কার্য্যের পরিণাম না দেখাইয়া, লেখক গল্পটির সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে নষ্ট করিয়া-ছেন। "তারিণীর" প্রতিহিংসা বা পাপ-প্রবৃত্তির প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই দেখান উচিত ছিল। গল্পটির বহু স্থানে ভাষাগত ভুল দৃষ্ট হইল; ভরসা করি, লেখক ভবিষ্যতে লিখন-কার্য্যে একটু সাবধান হই-বেন। "জুলী"—(গাথা) শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। মজুমদার মহাশয়ের 'জুলীতে' কিছুই নাই। ইহা 'গাথা' অথবা মুণ্ড—না মাথা কিছুই বুঝিলাম না। "সতরঞ্জ-ক্রীড়া"—পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইতে পারি নাই। প্রবন্ধের বহু স্থানে বর্ণাশুদ্ধি ও ব্যাকরণ-দুষ্ট পদ রহিয়াছে। ভরসা করি, লেখক সে বিষয়ে একটুকু সতর্কতা নিবেন। 'জমপুর' হিন্দু রাজা ছিলেন। তৎপুত্র 'গো' যখন "দক্ষ চিত্রকর আনাইয়া এক খণ্ড কাগজে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করাইলেন, এবং তাহতে রাজা, মন্ত্রী, দুই হস্তী, দুই ঘোটক, দুই নৌকা ও প্রতি পক্ষে আটজন পদাতিক সৈন্য স্থাপিত করাইলেন", তখন বুঝিতে হইবে, হিন্দু রাজপুত্র গো-ই 'সতরঞ্জ-ক্রীড়ার' প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং কালে তাহা ভারতেই ক্রীড়ায় পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু "পারস্যে গিয়া যে এই অপূর্ব্ব ক্রীড়া-তরু বর্দ্ধিত, পল্লবিত ও বিশাল শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট হইল," তাহার নজীর কোথায়? বিনা নজীরে সকলে এ কথা মানিবে কেন? শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের 'গানটি' বেস হইয়াছে। "নবনূরে" এবার কবিতা বলিতে গেলে, এই "গান"—আর সব "হেঁয়ালী" বা "পাঁচালী"।

পথিক।—অগ্রহায়ণ, ১৩১১। "যবন ও মুসলমান জাতি"—শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। প্রবন্ধটি আগা-গোড়া পাঠ করা আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। যাহা হউক, উক্ত প্রবন্ধের যতটুকু আমরা পাঠ করিতে পারিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া বুঝিলাম, প্রবন্ধকারের হস্তে নানা রকমের উপাদানই ছিল; কিন্তু শুধু বণ্টনের দোষেই ইহার স্বাদগ্রহণ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন,—"যবনগণ বিশুদ্ধ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন"। "বাইবেলের মতে যবন নোহের পৌত্র।" "ভারতের নহুষকে নোওয়া (বা নোহ) বানাইয়া নামের বিকৃতি ঘটান হইয়াছে।" বাহাবা!—বলিহারি যুক্তি!! এতাদৃশ যুক্তি দিতে না পরিলে কি "বিদ্যারত্ন" হয়? আমরা বলি, উপাধি-মুকুট এক্ষণ নামাইয়া রাখাই কর্ত্তব্য? প্রবন্ধকার আরও বলেন,—"পারস্যের উত্তর-পূর্ব্ব-প্রান্তবাসী পহ্লবগণ যবন ছিলেন না, তাঁহারা সোজা-সুজি হিন্দু ক্ষত্রিয় ছিলেন।" এমন "সোজা-সুজি" ক্ষত্রিয় না বানাইতে পারিলে কি উপাধি লাভ করা যায়? বিদ্যার ভারে নমিত হইয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিতেছেন,—"আরমাণী অর্থ আর্য্য মানব", "মুসলমান অর্থ ভক্ত;" "গান্ধারদেশ কাণ্ডাহার", "লোদী শব্দ নিশ্চয়ই রুদ্র শব্দের বিকার-প্রভব," "অংশুমানের বিকার ওস্মান খাঁ", "ইব্রাহিম অর্থ আমাদিগের আদিযাজী মহাত্মা পিতামহ ব্রহ্মা" ইত্যাদি ইত্যাদি। উমেশ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উল্লিখিতরূপ যুক্তি ও প্রমাণ দেখিয়া, কেহ যদি 'উ' শব্দের অর্থ 'ভোঃ', এবং 'মেশ' শব্দে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে 'শ'-কারের কোনরূপ গোলযোগ করতঃ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ন্যায় অন্য অর্থ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে, বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বোধ করি, একটু লাচার হইয়া পড়িতে হইবে! যে কোন কথাই বলা হউক না কেন, তাহার সদ্‌যুক্তি দেওয়া অবশ্যই কর্ত্তব্য। প্রবন্ধকার আরও বলি-

তেছেন,—"বর্ত্তমান কাবুলীগণ যহুর সন্তান; সুতরাং তাঁহারা অযবন মুসলমান।" ইহার অনুকূলে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের "ডুপ্লিকেট্ কপি" (Duplicate copy) হতে না থাকিলে, বুঝিবার সাধ্য নাই। "মা অন্নপূর্ণার প্রতি"—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন। কবিতাটি কালোচিত হইয়াছে, এবং ভাষাও খুব সরস ও প্রাণ-স্পর্শী হইয়াছে। "শ্রীপুর ডুবি"—শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নৌকা ডুবির" পর ঘোষজ মহাশয়ের "শ্রীপুর ডুবি" আরম্ভ হইল। এই "ডুবির" সঙ্গে সঙ্গে লেখক ধুরন্ধরও না ডুবিলে ভাল! কালী কাগজের যে যথেষ্ট অপচয় হইতেছে, তাহার আর ভুল কি? প্রবন্ধের এক স্থানে লেখা আছে,—"কথা হইতে ছিল দুইজন রমণীর মধ্যে; মৃৎপ্রাচীর বেষ্টিত উঠানে তুলসি তলায় বসিয়া সোণামা তরঙ্গের নিকট মিত্রজার সোণার সংসার কিরূপে পুড়িল, তাহার গল্প করিতে ছিলেন; আর দ্বাদশ বর্ষ-বয়স্কা উমা গালে হাত দিয়া আধ-শোয়া অবস্থায় তাহা শুনিতে ছিল।" আমাদের জিজ্ঞাস্য,—উমা কি বিছানা পত্র নিয়াই তুলসি-তলায় "আধ-শোয়া" হইয়াছিল,—না শুধু মাটির উপরই "আধ-শোয়া অবস্থায়" ছিল? আর একস্থানে লেখা হইয়াছে,—"গৌরী গঙ্গাধর রায়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, খর্ব্ব-কায়া, গৌরবর্ণা, স্থূল; ক্ষুদ্র বাহুতে সোণার তাবিজ, অনন্ত, বালা, কোমরে গোট, গলায় হেঁসোহার"। বলি, যখনকার কথা এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইতেছে, তখন 'তাবিজ', 'অনন্ত', 'বালা', 'গোট', 'হেঁসোহার' প্রভৃতি গহনার প্রচলন ছিল কি?—বিশেষতঃ 'স্থূলদেহা' গৌরীর বাহুটি হঠাৎ এত 'ক্ষুদ্র' হইল কি প্রকারে, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। এতদ্ব্যতীত আরও যে কত অস্বাভাবিক কথার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা লিখিতে গেলে, 'ধূমকেতুর' ক্ষুদ্র কলেবরে কুলায় না।

সম্পাদক-লিখিত "বিধবা বালিকা" খণ্ড কবিতা ; সেই এক-টানা নাঁকিস্বরেই চলিয়াছে। পড়িয়া আমরা প্রীতি লাভ করিতে পারি নাই। "সামান্যাকারে পাশ্চাত্য দর্শন"—শ্রীবিধুভূষণ সেন গুপ্ত। কতকগুলি "চর্ব্বিত চর্ব্বণের" সমবায় মাত্র। দার্শনিকদের নিকট কেমন লাগিবে, তাহা পরিজ্ঞাত নহি।

বীরভূমি।—পৌষ, ১৩১১। "সিংহলে ইংরাজ"—শ্রীসত্য রঞ্জন রায়, এম্, এ। প্রবন্ধটি মোটের উপর মন্দ হয় নাই। পাঠ করিয়া, আমরা প্রীত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত আবদুল করিমের "প্রাচীন কীর্ত্তিরক্ষা" পাঠ-যোগ্য প্রবন্ধ। "শাস্ত্র ও সাধনা"—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। এবারকার 'বীরভূমিতে' ইহাই সারগর্ভ প্রবন্ধ। "বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক" ক্রমপ্রকাশ্য ; উদ্যম প্রশংসনীয়। "শ্রীহট্টে বৈষ্ণব প্রভাব"—শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি। তত্ত্বনিধি মহাশয়ের তত্ত্ব পাঠ করিয়া, আমরা বুঝিয়াছি, যুক্তিহীন এ জটিল তত্ত্ব আমাদের জন্য লিখিত হয় নাই। ভাষাটাও নেহাৎ কট-মটে গোছের। "এত কি কঠিন"—(কবিতা) শ্রীমহম্মদ আজীজউল্ শোভান। ইহাও আধুনিক কবিতা-নিকুঞ্জের একটি বাসি ফুল,—গন্ধহীন—শোভাহীন।

নব-বিকাশ।—অগ্রাহায়ণ, ১৩১১। "উত্থান"—(কবিতা) শ্রীব্রজসুন্দর স্যান্যাল। কবিতাটি মোটের উপর মন্দ হয় নাই। ইহার পৌনে ষোল আনাই অতি প্রাঞ্জল ভষায় ভাবের সমাবেশে লিখিত। কিন্তু মাঝে মাঝে দুই চারিটি এমন কট-মটে রকমের শব্দ ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাতে কবিতার সকল সৌন্দর্য্য একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি,—"অকিতব", "কৈবল্য" ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এক স্থলে রহিয়াছে,—

"সকলে আপন হিস্তা বুঝে লয় প্রকাশিয়া বল।"

ভাষা হইতে বাঙ্গলায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় কবিতা বা প্রবন্ধাদি লিখিতে গিয়া, এতাদৃশ শব্দাদি ব্যবহার করিলে, বাস্তবিকই যেন ভাষার গৌরব নষ্ট হইয়া যায়। তবে চুট্‌কী গল্পে বা হাস্য-রসোদ্দীপক প্রবন্ধাদিতে তাদৃশ শব্দ-ব্যবহার প্রায়শঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে। "গোপীভাব"—শ্রীজানকী নাথ পাল, বি, এল্। যাঁহারা ধর্ম্ম-প্রাণ ভক্ত, তাঁহাদিগের নিকট উক্ত প্রবন্ধটি অতি উপাদেয় ও উপভোগ্য হইবে, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। ভাষাটি অতি সরল ও ভাবোদ্দীপক হইয়াছে। গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের বিশ্লেষণও অতি সরস হইয়াছে। পড়িতে, মাঝে মাঝে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। "শিশুপাঠ্য ইতিহাস"—শ্রীকুঞ্জবিহারী হার, এম্, এ। এই প্রবন্ধটি অতি সুন্দর হইয়াছে। কুঞ্জবিহারী বাবু আধুনিক শিশুপাঠ্য ইতিহাসের যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং তাহার অনুকূলে যে সমুদায় সুযুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, আমরা তৎসমুদায়ের নিতান্ত পক্ষপাতী। "বুদ্ধ ও বাইবেল" —শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। প্রবন্ধটি ক্রমপ্রকাশ্য। বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা ইহার যতটুকু পাঠ করিতে পাইয়াছি, তাহাতে বুঝিলাম, প্রবন্ধটি সারগর্ভ ও পাঠযোগ্য হইবে। "সন্তোষ ও বিশ্বাস"— (কবিতা) শ্রীযতীন্দ্রমোহন সাহা। মন্দ লাগিল না। "আমাদের অভাব ও তন্মোচন উপায়"—শ্রীজানকীনাথ পাল, বি, এল্। সময়োচিত পাঠ-যোগ্য প্রবন্ধ। "অর্জ্জুনের শোকশান্তি"—শ্রীশশি-মোহন বসাক এম, এ। আমরা এই প্রবন্ধটি আগা-গোড়া পড়িয়াছি; কিন্তু পাঠ করিয়া আদৌ প্রীত হইতে পারি নাই। এই প্রবন্ধে শশিবাবুর গৌরব অক্ষুণ্ণ রহে নাই। "একেলা"—(কবিতা) শ্রীকামিনীকুমার দে রায়। একটি চলন-সই খণ্ড কবিতা।

দ্বিতীয় খণ্ড] ফাল্গুন, ১৩১১। [১১শ সংখ্যা।

"উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ।

ক্লিওপেট্রা ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

চতুর সীজার শ্রবণ মাত্রই তাহাদিগের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিয়া লইলেন। বালক রাজা তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া বিপক্ষ দলের নায়ক হইলে যে, তিনি একান্তই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন, এ ধারণা তাঁহার মনের ত্রিসীমায়ও স্থান পাইল না। তিনি তাহাদের প্রস্তাব শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন। তিনি জানিতেন, বালক রাজা অজ্ঞ ও অক্ষম। এমন অনভিজ্ঞ ও শিশুর ভয়ে, অমন সিংহের একটি কেশরও কম্পিত হইতে পারে না। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার আত্ম-রক্ষণের উপায় ও শান্তি দূরবর্ত্তী নহে। ইহাও বুঝিলেন যে, বিদ্রোহীদিগের এই বিশ্বাসঘাতকতায়, তাঁহার ও তাঁহার প্রণয়িনী ক্লিওপেট্রার পথ বরং একটু সুগম এবং তাঁহাদের পক্ষের কথা জনসাধারণের চক্ষেও অধিকতর সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হইবে এবং বালক টলিমি ও তাঁহার পক্ষভুক্ত বিদ্রোহীদিগের আপত্তি সাধারণের বিচারে একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। অতএব তিনি টলিমিকে অবাধে প্রাসাদের বাহিরে যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

টলিমি বিদ্রোহীদিগের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্রই তাহারা জয়-ধ্বনি সহকারে তাঁহাকে প্রতিগ্রহ করিল এবং তাঁহাকে সর্ব্বাধ্যক্ষ ও নায়করূপে বরণ করিয়া, সীজারের বিরুদ্ধে রণ-যাত্রার বিরাট আয়োজন করিতে লাগিল। টলিমি তরুণবয়স্ক বালক। তিনি সৈন্যদলের এই উল্লাসে ভুলিয়া গেলেন। রোম

প্রজাতন্ত্র কি পদার্থ, রোমীয় প্রজাতন্ত্রের ডিক্টেটার বা অধ্যক্ষের অর্থ কি, এবং একমাত্র সীজারের শক্তি ও ওজন যে পঙ্গপাল সদৃশ মিশরীয় সেনার একটা বিপুল ব্যূহ অপেক্ষাও অনেক বেশী, বালকের সে অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভবপর নহে। মন্ত্রিদিগের মধ্যেও, বোধ হয়, তেমন পরিপক্ক লোক কেহই ছিলেন না। সুতরাং টলিমি এই তরঙ্গে আত্মহারা হইয়া ভাসিয়া চলিলেন। আরসিনু কিছু পূর্ব্বেই বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সন্ধির সমস্ত প্রস্তাব অমনি হাওয়ায় উড়াইয়া দিয়া, তাহারা বীরদর্পে রণভেরী বাজাইয়া আপতিতপ্রায় বিপদ,—অর্থাৎ 'ব' দ্বীপের অভিমুখে ধাবমান সেনাপতি মেথ্রেডেইট্সের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হইল।

এদিকে মেথ্রিডেইট্স পেলুসিয়াম্ বিধ্বস্ত করিয়া মেম্ফিসের পথে 'ব' দ্বীপের অভিমুখে ঝটিকার বেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে আরও একটা যুদ্ধ হইল, তাহাতেও মেথ্রেডেইট্স জয়লাভ করিয়া পশ্চিমদিক দিয়া নদী তটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সীজার যাহাতে সসৈন্য আসিয়া মেথ্রেডেইট্সের সহিত মিলিত হইতে না পারেন, তজ্জন্য বিদ্রোহিদল বিবিধ উপায় অবলম্বন করিল। সীজারও গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পাইয়াই হউক, অথবা বীর-ব্রত সেনানায়কের স্বাভাবিক বুদ্ধি-কৌশলেই হউক, মেথ্রেডেইট্সের গতিবিধি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হইয়া তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কৌশলে অবরোধকারীদিগের চক্ষে ধূলি দিবার অভিসন্ধিতে, লিবিয়ার দিকে মেরিয়া হ্রদের পার্শ্বে একটা ক্ষুদ্র সৈন্যদল সংস্থাপন করিয়া, তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর সৈন্যদলের সহিত যোগদান করিবার নিমিত্ত প্রস্থিত হইলেন। এদিকে মেথ্রেডেইট্সের গতিরোধের

উদ্দেশ্যে বালক টলিমিরাজ দলবলের সহিত জলপথে যাত্রা করিলেন। এই পথটি যদিও হ্রস্ব ও সহজগম্য এবং সীজারের অবলম্বিত স্থলবর্ত্ম যদিও দুর্গম ও দীর্ঘতর, তথাপি সীজার তাঁহার সুশিক্ষিত সেনার শ্রম, কষ্টসহিষ্ণুতা ও ক্ষিপ্রকারিতাগুণে বালক রাজার সৈন্যদলকে পশ্চাতে ফেলিয়া, অনেক দূর অগ্রবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার দুর্গধ্বংস করণার্থ বিদ্রোহি-দল যে সকল আয়োজন উদ্যোগ করিয়াছিল, তাহার সমস্ত কার্য্য এখন স্থগিত রাখা হইল। মেথ্রেডেইট্‌সের গতিরোধার্থ সমস্ত মৈশরীয় সৈন্য বালক রাজার নেতৃত্বে 'ব' দ্বীপের কোন একস্থানে যাইয়া কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিল।

মেথ্রেডেইট্‌স সসৈন্যে আসিয়া যেমন মৈশরীয় সৈন্যদলের সম্মুখে পহুঁচিলেন, অমনই তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল। এই সময়, ইরম্মদ-গতিতে, অন্যদিক হইতে, সীজারের সৈন্যদল আসিয়া মেথ্রেডেইট্‌সের সহিত সংযুক্ত হইল। ইহাতে বিদ্রোহী আলেক্‌জেণ্ড্রীয় সৈন্যদলের গতিরোধ হইয়া গেল। তাহারা সীজারকে এই অবস্থায় আক্রমণ করিবে কি না, এই কথা লইয়া যখন ইতস্ততঃ করিতেছিল, তখন সীজারই তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই সমবেত সৈন্যের সম্মুখে মৈশরীয় সৈন্যদল দাঁড়াইতে সমর্থ হইল না। সীজার ক্রমে তাহাদিগকে নদীর দিকে চাপাইয়া লইয়া গিয়া নদীতে ঝাঁপা-ইতে বাধ্য করিলেন। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। টলিমিরাজও এই পলাতকদিগের সঙ্গেই নদীতে ঝম্প প্রদান করিলেন। কিন্তু সঙ্গীয় অনেকে উঠিল, তিনি আর উঠিলেন না। বিধি-বিড়ম্বিত টলিমি-রাজ নদীগর্ভে চিরতরে অন্তর্হিত হইলেন!

সীজার জয়লাভের পর, আর বিলম্ব করিলেন না। অমনি

স্থলপথে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার অভিমুখে ধাবিত হইয়া, আলেক্‌-জেণ্ড্রিয়ার অবরোধকারীদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহারাও পরাজিত হইল। সীজার অবরুদ্ধ সৈন্যদিগকে অবরোধ হইতে মুক্ত করিয়া লইলেন। ক্ষিপ্ত জনতা এক্ষণ বিক্ষিপ্ত ও বিপন্ন। জয়লাভের আর কোন প্রত্যাশা নাই। তাহারা নিতান্ত হতাশ হইয়া সীজারের নিকট করুণ স্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। সীজারও তাঁহার স্বাভাবিক উদারতা ও মহত্বগুণে, প্রতিহিংসার কোন ব্যবস্থা না করিয়া তাহাদিগের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। কুমারী আরসিনু ফিরিয়া আবার তাঁহার হস্তে বন্দিনী হইলেন।

আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় শান্তি স্থাপিত হইল। সীজার, মৈশরীয় প্রথাঅনুসারে, কনিষ্ঠ টলিমির সহিত ক্লিওপেট্রার পরিণয় প্রস্তাব করিয়া ক্লিওপেট্রা ও কনিষ্ঠ টলিমিকে মিশর-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বলা বাহুল্য যে, কনিষ্ঠ টলিমি, ক্লিও-পেট্রার নাম-মাত্র স্বামী হইয়া ক্লিওপেট্রার কর-ধৃত পুতুলের ন্যায় সিংহাসনের অংশভাগী হইয়া রহিলেন মাত্র। সীজার অতঃপর আর মিশরে অবস্থান নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া রোমে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। যাইবার সময় আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াতে শান্তিরক্ষার্থ বিশেষ পরিপক্ক ও শক্তিশালী একদল সেনা রাখিয়া গেলেন। রোফিনাস নামক তাঁহার একজন প্রিয়পাত্রের পুত্রকে এই সেনাদলের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হইল। বন্দিনী কুমারী আর্‌সিনু তাঁহার সঙ্গে রোমে নীত হইলেন। সাইপ্রাস ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব চিরতরে মুলতুবি রহিল। টলিমিকুলে আর কোন রাজকুমার কিংবা রাজকুমারী নাই। কে উহা শাসন করিবে?

সূর্য্য অস্ত-গমন করিলে যেমন অন্ধকার পৃথিবীকে গ্রাস করে,

সীজার রোমে প্রস্থান করিলে পর, মিশরও তেমন, কিছুদিনের জন্য অন্ধকারে ডুবিয়া রহিল। এই সময়ে মিশরে কি হইল, ঐতিহাসিকেরা তাহা বলেন নাই। সম্ভবতঃ এই সময়ে, মিশরে উল্লেখযোগ্য, বিশেষ ঘটনা কিছুই ঘটে নাই। কিন্তু সীজার কৃত ব্যবস্থা মিশরবাসিগণ ও আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার লোকেরা কি ভাবে গ্রহণ করিল, তৎসম্পর্কেও ঐতিহাসিকগণ নীরব।

খৃঃ পূঃ ৪৬ অব্দে সীজার মিশর হইতে রোমে প্রত্যাগমন করিলেন। রোমে মহা-আড়ম্বরের সহিত বিজয়ী সীজারের সংবর্দ্ধনা হইল। তিনি ক্রমান্বয়ে চারিটা প্রলয় সমরকাণ্ডে জয়লাভ করিয়াছেন। জয়োল্লাসে সমগ্র দেশ প্রতিধ্বনিত। তিনি জনসাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য, রোমীয় প্রজাতন্ত্রের চারিটি বৈদেশিক শত্রুর প্রতিনিধিকে, তাঁহারই আপনার ব্যক্তিগত মর্ম্মান্তিক শত্রুবৎ, বিশেষ কঠোরতার সহিত, মিছিলের সমারোহে রোমের রাজ-পথে প্রদর্শিত করাইলেন। এই শত্রুরই একজন মিশরের বালিকা রাজকুমারী দুর্ভাগিনী আর্‌সিনু।

যখন প্রহরীরা বালিকা রাজনন্দিনী আর্‌সিনুকে তাঁহার কিশলয়সদৃশ কোমল ও কচি হাত দুখানিকে লৌহ নিগড়ে দৃঢ় আবদ্ধ করিয়া, রোমের রাজপথ দিয়া টানিয়া লইয়া চলিল, তখন বিজয়োৎসবের সেই তাণ্ডব-উল্লাসও যেন, ক্ষণকালের তরে, স্তম্ভিত ও বিষাদ-ছায়ায় একটু ম্লান হইয়া পড়িল। বালিকার সেই কাঁচা বয়স, প্রফুল্ল পুষ্পের ন্যায় মধুর মূর্ত্তি, বালিকা-সুলভ নির্দ্দোষ ও নির্ম্মল মুখচ্ছবি; তেজঃ-প্রদীপ্ত উজ্জ্বল নয়ন-প্রান্তে অশ্রু-বিন্দু, নিটোল কপোলে আহত অভিমানের রক্তিম-রাগ, এবং শৃঙ্খলিত সিংহ-শিশুর ন্যায় তাহার তখনকার সেই ক্রুদ্ধ গ্রীবাভঙ্গি, যে দেখিল, সেই বিস্মিত হইল, তাহারই চক্ষে জল ঝরিল, সে-ই মনের আবেগে বীরকেশরী সীজারকে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারিল না।

ধরিতে গেলে, প্রকৃত প্রস্তাবে এই ধিকারের পাত্র সীজার তত নহেন,—যত আর্‌সিনুর ভগিনীরূপিণী সর্ব্বনাশিনী কাল-নাগিনী ক্লিওপেট্রা। পিতৃহীনা রাজতনয়া আর্‌সিনুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ক্লিওপেট্রাই তখন জগতের স্থূলগণনায় মাতৃস্থানীয়া। কিন্তু সেই ক্লিওপেট্রা আধিপত্য-বিস্তার ও রাজ্য-কামনার দুর্দ্দম পিপাসায় নরকের কীট ও পিশাচ হইতেও অধম এবং ক্ষমতার অংশভাগী ভ্রাতা ও ভগিনী সম্বন্ধে বিকার-বিদ্বেষপূর্ণ সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপিণী। ক্লিওপেট্রা তদীয় কনিষ্ঠা ভগিনী আর্‌সিনুকে বন্দিনীবেশে রোমের রাজপথে এরূপ নিষ্ঠুরভাবে টানিয়া নেওয়ার প্রতিকূলে একটি কথা বলিলেও, বোধ হয়, সীজার এমন অনুষ্ঠান হইতে দিতেন না। ক্লিওপেট্রার পক্ষে তাদৃশ অনুরোধ করা দূরের কথা,—বিজ্ঞ ঐতিহাসিকদিগের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস যে, ক্লিওপেট্রার নির্ম্মম প্ররোচনা ব্যতিরেকে ঈদৃশ মর্ম্মান্তিক দৃশ্য কখনই প্রকটিত হইত না। সীজার ক্লিওপেট্রার উত্তেজনায় বাধ্য হইয়াই, এই কার্য্যে সম্মতি দিয়া কলঙ্কিত হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! ইহাতেই কি ক্লিওপেট্রার ভগিনী-বিদ্বেষ মন্দীভূত হইয়াছিল?

সীজারের মিশর পরিত্যাগের কএক মাস পরেই, ক্লিওপেট্রার একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। ক্লিওপেট্রা নবজাত শিশুকে নির্ব্বিবাদে ডিক্টেটার অর্থাৎ সীজারের ঔরসজাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তাঁহার শিশু ভ্রাতা বা স্বামী ইহাতে কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না,—অন্য কোন দিক হইতেও ইহার কোন প্রতিবাদ হইল না। মিশরবাসীরা এই পুত্রকে "সীজারিয়ণ" নামে অভিহিত করিল। ক্লিওপেট্রা পুত্রের রাজকীয় সুখ ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কখনও যত্নের ত্রুটি করেন নাই। পুত্র রাজকীয় কাগজ পত্রে টলিমি ও সীজার এই দুই নামেই চিহ্নিত হইল।

যেদেশে ব্যভিচারে লজ্জা নাই; যেদেশে মাতা মুক্তকণ্ঠে আপনার সন্তানকে উপপতি হইতে উৎপন্ন জারজ বলিয়া সগৌরবে নির্দ্দেশ করিয়া, উপপতির নামে উহার নামাকরণ করিতে সাহস পায়; এবং সন্তানকে উপপতির স্বত্বে স্বত্বাবান্ করিবার নিমিত্ত প্রকাশ্যভাবে চেষ্টা করিতে পারে; পতি একটি বাক্যব্যয় না করিয়া নীরবে বসিয়া ইহা দেখিয়া লয়; যেখানে পতি ও উপপতি তুল্য; যেদেশে পতি আছে, দাম্পত্য ধর্ম্ম নাই; উপপতি আছে, প্রেম নাই; ইন্দ্রিয় সংযম ও নৈতিক জীবন উপহাসের সামগ্রী; সেদেশে প্রণয় অলীক প্রলাপ—বিবাহ বিড়ম্বনা। মিশর এই সময়ে নৈতিক হিসাবে, পশুভাবাপন্ন পিশাচ-প্রকৃতি লুব্ধ মানুষের ভারে অধঃপাতের চরম স্তরে অবনমিত হইয়াছিল, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শিশু পতির সহিত এই পুত্র-জনন-ব্যাপের কোনরূপ সংশ্রব থাকা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। ক্লিওপেট্রার অন্য কোন প্রণয়ী ছিল, এমন কথাও কেহ অবগত ছিলেন না। সীজার যখন মিশরে আগমন করেন, তখন ক্লিওপেট্রা বিংশতিবর্ষীয়া পূর্ণা যুবতী। রূপলাবণ্যময়ী সুখলালাসাতুরা ক্লিওপেট্রা, এই বয়স পর্য্যন্ত মিশরের ন্যায় দেশে অবস্থিত রহিয়াও, অনাঘ্রাত পূজা-পুষ্পের ন্যায়, যৌবন-সুলভ স্বাভাবিক সুখ-সম্ভোগে বঞ্চিত ছিলেন,—এমন অসম্ভব কথায় কেহই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। যাহাহউক, তাহার পুত্রটিকে সকলে তখন সীজারের পুত্র বলিয়াই মানিয়া লইল।

ক্লিওপেট্রা, সীজার চলিয়া আসিলে, অন্তরে একটু ভীত হইলেন। সীজার তাঁহার ক্ষমতার বাহিরে, তাঁহারা কুহক-মন্ত্র বা মোহন-ইন্দ্রজালের বহির্ভাগে দূরে অবস্থান করেন, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ছিল। অতএব তিনি দীর্ঘকাল

সীজারকে রোমে রাখিয়া মিশরে নিশ্চিন্ত রহিতে পারেন না।
সীজারের সেই ভয়াবহ ও শোচনীয় হত্যার কিছু কাল পূর্ব্বেই
ক্লিওপেট্রা রোমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার শিশু
ভ্রাতা বা পতি টলিমি রাজকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।
টাইবার নদীর অপর পারস্থিত অদূরবর্ত্তী সীজার-প্রাসাদে তাঁহারা
সাদরে পরিগৃহীত ও অবস্থাপিত হইলেন। এই প্রসঙ্গে গোঁড়া
রোমানদিগের মধ্যে একটু নিন্দাবাদও প্রচারিত হইয়াছিল;—
সীজারের চরিত্র সম্বন্ধে অনেকেই অনেক প্রকার ইঙ্গিত করিয়া-
ছিলেন।

রোমের তদানীন্তন অদ্বিতীয় রাজনৈতিক পণ্ডিত প্রথ্যাত-
নামা সিসিরো একদিন ক্লিওপেট্রার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি-
লেন। সিসিরো বলিয়াছেন, এই সাক্ষাৎকারের সহিত
রাজনৈতিক কোন ব্যাপারের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। ক্লিও-
পেট্রা আলেক্জেণ্ড্রিয়া হইতে কএক খানি দুর্ল্লভ গ্রন্থ আনাইয়া
দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধি
এমোনিয়াস্ উক্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষণে অসমর্থ হন। এই উপলক্ষেই
সিসিরোর সহিত ক্লিওপেট্রার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সিসিরো
তাঁহার তেমন অসামান্য রূপলাবণ্য ছিল, কোন প্রসঙ্গে এমন
কথা প্রকাশ করেন নাই। ক্লিওপেট্রা বড় উদ্ধত প্রকৃতির রমণী,
সিসিরো তৎসম্বন্ধে মাত্র ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। রোমীয়
রাজনৈতিক ব্যাপারে ক্লিওপেট্রার কোন হাত বা ক্ষমতা ছিল,
এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু সিসিরো এতৎসম্বন্ধে
মনে মনে সন্দিহান ছিলেন।

ক্লিওপেট্রা আফ্রিকার সেই যথেচ্ছবিহারিণী অনীতির উন্মুক্ত
গতি অপেক্ষা নীতির গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রোমের সঙ্কীর্ণ জীবন
ভাল বাসিতেন, ইহা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। অনেকে

বলেন যে, তিনি সীজারকে তদীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন ; এমন কি, তিনি সীজারকে তাঁহার রাজধানী ইলিয়াম্ বা আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াতে উঠাইয়া আনিবার নিমিত্ত বলিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। ক্লিওপেট্রা সীজারকে পার্থিয়ান্‌দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত করিতে বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই সমস্ত অনুরোধ, উপরোধ ও উত্তেজনার মূলমন্ত্র তাঁহার কোনও মনোভীষ্ট সিদ্ধি বা অভিলষিত স্বার্থ উদ্ধার। তিনি বেস বুঝিয়াছিলেন যে, সিরিয়া সীজারের করায়ত্ত হইলে, উহা পরিণামে তাঁহারই শিশু পুত্রের সম্পত্তি হইবে। ক্লিওপেট্রা যে অত কষ্ট স্বীকার করিয়া, স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী ভ্রমরীর পাখায় স্বেচ্ছাক্রমে আঁটা মাখাইয়া, সীজারের মুখ চাহিয়া রোমে আবদ্ধ ছিলেন, তাহার কারণ প্রেম নহে,—সীজারের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বা সীজারের অদর্শন ও বিরহ জন্য দুঃখ নহে। তাহার কারণ,—প্রভাব প্রতিপত্তি ও আত্মসম্পদ বৃদ্ধির দুঃসহ দুরাকাঙ্ক্ষা।

ক্লিওপেট্রা রোমে আগমন ও অবস্থান সম্বন্ধে মেরেভিল্ লিখিয়াছেন :—ক্লিওপেট্রার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা পতি বালক টলিমির সহিত রোমে আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার সাম্রাজ্য ও রোম-প্রজাতন্ত্রের মধ্যে একটা স্থায়ী সন্ধিসংস্থাপন। টাইবারের পর পারে সীজার পল্লীতে মিশর রাজ অবস্থান করিতে লাগিলেন। মিশরের লোক সাধারণতঃ রোমীয়দিগের বন্ধুরূপেই পরিগৃহীত হইল। মিশরীয় রীতির অনুসরণে সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী ও প্রেম-দেবতার মন্দিরে বহু মনোমোহিনী রমণীর মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। ক্লিওপেট্রার সহিত সীজারের গুপ্তসম্বন্ধের কথা সর্ব্বত্র প্রকাশ্যভাবে আলোচিত ও স্বীকৃত হইল। সীজার মিশরীয় রাণী ক্লিওপেট্রার ঐরূপ নিকৃষ্ট ভোগ-লালসা ও প্রভাব

প্রতিপত্তি বৃদ্ধির দুর্দ্দমনীয় লালসায় অন্ধভাবে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করাতে, তদীয় পরিণীতা পত্নী খণ্ডিতা ক্যাল্‌পার্‌নিয়াকে উপর্য্যুপরি এইরূপ অত্যাচারে এরূপ মর্ম্মাহত হইতে হইয়াছিল যে, পরিশেষে ক্যাল্‌পার্‌নিয়া এতাদৃশ অত্যাচারে আর কষ্ট বোধ করিতেন না,—তাহার হৃদয় এই শ্রেণীর কষ্টবোধের অতীত হইয়া গিয়াছিল, এবং ক্লিওপেট্রার সাহস পাইয়া আপন মুখে সকলের সম্মুখে পুত্র সীজারিয়ণকে তাঁহার রোমান প্রণয়ী সীজারের ঔরস পুত্র বলিয়া মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। রাজসভার একজন সভাসদ সন্তানসন্ততির জন্য বহু বিবাহ দূষণীয় নহে, এই মর্ম্মে সীজারের অনুমোদন ক্রমে, একটা অভিনব আইনের পাণ্ডুলিপি অনায়াসে উত্থাপন করিতে পারেন, বলিয়া তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু বলা-বলি যেরূপই হউক না কেন, কার্য্যতঃ এরূপ কোন নিন্দনীয় অনুষ্ঠান হয় নাই।

ক্লিওপেট্রার রোমে অবস্থান কাহারও পক্ষে সুখ-প্রীতিকর হয় নাই। ক্লিওপেট্রা রোমের নীতিবান্ ভদ্রলোক ও বিজ্ঞদিগের সমাজে সর্ব্বত্রই চরিত্রহীন লম্পট জাতির প্রতিনিধিরূপে উপহসিত ও ঘৃণার চক্ষে পরিলক্ষিত হইতেন। সীজারকে তিনি একেবারে তাঁহার হাতের পুতুল করিয়া রাখেন, ইহাই তাঁহার আন্তরিক অভিসন্ধি ছিল। তিনি সীজারকে এই উদ্দেশ্যে পরিহাস ও বিদ্রূপের কেল্লা রোম হইতে সরাইয়া মিশরে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যথাশক্তি যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি রোম নগরের উপকণ্ঠে একবার একটা দরবারের অনুষ্ঠান করেন। এই দরবারে শুধু ডিক্‌টেটার সীজারের পক্ষাবলম্বিগণই উপস্থিত থাকিবেন,—দরবার শুধু সাজারিয়ান্‌দিগকে লইয়াই করা হইবে,

কথা ছিল। অথচ কার্য্যকালে তাহা হইল না। ক্লিওপেট্রার হাস্য-বিলসিত মুখ-মাধুরী দেখিয়া লইবার নিমিত্ত, সীজারের: শক্রপক্ষীয় বহু লোক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া গুপ্তভাবে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ক্রমে রোমের সেই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিন, সেই ঘোর বিপ্লব, সীজারের সেই রোমহর্ষণ নিষ্ঠুর হত্যার সময় উপস্থিত হইল। ক্লিওপেট্রা এক দিন সীজারের হত্যার সংবাদ পাইয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ভীত, ত্রস্ত, উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত সীজার পক্ষীর হাহাকার ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। স্বার্থপরায়ণা মায়াবিনী এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু দ্বারাও তাঁহার রোমান-প্রণয়ীর অন্তিম-তর্পণ করিয়াছিলেন কি না, কেহই তাহা অবগত নহেন! কিন্তু সীজারের মৃত্যুর পরেও কিছু দিন তিনি রোমে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, সীজারিয়ান্ অর্থাৎ সীজারের পক্ষীয় লোকেরা তাঁহার শিশুপুত্রকে সীজার-সন্তানরূপে সাদরে পরিগ্রহ করিবে। তিনি এই উদ্দেশ্যে বহু চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা ফলবতী হইল না। জারজ বলিয়া, তাঁহার পুত্রের পানে কোনও রোমান ফিরিয়াও চাহিল না। তখন তিনি গোপনে কোন্ জাহাজের যোগে মিশরে পলায়ন করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে, সিসিরোর ন্যায় সাবধান ব্যক্তিও আপদ গিয়াছে ভাবিয়া, সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ক্লিওপেট্রা পুনরন্তর্বর্তী, এইরূপ একটা জনরব উঠিয়াছিল। কিন্তু এ জনরব সর্ব্বৈব মিথ্যা।

সিসিরো ক্লিওপেট্রার পলায়ন প্রসঙ্গে বালক টলিমির কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহার পরেও আর তাঁহার কোন কথা শুনা যায় নাই। ইহাতে বোধ হয়, সে যুবক রাজা তখন জীবিত ছিলেন না। ক্লিওপেট্রার রোম পরিত্যাগের পূর্ব্বে, রোমেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

পতি ও ভ্রাতা যুবক টলিমির বয়স যত বাড়িতে লাগিল, ততই তিনি ক্লিওপেট্রার অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। তিনি এতদিন সম্পর্কে ভ্রাতা ও পতিমাত্র ছিলেন। বালক পতি অভিভাবিকা রূপিণী পত্নীর ইঙ্গিতে শিশুর ন্যায় পরিচালিত হইতেন। তিনি কোন অংশেও ক্লিওপেট্রার যথেচ্ছ-গতি বা সুখের পথে কোনরূপ অন্তরায় ছিলেন না। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এখন তিনি তাঁহার পথের কাটা ও চক্ষুশূল হইয়া উঠিলেন। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া মিশরে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই, ক্লিপপেট্রা বিষপ্রয়োগে সেই পথের কাঁটা দূর করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহাই সর্ব্বসাধারণের দৃঢ় ধারণা ও বিশ্বাস। তিনি রাজত্বের প্রথম চারি বৎসর কাল, দুই ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠের সহিত তৎপর চারি বৎসর কাল কনিষ্ঠের সহিত একত্র রাজ্য শাসন করিয়া সীজারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই একবারে সর্ব্বময়ী রাজ্যেশ্বরী রূপে মিশরে প্রত্যাগত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ।

সোনার স্বপন।

১

স্বপনে আসিয়া সে গো,
স্বপনে গিয়াছে চলি';
শিয়রে সে ব'সেছিল,
করুণ নয়ন মেলি'!

২

কি যেন সে ব'লেছিল,
ভাঙ্গিয়া সুষুপ্তি মোর;

হেরিনু মেলিয়া আঁখি,—
যামিনী হয়েছে ভোর!

৩

পাখীরা বলিল ডাকি',—
"পোহায়েছে বিভাবরী,—
রাখ স্বপ্ন-অভিসার,
হাতে পায় ধরা-ধরি"।

৪

চমকি' উঠিতে গেনু,
হৃদি-বাস গেল খুলি,'—
হেরিনু সে সিংহাসনে,
কাহার চরণ-ধূলি!

৫

মরম-বেদনা মম,
সকলি হইল দূর;—
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—যা'ক্
সোনার স্বপন মোর!

শ্রীমতী পূর্ণশশী দে রায়।

প্রাচীন ঢাকা।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, আফ্‌গানগণ দীল্লীশ্বর আকবর বাদশাহ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া, উড়িষ্যা ও প্রাচীন ঢাকার সীমান্ত প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে; এবং তথায় তাহারা উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক ধামরাইর নিকটবর্ত্তী গণকপাড়া ও গৌরীপাড়া নামক স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করে। মোগল সম্রাট

আকবরের মৃত্যুর পর, ১৬০৫ খৃঃ অব্দে ওস্মান খাঁ নামক জনৈক সমৃদ্ধ আফ্গান নিম্নবঙ্গ দখল করিয়া বসেন। উক্ত আফগান-শ্রেষ্ঠ ওস্মান খাঁ ১৬১২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিম্নবঙ্গে স্বীয় পদ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। তৎপর ইস্লাম খাঁর নেতৃত্বাধীনে ওস্মান খাঁ মোগল সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। দীল্লিতে তখন সম্রাট জাহাঙ্গীর বাদশাহ রাজত্ব করিতেছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর অতঃপর মোগল-সেনা-নায়ক উক্ত ইস্লাম খাঁকেই বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

বঙ্গেশ্বর ইস্লাম খাঁ নূতন চাকুরীতে বহাল হইয়াই, রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী উঠাইয়া আনেন, এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারেই ঢাকার "জাহাঙ্গীরনগর" নামকরণ করিয়া লন। ইস্লাম খাঁর শাসন-সময়ে সন্দীপের সার্ব্বভৌম অধীশ্বর সিবাষ্টিয়ান্ গঞ্জেলিসের (Sebastian Gonzales) নেতৃত্বাধীনে পর্ত্তুগীজ জল-দস্যুগণ বঙ্গদেশ আক্রমণ করে। এদিকে আরাকান-রাজ বাঙ্গলা আক্রমণ করিবার নিমিত্ত পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগের সহিত এক গুপ্ত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, উভয় পক্ষের সৈন্য সমবেত পূর্ব্বক বঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং বিনা বাধা বিপত্তিতে মেঘনা নদের পূর্ব্বপাড় পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশ দখল করিয়া লই-লেন। কিন্তু অচিরেই বহুসংখ্যক মোগল-সৈন্য আগমন করতঃ আরাকানীদিগকে পরাজিত করিয়াছিল, এবং সেই খণ্ডযুদ্ধে বহুতর আরকানী সৈন্য নিহত হইয়াছিল। বঙ্গেশ্বর ইস্লাম খাঁ খুব সুখ্যাতির সহিতই বাঙ্গালার শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে-ছিলেন। কিন্তু দারুণ কালের চক্ষে তাহা সহিল না। ১৬১৩ খৃঃ অব্দে ঢাকায়ই তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে।

ইসলাম খাঁর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে সম্রাট জাহাঙ্গীর বাদশাহ বাস্তবিকই বড় মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। ইস্লাম

খাঁর প্রতি বাদশাহের আন্তরিক প্রগাঢ় ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ, তিনি ইস্‌লাম খাঁর ভ্রাতা কাশিম খাঁকে বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। এই সময়ে সন্দ্বীপের অধিস্বামী পর্ত্তুগীজ দস্যু-সর্দ্দার গঞ্জেলিস্ ভারতস্থ পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ সমূহের প্রতিনিধির সাহায্য লইয়া, আরাকান আক্রমণের জন্য এক বিরাট আয়োজন করেন। কিন্তু নির্ভীক-চেতা আরাকান-রাজ কতিপয় দিনেমার পোতাধ্যক্ষের সাহায্যে পর্ত্তুগীজগণকে সম্যক্‌রূপে হটাইয়া দিয়াছিলেন; এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসরে সন্দ্বীপ আক্রমণ করতঃ তাহা দখল করিয়া বসেন। ইহার পর হইতেই আরাকানী মগগণ প্রায়শঃ নিম্নবঙ্গের অধিকাংশ স্থান আক্রমণ ও লুট-তরাজ করিতে আরম্ভ করে, এবং অধিবাসীদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে সচেষ্ট হয়,—এমন কি, অনেককে 'দাস' করিয়া লইয়া যায়। অসভ্য মগের আক্রমণ হইতে বাঙ্গালা রক্ষা করিতে নিতান্ত অসমর্থ বিধায়, দীল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর বাদশাহ কাশিম খাঁকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন। উহার ফলে, ১৬১৮ খৃঃ অব্দে কাশিম খাঁ বাঙ্গালার মস্‌নদ হইতে অপসৃত হন। তৎপর ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার গদিতে বসেন। ইব্রাহিম খাঁর শাসন-কালেই ইংরেজ বণিক্‌গণ সর্ব্বপ্রথম এতদ্দেশে আগমন করে।*

---

* "Some years previous to this time, agents have been sent overland from Surat to Agra where they had established a factory ; and on their representation, two persons were sent (A. D. 1620) to Patna to purchase clothes and to establish a house of business in that city ; but the great expense of land carriage, first to Agra, and then to Surat, so enhanced the price of the articles, that in the following year the trade was abandoned."—*Messrs. Hughes' and Parker's India Records, A. D. 1620, vol I.*

ইত্যবসরে দীল্লিতে এক অভাবনীয় ঘটনার সূত্রপাত হয়। সম্রাট-তনয় শাহজাহান তদীয় পিতা দীল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। শাহজাহান অতঃপর বাঙ্গালা আক্রমণ করেন ; কিন্তু বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা ইব্রাহিম খাঁ সসৈন্য ঢাকা পরিত্যাগ করতঃ রাজমহলে গিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় একটি বড় রকমের যুদ্ধও হইয়াছিল ; সেই যুদ্ধে বঙ্গেশ্বর ইব্রাহিম খাঁ পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর সম্রাট-তনয় শাহজাহান সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনের পর, দুর্গের দ্বারগুলি খোলা হইল, এবং সমস্ত হস্তী, ঘোটক ও চারি লক্ষ টাকা শাহজাহানের সমক্ষে সমুপস্থাপিত করা হইয়াছিল। ঢাকায় অল্পদিন অবস্থানের পর শাহজাহান পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং পশ্চিমধ্যে এলাহাবাদের সন্নিকট সম্রাট জাহাঙ্গীর-প্রেরিত মোগল সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন।

যখন সম্রাট জাহাঙ্গীর শুনিলেন যে, তাঁহার পুত্র বাঙ্গালা হইতে পলায়ন করিয়াছেন, তখন মহব্বৎ খাঁকে বঙ্গদেশের শাসন-কর্ত্তা মনোনীত করিয়া পাঠাইলেন, এবং মহব্বৎ খাঁর কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য খানেজাদ্ খাঁকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

মহব্বৎ খাঁর পর মুকুরেম্ খাঁ বঙ্গদেশের শাসন-কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এক জল-যাত্রায়, তিনি জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। অতঃপর নবাব ফেদাই খাঁ বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আইসেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের

১৬২৮ খৃঃ অব্দে নবাব ফেদাই খাঁর স্থলে কাশিম খাঁ যবুনীকে নিযুক্ত করেন। কাশিম খাঁর শাসন-সময়ে হুগুলীতে প্রায় সমস্ত পর্ত্তুগীজকেই নিদারুণ রূপে হত্যা করা হয়।

১৬৩২ খৃঃ অব্দে ঢাকায়ই কাশিম খাঁ পরলোক গমন করেন। তৎপর আজিম খাঁ বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আইসেন। আজিম খাঁর শাসন-সময়েই দীল্লীশ্বর শাহজাহান হইতে গৃহীত "ফর্‌মাণের" ফলে, ইংরেজ বণিক্‌গণ স্বীয় জাহাজযোগে সমগ্র বাঙ্গালায় বাণিজ্য-ব্যবসায় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু মোগল সম্রাট পর্ত্তুগীজদিগের ন্যায় ইউরোপ-বাসীদিগকে গঙ্গা নদীতে প্রবেশাধিকার দিয়াও বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। অতএব ইংরেজ বণিক্‌গণকে কেবল বালেশ্বরের পিপ্‌লী বন্দরেই প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছিল। বাঙ্গালায় পিপ্‌লীতেই ইংরেজ বণিক্‌গণ সর্ব্বপ্রথম বাণিজ্য-বন্দর সংস্থাপন করেন।*

এত বড় বঙ্গদেশ শাসন করিতে আজিম খাঁ নিতান্ত অসমর্থ বিধায়, তাঁহাকে অপসৃত করিয়া, ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে ইস্‌লাম খাঁকে তৎপদে সমাসীন করা হয়। ইঁহার শাসন-কালেই মগ-শ্রেষ্ঠ মুকুট রায় (যিনি আরাকান-রাজের স্থলে চট্টগ্রাম শাসন করিতেছিলেন) ভারত-সম্রাটের অনুগ্রহ প্রার্থী হইয়াছিলেন। মুকুট রায় ঢাকায় উপস্থিত হইয়া, ইস্‌লাম খাঁর নিকট বিস্তর উপঢৌকন প্রেরণ করতঃ যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন, এবং নিজকে মোগল সম্রাটের প্রজা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে স্বীয় রাজ্যের শাসন-কার্য্যের সমস্ত ভার সমর্পণ করেন।

* "A *Phirmund* had been obtained on the 2nd Feb, 1634, for the liberty of trade to the English in the Province of Bengal, without any other restriction than that the English ships were to resort to only to the port Piply."—*Annals of the Hon. East India Company by John Bruce. P. 320.*

ইস্‌লাম খাঁ ঢাকায় এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, এবং নৌ-সৈন্য, রণ-পোতাদি ও যুদ্ধোপকরণ প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত করেন। ইস্‌লাম খাঁর দুর্গের ভগ্নাবশেষ এক্ষণ আর বিদ্যমান নাই। সেই দুর্গ, বর্ত্তমান জেলখানা, কোতোয়ালী ও হাস্‌পাতাল ব্যাপিয়া ছিল; এবং উহার মধ্যে নবাবের প্রাসাদ, উদ্যান-বাটিকা বিচারালয়, ও টাকশাল প্রভৃতি সকলই ছিল।*

ইস্‌লাম খাঁর পর সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান মহম্মদ সুজা বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হন। মহম্মদ সুজা ঢাকায় কিয়ৎকাল অবস্থানের পর, রাজমহলে পুনরায় রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন; এবং তাঁহার সুদীর্ঘ বিংশতি বৎসর-ব্যাপী শাসন-সময়ে নানা বিভাগের উৎকর্ষ বিধান করিয়া, যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। মহম্মদ সুজা ইউরোপীয় বণিক্‌-গণকে বঙ্গে বাণিজ্য-বিষয়ে সম্মতিদানে যথেষ্ট আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তখন ইংলণ্ডে প্রথম চার্লস্ রাজত্ব করিতে-ছিলেন। রাষ্ট্র-বিপ্লবের দরুণ ইংলণ্ডে তখন সোরার দাম বড়ই বাড়িয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ বণিক্‌গণ যদৃচ্ছাক্রমে এতদ্দেশ হইতে সোরা (Salt petre) ইংলণ্ডে রপ্তানী করিবার অনুমতি পাইয়া-ছিলেন। মহম্মদ সুজার সময়ে, ১৬৩০ খৃঃ অব্দে হুগলী ও বালে-শ্বরে ইংরেজ বণিক্‌দিগের বাণিজ্য-বন্দর সংস্থাপিত হয়। বাঙ্গা-লায় অবাধ বাণিজ্যের দরুণ, তিনি ইংরেজ বণিক্‌গণকে তাঁহার "নিশান" দিয়াছিলেন। যে সকল বাণিজ্য-পোতে উক্ত নিশান লম্বমান রহিত, তৎসমুদায়কে কেহ কখনও আটকাইত না। ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে তিনি লালবাগের অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বদিকে চকের

* "The fort, no vestige of which now exists, occupied the site of the present Jail, Cotwali, and adjoining Hospitals, and enclosed within its walls Nawab's palace, and gardens, the court of justice and mint."

সম্মুখে এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। ঐ প্রাসাদের নাম ছিল—"কুটী"। অধুনা উহার ভগ্নাবশেষও দৃষ্টিগোচর হয় না।*

সম্রাট শাহজাহান পীড়িত হইলে পর, মহম্মদ সুজা সিংহাসন দাবী করিয়া, দীল্লির দিকে অগ্রসর হইলেন। সুজা মোগল সৈন্যগণ কর্ত্তৃক তিনবার পরাজিত হইয়া, অবশেষে ঢাকায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন; কিন্তু মিরজুম্‌লা আবার তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলেন। তখন হতভাগ্য সম্রাট-তনয় সুজা সপরিবারে আরকান-রাজের আশ্রয়-ভিখারী হন। আরাকান-রাজ প্রথমতঃ তাঁহাকে রাজোচিত সম্মানের সহিতই অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু পরিশেষে নিতান্ত বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। সম্রাট-তনয় সুজা একদিন পথিমধ্যে সহসা আক্রান্ত হইয়া আরকান-রাজের বন্দী হন; এবং আরা-কান-রাজের ষড়যন্ত্রেই সুজাকে জলে ডুবাইয়া মারা হয়! শাহ-জাহানের কাতরাবস্থায় দীল্লির সিংহাসন লইয়া, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে যে বিবাদের সূত্রপাত হয়, তাহাতে মিরজুম্‌লা তদীয় শুভাকাঙ্ক্ষী আশ্রয়-দাতা আওরঙ্গজীবেরই পক্ষাবলম্বন করিয়া-ছিলেন। আওরঙ্গজীব সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই, প্রত্যুপ-কারের চিহ্নস্বরূপ মিরজুম্‌লাকে বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান।

---

* "One of the public buildings now in ruins—*the Great Kutee*—was built by the direction of Sultan Mahammed Shuja in 1645. It is situated half a mile to the eastward of *Lalbag* in front of the *Chowk* and fills up a considerable portion of the space between that square and the river. It presented on the side next to the *Boori Ganga* an extensive front and having a lofty central gateway, flanked by smaller entrances and by two octagonal towers which rose to some height above the body of the building."

মিরজুম্‌লা পুনরায় ঢাকায়ই রাজধানী উঠাইয়া আনেন। এই সময়েই ঢাকার সর্ব্ববিধ উন্নতি সংসাধিত হয় বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বলেন। মগগণের ও অন্যান্য সীমান্তবাসীদিগের আক্রমণ হইতে বাঙ্গালাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মিরজুম্‌লা ধলেশ্বরী ও শীতলাক্ষার সঙ্গমস্থলে অনেকগুলি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; এবং অদ্যাপিও সে সকল দুর্গাদির ভগ্নাবশেষ লোক-চক্ষের গোচরীভূত হয়। উক্ত দুর্গ সমূহের মধ্যে হাজিগঞ্জ ও ইদ্রকপুরের দুর্গই প্রসিদ্ধ। ইদ্রকপুরের দুর্গের স্থানে এক্ষণ মুন্‌সীগঞ্জের ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রের বাসা-বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে।

"কুটি"র (The kutee) সম্মুখভাগে যে দুইটি কামান ছিল, তাহা মিরজুম্‌লার আদেশেই নির্ম্মিত ও সেইস্থানে রক্ষিত হয়। উক্ত কামানদ্বয়ের বড়টি বুড়ীগঙ্গার মধ্যস্থ এক বালু-চরে রাখা হইয়াছিল; কিন্তু কএক বৎসর হইল, উহা বালুকার স্তরে লোক-চক্ষুর অগোচর হইয়াছে। অপর ছোটটিকে (যাহা শোয়ারীঘাটে ছিল) ১৮২৮ খৃঃ অব্দে টানিয়া আনিয়া, চক বাজারের কেন্দ্রস্থলে রাখা হইয়াছে। উক্ত কামানটির ওজন আনুমানিক ৬৪৮১৫ পাউণ্ড। মিরজুম্‌লা সৈন্য চলা-চলের জন্য বহুতর রাস্তা ও সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পাগ্‌লা ও টঙ্গির সেতু তিনিই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সেতুটির কোন চিহ্ন এক্ষণ বিদ্যমান নাই; কিন্তু শেষোক্ত সেতুটি সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কার্ণাক্ ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তৎপর উহা কাষ্ঠদ্বারা পুনঃনির্ম্মাণ করা হয়; অদ্যাপিও সেই সেতুর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে।

মিরজুম্‌লা বহুতর মোগল নৌ-সৈন্য সহ আসাম আক্রমণের জন্য এক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি প্রথমতঃ বহু স্থানের খণ্ড যুদ্ধাদিতে জয় লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি অব-

শেষে স্বীয় সৈন্যবর্গের মধ্যে পীড়ার প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এমন কি, স্বয়ং মিরজুম্‌লাই কাতরাবস্থায় ঢাকায় আসিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

মিরজুম্‌লার মৃত্যুর পর তাঁহার সৈন্যগণ রাজমহলে অবস্থান করিতেছিল। মিরজুম্‌লার বঙ্গ-শাসনের শেষ অবস্থায়, তিনি ইংরেজ বণিক্‌গণের সোরা বোঝাই বাণিজ্য-পোতগুলির অবাধ বাণিজ্যের পথে প্রতিবন্ধকতা জন্মাইয়াছিলেন। উহাতে পাটনার ইংরেজ বণিক্‌মণ্ডলীর সমূহ ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। অতঃপর ইংরেজ বণিক্‌বর্গ প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, ১৬৬০ খৃঃ অব্দে মিরজুম্‌লার এক নৌকা আটকাইয়া রাখেন। কিন্তু এজন্য মিরজুম্‌লা উক্ত বণিক্‌গণকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া দিবার ভয় প্রদর্শন করিলে, ১৬৬১ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে ইংরেজ বণিক্‌গণ স্বীয় ত্রুটী স্বীকার করিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মিরজুম্‌লা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, এবং তাহারাও নৌকাটি প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। হুগলীর ফৌজাদার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বার্ষিক তিন সহস্র টাকা "ফরমাণ্,' তিনি সর্ব্বদাই ইংরেজ বণিক্‌গণ হইতে আদায় করিয়া লইতেন। মিরজুম্‌লার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভগ্নী-পুত্র সায়েস্তা খাঁ আমীর উল্ ওম্‌রা বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হন।

শ্রীকামিনীকুমার দে রায়।

ছায়া।

১

মোর আঁখির মাঝারে, দিবস যামিনী
ছায়া খানি তার ভাসে,—
তার নয়ন-মদিরা, নীলিম মাধুরী,
কি নেশা বিতরি' হাসে!

২

তার অধরে অরুণ, অলকে নীলিমা,
নয়নের লাজ হাসি ;
তার আশা-ভরা ভাষা,— বীণার রাগিণী,
আমি কত ভালবাসি !

৩

মথি' ফুলের সুরভি, চাঁদের অমিয়া,
যৌবনের সুখ-সুরা,—
সে যে অধীর হৃদের তরল বাসনা,
বিগলিত প্রেম-ধারা !

কুমার সুরেশচন্দ্র সিংহ, বি, এ।

কবিতার খাতা।

(গল্প)

১

জানকীনাথের বরাবরই ইচ্ছা, তাহাকে লোকে একজন কবি, —কিম্বা অন্ততঃ একজন খ্যাতিমান্ লেখক বলিয়া জানে। এই-জন্ত বৃদ্ধ পিতার একমাত্র বংশধর হইয়াও, সে শিশুকাল হইতেই বাঙ্গালা ভাষা নিয়া নাড়া-চাড়া করিয়া আসিতেছিল ; এবং বঙ্গ ভাষার আধুনিক দুর্গতি বিমোচনার্থই পাশ্চাত্য-নীতিবান্ শ্রীমান্ নলিন্ ও শচীন্ ভূষণকে সঙ্গী করিয়া, একটী "বঙ্গভাষা-উন্নতি-বিধায়িনী কন্ফারেন্স" প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছিল। জানকীনাথ আপনাকে বেস শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া জানিত; তদুপরি বিশ্বস্ত বন্ধুদ্বয়ের শ্রদ্ধা-সম্ভাষণ—"রাজকবি" (Poet Laureate) যখন কথায় কথায় তাহারই লক্ষ্যে ধ্বনিত হইত, তখন সে এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সহস্র যোজন উর্দ্ধে উঠিয়া

আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত। জানকীনাথ সবে যৌবনের প্রথমাঙ্কে পা ফেলিয়াছে; এখনও ভ্রমর-কৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজি, তাহার সমগ্র মুখখানি দখল করিবার সুযোগ পায় নাই। এই সুকুমার বয়সে, যখনই সে আপনার কবি-শোভন স্কন্ধ-দোলায়িত কুন্তল-কলাপ যথা-সমাবেশ করিতে করিতে, প্রাচীর-সংলগ্ন দর্পণ খানির সম্মুখে, ভঙ্গিমা-সহকারে দাঁড়াইত, তখনই কবিত্ব ও ভাবের পূর্ণ আবেগে তাহার আপাদশির স্তম্ভিত হইয়া রহিত!

দেশ-দুর্দ্দশার বিষম অনুপ্রাণনে আবিষ্ট-প্রাণ জানকীনাথ বাঙ্গালার ভূত ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, একপ্রকার নিরাশ হইয়াই পড়িয়াছিল। এই এক-প্রাণতার নিরাশ-স্পন্দনগুলি কালক্রমে ঘনীভূত হইয়া, তাহার মধ্যে যে ভাব-তরঙ্গের উন্নত স্তর সৃজন করিতেছিল, তাহারই অনুভূতি নিয়া, মাঝে মাঝে সে আক্ষেপ করিয়া বলিত,—"হায় হায়! দেশের দুর্গতি—ভাষার দুর্দ্দশার কথা আর কাহাকে বলিব? এ পোড়া দেশে কি মানুষ আছে, যাহার কাছে দু'টা কথা বলিলে, সে তাহা বুঝিবে, বা অনুসরণ করিবে?"

সমস্বরে বন্ধুদ্বয়ের কণ্ঠে অমনি প্রতিধ্বনি উঠিত,—"তা, বটেই তো! বড়ই পরিতাপের বিষয়—দেশের একান্ত দুর্ভাগ্য যে, কেহই আপনার মহদুদ্দেশ্য বুঝিল না!"

জানকীনাথ বলিল,—"দেশের দুরবস্থা কিসেই বা ঘুচাইব? ভাল, আমার মধ্যে কি এমন কোন শক্তি নাই—(বন্ধু-কণ্ঠে অমনি সোৎসাহ-স্বর বাজিয়া উঠিত,—না থাকিবে কেন? আমরা সহস্রবার বলি,—আছে, আছে, আছে!) যাহার এক পরমাণু ক্ষয় করিয়া,—হয়, একটা বক্তৃতা দিয়া, নয়, একবার আমার লেখনী চালাইয়া—এই পতিত দেশটাকে উন্নতির সোপানে টানিয়া লইতে পারি?"

বহু গবেষণার পর স্থির হইল,—বক্তৃতায় বিশেষ ফল নাই; আজ কাল লোকে প্রায়ই বক্তৃতা বুঝেনা; যদিও দু'এক জনে বুঝিল, তবু তাহারা তাহা অনুসরণ করিতে চায় না; আর যদিই বা দু'একজন অনুসরণ করিল, তাহাতে তো আর গোটা দেশটার কোন ফল হইল না। পক্ষান্তরে, জানকীনাথ বেস জানে সে একজন কবি ও ভাবুক; সুতরাং তাহার পক্ষে এক পৃষ্ঠা লেখনী চালাইয়া এ দেশটাকে জাগান সহজ-সাধ্য। বিশেষতঃ ইহাতে জগতের লোকে জানকীনাথকে চিনিবে। ভাবিতে-ভাবিতে, দেখিতে-দেখিতে, জানকীনাথের কবিতার খাতা খানি একটি নূতন কবিতা পৃষ্ঠে করিয়া হাসিয়া উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া যথাসময়ে, "মদন-মঞ্জরী' পত্রিকার অঙ্গ কৃতার্থ করিয়া জানকীনাথের "ঘুম-ভাঙ্গা'—কবিতা খনি প্রকাশিত হইল। "বর্দ্ধমান দর্পণের' সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রচারিত হইল,—"* * এ কবিকে উৎসাহ দেওয়া হোক্। ইনিই বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষার একমাত্র প্রাণ; * *।" বলা বাহুল্য যে, এ প্রশংসায় জানকীনাথ একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িল। বন্ধুদ্বয় আসিয়া হাসিয়া বলিল,—"হা, হা, দেখ্‌ছি—এ পোড়া দেশে এখনও দু'একজন মানুষ আছে।"

২

জানকীনাথের খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে, তাহার ধর্ম্ম-জীবনও নূতন দীক্ষা পাইতে একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সে ভাবিল,—"চির-জীবনটা এই পৌত্তলিক-প্রদেশে লাগিয়া থাকিলে চলিবে কেন? কাল্পনিক মূর্ত্তি বিশেষে হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধাটুকু ব্যয়িত করিয়া, এ জীবনটাকে কি শুধু নিষ্ফল, শাস্ত্র-নিয়মিত করিয়া তুলিব? আজ আমি একটা জাতির তলে স্বাধীনতার ভিত্তি তুলিতে যাই-তেছি, এসময়ে আমি নিজেই গণ্ডী-বদ্ধ হইয়া থাকিলে, দেশ যে উৎসন্ন যাইবে। স্বাধীন উপাসনার প্রেমময় স্তর ভেদ করিয়া,

প্রাণে প্রাণে স্বাধীন প্রেমের তরঙ্গ ফুটাইতে পারিলেই, দেশের মঙ্গল। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া, সে স্পষ্টই দেখিতে পাইল যে, স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, দেশের সর্ব্ব বিষয়েই— এমন কি, মানুষের ধর্ম্ম-জীবনেও—স্বাধীন পদ্ধতি যুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

এই প্রকারে জীবনের গতিবিধি স্বাধীনতাভিমুখিনী করিয়া, জানকীনাথ নিত্য নূতন সুখের আস্বাদন পাইতে লাগিল; এবং এই সূত্রে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্য রাজকুমার বাবুর সঙ্গে তাহার অচ্ছেদ্য অন্তরঙ্গতা ঘটিয়া উঠিল।

এভাবে কয়েকমাস অতিবাহিত হইল। এখন আর জানকীনাথের সেদিন নাই। ধর্ম্ম-জীবনের নূতন আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে সে এখন 'সাধক' ধরিতে পারিয়াছে; শুধু খ্যাতির দিকে লক্ষ্য রাখিলে তাহার চলিবে না। এক্ষণ সে একজন সমাজ-সংস্কারক। সুতরাং যাহাতে সমাজের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা তাহার প্রধান কর্ত্তব্য। দেশের সন্তানগণকে জাগাইবার পূর্ব্বে, তাহাদের মাতৃকুলকে জাগাইতেই হইবে। দেশের আশা, ভরসা,—যাহা কিছু বল সকলই—এক রমণীকুল।

যাহা হউক, রাজকুমার বাবুর সঙ্গে বিশেষ আত্মীয়তা থাকায়, এবিষয়ে জানকীনাথ প্রথমতঃ তাহার উপদেশই গ্রহণ করিল। এসম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে মতদ্বৈধ হইল না। জানকীনাথের প্রস্তাবক্রমে, উপাচার্য্য রাজকুমার বাবুর অন্তঃপুরেই "রমণী-সংস্কার-সমিতি"র প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে, কিম্বা জানকীনাথের আগ্রহাতিশয্যে, রাজকুমার বাবুর জ্যেষ্ঠা দুহিতা শ্রীমতী চপলকুমারী "সমিতি"র সম্পাদিকার পদে অভিষিক্তা হইলেন।

৩

এদিকে, জানকীনাথের বৃদ্ধ পিতা কেদারনাথ রায়, চক্ষু মুদিবার পূর্ব্বে একটি পৌত্রের মুখ দেখিয়া যাইবেন, এই আশায় আপন পুত্রের সঙ্গে, স্বীয় প্রতিবেশী উকীল গোপালগোবিন্দ বাবুর একমাত্র অতি সুন্দরী দুহিতা সুষমার বিবাহ সংঘটনার্থ উদ্যোগী হইলেন। বিপত্নীক বৃদ্ধ কেদারনাথ রায়ের অপর কোনও সন্তান সন্ততি ছিল না। ভাবিয়াছিলেন,—জীবনের এত-কাল তো অসীম দুঃখ কষ্টেই কাটাইয়াছেন, এখন এই বৃদ্ধ-বয়সে পুত্রবধূকে লইয়া কএকদিন আমোদ-আহ্লাদ করিবেন, এবং ভগবানের কৃপায় একটি পৌত্রের মুখ দেখিয়া মরিতে পারিলেই তিনি যথেষ্ট সুখী; তাই এ বিষয়ে পুত্রের মতামতের জন্য তিনি বিশেষ অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু কথাটা এক দুই করিয়া জানকীনাথের কানে পঁহুচিলে, সে তার-স্বরে বলিয়া উঠিল,—"Oh! Marriage?—That I can negatively do now. You see, there lies this responsible world still on my arms!"—অর্থাৎ বিবাহ?—সেতো এক্ষণ কিছুতেই হইতে পারে না;—দেখ ছুই তো, দায়িত্বময় এসংসার এখনও আমার মুখাপেক্ষী। বন্ধুদ্বয় আসিলে, সে তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিল,—"দেখ হে, আমার বিবাহের অবসর নাই। বিশেষতঃ এই কচি বয়সে বিবাহ করিয়া, এখনই যদি মানসিক বৃত্তিগুলির অপচয় করিয়া বসি, তবে দেশের ও দশের আশা আর থাকে কোথায়?" "বাহাবা!—বাহাবা!"—বলিয়া বন্ধুদ্বয় জানকীনাথের এহেন নিঃস্বার্থ স্বদেশ-সেবার প্রশংসা করিতে লাগিল। জানকীনাথও, এই অবসরে, মনের অবাধগতিতে রমণী-সংস্কারোদ্দেশে চপলকুমারীর গৃহাভিমুখে ছুটিল।

চপলকুমারী অনূঢ়া সুন্দরী যুবতী,—সবে মাত্র যৌবনের মাঝখানে পা দিয়াছেন; সুতরাং যৌবন-সুলভ সুকুমার মাধুরীতে

টল-টল লাবণ্যময়ী। দুষ্টলোকে, চপলকুমারীর প্রস্ফুট যৌবন-মুকুরে জানকীনাথের তীক্ষ্ণ চাহনির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত দেখিয়া, নানা কথা বলিত। কিন্তু এসব আমরা বিশ্বাস করিতে চাহি নাই। তবে, "সংস্কার-সমিতির"র কার্য্যনির্ব্বাহার্থ অনেক সময় যে, তাহাদিগকে নির্জ্জন-বাস করিতে হইত,—এবং অদর্শন-কালে চাপরাশী উভয় পক্ষের খাতাপত্র লইয়া, হেথাহোথা ছুটা-ছুটি করিত, ইহা সুনিশ্চিত। এসব রাজনৈতিক গুপ্ত রহস্য! এজন্য আমরা জানকীনাথকে এপর্য্যন্ত দোষ দিতে পারি নাই।

যাহা হউক, দিন দিন জানকীনাথের ভিতরে যেন কি একটা উদাসময় পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ করিল। খ্যাতি, বা সম্ভ্রমের প্রতি তাহার আর বড় দৃষ্টি নাই। "রমণী-সংস্কার-সমিতি"র কার্য্যাদি লইয়াই আজকাল সে ভারী ব্যস্ত। সংস্কারের নূতন নিয়মাবলিপূর্ণ তাহার কবিতার খাতা খানি দিবসে দুইবার সম্পাদিকার প্রকোষ্ঠপানে চালান হইত। তাহাতে কি থাকিত, না থাকিত, তাহা আমরা ঠিক বলিতে সক্ষম নহি। তবে আমরা বিশ্বস্তসূত্রে এইমাত্র জানিয়াছিলাম যে, জানকীনাথের কবিতার খাতাখানি নূতন কবিতায় প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; এবং নিত্যকার নূতন কবিতাগুলি অতি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া, সম্পাদিকা মহাশয়া প্রতি কবিতার নিম্নে তাহার নিজ নাম সহি করিয়া দিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন আমরা আরও একটি খবর রাখিতাম যে, আজকাল চপলকুমারীও বেশ কবিতা লিখিয়া থাকেন। এসংবাদ আমাদিগকে জানকীনাথ স্বয়ংই বলিয়া-ছিলেন,—সুতরাং অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই।

৪

চপলকুমারীর গৃহ হইতে ফিরিয়া একদিন জানকীনাথ

তাহার পিতা আসিয়া বলিলেন,—“এইমাত্র চিঠি আসিয়াছে, তোমার একমাত্র মাতুলের মৃত্যু হইয়াছে; সুতরাং তোমাকে একবার মাতুলালয়ে যাইতে হইবেক।” এমন অসময়ে মাতুলের মৃত্যু-সংবাদ অবগত হওয়ার জন্য জানকীনাথের মন কখনই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু পিতার ঐকান্তিক অনুরোধে, বিশেষতঃ মাতুলের সুবৃহৎ সম্পত্তির অপর কেহ উত্তরাধিকারী না থাকায়,—কালে সে-ই তাহার একমাত্র ভোগ-কর্ত্তা হইবে, এই আশায়, অন্ততঃ সাত দিনের জন্য জানকীনাথকে একবার মাতুল-গৃহে গমন করিতে হইল। বলা বাহুল্য যে, বাড়ী হইতে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে সংস্কার-সমিতির যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া আসিল।

জানকীনাথের মাতুলালয় সহর হইতে প্রায় দেড় দিনের পথ। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কোন গণ্ডগ্রামে যাইতে হইলে, ‘পানের নৌকার’ আশ্রয় লইতে হইত। তাহাও জানকীনাথের মাতুলালয়ের মত ক্ষুদ্র পল্লীতে সপ্তাহের মধ্যে মঙ্গল ও বুধবার ব্যতীত অন্য কোন দিনই যাইত না। যাহা হউক ‘পানের নৌকা’ অবলম্বন করিয়াই জানকীনাথ মাতুল-বাড়ী পঁহুচিল; এবং যথাবিধি মাতুলের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির আয়োজন করিতে লাগিল। জানকীনাথের মাতুলালয় যে গ্রামে অবস্থিত, সেখানে কএক ঘর ব্যতীত অপর বেশী ভদ্রলোকের বাসতি ছিল না। সুতরাং সকল কার্য্যই তাহাকে একক বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল, এবং মাতুলের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইতে হইতে তাহার সপ্তাহের অবকাশ নিঃশেষ হইলেও, তাহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিতে প্রায় আরো একসপ্তাহ অতিবাহিত হইল। অধিকন্তু এই সকল কর্ম্ম শেষ

য়ায়,—সুতরাং সেখানে 'পানের নৌকা' পঁহুচিতে এখনও চারি দিন বিলম্ব থাকায়, তাহাকে বাধ্য হইয়াই একে একে অষ্টাদশটি দিবস (!) মাতুলালয়ে অবস্থান করিতে হইল।

ক্রমে ক্রমে অষ্টাদশ দিবস গত হইলে, জানকীনাথ পুনঃ সহরাভিমুখে প্রধাবিত হইল। সাত দিনের অবকাশ স্থলে অষ্টাদশ দিবস গত হইয়া গিয়াছে, এজন্য একেই সে ভারী উদ্বিগ্ন-চিত্ত ছিল, তদুপরি 'সংস্কার-সমিতির' সংবাদাদির নিমিত্ত তাহার প্রাণ একেবারে আকুলিত হইয়া উঠিল। এই সকল কারণে, সহরে ফিরিয়াই জানকীনাথ সরাসর সম্পাদিকার গৃহ-পানে ছুটিল।

জানকীনাথ ডাকিল,—"চপল!" হাস্যমুখে নলিন্ ভূষণ গৃহ হইতে বাহির হইয়া উত্তর করিল,—"কে গা, জানকীবাবু?—আসুন, আসুন্। বড়ই দুঃখিত ছিলুম, আমাদের শুভ পরিণয়টা আপনার অনুপস্থিতে যেন কেমন নীরস ও শুক্‌নো-শুক্‌নো ঠেকেছিল। বসুন, 'সুইট্' চপল এখনই আপনাকে দেখা দিবেন।"

জানকীনাথ প্রথমতঃ এ কথার সারমর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলনা। পরে যখন ক্রমে রহস্য বাহির হইতে লাগিল, তখন সে বুঝিতে পারিল,—বহুদিন হইতেই রাজকুমার বাবু, নলিন্‌ভূষণকে আপনার জামাতা করিবার বাসনা পুষিতে ছিলেন; চপলকুমারীও নলিন্‌কে অন্তরের সহিত ভালবাসিত, নলিন্‌ও এজন্য তাহাকে প্রতিদান দিতে ভুলে নাই, এবং এইরূপ মনোমিলনেই আজ তিন দিন হয়, নলিন্‌ভূষণের সঙ্গে চপলকুমারীর শুভমিলন সংঘটন হইয়া গিয়াছে।—কথা শুনিয়া আর জানকীনাথ তথায় স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার বোধ হইল, এ জগৎটা যেন তাহাকে লইয়া এক পাক ঘুরিয়া আসিয়াছে,—সে যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যের কুহকে পড়িয়া কি প্রলাপ শুনিতেছে!

। হইয়া জানকীনাথ (

শেষ হইয়া গিয়াছে।

নানা ছলে, চপলকুমারীর কক্ষ হইতে বাহির হইয়া, জানকীনাথ প্রথমতঃ মনে মনে নলিন্‌ভূষণের উপর ভারী চটিয়া গেল। অপর কেহ চপলকুমারীকে বিবাহ করিলে সে তাহা সহিতে পারিত; কিন্তু আপন বন্ধু যে তাহার মুখের গ্রাস এরূপ গোপনে কাড়িয়া লইবে,—ঘরের ইঁদুর যে আপন ঘরের কানাচ কাটিয়া দিবে—একথা ভাবিতেও তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিল। জানকীনাথ ভাবিল,—"চপল কুমারী!—আহা! সে সরলা যুবতী,—সে-ই কি অবশেষে আমাকে এভাবে ফাঁকি দিল!"

যাহা হউক, যখন সব আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়াছে, তখন চিন্তায় আর কি ফল—এই ভাবিয়া জানকীনাথ যৎকিঞ্চিৎ সান্ত্বনার আশায় জীবন-বন্ধু শচীনের গৃহে গমন করিল। জানকীনাথ শচীনের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলে, গৃহ-বারান্দা হইতে একটি অনুপমা লাবণ্য-প্রতিমা বিদ্যুল্লতার মত সরিয়া গেল। সকৌতুকে জানকীনাথ চাহিয়া দেখিল, সে আর কেহই নহে, গোপালগোবিন্দ বাবুর একমাত্র অতি সুন্দরী দুহিতা সুষমা,—শচীনের নবপরিণীতা পত্নী!

আর সে তথায় স্থির থাকিতে পারিল না। অবিলম্বে বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৃহপ্রান্তে ভীম অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া, জানকীনাথ এক এক পৃষ্ঠা করিয়া আপনার কবিতার খাতা খানি সমস্ত তাহাতে প্রেম-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান করিল। লোহিত জিহ্বা বিস্তার করিয়া দেব বৈশ্বানর একে একে কাগজখণ্ডগুলি গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। মনে মনে—নলিন্, চপল, শচীন্, ...মা, বৃদ্ধ পিতা, মাতুল ও তাহার সম্পত্তি, এবং সর্ব্বশেষে

ন করিয়া, রোরুদ্যমান জানকীনাথ

শয্যায় শুইয়া প।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

কুমার সম্ভব।

তৃতীয় সর্গ।

(৪১)

রাখি হেমময় বেত্র বাম করতলে,

লতা-গৃহ দ্বারে নন্দী দাঁড়া'ল আসিয়া,

"না কর চাপল্য",—ইহা প্রথমের দলে

আদেশে সঙ্কেতে, মুখে অঙ্গুলি স্থাপিয়া।

(৪২)

তরু না নড়িছে, অলি না নাড়িছে পাখা

কূজন ছাড়িল পাখী, মৃগ বিচরণ,

জীবন-ব্যাপার-হীন পটে যেন আঁকা!—

নন্দীর শাসনে হেন সমস্ত কানন!

(৪৩)

* পুরশুক্র দেশ যথা ত্যজে যাত্রা কালে

নন্দীর নয়ন-পথ তথা পরিহরি,

পশে কাম আচ্ছাদিত পুন্নাগের ডালে

তপঃকুঞ্জে শঙ্করের, এক পাশ ধরি।

---

* যাত্রাকালে শুক্রগ্রহ সম্মুখে থাকা অমঙ্গল জনক। শুক্র সম্মুখে লইয়া যাত্রা করিলে, ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী রাজাকেও হতসৈন্য ও পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়।

(৪৪)

দেবদারু ক্রমে গড়া বেদিকা উপ' ব
বিস্তারিত শার্দ্দূলের চর্ম্ম আস্তরণ,
তদুপরি ধ্যান-মগ্ন ত্রিনেত্র শঙ্করে
আসন্ন-মরণ কাম করে দরশন।

(৪৫)

সমাসীন বীরাসনে, নত স্কন্ধদ্বয়,
দীর্ঘীকৃত পূর্ব্বকায় সরল নিশ্চল,
উর্দ্ধ্বতল করযুগ কিবা শোভাময়,—
ক্রোড় মাঝে ফুটে যেন রয়েছে কম·

(৪৬)

ভুজঙ্গ-বন্ধনে বদ্ধ উর্দ্ধে জটা চয়,
দ্বিগুণিত অক্ষসূত্র কর্ণে লম্বমান,
কণ্ঠ-নীল-প্রভা-পাতে নীল অতিশয়
গ্রন্থিযুত কৃষ্ণাজিন উত্তরী পিধান।

(৪৭)

স্তিমিত তারক উগ্র অল্প প্রকাশিত,
ভ্রুভঙ্গি-বিহীন নেত্র,—পলকে অর
সুনিবিড় পক্ষ্মমালা স্পন্দন-রহিত,
ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে বদ্ধ-লক্ষ্য দৃষ্টি অধোজ্যো

(৪৮)

বরষণ-বেগ-শূন্য বারিদ যেমন,
কিবা নিস্তরঙ্গ স্তব্ধ জলধির প্রায়,
নিবাত নিষ্কম্প দীপ শিখার মতন,
রোধি অন্তশ্চর বায়ু হর শোভা পায়।

(৪৯)

পেয়ে পথ ললাটস্থ নয়ন-বিবরে,
নিঃসরিছে জ্যোতিকণা ব্রহ্মরন্ধ্র হ'তে ;
শির-বালেন্দুর ভাতি আবৃত সে করে,
মৃদু সে বালেন্দু-কাঁন্তি বিশতন্তু হ'তে !

(৫০)

সমাধির বশে নব দ্বার সঞ্চরণ
নিবারি মনের, হৃদয়ে স্থাপিয়ে তায়,
যে অক্ষর জনে জানে ক্ষেত্রবিদগণ,
হেরিছে সে পর-আত্মা আপন আত্মায় ॥

(৫১)

অদূরে ত্র্যম্বকে হেন নিরখি মদন,
মনেও ধর্ষণা তাঁর অসাধ্য বুঝিলা ;
খসিল যে কর হ'তে শর-শরাসন,
ভয়ে শ্লথ-পাণি কাম জানিতে নারিলা ॥

(৫২)

এ সময়ে নষ্টপ্রায় বীর্য্যে পুন তার
দেহ মহিমায় যেন উজ্জীবিত করি ;
সখী বন-দেবী দ্বয়ে সঙ্গে নিয়ে আর,
দেখা দিলা সেই স্থানে নগেশ-কুমারী ॥

(৫৩)

স্বর্ণ-আভরণ সম ভাতে কর্ণিকার,
অশোক-কুসুম জিনে পদ্মরাগ মণি,
মুকুতা কলাপে পরিণত সিন্ধুবার,—
ভূষিতা বাসন্ত পুষ্পে চম্পক-বরণী ॥

(৫৪)

ঈষৎ নমিত দেহ স্তনযুগ-ভরে,
পরিধানে বালারুণ-রক্তিম বসন,
পর্য্যাপ্ত কুসুম গুচ্ছে নুয়ে নুয়ে পড়ে,
গতিশীলা পল্লবিনী বল্লরী যেমন ।

(৫৫)

বকুল মালার কাঞ্চী নিতম্ব হইতে
খসে গতিবশে, বালা ধ'রে ধ'রে যায় ;
স্থানজ্ঞ মদন বুঝি বিচারিয়া চিতে,
ন্যাসরূপে অন্য মৌর্ব্বী স্থাপিলা তথায় ।

(৫৬)

সুগন্ধি নিশ্বাসে অতি তৃষাতুর হ'য়ে
বিম্বাধর পাশে ভৃঙ্গ উড়ি উড়ি ধায়,—
শঙ্কায় চকিতেক্ষণা সরে সরে র'য়ে,
লীলা-অরবিন্দ নাড়ি নিবারিছে তায় !

(৫৭)

হেরি অনিন্দিত কান্তি অঙ্গে অঙ্গে তাঁর—
রতিও সরমে রয় বিনতবদনে,
পুষ্পধন্বা জিতেন্দ্রিয় শঙ্করে আবার,
স্বকার্য্য সিদ্ধির আশা আঁটে মনে মনে ।

(৫৮)

ভবিষ্যৎ-পতি শঙ্করের দ্বারদেশে,
উমা এসে উপনীতা হইল যেমন,
পরমাত্মা জ্যোতি প্রাণে হেরি যোগাবেশে.

(৫৯)

নিম্নদেশে, কায়ক্লেশে নাগ-অধিপতি
ফণাগ্রে ধরিলা ধরা সহ চরাচর।
রুদ্ধ প্রাণ বায়ু মুক্ত করি ধীরে অতি
দৃঢ় বীরাসন শ্লথ করিলা শঙ্কর।

(৬০)

নমি নন্দী নিবেদিলা বচনে বিনীত,—
"এসেছেন শৈলসুতা শুশ্রূষার তরে ;
ভ্রূক্ষেপে প্রবেশ-আজ্ঞা হইলে সূচিত,
আনে নন্দী শৈলজারে শঙ্কর গোচরে।

ক্রমশঃ—

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু।

কর্ম্ম-জীবন।

"Seest thou a man diligent in his business ?
He shall stand before a king."

Proverbs of Solomon.

"That man is but of the lower part of the world
That is not brought up to business and affairs".

Owen Feltham.

ভারতের আর্য্যজাতিই সর্ব্বাগ্রে কর্ম্ম-জীবনের প্রকৃত মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছিলেন। এই হেতুই, তাঁহারা গঙ্গা-যমুনা-বিধৌত, হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তি, তাঁহাদিগের প্রিয়নিকেতন, পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তের আর এক নাম রাখিয়াছিলেন,—কর্ম্মভূমি বা কর্ম্মক্ষেত্র। এক সময়ে, কর্ম্মভূমি বলিলে, শুধু আর্য্যা-

ভাবুক পরমার্থিক, ও সাময়িক ভাবাবেশে এই সসাগরা ধরিত্রীকেও, কখন কখন, কর্ম্মভূমি বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ধরিতে গেলে, অনন্তকর্ম্মময় অনন্তদেবের এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই, চির কর্ম্মনিরত কর্ম্ম-ভূমি। সৃষ্টির উদয়, স্থিতি ও লয় আছে ;—কোন অবস্থায়ই কর্ম্মের বিরাম নাই। কর্ম্মের আশ্রয়ে সৃষ্টি, কর্ম্মের আশ্রয়ে স্থিতি এবং যাহার নাম লয় বা ধ্বংস, তাহারও আশ্রয় ও অবলম্ব কর্ম্ম। কর্ম্মই জগতের নিয়ামক, কর্ম্মই জগতের প্রকৃতি।

বস্তুতঃ, এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় ব্রহ্মাণ্ডের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই দেখা যায়, ভাল হউক কি মন্দ হউক, অল্পাধিক পরিমাণে, সকলেই কোন না কোনরূপ কর্ম্মে ব্যাপৃত আছে। ত্রিতল হর্ম্ম্যোপরে মণি-রত্ন-খচিত স্বর্ণ-সিংহাসনারূঢ় সম্রাট্, কিংবা নিবিড় অরণ্যে ধ্যানমগ্ন নিমীলিত-নেত্র ঋষি, অথবা নিতান্ত দীন হীন পথের কাঙ্গাল, সকলেই নিজ নিজ গুরুত্ব এবং প্রয়োজন অনুসারে সর্ব্বদাই কর্ম্মে নিযুক্ত। শুধু মনুষ্য কেন ? তরুলতা প্রভৃতি উদ্ভিদ, এবং পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি জীব সমস্তই কর্ম্ম-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত এবং নিজ নিজ স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্মতৎপর। এই কর্ম্মক্ষেত্রে চেতনাহীন জড় জগৎও অকর্ম্মে নিশ্চেষ্ট থাকিতে সমর্থ নহে। জড়কে অন্তদীয় শক্তি কর্ম্মে চালনা করিতেছে। উদ্ভিদ ও ইতর জীবের চালক স্বভাব। মনুষ্যের কর্ম্ম প্রবর্ত্তক,—স্বভাব, স্বাধীন ইচ্ছা ও শিক্ষালব্ধ জ্ঞান এই তিনের পৃথক্‌ভূত বা সম্মিলিত শক্তি। যে শক্তি বলেই যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউক না কেন, কাহারও নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবার সাধ্য নাই।

ঐ যে তরুটি আজি বসন্ত-সমাগমে ফুলে ও মুকুলে সুসজ্জিত হইয়া বনের শ্যামল-কান্তিতে হাসির মাধুরী ফলাইতেছে, ইহা

উহার একটা দৈবাৎ প্রাপ্ত আকস্মিক সম্পদ্ নহে। তরুটি অঙ্কুররূপে উদ্গত হইবার সময় হইতেই নীরবে কর্ম্ম-নিরত রহিয়া, মৃত্তিকা হইতে রস শোষণ, বায়ু হইতে প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ এবং সৌরকর হইতে শক্তি-সঞ্চয় করিয়া, আজ এই অবস্থাপন্ন হইয়াছে। আজিকার এই ফুল-সজ্জা, উহার আজীবনব্যাপি কর্ম্মের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই যে পিপীলিকাটি, উৎসব বাটীর কর্ম্ম-কর্ত্তা বা ম্যানেজারের মত, ব্যস্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং আপনার গন্তব্যপথের বিঘ্নরূপে দণ্ডায়মান্ মত্ত মাতঙ্গকেও গণনায় না আনিয়া, নির্ভয়ে দংশন করিতেছে; কর্ম্মই ঐ পিপীলিকাটির পরিচালক। এইরূপ, যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, দেখিবে, সর্ব্বত্রই কর্ম্মের প্রবাহ অবিরাম-প্রবাহে প্রবাহিত; শুনিবে, সমস্তদিক্ই কর্ম্মের কল-কোলাহলে মুখরিত। নীচ বংশোদ্ভূত কাঙ্গাল, কিংবা উচ্চ বংশোদ্ভব ধন-কুবের যেই হউক, সংসারে কর্ম্মই যাঁহার অবলম্ব, কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই যিনি জীবন-বর্ত্মে অগ্রসর হইয়াছেন, তিনিই ধন্য,—তিনিই উচ্চ কল্পের উন্নত জীব। পণ্ডিতপ্রবর প্রথিতনামা মেঃ বার্ক (Burke) ইণ্ডিয়া বিলের সময় যে সুযুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ফেরিওয়ালা এবং ব্যবসায়ী বণিক্‌দিগের মধ্য হইতেও রাজনীতিজ্ঞ লোকের উদ্ভব হইয়াছেন, এবং তাহারা রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া, সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

কর্ম্ম করিলেই হইল না। কার্য্যের প্রকার-ভেদ বিস্তর। শুধু জীবনব্যাপি পরিশ্রমেই যে লোক কর্ম্মঠ বলিয়া অভিহিত এবং উন্নত হইতে পারিবে, তাহা নয়। কর্ম্ম করিতে হইলে, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি এবং শিক্ষা-পটুতা, কার্য্যে ক্ষিপ্রকারিতা, অপর লোক দ্বারা কর্ম্ম করাইবার কৌশল, মানব-জাতির চরিত্র-বিশ্লেষণে

নিপুণতা, নিয়ত আত্মোৎকর্ষ এবং কর্ম্মে স্বাভাবিক জ্ঞান, এই সমস্ত গুণ অতি আবশ্যকীয়। এই সকল গুণ লইয়া যিনিই কর্ম্মক্ষেত্রে পাদচারণা করিয়াছেন, তিনিই সংসারে উন্নত হইয়া, মানব-জাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বস্তুতঃ, একমাত্র কর্ম্মই মানুষকে সর্ব্বপ্রকারে উন্নত করে। এমন কি, শুধু কর্ম্ম দ্বারা সাধনা ও জ্ঞানলভ্য মোক্ষ বা মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করা যাইতে পারে। ভগবান্ স্বয়ং উপদেশ দিয়াছেন,—

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহকর্ম্মণঃ।"

—তৃতীয় অধ্যায় ৮ম শ্লোক।

* * * *

অর্থাৎ তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর। অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মই জানিও শ্রেষ্ঠ পথ। আবার অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।"

—৫ম অধ্যায় ৫ম শ্লোক।

জ্ঞাননিষ্ঠ যোগিগণ যে স্থান অর্থাৎ যে মোক্ষপদ লাভ করেন, শুধু কর্ম্মীরাওসেই স্থানই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"কর্ম্মণৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥"

—৩য় অধ্যায় ২০ শ্লোক গীতা।

জনকাদি শুধু কর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। লোক-সংগ্রহে দৃষ্টি রাখিয়া, তোমারও কর্ম্মকরাই উচিত। বস্তুতঃ, কর্ম্মই জীবন, কর্ম্মই গতি এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—কর্ম্মই এই চতুর্ব্বর্গের অদ্বিতীয় নিয়ামক।

অনভিজ্ঞ মূর্খ লোকেরাই মনে করে যে, প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণ ব্যবসায়ের অনুপযুক্ত; এবং ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগের মধ্যেও কেহ প্রতিভাশালী হইতে পারে না। এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই

ভ্রান্ত, সন্দেহ নাই! ব্যবসায় লোককে উন্নত না করিয়া কখনও অধোগতির পথ প্রদর্শন করে না, বরং ব্যক্তি বিশেষের অনভিজ্ঞতায়ই সর্ব্বপ্রকারে ব্যবসায়ের ক্ষতি হইয়া থাকে। শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রমলব্ধ যে কোন কাজই হউক যাহার মূলে সাধুতা এবং যাহার উদ্দেশ্য সাধু, আশু আপদসঙ্কুল মনে হইলেও তাহাই নিরাপদ, ও অসম্মানসূচক বোধ হইলেও, পরিণামে সম্মানার্হ এবং প্রথমে ক্ষতিকর জ্ঞান হইলেও, অবশেষে তাহাই লাভজনকরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। মানুষের হাত কলুষিত হইলেও অন্তঃকরণ নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র থাকিতে পারে। কিন্তু মানুষের নীতি-অনুষ্ঠানে যদি কলঙ্কের সঞ্চার হয়, তবে উহার বিষময় ফলে মানুষের যাবতীয় আভ্যন্তরীণ শক্তি এবং গুণাবলীর বিলয় সংসাধিত হইয়া তাহাকে নরকের কীটরূপে প্রতিপন্ন করে। কারণ, নৈতিক অনুষ্ঠানের অন্যথাচরণ বা লোভেই পাপের সৃষ্টি এবং এই পাপের অবশ্যম্ভাবি ফলই ধ্বংস-নীতির মূল সূত্র।

সংসারে খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের লক্ষ্য যদিও বহু উচ্চে অবস্থিত এবং যদিও তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে উন্নত হইবার প্রয়াসী, তবু তাঁহারা তাঁহাদের জীবনোপায়ের জন্য সাধুতার সহিত পরিশ্রম করিতে কখনও ঘৃণা বা লজ্জা বোধ করেন নাই। পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রধান জ্ঞানী এবং জ্যোতির্ব্বিদ্ থেইল্‌স্ (Thales) এথেন্স নগরীর প্রতিষ্ঠাতা সলন্ (Solon), এবং প্রসিদ্ধ গণিতবেত্তা হাইপিরেটস্ (Hyperates), ইঁহারা সকলেই ব্যবসায়ী বণিক্ ছিলেন। যে প্লেটো (Plato) তাঁহার অলোকসাধারণ জ্ঞানের জন্য ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হইয়া গিয়াছেন, তিনিও ইজিপ্টে নানাস্থানে ভ্রমণের সময়, তৈল বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ

নামা দার্শনিক পণ্ডিত স্পিনোজা (Spinoza) যখন অতিগভীর গবেষণা পূর্ব্বক দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন, তখন তিনি নিজ হস্তে কাচ পালিস করিয়া, তাহার উপস্বত্ব দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্ লিনায়াস্ (Linnæus) যখন উদ্ভিদ্-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, তখন তিনি নিজহস্তে জুতা প্রস্তুত করিয়া, তদ্দ্বারা আপনার ব্যয় সঙ্কুলন করিতেন। অদ্বিতীয় নাটককার এবং কবি শেক্ষপীর (Shakespeare) নাটকের ম্যানেজার ছিলেন, এবং নাটক লেখা অপেক্ষা নিজে সেই নাটক অভিনয় ও উহার সুবন্দোবস্ত ইত্যাদি করিতে নিজকে অধিকতর উপযুক্ত মনে করিতেন। তিনি এই ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিয়া, এভনে,—ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড সহরে তাঁহার নিজ বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ কবি চসার (Chaucer) তাঁহার প্রাথমিক জীবনে সৈন্য ছিলেন ; এবং পরে শুল্কের কমিশনার ও বন-বিভাগের ইন্‌স্পেক্টারের কার্য্য করিয়াছেন। মিল্‌টন্ (Milton) প্রথমতঃ স্কুলের মাষ্টার ছিলেন ; এবং ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া, সাধারণ তন্ত্রের সময় (Common wealth) রাজকীয় সভায় সেক্রেটারীর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ স্যর্ আইজাক্ নিউটন্ (Issiac Newton) টাঁকশালের মাষ্টার ছিলেন ; এবং তাঁহারই নিজের তত্ত্বাবধানে ১৬৯৪ খৃঃ অব্দে মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নূতন কৌশল কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। খ্যাতনামা কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) এবং স্কট্ (Scott) প্রথম আফিসে সিল অথবা মোহর দিতেন, পরে সেশন কোর্টে কেরানীর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁরা উভয়েই সাংসারিক

বেইলি (Baily) প্রথম কোম্পানীর কাগজের একজন দালাল ছিলেন।

বিধিবদ্ধ কার্য্য কিংবা ব্যবসায়ের সহিত উন্নত মানসিক শক্তির যে, বিরুদ্ধজনক ভাব নয়, ইহার আরও বহু উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীসের সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বপ্রধান ইতিহাসবেত্তা মিঃ গ্রোট্ (Grote) লণ্ডন মহানগরীতে একজন ধনাগারপতি (Banker) ছিলেন। অতি উন্নত এবং চিন্তাশীল দার্শনিক জন্ষ্টুয়ার্ট মিল্ (John Stuart Mill) ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরীক্ষক-বিভাগ হইতে অতিশয় যশ ও প্রতিপত্তির সহিত অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রে অতি উন্নত ছিলেন বলিয়া যে শুধু যশ অর্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা নয়, তিনি আফিসে যেরূপ নিয়ম, পদ্ধতির প্রচলন করিয়া অতি সন্তোষজনক ভাবে তাঁহার বিভাগের কর্ম্ম পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার যশ ও প্রতিপত্তি অর্জ্জনের প্রধান কারণ।

মানুষ, স্বাভাবিক জ্ঞান থাকিলেই, কর্ম্মে কৃতকার্য্য হইতে পারে। জ্ঞানার্জ্জন করিতে যেরূপ পরিশ্রম ও ধীরতার আবশ্যক, ব্যবসায়েও সেইরূপ ধীরতার সহিত পরিশ্রম ও মনোযোগের একান্ত দরকার। যে কোন ব্যবসায়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে এবং উন্নত হইতে হইলে, স্বভাব, অধ্যয়ন এবং অভ্যাস এই তিনটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যে অভ্যাসে ধীরতা এবং সাধুতা সংমিশ্রিত হইয়াছে, তাহাই ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতা লাভের নিদানীভূত হইয়া রহিয়াছে। অনেক লোক আছে, যাহারা শুধু নিজেদের শুভ অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, বৃথা জীবন অতিবাহিত করে। তাহারা অলক্ষিতভাবে ক্রমশঃই ধ্বংসের পথে নীত হইয়া থাকে। বেকন (Bacon) সর্ব্বদাই বলিতেন যে,—'It was in business as in ways—the

nearest way was commonly the foulest and that if a man would go the fairest way, he must go somewhat about." ইহার ভাবার্থ এই যে,—মনুষ্য পরিশ্রম না করিয়া, যতই আয়াসে জীবন অতিবাহিত করিবে, ততই উহা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে; এবং যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া জীবন কর্ত্তন করিবে, সে সংসারে অল্পাধিক পরিমাণে কিছু করিয়া যাইতে সক্ষম হইবে। ভ্রমণ করা পরিশ্রমজনক এবং বহু সময়সাপেক্ষ হইতে পারে; কিন্তু সেই পরিশ্রমের ভিতরে অলক্ষিতভাবে যে আনন্দটুকু নিহিত থাকে, এবং সেই পর্য্যটন হইতে উৎপন্ন ফলে যে সুখটুকু জড়িত থাকে, উহা বড়ই পবিত্র এবং মধুর। যে ব্যক্তি তাহার প্রাত্যহিক জীবনে, এমন কি, অতি সাধারণ নীচ কর্ম্মও নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করে, সে তাহার অবশিষ্ট জীবন ব্যাপিয়া, অধিকতর সুখ ও শান্তিপ্রদ ফল ভোগ করিয়া প্রাণে পরিতৃপ্ত রহে।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই ইহা বুঝা উচিত যে, তাহার নিজের সুখ স্বচ্ছন্দ ও উন্নতি, অন্য কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া, শুধু তাহার নিজের যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রমের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। ইহা মনুষ্যকে ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর করে, ব্যক্তিগত স্বভাবটিকে গঠন করিয়া লয়, এবং অন্যকে কার্য্য করিতে উৎসাহিত করে। অবশ্যই, সংসারে সকলেই সমভাবে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু তাহা না হইলেও, মোটের উপর, প্রত্যেকেই তাহার ব্যক্তিগত শক্তি অনুসারে ন্যূনাধিক পরিমাণে উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয়। টাসকান্‌দিগের একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে,—"Though all can not live on the piazza, every one mayfeel the sun."—অর্থাৎ যদিও সকলে বাহিরে বাস করিতে পারে না, তবু প্রত্যেকেই সূর্য্যের উত্তাপ অনুভব করিতে পারে।

উদ্দেশ্য নিন্দিত, নীচ বা কুৎসিত হইতে পারে। কিন্তু কর্ম্ম কখনও নিন্দিত বা নীচ নহে। সাধুভাবে এবং সরল ও পবিত্র প্রাণে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম মাত্রই, ইহ পারত্রিক সম্পদের সোপান স্বরূপ হইয়া থাকে। আজ যে ব্যক্তি কাষ্ঠের দুর্ব্বহ বোঝা মাথায় বহিয়া এক মুষ্টি অন্নের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছে, সেও, হয়ত, একদিন কর্ম্মের সরল ও সাধুবর্ত্মে অগ্রসর হইতে পারিলে, সাম্রাজ্যের ভার বহনে অধিকারী হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধনামা কর্ম্মবীর নেপোলিয়ন্ একটা বুড়ীর মাথায় খড়ের বোঝা দেখিয়া সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি চিরদিনই শ্রমজীবীর এইরূপ শ্রমকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকি।"

মোটের উপর মানুষ মাত্রেরই, সুখের কোলে ঘুমাইয়া এবং খেলিয়া বেড়াইয়া জীবন অতিবাহিত না করিয়া, নীচ কর্ম্ম হইলেও, তাহা পরিশ্রমের সহিত সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। বাস্তবিক, অতি সামান্য মূলধন লইয়াও, যদি ধীরতা, সাধুতা এবং অধ্যবসায়ের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া যায়, তবে উহা দ্বারাও জীবনে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

শ্রমশীলতাই ব্যক্তিগত জীবন এবং জাতীয় উন্নতির সর্ব্বপ্রধান ভিত্তি এবং সর্ব্বপ্রকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ। যে ব্যক্তি শ্রম-কুণ্ঠ এবং ভবিষ্যৎ জীবনে লক্ষ্য-বিহীন, ঈশ্বরও তাহার প্রতি সর্ব্বদা অভিশাপ প্রদান করিয়া থাকেন, এবং জীবন তাহার পক্ষে নিতান্তই ভারাক্রান্ত এবং দুর্ব্বহ হইয়া উঠে।

অনেকে ইহা মনে করিয়া বিস্মিত হয় যে,—"জীবনে কোন অপরাধ করি নাই, তথাপি অদৃষ্ট এমন মন্দ, বিধাতা এত বাম কেন?" যাহারা এই সিদ্ধান্তে বিভ্রান্ত ও বিস্মিত, তাহারা নিতান্তই অন্ধ। রুষদিগের একটি প্রবাদ বাক্যে আছে,—"Misfortune is

next door to stupidity."—ইহার ভাবার্থ এই যে,—যাহারা আপনাদিগকে দুর্ভাগ্য বলিয়া স্থির করিয়া রাখে, তাহারা, যাহারা সংসারে মূর্খ বলিয়া পরিচিত, তাহাদের অব্যবহিত পরের শ্রেণীর মূর্খ। যাহারা তাহাদের দুরদৃষ্টের জন্য সর্ব্বদা পরিতাপ করে, তাহাদের অবস্থা একটু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইবে যে, কার্য্যে অবহেলা, অপরিণামদর্শিতা এবং সুবন্দোবস্ত ও মনোযোগের অভাব, এই কয়টি অতি অলক্ষিত ভাবে তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া রহিয়াছে। ডাক্তার জন্‌সন্ (Dr. Johnson) যখন লণ্ডন মহানগরীতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি একবারে রিক্তহস্ত ছিলেন। এমন কি, কোনও একটি রাজার নিকট চিঠি লিখিতে তিনি আপনাকে (Dinnerless)—অনাহার-ক্লিষ্ট বলিয়া লিখিয়াছিলেন। তিনি একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন যে,—"All the complaints which are made of the world are unjust; I never knew a man of merit neglected; it was generally by his own fault that he failed of success."—অর্থাৎ লোক সংসারে যে সকল অভিযোগ উত্থাপন ও বিলাপ পরিতাপ করে, তৎসমস্তই অনুচিত এবং অন্যায়। আমি কখনও এমন কোন গুণবান্ লোক দেখি নাই, যে নিরবচ্ছিন্ন অবহেলিত রহিয়াছে। যে উদ্দিষ্ট বিষয়ে বিফলমনোরথ ও অকৃতকার্য্য হয়, সাধারণতঃ সে নিজের দোষেই তদ্রূপ হইয়া থাকে।

যে সকল ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ বা গুণবান্ বলিয়া অন্তরে গর্ব্বিত, তাহাদের হৃদয় শক্তিহীন, শিথিল এবং অসংযত। যে ব্যক্তি তাহার নিজের সুশিক্ষিত এবং পরিপক্ক বুদ্ধিতে পরিচালিত, অথচ অহঙ্কারশূন্য ও বিনীত, সে সর্ব্বদাই যে কোন কর্ম্মে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই পরিপক্ক বুদ্ধি হৃদয়ে নিশ্চেষ্ট

অবস্থায় না থাকিয়া, সর্ব্বদা তাহাকে কর্ম্মে পরিচালনা করে। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

—৩য় অধ্যায় ২৭ শ্লোক।

বস্তুতঃ প্রকৃতিই কর্ম্মে পরিচালিত করে, আপন আপন অন্তর্নিহিত বুদ্ধি ও শক্তি কর্ম্মের সিদ্ধির পথ মুক্ত করিয়া দেয়। কিন্তু যাহারা আপনাকে কর্ত্তা, শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান্ মনে করিয়া অহঙ্কারে বিভোর হয়, তাহারা অচিরেই অকর্ম্মার শ্রেণীতে গড়াইয়া পড়িয়া, জীবনে বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। আমেরিকার একজন খ্যাতনামা গ্রন্থকার ওয়াশিংটন্ আয়ারভিঙ্গ (Washington Irving) যথার্থই বলিয়াছেন,—"A barking dog is often more useful than a sleeping lion"—অর্থাৎ নিদ্রিত সিংহ অপেক্ষা শব্দায়মান্ অর্থাৎ জাগরিত কুকুরও অধিকতর কর্ম্মক্ষম ও শক্তিশালী।

সুচারুরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইলে, যে সমস্ত গুণের আবশ্যক, সেই সকল গুণের মধ্যে মনোযোগ, সতর্কতা, ভ্রান্তিশূন্যতা, শৃঙ্খলা বা পদ্ধতি, ও সময়-নিষ্ঠতা, এই সমস্ত গুণও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যদিও এই সমস্ত গুণ প্রথমতঃ অতি সামান্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তথাপি মানবজাতির উন্নতি এবং সর্ব্বপ্রকার সুখ-শান্তি বিধানের জন্য এ সকল নিতান্তই আবশ্যকীয়। ইহা অতি সাধারণ সত্য বিষয়; কিন্তু মানবজীবনও আপেক্ষিক সাধারণ বিষয়েরই সমষ্টি বিশেষ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার পুনরুক্তি এবং পর্য্যালোচনা দ্বারা শুধু মানব-চরিত্র নহে, জাতীয় জীবনও গঠিত হইয়া থাকে। যখন যেখানে যে কোন ব্যক্তি বা জাতীয় জীবনের অধঃপতন ঘটে, তখনই সেখানে অনুসন্ধান করিলে,

দেখা যায় যে, সামান্য বিষয়ের প্রতি অবহেলাই এইরূপ অধঃপতনের মূল কারণ। সংসারে প্রত্যেকেরই অল্লাধিক পরিমাণে কিছু করিবার আছে, এবং সেই জন্য উঁহা নিজের সাংসারিক কাজই হউক, কোন ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনার কর্ম্মই হউক, কিংবা কোন জাতীয় জীবন শাসন-সংরক্ষণ করিবার কার্য্যই হউক, উঁহা সম্পন্ন করিতে হইলে, যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, ঐসকল গুণের উৎকর্ষ বিধান প্রত্যেকেরই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

দৈনিক কার্য্যে দৃঢ় মনোযোগ এবং উঁহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পর্য্যালোচনাই মানব-জাতির উন্নতির মূল সূত্র; এবং সর্ব্বোপরি, কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রমই সৌভাগ্যের জনয়িতা। কার্য্যে ভ্রান্তি-শূন্যতা একটা মূল্যবান্ সম্পদ্। মানুষ ধার্ম্মিক, গুণবান্ এবং সৎস্বভাবাপন্ন হইতে পারে, কিন্তু সে যদি ভ্রান্তিশূন্য না হয়, তবে তাহাকে কখনও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কারণ, সে যে কাজই করে, উঁহা পুনরায় পর্য্যালোচনা করার আবশ্যক হয়, এবং উহাতে নানা অংশে, নানা প্রকারে, অপ্রীতি এবং ক্ষতি প্রভৃতি সংঘটিত হইয়া থাকে।

নিয়ম-শৃঙ্খলা বা সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি সহজে কর্ম্ম নির্ব্বাহের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান। বহুসংখ্যক কার্য্য হইলেও, ইহার সাহায্যে অতি সহজে সম্পন্ন করা যায়। অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্মের ভার অন্যের উপর ন্যস্ত না করিয়া, নিজেরই উঁহা দেখিয়া শুনিয়া সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে, কার্য্যটি মনোমত রূপে সুসম্পন্ন হয় না। একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে,—"If you want your business done, go and do it; if you don't want it done, send some one else."—অর্থাৎ—যদি তুমি তোমার কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিতে চাও, তবে নিজেই যাইয়া কর;

আর যদি কার্য্যটি অসম্পন্ন রাখিতে ইচ্ছা থাকে, তবে অন্য কাহাকেও পাঠাইয়া দাও।

সংসারে যাঁহারা কর্ম্ম-পুরুষ,—কর্ম্মই যাঁহাদের অবলম্ব, তাঁহারা বলেন যে,—"Time is money"—সময় ও সম্পদ একই কথা;—অর্থাৎ সময়ের সদ্ব্যবহারই অর্থ উপার্জ্জনের মূল ভিত্তি। সময় যাহাতে ফাকি দিয়া সরিয়া পড়িতে না পারে, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সময়ের আর এক নাম পরমায়ু,—পরমায়ু যাহাতে বিফলে ফুরাইয়া না যায়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেরই তৎপ্রতি দৃঢ় দৃষ্টি রাখা উচিত। আত্মোৎকর্ষ, আত্মোন্নতি ও উন্নত চরিত্র, মানুষের এই সমস্ত যথার্থ লোভনীয় পদার্থই সময়ের সদ্ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। মনুষ্যের যখন চিন্তাশক্তির স্ফুরণ সংঘটিত হয়, তখন হইতেই সৎপথ অবলম্বন করিয়া, অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত কর্ম্মে নিয়োজিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই আর অসৎ প্রবৃত্তি হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাকে কলুষিত এবং অকর্ম্মণ্য করিতে পারে না। মানুষের ধন সম্পত্তি অপহৃত এবং নষ্ট হইলে, পরিশ্রমের সাহায্যে পুনরায় তাহা লাভ করা যাইতে পারে; জ্ঞানের খর্ব্বতা ঘটিলে, অধ্যয়নের বলে, তাহা উপার্জ্জন করা যাইতে পারে; এবং স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইলে, তাহাও মিতাচারে ও ঔষধ প্রয়োগে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সময় একবার হারাইয়া ফেলিলে, কিংবা নষ্ট করিলে, অনন্ত কালের শত সহস্র চেষ্টায়ও উহার পুনরুদ্ধার ঘটিবে না। এই হেতুই, সময় যাহাতে বৃথা ব্যয়িত না হয়, তৎপ্রতি সকলেরই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

যাঁহারা সময়ের মূল্য অবধারণ করিতে সক্ষম হন, তাঁহাদের সময়-নিষ্ঠতার অভ্যাস আপনা হইতেই জন্মে। কিবা বিশিষ্ট

জনীয়। যাহারা সময়ের মূল্য বুঝিতে পারিয়া, উহার সদ্ব্যবহার করে, তাহাদের উপর অতি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বাস স্থাপিত হয়, এবং যাহারা উহার অন্যথাচারণ করে, তাহাদের প্রতি লোকের বিশ্বাসও শীঘ্রই তিরোহিত হইয়া যায়। আমরা সাংসারিক কাজ কর্ম্মে কিংবা ব্যবসায় বাণিজ্যে সর্ব্বদা যে সকল লোকের সংমিশ্রণে সময় অতিবাহিত করি, তাহাদের সময়-নিষ্ঠতাই তাহাদের ব্যক্তিগত সম্মান অর্জ্জনের একটি প্রধান কারণ। যাহারা সময়ের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে, তাহাদিগের প্রতি—আবশ্যকীয় কর্ম্মে একেবারেই বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। সময়-নিষ্ঠতার অন্যথাচরণে শুধু যে সেই অন্যথাচারীই কষ্টভোগ করে, এমন নহে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকের পক্ষেও নানা প্রকার কষ্ট ও বিরক্তির কারণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

কার্য্য করিতে অন্যান্য গুণের সঙ্গে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং দৃঢ়তা এই দুইটি গুণও বিদ্যমান থাকার আবশ্যক। কার্য্যে কৌশল ও উদ্ভাবনী-শক্তি যদিও ঈশ্বর-প্রদত্ত, তবু যত্ন এবং চেষ্টায় উহাতে অনেকটা উৎকর্ষ লাভ করা যাইতে পারে।

সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে অপ্রতিহত ইচ্ছাশক্তি এবং ক্ষমতা লইয়া এ পর্য্যন্ত যত লোকই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নেপোলিয়ান্ (Napoleon) এবং ওয়েলিংটন্ (Wellington) এর নাম প্রথম উল্লেখযোগ্য। নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টি সকল বিষয়েই এত অভিজ্ঞ এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন যে, এক কথায় বলিতে গেলে, সমস্ত পৃথিবীর শাসন ভারও যদি তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হইত, তবু বোধ হয়, তিনি অনায়াসে তাহা সম্পন্ন করিতেন।

সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মনিষ্ঠতা বা কর্ম্মযোগের সার কথা তিনটি,—কর্ম্মের অধিকার নির্ব্বাচন, কর্ত্তব্যে প্রেম ও কর্ম্ম-ফলে অনা-

সক্তি। যিনি ভগবানের কর্ম্ম-ভূমিতে এই তিনটি উক্ত ভাবকে আয়ত্ত করিয়া কর্ম্মীরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারেন, তিনিই ভাগ্যবান্,—তিনিই ধন্য!

কর্ম্ম না করিয়া কেহই কর্ম্ম-ভূমিতে ক্ষণকালও তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। গীতায় আছে,—

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।"
কার্য্যে তে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ গুণৈঃ।

—৩য় অধ্যায় ৫ম শ্লোক।

যাহার যাহার প্রকৃতিজ গুণই তাহাকে বাধ্য করিয়া, তদনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। কিন্তু প্রকৃতিজ গুণে যে কর্ম্মে যে অনধিকারী, সে সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার কোন প্রয়াস, যত্ন ও চেষ্টা কর্ম্মপদ-বাচ্য নহে। তাদৃশ অকর্ম্মের কর্ত্তাও কখন কর্ম্মীর সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যাহার বাহু সামান্য এক খানি যষ্টি উত্তোলন করিতে অক্ষম, তাহার হিমাদ্রি-উৎপাটনে শ্রম, মূকের বক্তৃতা করিবার প্রয়াস, এবং কাকের কোকিল-কূজনের অনুকরণ-চেষ্টা কিরূপ কর্ম্ম, তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝান অনাবশ্যক। বস্তুতঃ যে কর্ম্মে যাহার স্বভাবতঃ অধিকার আছে, সেই কর্ম্মই তাহার পক্ষে কর্ম্ম,—উহাই তাহার স্বধর্ম্ম।

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

—৩য় অধ্যায় ৩৫ শ্লোক—গীতা।

সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া জীবন ধারণও ভয়াবহ। বস্তুতঃ অধিকার নির্ব্বাচন করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

কারের অনুরূপ কর্ম্মে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। "কর্ম ব্রহ্মো-দ্ভবং"—কর্ম্মই ব্রহ্ম। এই উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অধীন হইতে হইবে।

এই সকলের উপরে—কর্ম্ম-ফলে অনাসক্তি। ফলের প্রতি অনাসক্ত চিত্ত হইয়া, কর্ম্ম করিতে পারিলে, আর কোন কথাই থাকে না। আত্ম-অধিকার বুঝিয়া, শুধু কর্ত্তব্য-জ্ঞানে অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্মের অনুষ্ঠানই উচ্চতম অঙ্গের কর্ম্ম-নিষ্ঠতা। ইহাই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগ। যথা—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরণ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥
—৩য় অধ্যায় ১৯ শ্লোক—গীতা।

সর্ব্বদা অনাসক্ত চিত্তে করণীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে পারিলে, নিশ্চিতই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। কিরূপে অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্ম করিতে হয়, ভগবান্ গীতাতে তৎসম্পর্কেও স্পষ্ট উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বলিয়াছেন,—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্ম চেতসা।
নিরাশী র্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্য বিগতজ্বর॥"
—৩য় অধ্যায় ৩০ শ্লোক।—গীতা।

মনকে আত্মার অভ্যন্তরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্থাৎ ভগবানে সমর্পণ কর এবং নিকাম ও আসক্তি-শূন্য হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।

সকল কর্ম্মের পক্ষেই এই কথা। ভগবানের কর্ম্ম-ভূমিতে আবির্ভূত হইয়া, কাহাকেও কর্ম্ম না করিয়া তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিয়া থাকিবার শক্তি নাই। তাই আবারও বলিতেছি,—ভাই, যে যতটুকু পার, আপনার শক্তি-বা স্বধর্ম্মের অনুরূপ কর্ম্মে, অনাসক্ত

যা নিষ্কামভাবে, শুধু কর্ত্তব্যবোধে, আপনাকে ব্যাপৃত রাখিতে অভ্যাস কর। যে যতদূর পার, এই কর্ম্ম-ক্ষেত্রে কর্ম্মের পবিত্র বেদীতে কর্ম্মময়ের নামে "কর্ম্মায় নমঃ" বলিয়া আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দিতে যত্নবান্ হও। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানীগণের ইহাই উপদেশ। স্বয়ং ভগবানের উক্তি বলিয়া ব্যাসের ন্যায় মহামুনি যে গীতার অমন সম্মান করিয়া গিয়াছেন, সেই গীতারও ইহাই আদেশ। যে ভাগ্যবান্ এইরূপে কর্ম্ম-যোগে যোগী হইতে পারেন, তিনি ইহলোকেও পরম সম্পদ্ লাভে কৃতার্থ হন, এবং পরজগতেও তাঁহার জন্য অক্ষয় স্বর্ণ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহে।

বিভু-সমীপে।

১

তোমারি রূপ দিয়া,
গড়িলে এই হিয়া,
কত যে মাধুরীমা
উথলে!
আবেশে উঠে শত
লহরী অবিরত,
আলোক-প্রতিভায়
উজলে!

২

নয়নে জাগে, ভূপ!
এ কি গো অপরূপ—
স্বরূপ ধরা-ভরা
অদ্ভুত,

কানে কি বাজে সুর,
নাসিকা ভর-পুর
সুবাসে তব দেহ-
প্রসূত !

৩

তোমারি প্রেম-গীতি
গাহিতে উঠে মাতি' ;
তোমারি প্রেমাকুল
রসনা,
পরশে দেহ তব,
তাড়িত খেলে নব,
বুঝি না, একি তব
করুণা !

৪

করিতে তব কাজ
যাইব ধরা মাঝ,
যে সাজে প্রয়োজন
সাজিব ।
আবার অবসরে,
ডাকিবে যবে মোরে,
উদার বুকে তব
মজিব !

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

নববিকাশ।—পৌষ, ১৩১১। "শ্রীবৃন্দাবন ও মথুরা-ধাম" —শ্রীকামেখ্যাপ্রসাদ বসু বি, এল। কামেখ্যাবাবুর এই ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিয়া, আমরা প্রীত হইয়াছি। স্থানে স্থানে লেখকের বর্ণনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। লেখাও খুব সরল ও সরস হইয়াছে। 'ভিক্ষু-গীতা'—শ্রীজানকীনাথ পাল বি, এল। প্রবন্ধটি সারগর্ভ হইয়াছে। ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুর নিকট ভাল লাগিবে। 'অভিশাপ'—(কবিতা) শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত। মন্দ নহে। 'বুদ্ধ ও বাইবেল'—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। 'অপ্রকাশিত পদাবলী'—ইহার সংগ্রহকারক শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী। সংগ্রহ করিয়াছেন বেস ; বিধু বাবুর উদ্যম প্রশংসনীয়। "ক্ষুদ্র কিছু নয় ?"—(কবিতা) শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। পড়িয়া আমরা সুখী হইতে পারি নাই। মৌলিকত্ব-হীন কতগুলি চর্ব্বিত-চর্ব্বণের সমবায় পাঁচালীতে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াই মনে লয়। 'মিলনে'—(কবিতা) শ্রীশরচ্চন্দ্র সাহা। ইহাকে অর্থহীন শব্দ-সমন্বয় বলিলেও ক্ষতি নাই। পাঠ করিলে বুঝা যায়, লেখক বহু কষ্টে এই ক'টি ছত্র লিখিয়াছেন। শরৎ বাবুর কবিতা ছাড়িয়া, অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেই ভাল হয়। পঁচা মাল আজ কালের বাজারে বিকাইবে কেন ? 'আদর্শ ও উদ্বোধন' —শ্রীশশিমোহন বসাক এম্, এ। ক্রম-প্রকাশ্য প্রবন্ধ। যবনিকা পড়িলে, আমাদের বক্তব্য বলিব। 'সমালোচনা'—'বাল্মীকির জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা'—মন্দ হয় নাই। এবারকার 'নববিকাশে' আমরা বহুতর মুদ্রাকর-প্রমাদ দেখিতে পাইলাম। একটি বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোকের হস্তে প্রুফ দেখিবার ভারার্পণ করিলে বোধ

হয়, এই অসুবিধা দূরীভূত হইতে পারে। ভরসা করি, সম্পাদক মহাশয় ও 'সাহা-সমিতির' সেক্রেটারী মহাশয় এ বিষয়ে দৃষ্টি-পাত করিবেন। কারণ অনেক সময়, প্রুফ্ দেখিবার দোষে 'রাম রহিম' হয়—'আম আমলী' হয়। বিশেষতঃ ইহাতে লেখক-গণেরও মনোকষ্টের যথেষ্ট কারণ হয়।

কমলা।—ভাদ্র, ১৩১১। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, ব্যবসা ও বিজ্ঞান-বিষয়ে একমাত্র "কমলা"ই বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র। আমরা এই সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় "শিল্প রক্ষার সদুপায়" প্রবন্ধটি মন্দ নহে। পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। "শিরীষ"—শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ বি, এল। প্রবন্ধটি বেস হইয়াছে। ইহাতে বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। "সুপারি"—শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়। দরিদ্র বাঙ্গালীর পক্ষে এতাদৃশ প্রবন্ধ-পাঠ অনেক উপকারে আসিবে। পরের 'হুকুম' তামিল না করিয়া, একটি "সুপারি"-বাগান করি-লেও এক দরিদ্র বাঙ্গালী-পরিবারের অনায়াসে অন্ন-জলের সংস্থান হইতে পারে। "কন্যা বিবাহের সদুপায়"—শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। সুলিখিত সারগর্ভ প্রবন্ধ। সকলেরই ইহা একবার পাঠ করা উচিত। "কার্পাস"—শ্রীহরিদাস মিত্র, বি, এল। নিতান্ত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। "লেবু ও সাইট্রিক এসিড্"—শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। "কুসুম ফুল"—শ্রীতিন-কড়ি মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধটি অতি উপাদেয় হইয়াছে। পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। "পিপুল"—শ্রীবসন্তকুমার সেন। সুখ-পাঠ্য প্রবন্ধ। "শিমুল আলু"—শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়। পাঠযোগ্য প্রবন্ধ। পড়িয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। "কাপড় বুনিবার কল"—শ্রীদীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়। দীনবন্ধু বাবুর উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসার্হ। ভরসা করি, দেশের ধনী সন্তানগণ এ বিষয়ে

দীনবন্ধু বাবুকে অর্থসাহায্য করিয়া, দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন। "পোকা-লাগা ও ধসা-ধরা"—(উদ্ধৃত)। যাহাদের ফলের বা ফুলের বাগান আছে, তাহাদের পক্ষে এই প্রবন্ধটি অতি উপাদেয় হইবে। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য কথা রহিয়াছে। পরিশেষে আমরা 'কমলা'র ক্রমোন্নতি কামনা করিতেছি।

প্রদীপ।—কার্ত্তিক, ১৩১১। 'শিক্ষা'—শ্রীপ্রসাদদাস গোস্বামী। প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য ও সুলিখিত। 'ফকির শাহ জালাল'—শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য। শ্রীহট্টের খ্যাতনামা শাহ জালালের কথাই এই প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। 'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান'—শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ। বৈষ্ণব কবি ৺ শঙ্করদেব-রচিত 'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানের' পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। 'মধ্য এসিয়ার প্রাচীন বিবরণ'—শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র সান্ন্যাল। ক্রম-প্রকাশ্য প্রবন্ধ হইলেও, যতদূর পাঠ করা গেল, তাহাতে আমরা প্রীত হইয়াছি। আমরা ইহার সুখ-সমাপ্তি দেখিতে বাসনা করি। 'চিতোর দর্শনে'—(কবিতা) শ্রীঅতুলচন্দ্র সিংহ। অতুল বাবু কষ্ট-কবি নহেন। কবিতার স্থানে স্থানে তাঁহার বর্ণনা-শক্তির ও শব্দ-সম্পদের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। 'পেগু অধিকার'—শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত। অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ভাষাটিও বেস প্রাঞ্জল। "পরীরাজ্য"—(প্রতিবাদ) শ্রীরামলাল সরকার। রামলাল বাবুর প্রতিবাদ যুক্তি-যুক্ত বলিয়াই আমাদের মনে লয়। কিন্তু বর্ম্মা ভাষার শব্দ উচ্চারণ সম্পর্কে, আমরা রামলাল বাবুর সহিত একমত হইতে পারিলাম না। কারণ অধিকাংশ উচ্চারণই অনুনাসিক। সুতরাং কাগজে-কলমে সেই সকল উচ্চারণ প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। বঙ্গভাষায় 'আমি' শব্দ অতুল বাবুর মতে 'চুনো'—রামলাল

অশিক্ষিত বর্ম্মান্‌কে "চৌ" বা "চুণ্ড" বলিতেও শুনিয়াছি।
ইত্যাদি ইত্যাদি।

অন্তঃপুর।—অগ্রহায়ণ, ১৩১১। "দিনাজপুরের প্রাচীন গৌরব"—শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দাসী। প্রবন্ধটি সুলিখিত বটে, কিন্তু বড়ই সংক্ষিপ্ত। "বঙ্গ বিধবা"—শ্রীমতী নীরদবাসিনী বসু। প্রবন্ধটি অতি উপাদেয় হইয়াছে। লেখিকা একটি "বিধবাশ্রম' প্রতিষ্ঠার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার এই সাধু সঙ্কল্প পূর্ণ হউক,—ভগবান্ তাঁহার সহায় হউন। "কাত্তাবক ক্ষিলিত শক্তির প্রভাব সর্ব্বজনবিদিত"। লেখিকার প্রাণে আমরাও বলিতেছি,—"জ্বালাময় বৈধব্য-জীবনের অশেষ জ্বালা যন্ত্রণা দুঃখ ক্লেশ নিরাকরণের একমাত্র উপায় ভগবৎ-প্রেমে ডুবিয়া, পরহিত-ব্রতে জীবন মন সমর্পণ।" "নীরদা"—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী। ক্রম-প্রকাশ্য গল্প। মন্দ লাগিল না। "সেবা"—'অন্তঃপুর'-সম্পাদিকা শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র লিখিত। প্রবন্ধটি সুখ-পাঠ্য হইয়াছে। লেখিকা বলেন,—"পরিবারই আমাদের শিক্ষা ও পরীক্ষার উপযুক্ত স্থান"। কিন্তু আমাদের মনে লয়, ত্রিবিধ (শারীরিক,বাচনিক ও মানসিক) "সেবার" গণ্ডী এতটা সঙ্কীর্ণ নহে,—যেন ইহারও অনেক বাহিরে। লেখিকা বঙ্গ বিধবাগণকে সেবা-ব্রতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু উহাই কি নিরক্ষরা বঙ্গবিধবাদের দুঃসহ যন্ত্রণা দূরীকরণের পক্ষে যথেষ্ট?—সেবা-ব্রতে দীক্ষিত হইবার জন্য অবসর প্রদান করা, পূর্ব্বে কর্ত্তব্য নয় কি? "ভিক্ষা"—(কবিতা) শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র। ভাবটি অতি উচ্চ,—বাঁধুনিও বেস সরস ও সরল। "অর্ঘ্য"—(কবিতা) শ্রীমতী শান্তিময়ী।—মন্দ লাগিল না। "লক্ষ্য তারা"—(কবিতা)

হল !"—(কবিতা)—হেমন্ত। শোকোচ্ছ্বাস বলিয়া পরিত্যক্ত। "সে শুভ দিন'—(কবিতা) শ্রীমতী হিরণ্ময়ী সেনগুপ্তা। একটি কষ্ট-কল্পিত পাঁচালী বা হেঁয়ালী। দুই এক স্থানে 'যতি'ও পড়িয়া গিয়াছে ; এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় ও ষোড়শ লাইনে "অক্ষর"-পাত ঘটিয়াছে। "অভাগিনী' - (কবিতা) শ্রীমতী সরোজিনী বসু। মন্দ হয় নাই। "সেক্স্পীয়ারের ঝটিকা নামক নাটকের বঙ্গানুবাদ"—শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু। উদ্যম প্রশংসনীয়। লেখাও মন্দ হইতেছেনা। "টোট্কা ঔষধ"—(উদ্ধৃত) প্রয়োজনীয় জিনিষ।

নবনূর।—মাঘ, ১৩১১। "সার্দ্ধ সপ্ত পরিবারের ইতিবৃত্ত"—মোহাম্মদ মহ্তসম-বিল্লা চৌধুরী। সুলিখিত প্রবন্ধ। "মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত"—ক্রম-প্রকাশ্য প্রবন্ধ। "শিশির-বর্ণন"—(পদ্যানুবাদ) শ্রীসতীশচন্দ্র রায়। মন্দ লাগিল না। "এস্লামিক যৎকিঞ্চিৎ"—মৌলভী ইম্দাদুল হক্, বি, এ। সুখ-পাঠ্য সারগর্ভ প্রবন্ধ। "গান" - (গীতি-কবিতা) শ্রীঅনঙ্গ-চন্দ্র দত্ত। অনঙ্গ বাবুর "গানে" আমাদের মন মাতিল না। "দুই খানি নূতন গ্রন্থ"—(আলোচনা) শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার। মজুমদার মহাশয়, শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত-প্রণীত "হজরত মোহাম্মদ" ও মৌলভী ইম্দাদুল হক্ বি, এ,-প্রণীত "মোস্লেম জগতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা" নামক গ্রন্থদ্বয়ের সমালোচনা করিতেছেন। ক্রম-প্রকাশ্য বলিয়া, আমাদের বক্তব্য মুলতুবি রহিল। "অভ্যর্থনা"—(কবিতা) শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন। ইহা "স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজের চট্টগ্রামে আগমন উপলক্ষে লিখিত ও অভ্যর্থনা-সভায় পঠিত।" লেখকের প্রাণে সমালোচনা এক প্রকার অসম্ভব। "সুকৃতি"—নওশের আলী খাঁ ইউসফ জী। সুলিখিত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। "স্বপ্নবাদীর আবেদন'—

শ্রীমতী চন্দ্রাননী দেবরাণী। কালোচিত ব্যঙ্গ-কবিতা। "কবিতা গুচ্ছ"—মাত্র "ধ্যান-ভঙ্গ" ছাড়া, অপর গুলি 'কবিতা' নামের নিতান্ত অযোগ্য। "বিধবা" কবিতাটি নিতান্ত কুরুচি-পূর্ণ—পত্রিকায় স্থান পাইবার যোগ্য নহে।

অর্চ্চনা।—পৌষ, ১৩১১। 'নিরাশ প্রতীক্ষা'—(কবিতা) শ্রীযতীন্দ্র নাথ সোম। আজি কালি কবিতা সাধারণতঃ যেরূপ হয়, ইহাও তেমনই হইয়াছে। বহু 'প্রতীক্ষা' করিয়াও, কবির মত আমাদিগকেও 'নিরাশ' হইতে হইয়াছে। "কর্ম্ম-ফল ও গ্রহের ফের"—শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত, এম, এ, বি, এল। প্রবন্ধটি সুখ-পাঠ্য হইলেও, একদেশ-দর্শী। একস্থলে লিখিত আছে,—"আত্মোন্নতি হিন্দুদিগের প্রধান লক্ষ্য।" আমরা বলি,—শুধু 'হিন্দুদিগের' কেন—'আত্মোন্নতি' সকল সম্প্রদায়েরই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে সম্প্রদায় এ বিষয়ে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট, তাহা সম্প্রদায় পদবাচ্য নহে। যাহা হউক, লেখক বহু চেষ্টা করিয়াও 'কর্ম্ম-ফল ও গ্রহের ফেরের' সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, চরম মীমাংসায় পঁহুছিতে পারেন নাই। উদ্যম প্রশংসনীয় বটে। 'মাধুরী'—(গল্প) যতদূর পাঠ করিয়াছি, তাহাতে সুখী হইতে পারি নাই। এ ত 'মাধুরী' নয়, যেন 'আলুনী খিচুরী'! সমাপ্তির পর বক্তব্য বলিব। 'রাঠোর বালক'—(কাব্য) শ্রীউমাচরণ ধর। ক্রম-প্রকাশ্য। 'বাঙ্গালার প্রাচীন পুঁথি-উদ্ধার'—আবদুল করিম। লেখকের উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসার্হ। এবার 'শনির পাঁচালী'র উদ্ধার হইয়াছে। 'কবিতা-কুঞ্জের'—'কমলে কামিনী' ও 'উমাশশী' সনেট দুটি একসূত্রে গাঁথা। লেখক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন। 'আত্ম প্রতিষ্ঠায়' ও 'আত্ম বিসর্জ্জনে' শীর্ষক সনেট্ দুইটিও এক সুরের। কিন্তু লেখক শ্রীউমাচরণ ধর মহাশয় প্রকৃত প্রেমিক নহেন। কারণ, তিনি 'প্রেমের

প্রতিদান' চাহেন। সুতরাং এই প্রেম নিষ্কাম নহে। 'আবাহন' —(কবিতা)—শ্রীকৃষ্ণ দাস চন্দ্র। ইহা সাহিত্য-ক্ষেত্রের আবর্জ্জনা বিশেষ। তবে উপাস্য দেবতাকে যে যে ভাবেই ডাকুক না কেন, তিনি ভক্তাধীন, অবশ্যই কৃপা করিলে করিতে পারেন। কিন্তু অপরে করিবে কেন ?

পথিক।—পৌষ, ১৩১১। 'শ্রীহরির প্রতি'—(কবিতা) শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন। কবিতাটি প্রেমিকের প্রাণে লিখিত। সুতরাং বিচারের ভার প্রকৃত ভক্তের নিকট। 'শঙ্করের ছান্দোগ্য ভাষ্য'—শ্রীউমেশ চন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন। প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য ও সারগর্ভ হইয়াছে পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। 'শ্রীপুর ডুবি'—(উপন্যাস) শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ। আজ দুই মাস যাবৎ এই 'ডুবি'র কার্য্য চলিয়াছে ; আরও কত কাল চলিবে, তাহা ভবিতব্যতাই জানেন। এবার দেখিলাম,— "ভিজা সর-সর বাতাসে" "অমর ফিন্ ফিনে পাঞ্জাবী, মিহি শান্তিপুরে ও জরির উড়ানি পড়িয়া ফড়াক্ ফড়াক্ শব্দে চটি বাজাইয়া সোণামার বাড়ী যাইতেছিল।" বলি, 'ভিজা বাতাসে' একটা মোটা গরম কাপড় গায় দেওয়াইয়া, অমরকে বাহির করিলে, দোষ ছিল কি ? এক্ষণ অমরের সর্দ্দি না ধরিলেই ভাল ! 'সাগরক্কের'—'জাপান জননী'—(কবিতা) শ্রীশরৎ কুমার সেন গুপ্ত। 'ছুটিলা', 'কহিলা', 'উঠিলা', 'চুম্বিলা', 'ভাতিলা' 'দেখিলা' প্রভৃতি 'মাইকেলী' ক্রিয়াপদগুলি অন্যায়রূপে ব্যবহার করিয়া, শরৎ বাবু এই কবিতাটির সৌন্দর্য্য অনেকাংশে নষ্ট করিয়াছেন। 'সকলি কি ভুল ?'—(কবিতা) শ্রীসুরেন্দ্র মোহন গুপ্ত। আমাদের মনে লয়, এই 'ভুল' শুধু লেখকের,— অন্যের নহে। বাস্তবিক কবিতা খানি মরমের কথায় ভরা। কিন্তু সে সকল আবার লেখক ছাড়া অন্যে বুঝিবার সাধ্য নাই।

'চুড়োর'—(কবিতা) কুমারী আশালতা গুপ্তা। ফুটনোটে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, কবিতার লেখিকা দশমবর্ষীয়া বালিকা। পাঠ করিয়া বুঝিলাম, যেন বয়সের অনুপাতে লেখাটা অনেক পাকিয়া উঠিয়াছে। কারণ, এ বালিকা-কবির শব্দ-সম্পদ্ অনেক আধুনিক কবি হইতেও যেন বেসী বলিয়া, মনে লয়। যাহা হউক, বয়সে বালিকা হইলেও, কুমারী আশালতাকে জ্ঞান-বৃদ্ধা বলিতে হইবে। 'অঞ্জলি'—(কবিতা) শ্রীমতী মৃণালিনী গুপ্তা। কবিতাটি বড়ই প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। ভাব ও ভাষা সরস ও সরল। লেখিকা দীর্ঘজীবিনী হউন।

আরতি।—মাঘ, ১৩১১। পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র রায় সম্পাদিত। এতদিন পর,—"আরতি" পুনঃ প্রচারিত হইল। আমরা "আরতির" দীর্ঘ জীবন কামনা করি। "বাণী-আরাধনা"—সম্পাদক-লিখিত। কবিতাটি সরস হইয়াছে। "কালিদাস ও রঘুবংশ'—শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী। সুলিখিত প্রবন্ধ। "খুকি"—(গল্প) শ্রী:—। গল্পটি মন্দ হয় নাই; কিন্তু দুইএক স্থানে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে লয়। "খেদা"—শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মণঃ। এই প্রবন্ধে হস্তী ধরা ও উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। "ময়মনসিংহে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ"—শ্রীকেদারনাথ মজুমদার। কেদার বাবু প্রাচীন তথ্যাদি সংগ্রহে সিদ্ধহস্ত। "কাব্যালোচনা'—মন্দ লাগিল না। "নুপুর"—(কবিতা) শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, বি, এল। কবিতাটিতে মৌলিকত্ব আছে। কিন্তু ভাবটি উচ্চ অঙ্গের নহে। রমণী বাবুর "নূপুর", "ভ্রমর"—না, "মায়ার বন্ধন", তাহার শেষ মীমাংসা হয় নাই।

"উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ"।

বিদায়।

বিফল প্রয়াসে প্রেম চাহে বাঁধিবার,
বিদায় খুলিয়া দেয় মিলন-বন্ধন ;
আকুল হৃদয়ে প্রেম দেখে দাঁড়াইয়া,
সীমাহীন আকাঙ্ক্ষার নিষ্ফল মরণ !
সুকুমারী নিঝরিণী নগেন্দ্র-কন্দরে
জনমি,—অমনি চাহে কাতরে বিদায় ;
প্রভাতী তরুণ রবি সন্ধ্যার সাগরে
ধরণীর কাছে যাচে নীরব বিদায় ;
শ্যামল বল্লরী সিক্ত নয়ন সলিলে,
নেহারে বিদায় ম্লান কুসুম তাহার ;
শ্মশান-বিহারী বায়ু,—উচ্ছ্বাসে তটিনী,
বিদায়ের শোক-গাথা গাহে অনিবার ;
নীরবেতে বসুন্ধরা নয়নে অঞ্চল
কাতরে মুছিছে শুধু শোক-অশ্রু-জল !

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ

সায়েস্তা খাঁ আমীর উল্ ওম্‌রা। *

মিরজুম্‌লার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্ঞী নুরজাহানের ভগ্নী-পুত্র সায়েস্তা খাঁ আমীর উল্ ওম্‌রা বাঙ্গালার মস্‌নদে সমাসীন হন। ইঁহার শাসন-কালের প্রথম কার্য্য,—১৬৬৪ খৃঃ অব্দে বহুতর রণ-তরী সংগ্রহ, এবং রণ-কুশল তের হাজার লোক দ্বারা একটি সৈন্য-দল সংগঠন।‡ উক্ত সৈন্য-দল সর্ব্বপ্রথম রণ-পোতাদি সহ ঢাকা হইতে যাত্রা করিয়া জুগ্‌দিয়া ও আলমগীরনগরের দুর্গ ধ্বংস করতঃ সন্দীপ দখল করিয়া লয়। বহুদিন যাবৎ এই সন্দীপ আরাকানীদের দখলে ছিল। চট্টগ্রামে যেসকল পর্ত্তুগীজ বসতি করিতেছিল, তাহাদের অনেক আরাকান-রাজ কর্ত্তৃক ঐ রাজ্যের বিবিধ বিষয়-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু মোগল সৈন্যা-ধ্যক্ষের প্ররোচনায়, ভয়েই হউক,—কিংবা মোগলের অধীনে বাঙ্গালায় উচ্চপদ-প্রাপ্তির আশায় এবং সপরিবারে সুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিবার জন্য ভূমি-লাভের প্রলোভনেই হউক, তাহারা আরাকান-রাজের আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বাস্তবিক ইহা পর্ত্তুগীজদের পক্ষে শ্লাঘার কথা নহে।

অতঃপর পর্ত্তুগীজগণ সপরিবারে সন্দীপে উপস্থিত হইলে, মোগল-সেনাপতি তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মোগল-সৈন্যাধ্যক্ষ পর্ত্তুগীজদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া, কতিপয় কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিকে আরাকান-রাজের বিরুদ্ধে প্রেরিত মোগল-অভিযানের সাহায্য করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং অবশিষ্ট পর্ত্তুগীজগণকে বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তার নিকট প্রেরণ

---

* এই প্রবন্ধটি ফাল্গুনের "ধূমকেতু"তে প্রকাশিত "প্রাচীন ঢাকা" শীর্ষক প্রবন্ধের অংশ বিশেষ। প্রঃ লেঃ।

‡ Vide India Records, Vol. III. AD. 1664.

করিয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর সায়েস্তা খাঁ উহাদের বাসের জন্য ঢাকার ১২ মাইল দূরবর্ত্তী একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। অদ্যাপিও উক্ত স্থান "ফিরিঙ্গিবাজার" বলিয়া অভিহিত হয়, এবং তথায় এক্ষণও পর্ত্তুগীজদের বংশধরগণ অবস্থান করিতেছেন।

এদিকে আরাকানী ও মোগল সৈন্যের মধ্যে এক খণ্ড-যুদ্ধ হওয়ার পর, আরাকানীগণ হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। অতঃপর মোগল সৈন্য চট্টগ্রামাভিমুখে অগ্রসর হয়, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই চট্টগ্রাম মোগলদের হস্তগত হয়। সে সময়েই মোগলগণ কর্ত্তৃক চট্টগ্রামের "ইস্‌লামাবাদ" বা "ধর্ম্মাশ্রম" (the residence of the faithful) নামকরণ হয়।

সায়েস্তা খাঁর শাসন-সময়েই ইংরেজ বণিক্‌গণকে ঢাকায় নূতন বাণিজ্যাগার স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়।* বাঙ্গালায় ইংরেজ বণিক্‌গণের বাণিজ্য-ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার দেশীয় তাঁতির কাপড়েরও যথেষ্ট কাট্‌তি হয়। ১৬৬৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঢাকায় ইংরেজদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাণিজ্যাগার ছিল না। ইংরেজ বণিক্‌গণ সময় সময় বাণিজ্য-বস্তু সহ ঢাকায় উপস্থিত হইতেন, এবং তদ্বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারা ঢাকাই মস্‌লিন ও অন্যান্য দেশীয় শিল্পজাত ক্রয় করিয়া, কোম্পানীর জাহাজ যোগে হুগুলী ও বালেশ্বরে চালান দিতেন। ঢাকার শিল্পজাত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমতঃ কাশিমবাজারের সওদাগরদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইতেন। তখন ঢাকায় ইংরেজ বণিক্‌গণের কোন বাণিজ্যাগার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু

* "In 1668 permission was granted to form a new establishment at *Dacca*, the then capital of *Bengal*, celebrated for the fineness of its muslins and the beauty of its woven stuff."—*Wilson's Early Annals of the English in Bengal, P. 45.*

ঢাকার দেশীয় শিল্পজাতের বিস্তর কাট্‌তি দেখিয়া, কোম্পানী, হুগলীর এজেন্টের তত্ত্বাবধানে, ঢাকাতে একটি শাখা-বাণিজ্যাগার প্রতিষ্ঠার্থ অনুমতি পাইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও বহু কারণে কোম্পানীর ঢাকায় স্থায়ীভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইবার বাসনা বলবতী ছিল। যেহেতু তৎকালে ঢাকা বাঙ্গালার রাজধানী ছিল; সুতরাং বঙ্গের প্রধান প্রধান বন্দরগুলিতে বাণিজ্য করিবার অনুমতি লওয়ার জন্য, কোম্পানীর এজেন্টকে প্রায়শঃ ঢাকায় যাতায়াত করিতে হইত। বিশেষতঃ হুগলী ও কাশিমবাজারের ছোট-খাট মোগল-কার্য্যকারকগণের অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত, এবং যাহাতে মোগল সম্রাটের নিকট পর্ত্তুগীজ ও দিনেমারদিগের প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি না পায়, তদুদ্দেশ্যে মোগল-রাজ-কর্ম্মচারিগণের সহিত কোম্পানীর অতি নিকট সম্বন্ধ থাকা, একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল।

১৬৬৮ খৃঃ অব্দে ঢাকায় ইংরেজ বণিক্‌গণের বাণিজ্যাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।* কোম্পানীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ঢাকায় বাণিজ্যাগার প্রতিষ্ঠা করিলে, বিলাতী শিল্পের খুব বেসী কাট্‌তি হইবে। পক্ষান্তরে, বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তাদেরও ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, এই সুযোগে ঢাকার দেশীয় শিল্পজাতের যথেষ্ট সমাদর হইবে॥ এই হেতুই ইংরেজ বণিক্‌গণকে ঢাকায় একটি বাণিজ্যাগার সংস্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়।§ নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসন-

* Vide *Extract from the Courts letter to the Council at Hoogly.*

§ "We then give you liberty to send 2 or 3 fit persons thither to reside and to furnish them with cloths & proper for that place."—*Diary of William Hedges. Vol. III. P. CXCV.*

কালে ইংরেজদের বাণিজ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল; খ্যাত নামা ঐতিহাসিক মিঃ ষ্টিউয়ার্টও একথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। উক্ত ঐতিহাসিক আরও বলেন,—১৬৭২ খৃঃ অব্দে ইংরেজ বণিক্‌গণকে বিনা শুল্কে সমগ্র বঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের অনুমতি প্রদান করা হয়। † সেই "পরওয়ানা" বা আদেশ-পত্র সম্রাট আওরঙ্গজীবের রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরের তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিবসে লিখিত হয়। ‡

প্রসিদ্ধ ফরাসী পর্য্যটক মিঃ জে, বি, টেভারনিয়ার (Mr. J. B. Tavernier) মোগলদের নিকট বিক্রয়ার্থ বহুমূল্য শিল্প-সম্ভার সমভিব্যাহারে দুই বার ঢাকায় সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমবার ১৬৪০ খৃঃ অব্দে এবং দ্বিতীয়বার ১৬৬০ খৃঃ অব্দের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে তিনি ঢাকায় পঁহুচিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার অতি অল্প সময় তিনি ঢাকায় অবস্থান করিয়াছিলেন। ঢাকার তদানীন্তন সমৃদ্ধি সম্পর্কে উক্ত ফরাসী পর্য্যটক যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা বহুতর তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি।* দ্বিতীয়বার যখন তিনি ঢাকায় উপস্থিত হন, তখন নবাব সায়েস্তা খাঁ আরাকান-রাজের সহিত যুদ্ধে সম্পৃক্ত ছিলেন। সায়েস্তা খাঁর সম্পর্কে আরও অনেক কথা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

---

† "He also, in the year 1672, granted them an order for freedom of trade throughout the province, without the payment of any duties."—*Stewart's History of Bengal.*

‡ Vide *A diary kept by Streynsham Master, 1675-1676. No. 120. Pp. 348-49.*

* "*Dacca* is a large town, which is only of the extent as regards length, each person being anxious to have his house close to the *Ganges.* This length exceeds 2 coss ; and from the last brick-bridge, which I have mentioned above upto

উক্ত ফরাসী পর্য্যটক বলেন,—বাঙ্গালার নবাব সায়েস্তা খাঁ একজন সুচতুর লোক ছিলেন। আরাকান-রাজের সহিত যুদ্ধের সময়, তিনি বহুতর আরাকানী সৈন্যকে গোপনে উৎকোচ প্রদানে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এতদ্ধেতুই যুদ্ধকালে পর্ত্তুগীজগণের নেতৃত্বাধীনস্থ আরাকান-রাজের প্রায় চল্লিশ খানি সুসজ্জিত রণ-তরী সহসা সায়েস্তা খাঁর পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। এই সকল গুপ্ত সাহায্য দৃঢ়ীকরণকল্পে, বাঙ্গালার নবাব প্রত্যেক পর্ত্তুগীজ-রণ-কর্ম্মচারীকে ও তদধীনস্থ সৈন্যদিগকে যথেষ্ট বেতন দিতেন; কিন্তু দেশীয় সৈন্যগণ মাত্র তাহাদের প্রচলিত বেতনের দ্বিগুণ প্রাপ্ত হইত। তৎকালে যে সকল তরীযোগে যুদ্ধ-যাত্রা হইত, তৎসমুদায়ই এদেশীয় কারিকরের প্রস্তুত। বহুসংখ্যক দাঁড় সংযোগে ঐসকল তরী পরিচালিত হইত। মিঃ টেভারনিয়ার বলেন,—ঐ জাতীয় কোন কোন তরীর প্রত্যেক পার্শ্বে পঞ্চাশ খানা করিয়া দাঁড় সংলগ্ন থাকিত; প্রত্যেক দাঁড় দুইজন লোক দ্বারা টানিত হইত। সমস্ত দাঁড়

Dacca, there is a succession of houses, separated one from the other, and inhabited for the most part by the carpenters who built galleys and other vessels. These houses are properly speaking, only miserable huts, made of bamboo and mud, which is spread over them. Those of *Dacca* are scarcely better-built, and that which is the residence of the Governor is an enclosure of high walls, in the middle of which is a poor house, merely built of wood. He ordinarily resides under tents, which he pitched in a large court in this enclosure. The Dutch, finding that their goods were not sufficiently safe in the common house of *Dacca*, have built a very fine house, and the English have also got one which is fairly good. The church of the Rev. Augustin Fathers is all of brick, and the workmanship of it is rather beautiful."—*Extract from the Diary of Mr. J. B. Tavernier.*

একসঙ্গে টানিলে, তরীগুলি এত দ্রুত চলিত যে, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। কোন কোন তরী আবার বিবিধ বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত রহিত।*

মিঃ টেভারনিয়ার নবাব সায়েস্তা খাঁ ও তাঁহার দশম বর্ষবয়স্ক পুত্রের নিকট বহুমূল্য জহরৎ-খচিত একটি জামা, একটি হার, একটি ঘড়ি, তুইটি পিস্তল ও একটি দূরবীক্ষণ-যন্ত্র বিক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি উপরোক্ত দ্রব্যজাতের মূল্য কাশিমবাজারে পাওয়ার জন্য নবাবের দেওয়ানের নিকট হইতে এক অনুজ্ঞা-পত্র লইয়াছিলেন। নবাব যে ঢাকায় তাঁহাকে মূল্যের মুদ্রা দিতে অস্বীকৃত ছিলেন, এমন নহে; কিন্তু মিঃ টেভারনিয়ার তাঁহার কতিপয় দিনেমার বন্ধু কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াই, মূল্যের টাকা কাশিমবাজারে লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কারণ টাকা লইয়া নৌকাযোগে এতদূর যাওয়া, তখন বাস্তবিকই নিরাপদ ছিল না; জল-পথে বহুতর চোর ডাকাতের উপদ্রব ছিল। ২০শে জানুয়ারী তারিখে তিনি নবাবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন; বিদায়-কালে নবাব তাঁহাকে স্বীয় পরিবারস্থ ব্যক্তি বলিয়া একখানা "ছাড়-চিঠি" (pass-port) দিয়াছিলেন। ঐ চিঠির বলে তিনি মোগলাধিকারে যথাতথা যাতায়াত করিতে পারিতেন; কেহ কখনও তাঁহার গতিরোধ করিতে সাহসী হইত না।‡

* "It is a most surprising thing to see with what speed these galleys are propelled by oars. There are some so long that they have upto fifty oars on each side, but there are not more than 2 men to each oar ; you see some, which are much decorated, where the gold and azure have not been spared."—*Diary of Mr. Tavernier.*

‡ "On the 20th, I took leave of the Nawab, * * * * * * and who gave me a pass-port, in which he described me as a gentleman of his house-hold. * * * * * * * * * * * * * * In virtue of this pass-port, I was able to go and come throughout all the territories of the Great Mugul as one of his households, and I shall explain their tenor in Book II."—*Diary of Mr. Tavernier.*

ঢাকায় তখন মিঃ প্রাট্ (Mr. Pratt) ইংরেজদিগের কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। মিঃ টেভারনিয়ার ঢাকা পরিত্যাগ কালে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ২৯শে জানুয়ারী তারিখে তিনি ঢাকা পরিত্যাগ করেন। ঐ তারিখ হইতে ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত নৌকায় অবস্থানের পর, তিনি হাজ্রাপুরে মালপত্র সহ ভৃত্যগণকে ছাড়িয়া, অপর এক নৌকা ভাড়া করতঃ মিরধাপুর নামক এক গণ্ডগ্রামে উপস্থিত হন।

অতঃপর কাশিমবাজারে পঁহুছিয়া মোগল কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে মিঃ টেভারনিয়ারকে বহু বেগ পাইতে হইয়াছিল। মোগল কোষাধ্যক্ষের নিকট নবাব সায়েস্তা খাঁর অনুজ্ঞা-পত্র প্রদর্শন করিলে, কোষাধ্যক্ষ বলিল যে, তিন দিবস পূর্ব্বেই সে নবাবের নিকট হইতে টাকা না দেওয়ার জন্য, দ্বিতীয় এক আদেশ-পত্র প্রাপ্ত হইয়াছে! অতঃপর নবাব সায়েস্তা খাঁর অনুমতি-পত্র পাইয়াও, কোষাধ্যক্ষ মিঃ টেভারনিয়ারকে তাঁহার প্রাপ্য টাকা হইতে বিংশতি সহস্র মুদ্রা কম দিতে চাহিয়াছিল! ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, তখন কোন কোন রাজ-কর্ম্মচারী চুরি-চামারী ও জাল-জুয়াচুরিতে কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিল! কিন্তু মিঃ টেভারনিয়ার কোষাধ্যক্ষের এতাদৃশ অন্যায় আবদার অগ্রাহ্য করিয়া, পুনঃ এতৎসম্পর্কে নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তারপর নবাবের কড়া হুকুমে মিঃ টেভারনিয়ারের লাভের বাণিজ্যের জের মিটিল!

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঢাকা ও ঢাকাবাসীদিগের অবস্থান্তর সম্পর্কে বহু তথ্য মিঃ হেজের ডায়েরী হইতে আমরা সংগ্রহ করিতে পারি। মিঃ হেজ্ তখন বঙ্গে ইংরেজ উপনিবেশ সমূহের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন, এবং ১৬৮২ খৃঃ অব্দে তিনি ঢাকায় পদার্পণ

কথা জ্ঞাপন করতঃ, বঙ্গোপসাগরে ইংরেজদিগের অবাধ বাণিজ্যের এক অনুমতি-পত্র বা "ফরমাণের" প্রার্থনা করেন।

১৬৮২ খৃঃ অব্দের ২৫শে অক্টোবর তারিখে মিঃ হেজ্ ঢাকার নিকটবর্ত্তী চাঁদ খাঁর বাগানে প্রথম উপনীত হন; তথায় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বহুসংখ্যক দিনেমার বণিক্ ও ইংরেজ বণিক্ সমুপস্থিত ছিলেন। তৎপর দিবস প্রাতে মিঃ পাউনেস্ট ও মিঃ জে, প্রাইস্, নবাবের দেওয়ান রায় নন্দলালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, মিঃ হেজের আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করেন, এবং যাহাতে তিনি নবাবের দর্শন-লাভ করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়া আইসেন। ঐ দিন বিকাল বেলায় মির্জ্জা মোজাফর খাঁ নামক জনৈক মোগল যুবক (যাঁহার মাতা ও আওরঙ্গজীব ভাই-ভগ্নী সম্বন্ধ, এবং যিনি বর্ত্তমান নবাব সায়েস্তা-খাঁর সম্পর্কিত ভাগিনেয়) মিঃ হেজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। বহুক্ষণ দুই জনে আলাপ-প্রসঙ্গ হয়।

২৭শে অক্টোবর সন্ধ্যার প্রাক্কালে মিঃ হেজ্ নবাবের দেওয়ান রায় নন্দলালের সহিত সাক্ষাৎ করেন। রায় নন্দলাল তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন, এবং ঐ রাত্রিতে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করেন। নবাব প্রকাশ্য দরবারে বসিলেই সাক্ষাৎ করা যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনায়, মিঃ হেজ্ সাক্ষাৎ করিতে বিরত হন। ২৯শে অক্টোবর নবাব দরবারে বসিবেন, একথা পরিজ্ঞাত হইয়া তিনি ফিরিয়া আইসেন।

২৯শে অক্টোবর প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় মিঃ হেজ্ নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। প্রায় পোয়া ঘণ্টা কাল অপেক্ষার পর তিনি নবাবের দরবারে নীত হন। কিন্তু নবাব সায়েস্তা খাঁ আসাম ও শ্রীহট্ট আক্রমণার্থ প্রেরিত অভিযানের

পরাজয়-বার্ত্তা শ্রবণে উদ্বিগ্ন ও নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, প্রথমতঃ মিঃ হেজের দরবার গৃহে প্রবেশ-লাভ লক্ষ্য করিতে অবসর পান নাই। ঐ সকল কার্য্য সম্পাদনের পর নবাব, মিঃ হেজের উকীল মিঃ প্রাইস্‌কে ডাকাইয়া বলেন যে, মিঃ হেজের আগমনে তিনি যথেষ্ট আনন্দিত ও প্রীত হইয়াছেন। নবাব বারংবারই ইনি (মিঃ হেজ) কোম্পানীর লোক কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তৎপর মিঃ হেজের সহিত নবাবের বিবিধ আলাপ-প্রসঙ্গ হয়। তিনি তুরস্ক ও আরবে কথনও গিয়াছেন কি না, ঐ দেশীয় ভাষা জানেন কি না, জর্ম্মণ সম্রাটকে দেখিয়াছেন কি না, স্পেন সাম্রাজ্য পৃথিবীর কোন অংশে অবস্থিত ইত্যাদি বহু প্রশ্ন মিঃ হেজ্‌কে করিয়াছিলেন। মিঃ হেজও যথাসম্ভব উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। বিদায় কালে নবাব আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, মিঃ হেজের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং মিঃ হেজ্ দরবারগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলে পর, নবাব অন্দর মহলে চলিয়া যান।

৩০শে অক্টোবর সম্রাটের দেওয়ান হাজি সাফি খাঁর সহিত মিঃ হেজ্ সাক্ষাৎ করেন। তিনি তখন তথায়ই ছিলেন। ঐ দিবসই বিকাল বেলায় নবাবের প্রাসাদ হইতে মিঃ হেজের জন্ত বিবিধ সুখাদ্য পরিপূর্ণ, রৌপ্য-নির্ম্মিত ঢাকুনীতে আচ্ছাদিত, বড় বড় ৮।১০ খানা থালা আসে। ইহাও মিঃ হেজের পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নহে।

রায় নন্দলালের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত সময় নির্দ্দেশার্থ ৯ই নভেম্বর মিঃ প্রাইস্‌কে তৎসন্নিধানে পাঠান হয়। ঐ দিবসই দিবা দুই প্রহরের পর রায় নন্দলালের সহিত মিঃ হেজের শেষ সাক্ষাৎকার হয়। তখন তিনি, হুগুলীর বুলচাঁদ ও পরমেশ্বর দাস, ইংরেজদের প্রতি কীদৃশ অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়ন

করে, তদ্বিষয় সবিস্তর বর্ণনা করিয়া, অবাধ বাণিজ্যের দরুণ একটি 'ফরমান্' লইয়া দেওয়ার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তরে রায় নন্দলাল তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া, 'ফরমাণের' মোসাবিদা করিবার জন্য দুই জন কর্ম্মচারীকে আদেশ করেন।

৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে মিঃ প্রাইস্ মিঃ হেজ্‌কে তিন খানা "পরওয়ানার" পাণ্ডুলিপি দেখাইয়া ছিলেন। ঐ তিন খানা "পরওয়ানাই" মিঃ হেজ্‌কে নবাব সায়েস্তা খাঁ শীল-মোহর করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম "পরওয়ানায়" পরমেশ্বর দাসকে কার্য্য হইতে বিতাড়ন, ইংরেজদিগের নিকট হইতে যে অর্থ জোর করিয়া লইয়াছিল, তাহার প্রত্যর্পণ ও ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যের "হুকুম" ছিল; দ্বিতীয় "পরওয়ানায়" বুলচাঁদ ও হুগলীর ফৌজদারের প্রতি আদেশ ছিল যে, তাহারা অচিরে মিঃ পিট্‌স্ ও কাপ্তান ডরেল্‌কে ধরিয়া নবাবের নিকট লইয়া আসিবে; কারণ মোগলের প্রজাগণের উপর অযথা অত্যাচারের দরুণ তাহাদের জামীন দেওয়ার অতি আবশ্যক। যদি তাহারা পলায়নপর হয়, তবে তাহারা পলাতক আসামী বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং ভবিষ্যতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের দরুণ কোন "হুকুম" পাইবে না; তৃতীয় "পরওয়ানায়" মালদহের অভাব অসুবিধার প্রতিকারের জন্য বিহিত আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল। তৎপর ১০ই ডিসেম্বর নবাব উক্ত পরওয়ানাত্রয়ে নিজ নামের শীল-মোহর দিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিবার জন্য উপযুক্ত লোকের হাওলা করিয়া দেওয়াইয়া ছিলেন।

কিন্তু মিঃ হেজের আশা তথাপি ফলবতী হইল না; কারণ কারখানার কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে আত্ম-কলহ উপস্থিত হওয়ায়, মিঃ হেজ্ দুই বৎসর কার্য্য-কাল পূর্ণ না হইতেই অবসর গ্রহণ

গোলযোগ উপস্থিত হয়, এবং অপরাপর বণিক্‌গণ তাঁহাদিগকে সাতিশয় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। এ জন্যই কোম্পানীর হুগুলীর কারখানার গবর্ণর মিঃ গাইফোর্ড ১৬৮৫ খৃঃ অব্দে কোম্পানীর অবাধ-বাণিজ্যের জন্য ও গঙ্গার মোহানায় বা তীরদেশে একটি বাণিজ্যাগার প্রতিষ্ঠার জন্য দরখাস্ত করেন। কিন্তু নবাব সায়েস্তা খাঁও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্‌ ছিলেন। দরখাস্ত মঞ্জুর করা ত দূরের কথা, তিনি তাহাদের বার্ষিক "ফরমান্‌" তিন সহস্র টাকা ব্যতীত আরও শতকরা সাড়ে তিন টাকা করিয়া শুল্ক বসাইলেন। ইহাতেই বাঙ্গলার নবাব ও ইংরেজ বণিক্‌গণের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়; এবং বাণিজ্য-বিষয়ে ইংরেজগণ অতঃপর এতই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন যে, নবাবের নিদেশক্রমে তাঁহাদের মাল-বোঝাই তরীগুলি মাল ফেলিয়া, বাণিজ্য বন্দর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অবশেষে নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ব্যতীত ইংরেজদের গত্যন্তর ছিল না, এবং এতদুদ্দেশ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ড-রাজ দ্বিতীয় জেম্‌সের নিকট হইতে অনুমতিও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর যখন মান্দ্রাজ হইতে বহুতর ইংরেজ সৈন্য আগমন করিয়াছিল, তখন নবাব সায়েস্তা খাঁ সাতিশয় ভীত হইয়া, ইংরেজের সহিত মনোমালিন্য আপোষে মিটাইয়া ফেলিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজ ও নবাবের সৈন্যের মধ্যে একটি আকস্মিক যুদ্ধ হইয়া যায়; তাহাতে ৬০ জন মোগল সৈন্য নিহত ও বহুসংখ্যক সৈন্য আহত হয়। নবাব সায়েস্তা খাঁ যেই মাত্র এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন, অমনই ইংরেজ বণিক্‌দের পাটনা, মালদহ, ঢাকা ও কাশিমবাজারের বাণিজ্য-বন্দর বাজেয়াপ্ত করিলেন; এবং তন্মুহূর্ত্তেই বহুসংখ্যক পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য হুগুলীতে পাঠাইয়া ইংরেজদিগকে

দেশের বাহির করিয়া দিবার জন্ত আদেশ করিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল;—ইংরেজগণ বাঙ্গালা হইতে বহিস্কৃত হইলেন।

ইংরেজ বণিক্‌গণের এই বিপত্তির সময়, সুযোগ বুঝিয়া, দিনেমার ও ফরাসী বণিক্‌গণ তাঁহাদের স্বস্ব বাণিজ্যাগারের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া লইলেন। ইংরেজগণ এমনই অসহায় অবস্থায় নিপতিত হইয়াছিলেন যে, তখন প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা না করিয়া, বরঞ্চ শান্তির জন্যই সবিশেষ লালায়িত হইয়াছিলেন।

এতদ্ধেতু ইংরেজ বণিক্‌গণ গত বিষয়ের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, নবাবের নিকট এক দরখাস্ত পেশ করিয়াছিলেন; এবং যাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বতন 'ফরমান্' বজায় থাকে, তদ্বিষয়ও উহাতে লেখা ছিল।

১৬৮৬ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে ঢাকা হইতে নবাবের তিন জন মন্ত্রী হুগুলীতে আগমন করতঃ, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সন্ধিপত্রের এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। ইত্যবসরে নবাব সায়েস্তা খাঁ ইংরেজগণকে দেশের বাহির করার জন্ত বহুসংখ্যক সৈন্তসংগ্রহ পূর্ব্বক, ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমভাগেই হুগুলীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। নবাবের চাতুরি-জাল ইংরেজগণ প্রথম ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই, অপ্রস্তুত অবস্থায় ইংরেজদিগকে হটিয়া যাইতে হইয়াছিল; কিন্তু হটিয়া যাইবার পথে, তাহারা টানার দুর্গ ও মোগল প্রকৃতিপুঞ্জের অনেক ধান্তের গোলা বিধ্বস্ত করিয়া যান, এবং বহুসংখ্যক মোগল তরী আটক করেন।

এই সময়ে নবাব শান্তির জন্ত লালায়িত হন, এবং সকৌন্সিল মিঃ চার্লস কর্ত্তৃক তাহা সাদরে গৃহীত হয়। ১৬৮৭ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে নবাব সায়েস্তা খাঁ এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন;

তাঁহাতে ইংরেজ বণিক্‌গণকে পুনরায় বাঙ্গালায় বাণিজ্য ব্যবসায় করিবার আদেশ দেওয়া হয়, শতকরা সাড়ে তিন টাকা হারে যে পণ্য-শুল্ক ধরা হইয়াছিল, তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয়, এবং উলবেড়িয়াতে পোতাধিষ্ঠান প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অনুমতি দেওয়া হয়। এই সন্ধির বলেই ইংরেজগণ বাঙ্গালার বিভিন্ন বাণিজ্য বন্দরে পুনরাগমন করেন। কিন্তু এই সন্ধিপত্রের সর্ত্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল না। কারণ বিগত বিদ্রোহের সময় দেশের লোক অনেক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; নবাব ঐ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মিঃ চার্ণকের নিকট অনেক টাকা চাহেন। মিঃ চার্ণক্ তাঁহার দুই জন সদস্যকে ঢাকায় পাঠাইয়া দেন; উদ্দেশ্য ছিল, বিষয়টা শান্তিতে মিটাইয়া ফেলা যায় কি না। এই সময়ে ইংলণ্ড হইতে কাপ্তান হেথের নেতৃত্বাধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি শান্তির জন্য অপেক্ষা না করিয়াই, বালেশ্বর আক্রমণ ও লুট-তরাজ করিয়া বসেন। ইহা ও অন্যান্য কারণে সম্রাট আওরঙ্গজীব ইংরেজদের প্রতি এতটাই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে যে কোন উপায়ে তাঁহার 'মুলুক' হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য আদেশ করিতেও দ্বিধা ভাবেন নাই। সম্রাটের আদেশক্রমে নবাব সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালায় ইংরেজদের যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি ছিল, তৎসমুদায় বাজেয়াপ্ত করেন এবং কোম্পানীর এজেণ্টগণকে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া ঢাকায় আনয়ন করেন।

এই সময়ে বয়োধিক্য প্রযুক্ত সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার শাসন-দণ্ড পরিচালন-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন; নবাব ফেদাই খাঁ তাঁহার স্থলে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। সায়েস্তা খাঁ সুদীর্ঘ পনের বৎসর কাল বাঙ্গালার শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়া ছিলেন; মাঝ খানে দুই বৎসর মাত্র তিনি ছিলেন না। এই

সময় ফেদাই খাঁ, আজিম খাঁ ও সম্রাটের তৃতীয় পুত্র সুলতান মহম্মদ আজম বাঙ্গলার শাসন-কার্য্য পরিচালনা করেন।

সুলতান মহম্মদ আজম ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে লালবাগের রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মাণের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন; কিন্তু উহা অপূর্ণ অবস্থায় রাখিয়াই তিনি অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। পরে নবাব সায়েস্তা খাঁ পুনরায় বাঙ্গালার গদিতে বসিয়া, ঐ প্রাসাদের কার্য্য শেষ করেন। নবাব সায়েস্তা খাঁ ঐ রাজ-অঙ্গনের ভিতরে তদীয় দুহিতা বিবি পারীর (সুলতান মহম্মদ আজমের পত্নী) স্মৃতি রক্ষার্থ একটি সুদৃশ্য মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করান। সায়েস্তা খাঁ আরও বহুতর মস্‌জিদ ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ সকলের ধ্বংসাবশেষ মাত্র বিদ্যমান আছে। নবাব সায়েস্তা খাঁ শিল্প-বিদ্যার প্রকৃত উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অদ্যাপিও এদেশে "সায়েস্তাখানি" গাঁথুনির প্রচলন আছে।

সায়েস্তা খাঁর শাসন সময়ে ঢাকা নগরী উত্তর দিকে প্রায় ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী টঙ্গি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; এক্ষণ উহার অনেক অংশই নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। ইহাও প্রবাদ আছে যে, সায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রয় হইত! তাঁহার ঢাকা পরিত্যাগের সময়, তিনি সহরের পশ্চিমদিগের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, তাহাতে এই লিখিয়া যান যে,—"যে নবাব চাউলের দাম আরও কমাইতে না পারিবেন, তিনি কখনও এই দ্বার খুলিবেন না।" নবাব সর্‌ফরাজ খাঁর আমল পর্য্যন্ত সেই দ্বার রুদ্ধই ছিল।

ইহার তিন বৎসর পরে কোন এক ইউরোপীয় পোতাধ্যক্ষ মক্কা ও জেড্ডাভিমুখে গম্যমান্ দুইখানি মোগল-পোত আটক করিয়াছিল। এই কারণে আবার দিনেমার, ফরাসী ও ইংরেজ

বণিক্‌গণের বঙ্গস্থ বাণিজ্য বন্দরগুলি নবাবের আদেশে রুদ্ধ হইয়াছিল, এবং তাহাদের বাণিজ্য-ব্যবসায় বাঙ্গালা হইতে এক প্রকার উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সহৃদয় ইব্রাহিম খাঁর কৃপায়, ইংরেজ বণিক্‌গণ গুপ্তভাবে বাঙ্গালায় বাণিজ্য-ব্যবসায় করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মোগল ও ইংরেজদের মধ্যে এমনই এক সম্প্রীতি সংস্থাপন হইয়াছিল যে, বর্দ্ধমানের কোন হিন্দু জমীদারের বিদ্রোহের সময়, ইংরেজগণ আত্ম-রক্ষার ব্যপদেশে চুঁচুঁড়া, চন্দননগর ও কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিদ্রোহিগণ রহিম খাঁ নামক জনৈক আফ্‌গান হইতে প্রথম যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিল বটে, কিন্তু পরিশেষে ঐ আফ্‌গান-শ্রেষ্ঠ রহিম খাঁই রাজা কৃষ্ণরামকে হত্যা করে এবং তাঁহার সকল সম্পত্তি আত্মসাৎ করে! উক্ত রাজা কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরায় কোন মতে পরিত্রাণ পাইয়া, ঢাকায় আসিয়া বঙ্গের শাসন-কর্ত্তার নিকট ঐ মর্ম্মে নিবেদন করিলে পর, বাঙ্গালার নবাব, আক্রমণ-কারীদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার নিমিত্ত, হুগুলীর ফৌজদা-রের নিকট অনুজ্ঞা-পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু বিদ্রোহিগণ অগ্রসর হইলে, হুগুলীর ফৌজদার আত্ম-রক্ষার জন্য দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন, এবং চুঁচুঁড়াস্থ দিনেমারদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। আত্মরক্ষার জন্য ভীত হইয়া, ফৌজদার প্রবর রাত্রিতে নৌকাযোগে নদী পার হইয়া, যশোহরে পলায়ন করেন। বিদ্রোহিগণ হুগুলীর দুর্গ দখল করিয়াছিল বটে, কিন্তু পরিশেষে দিনেমারগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিল। তৎপর বিদ্রোহিগণ হুগুলী পরিত্যাগ করিয়া, সাতগাঁও নামক স্থানে হটিয়া গিয়াছিল।

নবাব সায়েস্তা খাঁর সর্ব্বাংশে অবসর গ্রহণ করিতে ...

আওরঙ্গজীব ইব্রাহিম খাঁকে বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইব্রাহিম খাঁ নূতন চাকুরীতে বহাল হইয়াই, কোম্পানীর যে সকল এজেণ্ট ঢাকায় অবরুদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে মুক্তি-দান করেন। ইংরেজদিগকে পুনরায় বাণিজ্য করণার্থ বাঙ্গালায় আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে, তিনি সম্রাট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন, বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীকামিনীকুমার দে রায়।

রাজা সীতারাম।

অমর-কীর্ত্তি রাজা সীতারাম রায় একজন প্রকৃত বীরপুরুষ ছিলেন। নিরীহ শান্তি-প্রিয় বাঙ্গালীকে ভীরু কাপুরুষ বলিতে যাহারা একটুকুও সঙ্কুচিত হন না, প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্গ-বীর রাজা সীতারামের বিস্ময়াবহ জীবন-বৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে, তাহাদের সেই অন্ধ বিশ্বাস সম্যক্ দূরীভূত হইবে, একথা আমরা নিঃসন্দেহরূপে বলিতে পারি। দরিদ্র বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম ধারণ করিয়া, সীতারাম স্বীয় শৌর্য্য-বীর্য্যে একদিন, প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটকেও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশ-বাৎসল্যের পুণ্য-কাহিনী সত্য-ব্রত ইতিহাস অমর অক্ষরে বক্ষে ধারণ করিয়া, অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে. এবং চিরদিনই করিবে। রাজা সীতারামের সেই পুণ্য-গীতির আলোচনা করিতে গিয়া, দুঃস্থ, হত-বল, হৃত-সর্ব্বস্ব, নিরীহ বাঙ্গালীর প্রাণে, যদি একটুকু নব বলেরও সঞ্চার হয়, তবে উহাই বিপন্ন বঙ্গবাসীর পক্ষে যথেষ্ট। তদুদ্দেশ্যেই আজ আমরা বঙ্গ-বীর রাজা সীতা-রামের পবিত্র গাথার অবতারণা করিতে প্রয়াসী হইলাম।

খৃষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, রাজা সীতারাম রায় মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে সশস্ত্র দণ্ডায়মান হইতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই! স্বদেশ-প্রীতির আতিশয্যে ও স্বদেশবাসিগণের দুঃখ-দুর্দ্দশা বিমোচনার্থ, তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন। সুতরাং মোগল সম্রাটের অত্যাচার উৎপীড়নাদি দূরীকরণার্থ, রাজা সীতারাম বদ্ধপরিকর হইলেন। দিল্লীশ্বরের সহিত অনেকানেক যুদ্ধে ও খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, রাজা সীতারাম দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত প্রকম্পিত করিয়াছিলেন। বঙ্গ-বীর সীতারাম যখন দেশের ও দশের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূরীকরণে কৃতসঙ্কল্প, তখন মোগল সম্রাট আওরঙ্গজীব দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন।

কুটিল-প্রকৃতি উদ্ধত-স্বভাব সম্রাট আওরঙ্গজীবের অত্যাচার ও অবিচারে, শিবাজীর নেতৃত্বাধীনে মহারাষ্ট্রীগণ, গুরুগোবিন্দের অধিনায়কত্বে শিখগণ, এবং রণজিৎসিংহের অধীনে রাজপুতগণ, দিল্লীর সিংহাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, একথা, বোধ হয়, কেহই অপরিজ্ঞাত নহেন। গৃহ-প্রিয় অকর্ম্মণ্য ভীরু বাঙ্গালীরাও সে সময় নিঃচেষ্ট ছিলেন না। সত্য-ব্রত ইতিহাস বাঙ্গালীর বীরত্বের পুণ্য-গীতি স্বর্ণাক্ষরে বুকে করিয়া, সেই অতীত ঘটনাবলীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তখন অতুল-কীর্ত্তি প্রাতঃস্মরণীয় রাজা সীতারাম রায়, তদীয় সুযোগ্য সেনাপতি মেনাহাতী (মৃণ্ময়) সমভিব্যাহারে রণাঙ্গনে পাদক্ষেপ করতঃ দেখাইয়া গিয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে, শান্তি-প্রিয় বাঙ্গালীগণও প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া, অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়।

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজীব ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুদিগের স্বদেশ-বাৎসল্য দর্শনে বাস্তবিকই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ চতুর্দ্দিকস্থ বিপদপাতে কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া, এবং তদীয় রাজ-

কোষ শূন্য দেখিয়া, সম্রাট অর্থের সচ্ছলতার জন্য বাঙ্গালার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা নবাব আজিম ওস্মান খাঁ ও তদীয় দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁর সমীপে এক অনুজ্ঞাপত্র প্রেরণ করিলেন। পক্ষান্তরে, নবাবও সর্ব্বগ্রাসী সম্রাটের বিরাট উদর পূরণের জন্য, হতভাগ্য নিরীহ বাঙ্গালীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিলেন। এমন কি, রাজ-ভক্ত প্রকৃতিপুঞ্জের যথাসর্ব্বস্ব "লুট-তরাজ' করিতেও দ্বিধা বোধ করিলেন না!

যখন বঙ্গদেশ এতাদৃশ দুঃখ-দুর্দ্দশায় বিপন্ন, তখন রাজা সীতা রাম রায় জনৈক দরিদ্র বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করতঃ, অলক্ষ্যে অজ্ঞাতভাবে প্রকৃতিদেবীর স্নেহময় অঙ্কে, দ্বিতীয়ার শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। কত শত সুগন্ধি সুচারু কুসুম নিবিড় অরণ্য-প্রদেশে বিকশিত হইয়া, স্বীয় সৌরভ-সম্ভারে বনদেশ আমোদিত করিয়া তোলে, কে তাহার খবর লইতে চায়? যদি দৈবাৎ সেই বনৈকদেশে কোন সুরসিক সজ্জনের শুভ সমাগম হয়, তবেই বিধাতার দিব্য সৃষ্টি কুসুমকলাপের সৌরভ-সৌন্দর্য্যের সমাদর হইয়া থাকে; নতুবা বনে উঠিয়া, বনে ফুটিয়া—বনেই সেই কুসুম ঝরিয়া পড়িয়া যায়,—কেহই উহার অস্তিত্ব, সৌরভ ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। রাজা সীতারামও একটি পবিত্র আরণ্য কুসুমের ন্যায় প্রকৃতির অঙ্কে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যশ-সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিল,—সকলের চক্ষুই তাঁহার দিকে ফিরিল। সকলেই বুঝিল, বঙ্গের এক কোণে ফুটিয়া থাকিলেও, সৌরভ-সম্ভারে গুণ-গরিমায় এই ফুলটি স্বর্গের পারিজাতের সমতুল। বাস্তবিক, অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত হইলেও, উহার দাহিকা-শক্তির অনুভূতি হইবার পক্ষে কোন অন্তরায় থাকে

না ;—শত সহস্র বস্ত্র খণ্ডে আবৃত করিয়া রাখ, আগুন আপনা হইতেই তৎসমুদায় ভেদ করিয়া, নিজ প্রভার বিকাশ করিবেই করিবে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সীতারামের নমনীয় হৃদয়ে প্রকৃত স্বদেশ-প্রীতির পবিত্র বীজ অঙ্কুরিত হইল; তিনি বুঝিয়া লইলেন, স্বদেশ-প্রেমের মধুর মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে না পারিলে, —দেশের ও দশের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূরীভূত করিতে না পারিলে, মানব-জীবনের সার্থকতা নাই। অতএব মুসলমানদের অন্যায় অত্যাচার ও অবিচার হইতে স্বদেশকে মুক্ত করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইল। কিরূপে সেই পুণ্য-ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন, সীতারাম অহর্নিশ সেই চিন্তায় মগ্ন রহিয়া, ক্রমশঃ হৃদয়ে নব বলের সঞ্চার পূর্ব্বক পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। স্বদেশ-সেবা-ব্রতের উদ্‌যাপন-কার্য্যে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইতিহাসই দিতেছে ও দিবে। রাজা সীতারামের সেই পুণ্য-কাহিনী অমরাক্ষরে ইতিহাসের বুকে গ্রথিত রহিয়াছে।

রাজা সীতারাম যখন কর্ম্ম-ক্ষেত্রে কর্ম্ম-বীররূপে অবতীর্ণ, তখন বঙ্গদেশ কতিপয় স্থানীয় তথা-কথিত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি দ্বারা শাসিত হইত; কিন্তু তাহারা এতাদৃশ উদ্ধত-স্বভাব ও অবিবেচক ছিল যে, মনে লয়, অরাজকতা যেন তখন সশরীরেই বঙ্গে রঙ্গ করিতেছিল! লুট-তরাজ, জোর-জবরদস্তি, ও অত্যাচার-অবিচারের মাত্রা পঞ্চম গ্রামে চড়িয়াছিল! হৃত-সর্ব্বস্ব, আর্ত্ত, অনাথের করুণ ক্রন্দনে সমগ্র বঙ্গদেশ এক ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল! দিন দিন দস্যু ও তস্করের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তাহারা দেশবাসীদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, গোঁফে তা' দিয়া বেড়াইতে লাগিল,—অথচ এ সকল অমানুষিক অত্যাচারের

ডাকাতগণ, কোন কোন বিষয়ে, নবাবের নিয়োজিত শান্তি-রক্ষক ফৌজদারগণের সহিত গুপ্তভাবে সংপৃক্ত ছিল। শান্তি-রক্ষকগণ, দস্যু ও তস্করদের নিকট হইতে অপহৃত ও লুণ্ঠিত দ্রব্যজাতের 'বখ্‌রা' (অংশ) পাইতেন, বলিয়া প্রকাশ। রাজা সীতারামের কোমল হৃদয়ে এই বিসদৃশ দৃশ্য বিষম বাজিল,—তিনি দেশের ও দশের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূরীকরণার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। যাহাতে এতাদৃশ অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়নাদি আর হইতে না পারে, তজ্জন্য রাজা সীতারাম ঢাকার নবাবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া, অতি বিনীত ভাবে দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করিলেন, এবং উহার প্রতিকারের জন্য বিনীত প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু তিনি তথায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অতএব হৃদয়ে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, সেই সকল পাপ-কার্য্যের প্রতিবিধানের জন্য দিল্লীতে সম্রাটের দরবারে গিয়া আত্মকথা নিবেদন করিলেন। কিন্তু গ্রহ-বৈগুণ্য হেতু সেখানেও তাঁহার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। এবার রাজা সীতারামের হৃদয়-তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার জীবন বৃথা,—যদি স্বদেশের দুঃখ-দুর্দ্দশাই দূর করিতে না পারিলেন, তবে এই দুর্ব্বহ জীবন-ভার বহন করিয়া ফল কি? অতএব স্বদেশ-প্রেমিক রাজা সীতারাম জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

স্থির-প্রতিজ্ঞ সীতারাম কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, পুণ্য-ভূমি বঙ্গদেশ তমসাচ্ছন্ন ভীতি-ব্যঞ্জক শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে! বড় বড় হিন্দু জমীদারগণ, নগণ্য মোগল কার্য্য-কারকগণ কর্ত্তৃক অন্যায়রূপে যথা তথা বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হইতেছেন; এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এক-প্রাণতার যে সকল পবিত্র বন্ধন ছিল, তৎসমুদায়ও নিদারুণ ঘৃণায় পরিণত হইয়াছে!

অভিমানে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, রাজা সীতারামের নয়নপ্রান্তে কয়েক ফোঁটা অশ্রু দেখা দিল বটে,—কিন্তু যাহাতে মুসলমানদের অধীনতার কঠিন নিগড় হইতে স্বদেশকে মুক্ত করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে তিনি যত্নপর হইলেন।

আমরা এস্থলে যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বঙ্গে বিশুদ্ধ পানীয় জলের বড়ই অভাব ছিল। নিদারুণ নিদাঘের দারুণ দাপটে এক বিন্দু জলের জন্য বহুতর বাঙ্গালীর অন্তিম সময় সমুপস্থিত হইত! রাজা সীতারাম সর্ব্বসাধারণের জলকষ্ট দূরীকরণার্থ, নবাবের নিকট হইতে, বঙ্গে বড় বড় দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী খনন করিবার অনুমতি-পত্র লইলেন। এই খনন-কার্য্যই তাঁহার অন্তরের অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল হইল। বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ রাজা সীতারাম উক্ত খনন-কার্য্যের জন্য দ্বাবিংশ সহস্র লোক নিয়োজিত করিলেন। মুসলমানদের করাল কবল হইতে স্বদেশবাসিগণকে মুক্ত করা রাজা সীতারামের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, তৎসঙ্গে দেশের জলাভাব দূরীকরণও, তাঁহার একটি গৌণ উদ্দেশ্য ছিল।

যে সকল লোক খনন-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, রাজা সীতারাম গোপনে তাহাদিগকে যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং খনন-কার্য্যের ব্যপদেশে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, বঙ্গের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি যতই ঘুরিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার জলকষ্ট দূরীকরণের প্রবৃত্তি দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। জনশ্রুতি আছে, তিনি প্রত্যহ এক একটি নূতন পুষ্করিণীতে অবগাহন করিবার আদেশ প্রচার করিয়া, তাহা কার্য্যে পরিণতও করিয়াছিলেন। এই আদেশের মূলে যে কি রাজ-নীতি নিহিত ছিল, তাহা, বোধ হয়, সকলেই বুঝিতে পারেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে রাজা সীতারামের এতাদৃশ

বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া, বাস্তবিকই তাঁহার স্বর্গীয় নামে ভক্তির পূত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে সাধ যায়। ধন্য রাজা সীতারাম! ধন্য তাঁহার জন্ম-ভূমি ও কর্ম্ম-ক্ষেত্র বঙ্গদেশ!! তাঁহার সেই প্রাতঃ-স্মরণীয় নাম জিহ্বাগ্রে আনিলেও, নিরন্ন নিরীহ বাঙ্গালীর যথেষ্ট লাভ আছে।"

ইত্যবসরে কোন দুরাত্মা বঙ্গের নবাবের সন্নিধানে প্রকাশ করিয়া দিল যে, রাজা সীতারাম তাঁহার লোকদিগকে গোপনে যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্রই নবাব তাঁহার কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু নবাবের মন হইতে সেই সন্দেহ দূরীভূত করিতে, রাজনীতিজ্ঞ সুচতুর রাজা সীতারামকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। তিনি যথাসময়ে নবাবের নিকট কৈফিয়ৎ পাঠাইলেন। কৈফিয়তে লিখিয়া দিলেন যে,—তিনি তাঁহার লোকদিগকে একটু একটু যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন, একথা সত্য; কিন্তু এই শিক্ষার উদ্দেশ্য দেশস্থ চোর ডাকাতগণকে নির্য্যাতন করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃত পক্ষে রাজা সীতারাম মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিলেন না; যেহেতু অরাজকতা ও অনর্থক অত্যাচারের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ ডাকাত-গণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করতঃ, তিনি দেশের ও দশের দুঃখ-দুর্দ্দশা অনেকাংশে দূরীভূতও করিয়াছিলেন। নবাব, রাজা সীতারামের কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইলেন; সীতারামও হাঁফ ছাড়িয়া প্রাণে বাঁচিলেন। বাস্তবিক, তস্কর ও দস্যুগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া, তিনি যে দেশে কেবল সুখ-শান্তির শীতল ছায়া আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা নহে, পরন্তু তাহারা দেশবাসীদের যে সকল ধন রত্ন অপহরণ ও লুণ্ঠন করিয়াছিল, তৎসমুদায়েরও অধিকাংশ, তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল।

উপরোক্ত ঘটনাবলীর পূর্ব্বে, রাজা সীতারাম যখন নিতান্ত

যুবক ছিলেন, তখন তিনি, নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারী জনৈক বিদ্রোহী পাঠানকে পরাজিত করিয়া, দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে পুরস্কার স্বরূপ সমগ্র নলদী পরগণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন তিনি দিল্লীশ্বর ও বঙ্গেশ্বরের যথেষ্ট প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায় বহুদিন গোপন রহিতে পারিল না। আনুমানিক ১৭০০ খৃঃ অব্দে রাজা সীতারাম রাজ-দ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন, এবং ভূষণা ও যশোহরের ফৌজদারদিগের সম্মিলিত শক্তির সংঘর্ষণে আসিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু রাজা সীতারাম ভীত হইবার পাত্র ছিলেন না; তাঁহার হৃদয় অন্য উপাদানে গঠিত ছিল। প্রকাশ্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ফৌজদারগণকে পরাজিত করিয়া, তিনি বঙ্গের সেই অংশের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ক্রমে ক্রমে বঙ্গের অপরাপর জমীদারগণও রাজা সীতারামকে 'রাজা' বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং তাঁহার সহিত একতা-সূত্রে বদ্ধ হইয়া, দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। সম্মিলিত শক্তির প্রভাব চিরদিনই সর্ব্ব-জনবিদিত। অত্যল্প সময়ের মধ্যেই রাজা সীতারাম চৌয়াল্লিশ পরগণার সার্ব্বভৌম অধীশ্বর হইয়া বসিলেন; এবং তাঁহার রাজ্য খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলার অধিকাংশ ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল। কানিনগর নামক স্থানে রাজা সীতারাম তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং তথায় সুপ্রশস্ত গভীর পরিখা-বেষ্টিত ও সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীর-সমন্বিত একটি দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রভূত যুদ্ধোপকরণ সঞ্চয় করিয়া লইলেন।

রাজা সীতারাম কীদৃশ বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ ছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাটি হইতেই সম্যক্ প্রতিপন্ন হইবে। মুসলমান প্রকৃতিপুঞ্জকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য, এবং তিনি যে, জাতি-নির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমানকে প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করেন,

একথা সম্যক্ প্রতিপন্ন করিবার জন্য, রাজা সীতারাম স্থানীয় জনৈক মুসলমান ফকিরের নামানুসারে তদীয় রাজধানীর 'মহম্মদপুর' নামকরণ করিয়া লইলেন।

ইতিমধ্যে বাঙ্গালার নবাব রাজা সীতারামকে দমন করিবার নিমিত্ত জনৈক খ্যাতনামা মোগল সেনাপতির অধিনায়কত্বে একদল সুশিক্ষিত সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বঙ্গ-বীর রাজা সীতারাম সেই সৈন্য দলকে উৎসন্ন করিয়াছিলেন, এবং সেই খণ্ডযুদ্ধে মোগল সেনাপতি নিহত হইয়াছিলেন। অতঃপর আবু তরাফ্ নামক জনৈক উদ্ধত-প্রকৃতি মোগল সেনানী বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে সম্রাট্ কর্ত্তৃক তদুদ্দেশ্যেই প্রেরিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজা সীতারামের প্রখ্যাতনামা সেনাপতি মেনাহাতীর (মৃণ্ময়) হস্তে, তাহাকেও দশমদশাই প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল। রাজা সীতারামের বক্তিয়ার নামক আরও একজন মুসলমান সেনাপতি ছিল। এই দাম্ভিক মুসলমান, প্রথম দস্যুর সর্দ্দার ছিলেন। তিনি খুব শক্তি-শালী সাহসী বীর-পুরুষ ছিলেন। সর্ব্বদা লোকের যথাসর্ব্বস্ব লুট-তরাজ করিয়া ফিরিতেন। ঘটনাক্রমে একদিন রাজা সীতারামের সম্মুখে তিনি নিপতিত হন। উভয়ের মধ্যে ঘোরতর অসিযুদ্ধ ও তৎপর মল্লযুদ্ধ হয়; কিন্তু কেহই কাহাকে হটাইতে পারেন না। পরে তাঁহারা সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, দেশের কল্যাণকল্পে জীবন-প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। সেনাপতি মেনাহাতী যথেষ্ট শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। শক্তির পরিচয় স্বরূপ তাঁহাকে 'মেনাহাতী' উপাধি দেওয়া হয়। তিনি কুস্তি ক্রীড়ার সময় শরীরে মাটি মাখিয়া লইতেন, তজ্জন্যই রাজা সীতারাম তাহাকে সস্নেহে "মৃণ্ময়" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি হিন্দু কি মুসলমান ছিলেন, এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে।

যাহা হউক, রাজা সীতারামের সহিত যুদ্ধে শেষবারের পরাজয়ে, বঙ্গেশ্বর,—এমনকি, দিল্লীশ্বরকেও মহা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইতে হইয়াছিল। অতঃপর মোগল সম্রাটের নিদেশানুসারে বাঙ্গালার তদানীন্তন নবাব মুর্শিদ্‌কুলি খাঁ, রাজা সীতারামকে দমন করণার্থ একটি বড় যুদ্ধের আয়োজন করেন। বহু স্থানের যুদ্ধেই রাজা সীতারাম মোগল সৈন্যগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। পরিশেষে একদিন তদীয় সুযোগ্য সেনাপতি মেনাহাতী গুপ্তঘাতকের হস্তে অতি নৃশংসরূপে নিহত হইলে, রাজা সীতারামের মহাব্রত উদ্‌যাপনের পথে অনেক পরিপন্থী আসিয়া যুটে। কথিত আছে, বঙ্গের কলঙ্ক স্বরূপ জনৈক সম্ভ্রান্ত জমিদার মেনাহাতীর নিধন ব্যাপারে নবাবকে লোক দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন! হায়! হতভাগ্য আত্মদ্রোহী বাঙ্গালী! যদি তোমাদের মধ্যে একতার মধুর বন্ধন বিদ্যমান্ থাকিত, তবে তোমরা কেন এমন হীনাবস্থ হইবে?—কেন এক মুষ্টি অন্নের জন্য পরের মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া থাকিবে?

সহায়-সম্পদ্-বিহীন হইয়াও, রাজা সীতারাম জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বদেশের উদ্ধার সাধনের জন্য যুদ্ধ করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করতঃ বীরত্বের ও স্বদেশ-প্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন! রাজা সীতারাম রায়ের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালীর শেষ আশা ভরসা চিরদিনের জন্য অতল জলধি-জলে নিমজ্জিত হইয়াছে। রাজা সীতারাম বীরত্বের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। সেই হেতুই তিনি বাঙ্গালীর,—শুধু বাঙ্গালীর কেন,—জগতেরও নমস্য। আমরা দৃঢ়তা ও স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি, সীতারামের পবিত্র নাম ভীরু (?) বাঙ্গালীর কলঙ্ক-কালিমা ক্ষালনের পুণ্য-গঙ্গা। বাঙ্গালী তাঁহার স্বর্গীয়

নামে স্ব স্ব জীবনের অন্তিম-তর্পণ করিয়া, কৃতার্থম্মন্ত হউক,—সীতারামের পুণ্য-গীতি বঙ্গের ঘরে ঘরে সমস্বরে ধ্বনিত হইয়া, নির্জ্জীব, নিরীহ, হৃত-সর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর হৃদয়ে ভুবনমোহিনী সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করুক।

শ্রীকামিনীকুমার দে রায়।

কুমার সম্ভব।

তৃতীয় সর্গ।

(৬১)

করি প্রণিপাত অগ্রে সখীদ্বয় তাঁর
স্বহস্ত-চয়িত, বন-বাসন্ত ভূষণ,—
নব কিশলয় সহ ফুল্ল-পুষ্প-ভার,
ত্র্যম্বকের পাদ-মূলে করিল অর্পণ।

(৬২)

নীলালক মাঝে অতি শোভিত সুন্দর
নব কর্ণিকারে খুলি' চরণে অর্পিলা,
কর্ণহতে খ'সে প'ল পল্লবের থর,
শির নুয়ে বৃষধ্বজে উমাও নমিলা।

(৬৩)

"না ভজে যে অন্যপত্নী লভ' হেন পতি"—
আশীষিলা হর ;—সত্য এ আশীর্ব্বচন।—
কভু মহাপুরুষের কথিত ভারতী;
বিপরীত অর্থ লোকে করে না জ্ঞাপন।

(৬৪)

হেরি শর-সন্ধানের যোগ্য অবসর,
ইচ্ছি' বহ্নি-মুখে, পশিতে পতঙ্গ প্রায়,
উমার সমক্ষে হরে লক্ষ্য রাখি' স্মর,
মুহুর্মুহুঃ দিলা হাত ধনুর ছিলায়।

(৬৫)

ভানুর কিরণে শুষ্ক, গাঁথা থরে থরে,
মন্দাকিনী-পদ্ম-বীজে বিরচিত মালা,
লয়ে যত্নে সমর্পিলা, আলোহিত করে,
তপস্বী গিরিশে তবে নগরাজ-বালা।

(৬৬)

অর্থিনীর প্রীতি হেতু যেই ত্রিলোচন,
হইলা উদ্যত লইতে সে অক্ষমালা,
অমোঘ অব্যর্থ বাণ নাম সম্মোহন
অমনি সে ফুল-ধনু ধনুকে যোজিলা।

(৬৭)

চন্দ্রোদয়ারম্ভে যথা উদ্বেল সাগর,—
ধূর্জ্জটিও ধৈর্য্যচ্যুত ঈষত হইলা,
ঢল-ঢল বিম্ব সম অধরে সুন্দর
উমা-মুখ 'পরে তিন নয়ন স্থাপিলা।

(৬৮)

বিকাশ-উন্মুখ বাল কদম্বের প্রায়,
রোমাঞ্চিত দেহে উমা দাঁড়াল তখন,
সহসা কি ভাবাবেশে, বাঁকান গ্রীবায় ;—
লজ্জানত নেত্রে কিবা চারু সে আনন !

(৬৯)

তবে সে অযুগ্মনেত্র, আত্মবশিতায়
মানস-বিকার ক্ষণে দৃঢ় নিরোধিলা,—
দেখিতে এ বিকারের কারণ কোথায়,
দিশ-প্রান্ত-দেশে স্বীয় দৃষ্টি প্রসারিলা।

(৭০)

দক্ষিণ নয়ন-কোণে মুষ্টি নিবেশিয়া,
নুয়ে কাঁধ, বামপদ করি আকুঞ্চন,
মণ্ডল আকারে চারু চাপ আকর্ষিয়া
প্রহারে উদ্যত কাম, দেখে ত্রিলোচন।

(৭১)

তপ-প্রতিকূলাচারে ক্রোধ উপজিল,
ভ্রূকুটি-ভঙ্গিতে হ'ল দুর্দ্দর্শ বদন,—
তৃতীয় নয়ন হইতে সহসা ছুটিল,
উগারিয়া তীব্র-জ্বালা দীপ্ত হুতাশন!

(৭২)

"সংহর সংহর ক্রোধ প্রভো,"—এই বাণী
দেব-মুখে ব্যোম-পথে হ'তে হ'তে শেষ,
হরনেত্র-সমুদ্ভূত সে কাল অগিনি
করিল মদনে পুড়ি ভস্ম অবশেষ।

(৭৩)

দুঃসহ এ পরিভবে মোহ উপজিল,
স্তম্ভিত হইল যত ইন্দ্রিয়-ব্যাপার,
ভর্ত্তৃ-নাশ-দুঃখ রতি ক্ষণ না জানিল,
মোহেই করিল তার এই উপকার।

(৭৪)

তপস্যার আশুবিঘ্ন—কাম-কলেবরে
বজ্র মহীরুহে যথা, ভাঙ্গিয়া তেমন,
নারীর সান্নিধ্য ত্যাগ ইচ্ছিয়া অন্তরে,
ভূত সহ ভূতপতি হ'লা অদর্শন!

(৭৫)

উচ্চশির জনকের ব্যর্থ অভিলাষ,
বিফল সে চারু কান্তি বুঝিলা নির্য্যাস,
সখীর সমক্ষে তাই বড় লাজ পাইলা,
শৈলজাও শূন্য প্রাণে গৃহ পানে ফিরিলা॥

(৭৬)

গিরীন্দ্র, মুদিত-নেত্রা রুদ্র কোপ-ভয়ে,
কৃপাপাত্রী তনয়ায় নিয়ে বাহুদ্বয়ে,
বেগায়ত দেহে পথ অনুসরে অমনি,
ধায় সুরগজ যথা, দন্তলগ্ন নলিনী॥

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু।

তদ্বিরী যশ।

পার্থিব জীবনের এক সম্পদ্ ধন,—আর এক সম্পদ্ যশ। ধন ও যশের সহিত মানুষের লৌকিক সম্পর্ক দুদিনের তরে হইলেও, এ দু-ই বড় লোভনীয় পদার্থ,—দু-ই বড় প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

ধনের শক্তি অসামান্য। ধন ক্ষুধায় অন্ন যোগায়, তৃষ্ণায় জল-দান করে। যে মান প্রাণ অপেক্ষাও বড়, সে মানও আসিয়া অনেক

সময়, ধনের চরণে গল-লগ্নী-কৃত-বাসে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় মাথা নোয়াইতে ভালবাসে। ধনের প্রসাদে কালপেঁচা কন্দর্পের পূজা পায়; সাইলক বা রক্তশোষ দাতাকর্ণের উচ্চ অভ্যর্থনায় সংবর্দ্ধিত হয়। রজত-কাঞ্চন-জড়িত গো বা গর্দ্দভও, বুদ্ধির প্রসঙ্গে, বৃহস্পতির সম্মান পাইয়া, মনের গৌরবে, একবার শৃঙ্গ-আস্ফালন বা পুচ্ছ-আন্দোলন করিয়া লইতে পারে। যেখানে যে গুণ বা শক্তি নাই, ধন সেখানেও সেই গুণ বা শক্তি টানিয়া আনিয়া, এক বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা করিয়া লয়। কিন্তু যেখানে গুণে ও ধনে মণি-কাঞ্চন-সংযোগ ঘটে, সেখানকার আর কথা কি?—সেখানে কখনও, ইন্দ্রের অমরা, একদিকে বজ্র-বিদ্যুতে শক্তিমত্তার পরিচয় প্রদান করে,—অন্যদিকে নন্দন-কাননের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া দেয়; কখনও বা কুবেরের অলকা চঞ্চলা লক্ষ্মীর অচঞ্চল দৃষ্টিতে খল-খল হাসিয়া উঠে। ধন উপেক্ষার বস্তু নহে। অভ্যস্ত বৈরাগ্যের বলে, ধনের আড়ম্বরে অস্পৃষ্ট রহিতে শিখিলেও, লৌকিক জীবনে ধনকে একবারে অবহেলায় উড়াইয়া দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব ও অসাধ্য। ধন না হইলে, সংসার তিলার্দ্ধ কালও চলে কি?

যশ ভিন্ন শ্রেণীর বস্তু। ধনের যত প্রয়োজন, যশের তত প্রয়োজন নাই সত্য; কিন্তু তত প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও, উহা ধন হইতে কোন অংশেও কম লোভনীয় নহে; কোন কোন অংশে বরং অধিকতর গৌরবার্হ ও আদরণীয়। যশ অবশ্যই ধনের মত সংসার-জীবনের নিত্য ব্যবহার্য্য অপরিহার্য্য উপকরণরূপে আদর পায় না;—যশ না হইলেও মানুষ বাঁচে; সংসার অচল হইয়া পড়ে না। কিন্তু তথাপি মানুষ যশের জন্য চির-উন্মত্ত। এ উন্মত্ততা নিতান্তই অহেতুক উপসর্গ বিশেষ, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। কারণ, যশের প্রসাদে পানা-পচা কদর্য্য পুকুর হইতেও প্রস্ফুট

পদ্মের সৌরভ উত্থিত হইয়া থাকে। যশের জ্যোৎস্নায় পঙ্কিল জলে রজতের লহরী খেলে। অঙ্গারের অঙ্গেও, কারিকরের কৌশলে যশের প্রলেপ পড়িলে, ক্ষণকালের তরে, অমল ধবল বিচিত্র অঙ্গরাগ ফুটিয়া উঠে। যশ সকলেই চায়, এবং প্রায় সকলেই যশের জন্য মনে মনে লালায়িত রহে।

যশের আরও একটা মাহাত্ম্য আছে। বিষয় সম্পত্তি প্রভৃতি অন্য কোন পার্থিব পদার্থেরই সে মাহাত্ম্য নাই। যশ ইহলোকের গণ্ডী পার হইয়া, পরলোকের যবনিকা ভেদ করিয়াও, সময় সময়, উঁকি দিতে সমর্থ হয়। উহা কখন কখন পরলোকের দ্বারে দাঁড়াইয়া, পরলোকগত যশস্বীকে আপনার সেই ভুবন-মোহন বাশরীর মন-মাতান মধুর সঙ্গীত শুনাইতে চেষ্টা করে; এবং তাঁহাকে অমর বর দিয়া, ইহলোকেও তাঁহার স্মৃতিটিকে অক্ষয় অমর সম্পদে বাঁচাইয়া রাখিতে যত্নপর হয়। অযোধ্যার রাম যশের প্রসাদেই চিরজীবী এবং ভারতের স্বর্ণসিংহাসনে চির-প্রতিষ্ঠিত। কুরুক্ষেত্রের কবি-কীর্ত্তিত সেই পঞ্চপাণ্ডব এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতি এখন নাই, একথা বলিলে চলিবে কেন? যশের অক্ষয় ফণোগ্রাফে এখনও তাঁহাদিগের শঙ্খ ধ্বনিত এবং সেই বজ্র-গভীর নাদে পৃথিবী, তখনকার মত কম্পিত না হইলেও, এখনও রোমাঞ্চিত।

সোনা যেমন আসল ও কৃত্রিম, এবং পাইনের পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর,—টাকা যেমন মেকি ও খাটিভেদে বিভিন্ন, যশও তেমন আসল ও কৃত্রিম ভেদে, এবং পাইনের তারতম্য অনুসারে অনন্ত প্রকারের। কিন্তু সকল শ্রেণীস্থ যশের বিভিন্নরূপ প্রকার প্রদর্শন,—বিস্তৃত যশ-কুলজীর অন্তর্নিবিষ্ট সুদীর্ঘ বংশাবলীর সম্যক্ পরিচয় প্রদান সহজসাধ্য নহে। সুতরাং, আমরা এই প্রবন্ধে যশকে অপেক্ষাকৃত স্থূলভাবে মাত্র দুইশ্রেণীতে

বিভক্ত করিয়া লইলাম। একটি অবিমিশ্র বিশুদ্ধ যশ,—আর একটি তদ্বিরী যশ।

যশোলালসা মানুষের একটা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম বা মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তি সকলেরই আছে। কিন্তু পাত্রভেদে, যশোলালসার বিকাশ ও বিকারের মাত্রা ভেদ বিস্তর। যশ বা সুনাম, মানব-নামধারী জীব মাত্রেরই প্রাণ-প্রিয় বস্তু। সকলেই উহা চায়, এবং চায় বলিয়াই যশ অর্জ্জনার্থ, আপন আপন প্রবৃত্তি, প্রকৃতি বা শিক্ষার অনুরূপ যত্ন করিয়া থাকে। এ অংশে যে ভাগ্যবান্, তাহাকে কোমরে কাপড় বাঁধিয়া, 'যশ যশ' করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না ; যশই যেন, তাঁহার আশ্রয়ে কৃতার্থ হইবার নিমিত্ত, তাহাকে খুঁজিয়া লইতে চেষ্টা করে। যাহার ভাগ্য তত প্রসন্ন নহে, সে বহু অন্বেষণে, বহু যত্নে, উহার সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হয়। কিন্তু যাহারা এ ক্ষেত্রে নিতান্তই হতভাগ্য তাহাদিগের কথা পৃথক্। তাহারা যশ খুঁজিয়া খুঁজিয়া গলদঘর্ম্ম হইয়াও পোড়া যশের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না ; অবশেষে যশের মালা ভ্রমে বিছুটীর কণ্ঠী গলায় জড়াইয়া বিড়ম্বিত হইয়া থাকে।

যশ কোথাও মদিরার মত উন্মাদক, কোথাও সুপের সরবতের মত প্রমোদক, এবং কোন কোন স্থানে, মলয়-অনিলের ন্যায়, সুবাস-স্নিগ্ধ ও প্রাণ-পরিপোষক। কিন্তু সুরা ও সরবৎ না খুঁজিলে পাওয়া যায় না। মলয়-অনিল, ইচ্ছাপূর্ব্বক উহার গতিরোধ না করিলে, আপনি আসিয়া আলিঙ্গন করে। যশের সম্বন্ধেও এই কথা। যশ যখন সুরা বা সরবতের অবস্থাপন্ন, তখন উহাকে যোগাড় যন্ত্র করিয়া খুঁজিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। আর যখন উহা মলয়-অনিল সদৃশ স্বয়ং-প্রবহমান, তখন আপনি আসিয়া আপনার সুগন্ধি নিশ্বাসে কর্ম্মী পুরুষের স্বেদার্দ্র ললাট চুম্বন করিয়া লয়।

যাহারা যশের নেশায় আত্মহারা হইয়া যশ শিকারে বহির্গত হয়, যশ প্রায়শঃ তাহাদিগকে ধরা দিতে চাহে না। তাহারা যতই উহার পানে অগ্রসর হয়, উহাও ততই, মরুর মরীচিকা, আবিল জলের আলেয়া বা আকাশের রামধনুর মত, দূরে দূরে সরিয়া সরিয়া রহিতে চেষ্টা করে। এই শ্রেণীর যশোলিপ্সুর বহু আয়াসলব্ধ যশই তদ্বিরী যশ। তদ্বিরী যশের অধিকাংশই অসার, অস্থায়ী, ভেজাল বা কৃত্রিম। উহা এই আছে,—এই নাই! যখন থাকে, তখন খুবই জাক-যমকের সহিত ফুটিয়া পড়ে; যখন যায়, তখন আবার তেমনই ভাবে যায়,—সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত বা বজ্রাহত ব্যক্তির প্রাণ-বায়ুর ন্যায়, কোন্ পথে কেমন করিয়া চলিয়া যায়, ভাল করিয়া কেহ তাহা টেরও পায় না। একবার গেলে উহার লেশমাত্রও আর অবশিষ্ট থাকে না। যাবৎ থাকে, তাবৎ দিগঙ্গনাগণ ঢাক-ঢোল বাজাইয়া কুলু-কুলু উলুধ্বনিতে দেশের একার্দ্ধ আমোদিত ও অপরার্দ্ধ ঈর্ষ্যানলে কলুষিত করিয়া তুলেন। কিন্তু বিপরীত দিক্ হইতে বাতাস বহিবা মাত্রই,—সত্যরূপী প্রখর রবির আলোকপাতে, উহা মাঘের কুয়াসার মত চক্ষের পলকে উড়িয়া বা শুষিয়া যাইতে থাকে, তখন হঠাৎ এক সঙ্গে সমস্ত ঢাক-ঢোল নীরব ও উলুর কলকণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া রহে।

অবিমিশ্র বিশুদ্ধ যশ কোনরূপ তদ্বির বা যোগাড় যন্ত্রের অপেক্ষা রাখে না। উহা চিরদিনই সুকৃতির অনুসরণ করিয়া ফিরে এবং সেই সুকৃতি বা সদনুষ্ঠানের গৌরব ও গুরুত্ব অনুসারে উহার স্থায়িত্ব সংঘটিত হয়। কীর্ত্তিমান্ কৃতী পুরুষ প্রায়শঃ যশের কামনায় সুকৃতির অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহারা কখনও কর্ত্তব্য অনুরোধে কঠোর ব্রতধারী হন, কখনও ধর্ম্মের পাদপীঠে প্রাণের টানে আত্মোৎসর্গ করেন, কখনও বা প্রীতি

বা দয়ার মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া, পরার্থ আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দেন। যশ তাঁহাদিগের পুণ্যব্রতের আনুষঙ্গিক ফল,—বিধি-প্রদত্ত পুরস্কার,—মানবীয় প্রীতি ও শ্রদ্ধার কল্যাণকর আশীর্ব্বাদ। এই শ্রেণীর লোক-আকাঙ্ক্ষিত, স্বয়মিচ্ছু জনসাধারণের প্রদত্ত যশই মানুষের ঐহিক অমরত্ব বিধায়ক দুর্লভ সম্পদ্। এই যশের প্রসাদেই মানুষ মানুষের নিকট পূজা পায়;—মানব-শরীরেই দেবত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যশোলালসা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম বা হৃদয়িক উপাদান। মঙ্গলময় ভগবানের অনুশাসন-নীতিতে, মানুষের প্রকৃতি-প্রদত্ত সমস্ত উপাদানই মঙ্গলবিধায়ক। কিন্তু সেই মানসিক বৃত্তি ও হৃদয়িক উপাদানগুলিকে প্রতিনিয়তই নীতি ও সংযমের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। অন্যথা মঙ্গল অমঙ্গলে,—অমৃত গরলে পরিণত হইয়া যায়। যে তাপ ভিন্ন মানুষের প্রাণ বাঁচে না, সেই প্রাণরক্ষক তাপই যখন আবার আপন প্রতাপে সংযমের সীমা লঙ্ঘন করিয়া অনলের মূর্ত্তিতে জ্বলিয়া উঠে, তখন তাহাতেই পুড়িয়া মরিতে হয়। মানুষের নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট উভয়বিধ মনোবৃত্তিরই প্রয়োজন আছে, এবং সংযমের শৃঙ্খলে নিয়মিত রহিলে এই উভয়বিধ মনোবৃত্তিই সুফল প্রসব করিয়া থাকে। অন্য মনোবৃত্তি সম্বন্ধে যে কথা, যশোলিপ্সা বা যশোলালসা সম্বন্ধেও সেই কথা। নিঃস্বার্থকল্প, যশোলাভে বীতস্পৃহ ও পরকীয় কল্যাণ-সাধনে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলেই প্রাণে কৃতার্থ, ঈদৃশ নিষ্কামধর্ম্মী, প্রেম ও দয়ার প্রতিকৃতি স্বরূপ জগৎপূজ্য প্রাণ সংসারে অতি বিরল। কিন্তু জীবিতকালে প্রশংসার মধুপানে উজ্জীবিত রহিব, এবং মৃত্যুর পরেও লোকের মনোমন্দিরে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলিতে পরিপূজিত হইব, এই আশা মনে পোষণ করিতে পারেন, এবং কতেকটা যশোমদিরায়

অনিবার্য্য পিপাসায় ও কতেকটা প্রাণের স্বাভাবিক টানে, পুণ্য অনুষ্ঠান করিয়া, পরার্থ আত্মবিসর্জ্জনে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সমর্থ হন, এরূপ লোকের সংখ্যা পূর্ব্বোল্লিখিত মহাপুরুষগণ অপেক্ষা অনেক বেসী।

এক্ষেত্রে যশের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টই অনুভূত হইয়া থাকে। প্রাণে যশঃতৃষ্ণা প্রবল। যশোলাভের উপযুক্ত উপকরণ তহবিলে নাই। এ অবস্থায় যশোলাভ অদৃষ্টে না ঘটিতে পারে; কিন্তু তথাপি ঐ যশোলালসা হইতেও অন্য প্রকারে, বিশেষ ইষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। যথার্থ যশোলালসা যশোলালসিত ব্যক্তির, পাপকর্ম্মে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে, একটা গুরুতর বাধা বা অন্তরায় স্বরূপ হইয়া উঠে। যে যশ চাহে, সে সর্ব্বদাই অযশস্য কর্ম্ম করিয়া অপবাদ-গ্রস্ত হইবার ভয়ে শঙ্কিত রহে।

যশ ও নিন্দা পরস্পরবিরোধী। যদিও দেখা যায় যে, এক-জনের কল্যাণে, একদিকে যে সময়ে অনুরাগী ও উদার রসনায় যশের ঝঙ্কার উত্থিত হয়, ঠিক্ সেই সময়েই, অন্য দিকে অনুদার ও বিদ্বিষ্ট রসনায় ঈর্ষ্যার গরল-উদ্গার উৎসারিত হইতে থাকে, তথাপি যশ ও নিন্দায় যে জল ও অনলের ন্যায় চির-বৈরভাবাপন্ন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে স্থান-টুকু ব্যাপিয়া প্রশংসার কল-কল্লোল, সেইস্থান টুকু যুড়িয়া নিন্দার অনল এক সঙ্গে অবস্থান করিতে পারে না। যিনি নিরপেক্ষ ন্যায়ের বিচারে জগতের হিত কামনায় আত্মসুখের এক কণিকাও বিসর্জ্জন করিতে সক্ষম হন, তিনিই যশঃশ্রীতে ভূষিত হইবার উপযুক্ত পাত্র। তিনি যদি সর্ব্বতোভাবে নিষ্কাম বা নির্ব্বিকার নাও হন, তথাপি উপযুক্ত মাত্রায় যশোলাভে সম্পূর্ণ অধিকারী। তাঁহার পক্ষে যশের আস্বাদলাভ প্রয়োজনীয়ও বটে। বলিতে কি, যশের মন-উন্মাদন বংশী-ধ্বনি শ্রুতিপথে

প্রবেশ লাভ করিয়া, যদি মানব-হৃদয়ে একটা বিস্ময়াবহ অভিনব শক্তি সঞ্চার করিতে না পারিত, তাহা হইলে, এই সংসার-মরুর, পরার্থ-উৎসর্গী-কৃত অধিকাংশ প্রেম-মন্দাকিনীই অচিরে শুষ্ক হইয়া যাইত। পৃথিবীর কাব্য ইতিহাসগুলিও লোকোত্তর পুরুষদিগের অলোকসাধারণ আত্মোৎসর্গের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিত না। ঐ সকল কাব্য ও ইতিহাস প্রণেতৃগণ যদি এই প্রাণ-উন্মাদন সঞ্জীবন-রসের আস্বাদ-সুখ গ্রহণ করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও তাঁহাদিগের ভবিষ্য পুরুষদিগের জন্য অমৃতধারার অমন অফুরন্ত উৎস খুলিয়া রাখিতে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে লিপ্ত হইতেন কিনা, সন্দেহ।

মানুষ স্বভাবতঃই যশোলুব্ধ। তাহাতে আবার ইতিহাস, বিভীষিকাময়ী প্রেতমূর্ত্তির ন্যায় অপযশগ্রস্ত দানব-চরিত্রের চিত্র পার্শ্বে অঙ্কিত রাখিয়া, জয়-শ্রীতে বিলসিত গৌরব-বিগ্রহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যশের ভেরী বাজাইয়া, মানুষকে দ্বিগুণ প্রলোভিত ও উন্মাদিত করিয়া তুলিতেছে;—তাঁহার স্মৃতি যাহাতে এই মর্ত্ত্যধামের অচির-নিবাসে চিরস্থায়িনী হইয়া রহে, তদর্থ তাঁহার চিত্তের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটিকে অধিকতর উদ্দীপ্ত করিয়া লইতেছে। কাব্যও তাহার সুচিত্রিত পটে, ঐন্দ্রজালিক তুলিকা-স্পর্শে ঐ একই আলেখ্য আঁকিয়া রাখিতেছে; আর যশঃ-কিরণ-উদ্ভাসিত সুকীর্ত্তি দেবীর ঊর্দ্ধস্থিত মন্দিরের দিকে মানুষের হৃদয়, মন, ও প্রাণকে সবলে আকৃষ্ট করিতেছে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্পর্ক থাকুক, আর না থাকুক, যশের স্বভাব-লুব্ধ মনুষ্য, কালের যত্ন-সঞ্চিত অভিজ্ঞতার স্তর স্বরূপ ইতিহাস কিংবা জাতীয় হৃদয়ের অভিব্যক্তি—কাব্যের এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিতে একবারে উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে কি?

বিশুদ্ধ যশ ইহলোকের বস্তু হইলেও দেব-ভোগ্য অমৃত। দেবতা যেমন উহার জন্য লালায়িত, অসুরও ইহার জন্য তেমন প্রলুব্ধ। স্তুতিরূপিণী মোহিনী যত্নের সহিত দেবতাদিগকে উহা বণ্টন করিয়া দেন। তাঁহারা ঐ অমৃত-পানে অমল-ধবল-অমর-কিরণে উদ্ভাসিত ও উৎফুল্ল রহেন। অসুরও কলে-কৌশলে চুরি করিয়া, উহার ভাগ লইয়া, ছিন্নগ্রীব হইয়াও বাঁচিয়া থাকে; এবং সুযোগ পাইলেই, রাহুর বিকট-মূর্ত্তিতে জগতের আনন্দপ্রদ আলোক-পিণ্ড,—চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া বইসে। রামও যশস্বী,—রাবণও এক হিসাবে যশস্বী। কিন্তু রামের যশঃ-সঙ্গীতে জগতের প্রাণ শীতল হয়,—রাবণের যশোহুঙ্কারে পৃথিবীর প্রাণ শিহরিয়া উঠে! যশের প্রসাদে রামও অমর,—রাবণও অমর। কিন্তু একের অমরত্বে আশা,—অন্যের অমরত্বে আতঙ্ক। একের কীর্ত্তি সুযশ নামে সম্পূজিত,—অন্যের কীর্ত্তি অখ্যাতি বা অপযশ আখ্যায় কলঙ্কিত। যে যশের ভিত্তি জগন্মঙ্গল্য ভাবের উপর, পরার্থিনী প্রীতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, সেই যশের বিজয়-দুন্দুভিই দেবলোকে ধ্বনিত হইয়া থাকে, আর যে যশের ভিত্তি পরপীড়ন ও আত্ম-স্তুরিতার কমঠ-পৃষ্ঠে শিহিত, তাহারই নামে আকাশে উল্কা ছোটে, বাতাসে অনল বহে, সলিলে প্রবল তরঙ্গ উঠে এবং ভয়ার্ত্ত জীব-জগৎ হইতে 'ত্রাহি মধুসূদন'—ধ্বনি সমুত্থিত হয়!

যশের প্রকার ও প্রকৃতি, প্রয়োজন ও বিকৃতি, এবং গুণ ও অগুণ সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। প্রকৃত যশস্বী ব্যক্তিও সংসার-ক্ষেত্রে পরকীয় ঈর্ষ্যা ও অসূয়াবশে, স্তুতির পরিবর্ত্তে, সময় সময়, নিন্দার দংশনে ক্লিষ্ট ও বিড়ম্বিত হইয়া থাকেন। পৃথিবীতে এমন ভাগ্যবান্ যশস্বী পুরুষ কে, যিনি একই সময়ে, একদিকে স্তুতির বিনোদ্ পুষ্পমালায় সংবর্দ্ধিত,—অন্যদিকে নিন্দার কদর্য্য ক্লেদে লাঞ্ছিত না হইয়াছেন? আলেক্‌জাণ্ডার, জুলিয়াস্ সীজার,

নেপোলিয়ন্ প্রভৃতির ত কথাই নাই। প্রাতঃস্মরণীয় ভগবৎ পুত্র জগদ্বরেণ্য মহাত্মা খৃষ্টদেব এবং সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহরূপে পরিপূজিত বাসুদেবও এইশ্রেণীর পার্থিব লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। যশের প্রকৃত পরীক্ষা কর্ম্মে ;— সাময়িক নিন্দা বা স্তুতিতে নহে।

প্রকৃত যশস্য কর্ম্মের সহিত যে যশের সম্পর্ক, আমরা সে যশের কথা বলিলাম। এই যশই খাটি যশ। কিন্তু আজি কালি দেশে আর এক শ্রেণীর যশ ও যশস্বীর নূতন অভ্যুদয় পরিলক্ষিত হইতেছে। এই শ্রেণীর যশ ও যশস্বীর সহিত অধিকাংশ স্থলেই যশস্য কর্ম্মের সম্পর্ক বড় কম! আদিতে প্রত্যেক জিনিষই সাধারণতঃ একবিধ থাকে। কালে ব্যবহারের দোষে বা গুণে উহাতে ভাল ও মন্দ বহু প্রকারভেদ বা শ্রেণীবিভাগের হেতু সমুৎপাদিত হয়। ঐ আদি অবস্থাই উহার আসল বা প্রকৃত অবস্থা। এখন অনেক জিনিষেরই সেই আদিযুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আসল জিনিষের প্রকার বা অবস্থাভেদে রূপান্তর এক কথা,—আসলের স্থলে নকলের অনধিকার প্রবেশ আর এক কথা। আজি কালিকার এই 'গিল্টির যুগে' আসল অপেক্ষাও নকলের বাজারই অধিকতর গুলজার! সকল জিনিষেরই আসল ও নকল আছে। যশেরও তাহা না থাকিবে কেন? পূর্ব্বকালে, লোক-হিত-কল্পে অনুষ্ঠিত কর্ম্মজনিত শ্রমভারে অবনত লোকদিগেরই যশোরূপ সম্পদ্ স্বতঃলভ্য ছিল। তাদৃশ লোকেরা আপন আপন সুকৃতি বলে, যে কীর্ত্তিলাভ করিতেন, তাহাই যশ আখ্যায় সর্ব্বত্র বিঘোষিত ও সম্মানিত হইত। কিন্তু এক্ষণ এই শ্রেণীর খাটি যশ ব্যতিরেকেও, বাজারে আর এক শ্রেণীস্থ যশের প্রচুর আমদানী হইয়াছে! এই নকল যশের দৌরাত্ম্যে অনেক সময়, আসল যশও বাহিরে ফুটিবার পথপ্রাপ্ত না হইয়া

অন্ধকারে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। সর্ব্বত্রই চর্ব্বির স্থলবর্ত্তী যদি হয় ঘৃত, পেষিত তণ্ডুলের কাথ যদি হয় দুগ্ধ, সৈন্ধব মিশ্রি এবং লবণ যদি হয় চিনি, তাহা হইলে, বিনা পরখে খাটি জিনিষ চিনিয়া লওয়া কেমন কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়ে, তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝান অনাবশ্যক। এই হেতুই এক্ষণ কোন্ যশ প্রকৃত, কাহার জয়ধ্বনি প্রয়োজনীয়, অনেক সময় লোকে তাহা বুঝিতে না পারিয়া, খাটি যশকে উপেক্ষার ভাবে সরাইয়া রাখিয়া দেয় এবং নকলকে আসল মনে করিয়া উহারই নামে উল্লম্ফন করে। সুতরাং খাটি যশ ঐরূপে উপেক্ষিত হইবার আশঙ্কায়, নীরব জয়ঢাক কাঁধে লইয়া নীরব মিশিলের অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়। চর্ব্বির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে, খাটি ঘৃতের অভিমানে আঘাত লাগা কোন অংশেই অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে।

নকল যশগুলির সমস্তই তদ্বিরী যশের অন্তর্নিবিষ্ট। এই তদ্বিরী যশের প্রধান লক্ষণ এই যে, উহা কুত্রাপি স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, এবং তদ্বিরে বাধা পড়িলে বা তদ্বির থামিয়া গেলে, উহা আর তিলার্দ্ধকালও স্ববলে ও স্ববশে জীবিত থাকিতে সমর্থ হয় না।

পৃথিবীর সকল অকৃতী ও অকর্ম্মার দল যশোলোভে মুগ্ধ হইয়া, তদ্বিরী যশের অনুসরণে জীবন উৎসর্গ করিয়া দেয়। এই অস্থায়ী কৃত্রিম যশোলাভের জন্য তাহারা যে শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করে, সেই আয়াস ও শ্রমটুকু, কোন সৎসঙ্কল্পে, তেমনই আগ্রহের সহিত প্রবুক্ত হইলে, তাহারা যে যশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়া, আসলের পরিবর্ত্তে নকল পাইয়াই মনকে প্রবোধ দিতে উৎসুক হয়, সেই খাটি যশ লাভেই কৃতার্থ হইতে পারে। কিন্তু অধুনা যুগধর্ম্মে গোবর্দ্ধন ধরিয়া, গোকুল রক্ষায় কাহারও

যত্ন, ঔৎসুক্য বা সামর্থ্য নাই,—রাস-লীলার মধুপানে প্রায় সকল রসনাই লালায়িত!

এদেশের কর্ম্ম-ভূমিতে, কর্ম্ম এখন প্রায় সকল বিভাগেই অল্পাধিক মাত্রায় ধিক্কৃত বা বিড়ম্বিত। এখন প্রায় সর্ব্বত্রই আলস্য, অকর্ম্ম কিংবা কুকর্ম্মের পূর্ণ আধিপত্য। ধন, মান ও যশোলাভের প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু তজ্জন্য সাধু, সৎ ও সরল পথে পা ফেলিয়া, শ্রম ও কষ্ট স্বীকারে অধিকাংশেরই মতি নাই। ধনলিপ্সু কর্ম্ম করিয়া, পরিশ্রমের কঠোর সাধনায়, ধনদা লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ভালবাসে না। আলস্যের সুখ-শয্যায় নয়ন মুদিয়া শুইয়া থাকিব, আর কুবেরের অলকা আপনা হইতে আমার পর্ণকুটীরে অজস্র ধারায় সোনার চাঁপা বর্ষণ করিবে,—রাতারাতি রথ্‌চাইল্ড বা জগৎশেঠ হইয়া নয়ন উন্মীলন করিব,—অনেক ধনার্থীরই এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা গূঢ়ভাবে অন্তর্নিবিষ্ট। যশোলিপ্সুর পক্ষেও ঐ কথা; যশস্য কর্ম্মানুষ্ঠানের কষ্ট স্বীকার করিব না, তথাপি চারিদিক হইতে লোকে "শ্রুত্বাতিদূরে ভবদীয়া কীর্ত্তি"—এই মন্ত্রে আমার বন্দনা গাইবে। সুতরাং ধন লাভ ও যশ উপার্জ্জন, এই দুই দিকেই এক্ষণ শ্রম অপেক্ষা তদ্বিরের প্রভাব অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ধন চাই, কঠোরশ্রমে আয়ুক্ষয় করিব না, তদ্বির ও যোগাড় যন্ত্রের কৌশলে অনায়াসে ধন লাভ হইবে। যশ চাই, যশের জন্য স্বীয় এক তিল স্বার্থ উৎসর্গ অথবা শরীরের একবিন্দু ঘর্ম্মপাতও করিব না, অথচ তদ্বিরের কৌশলে যশঃ-শ্রীতে চিরবিলসিত রহিব। যাহারা শুধু এইরূপ তদ্বিরের আশ্রয়ে ধনার্জ্জনে উৎসুক, তাহাদিগের কেহ বঞ্চক, কেহ ঠক, কেহ চোর, কেহ ডাকাত; মিথ্যুক তাহাদিগের প্রায় সকলেই। তদ্বিরী যশোলিপ্সুদিগের সম্বন্ধেও

ঠিক এই কথাই প্রযুজ্য। তাহাদিগের মধ্যেও চোর, ডাকাত, দস্যু, বঞ্চক, ঠক ও মিথ্যুক, এ সমস্তই আছে।

যাহারা তদ্বিরের কৌশলে, অন্যকৃত কর্ম্মে আত্মনামের সিল-মোহর বসাইয়া দিয়া যশস্বী হয়, তাহারা হয় তস্কর,—না হয় বঞ্চক। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাহারা মনে মনে আপনাকে চতুর-চূড়ামণি ঠাউরাইয়া লইয়া অষ্টপ্রহর বাহাদুরীর ভাবেই ডগ-মগ থাকে। যাহারা প্রতাপ, প্রভুত্ব ও শক্তিদ্বারা অভিভূত রাখিয়া ক্ষীণশক্তি যশস্বী ব্যক্তির যশ কাড়িয়া লয়, তাহারাই এক্ষেত্রে দস্যু। এই কর্ম্ম দ্বারা তাহারা লজ্জিত হয় না, বরং আত্মপ্রাধান্য চিন্তা করিয়া, গর্ব্বভরে দ্বিগুণ স্ফীত হইয়া উঠে। যাহারা পরের যশ অপহরণ করে বা পরের সুনামের উপর বাটপারি করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগের মনেও, ঐ উপায়ে যশোলাভের আকাঙ্ক্ষাই বলবতী থাকে। কিন্তু তাহারা কখনও যশস্বী হইতে পারে না। তাহারা অন্যকে ভিখারী বানায় সত্য,—নিজে কখনও যশোধনে ধনী হইতে সমর্থ হয় না।

এখন প্রায় দেশের পোনে যোলআনা লোকই তদ্বিরী যশের ভিখারী। এই যশ উপার্জ্জনের জন্য প্রায় সকলেই প্রাণপণে যত্নশীল। প্রতিভা নাই ?—নাই বা থাকিল, অন্যের নিকট প্রতিভান্বিত নামে পরিচিত হইতে পারিলেই ত হইল। ধন নাই ?—লোকে ধনী বলিয়া সম্মান করুক; মান নাই ?—লোকে মানী বলিয়া বুঝুক; বিদ্যা নাই ?—লোকে বিদ্বান্ বলিয়া সম্মান করুক। প্রতিভাকে জাগাইতে, ধনে ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে, মান বাড়াইতে এবং বিদ্যা লাভ করিতে যে কঠোর সাধনার প্রয়োজন, সে কষ্টে তনুক্ষয় করিয়া লাভ কি ? তদ্বির বা যোগাড় যন্ত্রের চতুর-চাতুরিতে লোককে, ঐ সকল আছে বলিয়া, বুঝাইয়া লইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। এই ভাবেরই এক্ষণ প্রবল আধিপত্য। এই কারণেই আজি কালি বিদ্যালয়ে যে সকল

ছাত্র পুস্তক লইয়া পরিশ্রম করে, প্রতিভাভিমানী সহাধ্যায়ী-দিগের নিকট, তাহাদিগের কাহারও নাম গাধা, কাহারও নাম গরু। পুস্তক না ছুঁইয়াই পণ্ডিত হইব, না পড়িয়াই পরীক্ষায় পাস করিব, ইহা না পারিলে আর প্রতিভার বাহাদুরি কি ?—এই বাহাদুরির পরিণাম অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দাঁড়ায় যে, পরীক্ষার সময়, বিদ্যালয়ের গর্দ্দভেরা বসিয়া লিখে, আর সুচতুর প্রতিভা-শালীরা তাহাদের পাশে বসিয়া নকল করে, এবং অনেক সময়েই, এই তদ্বিরের প্রসাদে পরিণামে পাসের যশ না পাইয়া অভি-শাপের নির্ঘাত আঘাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কক্ষ হইতে খসিয়া পড়ে !

বর্ত্তমান সাহিত্যিকদিগের মধ্যে যাঁহারা তদ্বিরের অব্যর্থ সন্ধানে যশস্বী, তাঁহাদিগের প্রধান অবলম্ব মাসিক সাহিত্য বা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। যিনি কালি কলমে, "খাচ্ছি, দিচ্ছি, নিচ্ছি' ইত্যাদি ক্রিয়াপদ যোজনা করিয়া, একটা কথোপকথনের শিকলী গাঁথিয়া দিতে পারেন, অথবা ভঙ্গ-অমিত্রাক্ষরের ছাঁচে ঢালিয়া নাটক নামে একটা 'আজগুবি চিজ্' খাড়া করিয়া লইতে সমর্থ হন, তিনিই নাটককার! সে নাটককারও ছোট-খাট গোছের নহে, একবারে কালিদাস বা শেক্ষপীরের সমকক্ষ! দুটি কথা মিল দিয়া লিখিতে পারিলে, আর রক্ষা নাই, অমনি সে কবি-যশঃপ্রার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হইল! তাহাকে নবীন, হেম বা রবি কবি বলিলেও তাহার তৃপ্তি হইবে না, একবারে তাহার শেরীডান, সাথী, মিল্টন বা টেনিসনের সমান যশ পাওয়া আবশ্যক। "মনের কথা তাই লো তাই"—গোছের একটা কিছু কাহিনী লিখিয়া তুলিতে পারিলেই, লেখক সাহিত্যিক সম্প্রদায়ে নাম লিখাইয়া বাঙ্গালার স্কট্ বা ডুমা হইতে উৎসুক হয় ; এবং সুতা-ছেড়া ভাবশূন্য গদ্যে শব্দের একটা বোম্বার্ডমেণ্ট

যে ফুটাইতে পারিল, তাহারই কার্‌লাইল, বা ইমার্সনের প্রতিভার উপর দাবি পহুঁচিল!

ঈদৃশ যশতৃষ্ণার তৃপ্তি কোথায়,—কিরূপে হইবে?—ইহা স্থূল দৃষ্টিতে অসম্ভব বোধ হইলেও, প্রকৃতপ্রস্তাবে অসম্ভব নহে। এই শ্রেণীর সাহিত্যিকেরাও তদ্বিরের গুণে, মাসিক সাহিত্য ও সংবাদ পত্রের মন-রাখা উদার দৃষ্টির প্রসাদে, অনেক সময়েই, আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ সার্টিফিকেট্ পাইয়া তরিয়া যাইতেছে!

সংবাদ-পত্র প্রভৃতি শুধু পরকীয় যশের তদ্বির দিয়াই নিরস্ত নহে। তাহারা এই উপায়ে আপনাদিগের নিজের তদ্বিরটাও একটু করিয়া লয়। শ্রীকৃষ্ণের শত নাম।—এদেশে সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রের অনন্ত নাম। কাহার নাম 'বিশল্যকরণী', কাহারও নাম 'অস্থিসঞ্চারিণী', কেহ 'মৃত-সঞ্জীবনী', কেহ 'প্রত্নতত্ত্বনন্দিনী'; কাহারও নাম 'ভাববিকাশ', কাহার নাম 'প্রেম-প্রকাশ' ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহাদিগের মধ্যে সাধারণতঃ সমসাময়িক সখিত্বের দুটি ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এ দুটি ভাব পরস্পর বিপরীত ও বিরুদ্ধ। কোন শ্রেণীর ব্যবসায়ীই রুচি বুঝিয়া রোচক ও মন বুঝিয়া মোদক যোগাইতে না পারিলে, ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হয় না। ব্যবসায়ী সাময়িক সাহিত্যগুলির মধ্যে যাঁহারা মেছোবাজার বা বিলিংস্ গেটের বুলী ধরিয়া, নিদ্রিত মিঞাভাইদের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া আসর যমকাইতে উৎসুক, তাঁহারা পরস্পরের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত নবমীর পর্ব্বে তান ধরেন; আর যাঁহারা এখনও লোকের নিকট ভালরূপ পরিচিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রশংসায়, ষষ্ঠী ব্রতের 'বায়না বদলের' পদ্ধতি অবলম্বন করেন। 'বিশল্যকরণী' বলেন,—'অস্থিসঞ্চারিণীর' মত পত্রিকা বাঙ্গালায় আর হয় নাই, ইহা বিলাতের ওভার ল্যাণ্ড মেইলের (Over-

land Mail) সমকক্ষ। আবার 'অস্থিসঞ্চারিণী' বলেন,—'বিশল্যকরণীর' কথা আর কি কহিব, 'বিশল্যকরণী,' ভারতের টাইমস্ (Times)। পরস্পর এইভাবে প্রেমালিঙ্গন করিয়া, তাঁহারা কথনও দেশহিতৈষিতার নামে তীব্ররসিকতার বুকুনি ঝাড়িয়া, দেশের মঙ্গলবিধাতা রাজপুরুষদিগকে চটাইয়া তুলেন, কথনও বা মানী ও পদস্থ ব্যক্তির মানে আঘাত করিয়া সাহসিকতার পরিচয় দেন। এই সকলের কোন অনুষ্ঠানই আত্মযশ খ্যাপনের পরিপক্ক তদ্বির ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বিজ্ঞাপন নব্যযুগের প্রধান ভাট। বিজ্ঞাপন অহোরাত্র সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রে ধারদিয়া, রাজপথের উচ্চ স্তম্ভে বসিয়া, অথবা চলন্ত পদাতিকের ঘাড়ে চাপিয়া, বিষকে অমৃত, অমৃতকে বিষ, চোরকে সাধু, সাধুকে চোর, ব্রাহ্মণকে চণ্ডাল ও চণ্ডালকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে! বিজ্ঞাপনের বলে যে কত কুসুম-সুবাসিনী তৈল, কত মনোমাদিনী আরক, কত দন্ত-উৎপাটনী চূর্ণ, কত জরভঙ্গ-গজাঙ্কুশবটিকা, ব্যাকরণ ও শিষ্ট প্রয়োগের শ্রাদ্ধ করিয়া, বাজারে যশের ঢক্কা বাজাইয়া আপন আপন পসার যমকাইয়া লইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিজ্ঞাপনের প্রসাদে কত পতিভিখারিণী পতিলাভ করে, কত অবরণীয় বর্ব্বর বরের গৃহশূন্যতা দোষ দূর হয়, কত পত্নী-বিয়োগ-বিধুর বৃদ্ধ, সংসার-সরিৎ তরিবার উদ্দেশ্যে তরুণীর আশ্রয় লইয়া ঝটিকা-তাড়নে ডুবিয়া মরেন। যশের তদ্বিরে বিজ্ঞাপন অমোঘ অস্ত্র।

উকীল, ডাক্তার, মোক্তার ও কবিরাজ, পুরোহিত ব্রাহ্মণ ও গুরু ঠাকুর, প্রচারক, বক্তা ও লেথক, যশের তদ্বিরে কেনা আকুল,—কেনা অধীর?—যোগাড়ী ডাক্তার সামান্য সর্দ্দির হাঁচিতে তীব্র কফ মিক্‌চার লাগাইয়া রোগীকে আড়ষ্ট করিয়া রাথেন, আর

সুহৃদ্ সংবাদপত্রের প্রসাদে যক্ষ্মা আরোগ্য করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণে যত্নপর হন। ফিকির-বাজ কবিরাজ কখন কখন পোণ্টার ভার হাতুড়ের হাতে দিয়া, উপাধির মালা কণ্ঠে দোলাইয়া, চড়ক ও সুশ্রুতের অঙ্গে আধুনিক রুচির ডাক্তারি নিশান চড়াইয়া, আপনি ধন্বন্তরি সাজিয়া বসেন! কোথায় বা সে ধন্বন্তরি, আর কোথায় বা এই ভূঁই-ফোড় সহস্র-মারী! এ সমস্তই যশের তদ্বির বা যশের অকালবোধন বা অধিবাস। স্বপক্ষীয় নাম-করা সাক্ষীর চির-অভ্যস্ত কারিকরিতে মোকর্দ্দমায় জয়লাভ করিয়া, অমনি সে মোকদ্দমার জটিলত্ব ও কুটিলত্বের অশেষ স্তর প্রদর্শন সহকারে, উহার বিস্তৃত বিবরণ-দ্বারা প্রণয়-বদ্ধ সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠা পূরণ করা হইল। এ দুরূহ মোকদ্দমায় উকীল বা মোক্তার ছিলেন কে?—অমুক বা অমুক। নামটি বড় বড় অক্ষরে সংবাদপত্রের স্তম্ভে ফুটিয়া পড়িল। ইহাও উকীল মোক্তারের পক্ষে যশেরই এক প্রকার তদ্বির বটে।

বক্তা বকিয়া বকিয়া, সভাগৃহে বিরক্ত শ্রোতার কান ঝালা-পালা করিলেন, কিন্তু বিজ্ঞাপনে বিঘোষিত হইল, অমুক বক্তা গ্লাডষ্টোন বা কেশব সেনের স্থলবর্ত্তী। প্রচারকদিগের অধিকাংশই এক্ষণ লুথার বা সেণ্টপলের সমশ্রেণীস্থ। তিলক, নামাবলী ও ফোঁটার প্রসাদে সিঁধাল চোর বা দুর্দ্ধর্ষ লাঠিয়ালও, কিরূপে সময় সময়, সাধুজী বা জগদ্গুরু, নামে তরিয়া যায়, অথবা কত ভেল্কী-বাজ কল্কী অকালে প্রলয় ঘটাইয়া ভয় ও বিস্ময়ের তরঙ্গ তুলিয়া দেয়, অনেকেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অনেক স্থানেই গুরুজী ভাবেন বার্ষিক প্রণামী,—পুরোহিত ঠাকুর দক্ষিণা! শিষ্য বা যজমানের ইহকাল ও পরকাল গোল্লায় যাউক, সে ভাবনা ভাবিবার অবসর কোথায়? অথচ, নামাবলী, জপের মালা, তিলক ইত্যাদি উপলক্ষণ ও কথায় কথায় হরিনামের ফাকা

আওয়াজে ভগবদ্ভক্তি, ধর্ম্ম ও পাণ্ডিত্যের বাহ্য বাহ্বাস্ফোটন করিয়া লন ষোড়শোপচারে। ইহাই অধিকাংশ স্থানের চলিত ব্যবস্থা। যশের তদ্বিরে প্রায়শঃই অকাণ্ডে এইরূপ প্রলয় ঘটিয়া থাকে।

রাজা, জমিদারগণ ও ভূম্যধিকারীদিগের অনেকেই তদ্বির ও যোগাড়ের গুণে, কৃষীপ্রজার কষ্টসঞ্চিত শোণিত শোষণ করিয়া, সেই মূল্যে যশের উচ্চ উপাধি ক্রয় করিয়া কৃতার্থ হন! তাঁহারা কখনও মধুর কথার মন-মাতান মোহিনীতে অজ্ঞ প্রজার মন ভুলাইয়া, কখনও বা পীড়নের অপ্রতিহত কৌশলে বাধ্য করিয়া, প্রজার 'সেলামী' সংগ্রহ করেন ও উচ্চ রাজপুরুষদিগকে সাক্ষী রাখিয়া, লোকহিতৈষণা বা দয়ার পবিত্র নামে, নিরশ্রুনয়নে ক্রন্দন করিয়া, নিরাকার জলে বক্ষ ভাসাইয়া দেন এবং মুক্তহস্তে সেই অর্থ "তুভ্যং নমঃ" বলিয়া ঢালিয়া দিয়া, সাহেব সুবার দরবারে আসর যমকাইয়া লন। "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"—এই সূত্রের অনুসরণে কত জনে যে পৈতৃক সম্পত্তি বিপন্ন করিয়া ঋণী হন এবং এইরূপে ঋণ করিয়া যশের ঘৃত পান করিয়া থাকেন, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। কেহ আপনার নাম জাকাইবার নিমিত্ত একটা ফাকা উপাধির আওয়াজে দেশ-ব্যাপী রব তুলিবার উদ্দেশ্যে অকারণ সোনার দানসাগর বা ধনীর মচ্ছন্দ-বিহারী 'বিড়ালের বিবাহের' মত, অকালে রাজসূয়ের আয়োজন করেন। কেহ বা যশস্য কর্ম্ম করিয়াও উহা ঢাকিয়া রাখিবার কৃত্রিম অভিনয়ে হাস্যজনক অনুষ্ঠান করিয়া আপনার যশোবিরাগী নাম ঘোষণার্থ অন্যরূপে যশের তদ্বির দিতে ভাল বাসেন।

এইরূপ সকল বিভাগীয় তদ্বিরী যশের হিল্লোলে আজি কালি দেশ ডুবু-ডুবু! যশস্বীর দুর্ব্বহ ভারে পৃথিবী ভারাক্রান্ত! যাহারা পরধন হরণ, পরস্ত্রী গমন, পরের গৃহে অগ্নিপ্রদান ও পরপ্রাণ হনন

প্রভৃতি ভীষণ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, শাস্ত্রানুসারে তাহাদিগের নাম আততায়ী। এই শাস্ত্র-প্রণয়ন সময়ে মানুষ যশের ভিখারী ছিল না,—ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুরাগী ছিল। তখন সত্যের সম্মান বৃদ্ধি করিতে যাইয়া লোকে আত্মখ্যাপন অপেক্ষা আত্মগোপনেরই অধিকতর গৌরব করিত। এই হেতু ধন্বন্তরিও আত্মকৃত চিকিৎসা গ্রন্থের প্রণেতৃরূপে মহাদেবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেন। ব্যাস ও আত্মকৃত দুর্লভ পদার্থের প্রণেতৃ স্থলে, ভগবৎ নামের আশ্রয় লইয়া কৃতার্থ হইতেন। তখন এরূপ তদ্বিরী যশের উৎকট উপসর্গ যদি সমাজে এতটা প্রবলরূপে বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে, ইহা দৃঢ়রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, ঋষিপ্রণীত নীতিসূত্রে নিশ্চিতই তদ্বিরী যশে যশস্বী ব্যক্তিরাও আততায়ী শ্রেণীভুক্ত ও দেশের কল্যাণে বধার্হরূপে নির্দ্ধারিত হইতেন।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

গ্রন্থ সমালোচনা।

ময়মনসিংহের বিবরণ।—"আরতি"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদার মজুমদার প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া, আমরা প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থের ভাবাটি অতি সরল ও সরস হইয়াছে। বিশেষতঃ গ্রন্থকারের গবেষণা ও ইতিবৃত্তসংগ্রহের নৈপুণ্য দেখিয়া, বাস্তবিকই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। কেদার বাবু অতি সংক্ষেপে অনেক অপ্রকাশিতপূর্ব্ব কাজের কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রম সফল হইয়াছে, একথা আমরা মুক্ত-

কণ্ঠে বলিতে পারি। আমরা গ্রন্থকারের "ময়মনসিংহের ইতি-হাস" ও "ময়মনসিংহ-কাহিনী" পাঠ করিবার জন্য লালায়িত রহিলাম।

অর্ঘ্য।—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। ইহা একখানি কবিতা পুস্তক। গ্রন্থকার ভক্তি সহকারে 'পূর্ব্বকবিগণে,' তাঁহার এই চতুরঙ্গুলি 'অর্ঘ্য' অর্পণ করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথম ভ্রমসংশোধনের তালিকা দেখিয়াই, মাথা ঘুরিয়া যায়! কিন্তু তাই বলিয়া করা কি?—অনেক সময়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কর্ত্তব্যের অনুরোধ, বাধ্য হইয়াই, কোন কোন কার্য্য করিতে হয়। আমরা বিপিন বাবুর "অর্ঘ্য" আদ্যো-পান্ত পাঠ করিয়াছি; কিন্তু প্রীতি লাভ করিতে পারি নাই,—বরঞ্চ ফল অনেক স্থলে বিপরীতই ঘটিয়াছে। বোধ হয়, গ্রন্থ-কার সমৃদ্ধ ব্যক্তি,—নতুবা এতাদৃশ আবর্জ্জনা রাশি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া, অযথা অর্থের অপব্যয় করিবেন কেন? আর যদি দরিদ্র হইয়া থাকেন, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব, তিনি কোন উৎকট রোগাক্রান্ত! বিপিন বাবুর 'অর্ঘ্য' কতকগুলি নির্গন্ধ বাসি ফুল ও পঁচা বিল্বদলে পরিপূর্ণ। যে দুই চারিটি সুগন্ধি কুসুম ইহাতে আছে, পঁচা গন্ধের আধিক্য-হেতু, তৎ সমুদায়ের অস্তিত্বও আদৌ উপলব্ধি হয় না। গ্রন্থকারকে 'কবি' না বলিয়া, 'কবির সরকার' বলিলেই যেন মানান-সই হয়। নমুনা স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"বেয়ানা বেশাদ্ নিয়ে করিস্ বড়াই,
তাই শুধু মনে ভয় হারাই হারাই।"

* * * * *

"মুক্ত হবে রাম শ্যাম মুক্ত হবে রাধা,
মুক্ত হবে হাতী ঘোড়া উট গরু গাধা।"

* * * * *

"বলিলে আসল কথা চোক হবে লাল,
চিনি না বলিলে বেশ ফুরায় জঞ্জাল।"—ইত্যাদি।

চিন্তা-সরিৎ।—শ্রীযুক্ত শশিমোহন বসাক এম্, এ প্রণীত ও শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসাক বি, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র। প্রথম কথা, পুস্তকের মুদ্রণ-কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় নাই, এবং অনেক স্থলেই মুদ্রাকর-প্রমাদ পরিলক্ষিত হয়। এগুলি শুধু ছাপাখানার ভূতের ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে কেন?—এজন্য স্বয়ং গ্রন্থকারও ন্যায়তঃ আংশিক রূপে দায়ী। 'চিন্তা-সরিৎ' আমরা আগা-গোড়া বেস মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হইল, গ্রন্থকার কতিপয় খ্যাতনামা পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতামত বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন,—তাঁহার নিজস্ব কিছুই নহে। অনেক স্থলে আবার অনুবাদটিও মূল বিষয় হইতে দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। একেই ত দর্শন শাস্ত্র,—তাহাতে যদি ভাষাটাও নিতান্ত কট-মটে গোছের হয়, তবে সাধারণ পাঠকের পক্ষে উহা আকাশ-কুসুম হইয়া দাঁড়ায়;—বিশেষজ্ঞের কথা আমরা বলিতেছি না। ভাষাটি আরও একটু প্রাঞ্জল ও সরস হইলে, গ্রন্থখানি খুব উপাদেয় হইত। গ্রন্থকারের ইহা প্রথম উদ্যম বলিয়া, আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। কালে ইনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে যশস্বী হইতে পারিবেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

বান্ধব।—অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩১১। 'চিন্তালহরী'—(বিশ্বাস আর অবিশ্বাস) প্রবন্ধটি শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ের লেখনী-নিঃসৃত। ইহা পাঠ করিয়া, আমরা প্রীত হইয়াছি। 'কর্ণ কে?'—শ্রীশশিমোহন বসাক এম্, এ। এই প্রবন্ধে লেখক 'কর্ণ ও কবিত্বের সম্বন্ধ' নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। লেখক সে বিষয়ে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। প্রবন্ধকার দাতাকর্ণের সুমধুর পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া, যাদৃশী ওজস্বিনী ভাষায় প্রবন্ধটির সূচনা ও সুখ-সমাপ্তি করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিশেষ ভরসা হয়, ইনি কালে সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত হইতে পারিবেন। 'চারুশীলা'—(গল্প) শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ বি, এ। এবার সমাপ্ত হইয়াছে। আমরা গল্পটি আগা-গোড়া পাঠ করিয়াছি। দুই এক স্থলে সামান্য দোষ দৃষ্ট হইলেও, গল্পটি মোটের উপর মন্দ হয় নাই। বিষয়টি বিস্ময়োদ্দীপক বটে। 'শবরী'—(কবিতা) শ্রীঃ—। নর-নারায়ণ রামচন্দ্রের প্রতি শবরীর উক্তি-গুলি, পদ্যাকারে ইহাতে স্থান পাইয়াছে। প্রকৃত ভক্তের প্রাণে ডাকিলে, ভক্তাধীন ভগবান্ অবশ্যই করুণ-নয়নে চাহিবেন। বাস্তবিক ভাব-গদ্-গদ-কণ্ঠ-নিঃসৃত ভক্তের কৃপা-প্রার্থনা শুনিতেও প্রাণ-মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া যায়। 'গীতি-লহরী'—এই প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৺ মির্জ্জা কালীদাসের গীতাবলীর সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনা সমীচীন ও নিরপেক্ষ হইয়াছে বলিয়াই আমাদের ধারণা। 'ছায়াদর্শন'।—এবারকার ঘটনাবলী বিস্ময়কর বটে। 'সুবর্ণ বণিকের সামাজিক মর্য্যাদা'—মন্দ হয়

নাই। 'তোমার কথা'—(কবিতা) শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ। প্রিয়তমার বিরহে বিহ্বল হইয়া, কবি ইহাতে 'উদাস প্রাণে' 'বিচ্ছেদ-ব্যথা' ব্যক্ত করিয়াছেন। বাস্তবিকই লেখক একজন প্রকৃত প্রেমিক; তাঁহার প্রেমও নিতান্ত নিঃস্বার্থ। সুতরাং তিনি 'বর্ষ মাস দিন' 'আশা বা সে দুরাশায়' কাটাইতেছেন। কবির বিরহ-ব্যথায় আমরা আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। কবিতাটি অতীব প্রাণ-স্পর্শী হইয়াছে।

বঙ্গদর্শন।—ফাল্গুন, ১৩১১। "রাজা রামমোহন রায়"।—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। সুলিখিত সার-গর্ভ চরিতাখ্যান। এরূপ মহজ্জীবনের আখ্যায়িকা পাঠে পাঠকপাঠিকার মহদুপকার সংসাধিত হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্ম্ম-বীর রাজা রামমোহনের কর্ম্মের অনুপাতে, দীনেশ বাবুর লিখিত জীবন-চরিত যে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, একথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন। "নৌকাডুবি,—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ক্রম-প্রকাশ্য উপন্যাস। বাজারে কিরূপ কাট্‌তি হইবে, তাহা যবনিকা না পড়িলে, বলিয়া উঠা যায় না। "রামায়ণের রচনা কাল"—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। সুচিন্তিত সুলিখিত সসার প্রবন্ধ। "প্রার্থনা," "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ" ও "নবজীবনের আদর্শ' এই তিনটি প্রবন্ধই স্বর্গগত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্পর্কে লিখিত। যদিও তিনটি প্রবন্ধ, তিনজন খ্যাতনামা বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবীর লেখনী-নিঃসৃত, তথাপি ত্রিপথ-গামিনী পুণ্যতোয়া গঙ্গার ন্যায়, উহা একই অনন্তে পঁহুছিয়া লক্ষ্য স্থল ধরিতে পারিয়াছে।

সাহিত্য।—মাঘ, ১৩১১। "ভারতচন্দ্র"—শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। প্রবন্ধটি অতি উপাদেয় হইয়াছে; পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। "ফিরিঙ্গি বণিক্''—সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের লেখনী-

প্রসূত একটি সুলিখিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। "মাতৃপূজা"—(কবিতা) শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ। জাতীয় জীবনের উদ্বোধন মানসে মুনীন্দ্রবাবু এই চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি লিখিয়াছেন। মন্দ লাগিল না। "ইংরাজ বর্জ্জিত ভারতবর্ষ"—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। পাঠ-যোগ্য প্রবন্ধ। 'আমার সংসার'—(কথা) আধুনিক বঙ্গ-পরিবারের একটি প্রস্ফুট চিত্র। "সহযোগী সাহিত্য" —এবারকার সহযোগী সাহিত্য বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। "কথা"—(ধর্ম্মাধর্ম্ম)। একস্থলে লিখিত হইয়াছে,—"তর্কালঙ্কারের সন্দেহ হইয়াছিল যে, গ্রীষ্মকালে গাত্র ঘামে কেন? এবং দ্বিতীয় সন্দেহ যে, গাত্র ঘর্ম্ম-পরিপ্লুত হইলে গৃহিণী বাতাস করে না কেন?" আবার গৃহিণীকে মনের কথা বলিয়া জানা গেল যে, "গৃহিণীর সমস্যাও কর্ত্তার ন্যায়"। সুতরাং যাহাতে "চটাচটি না হয়," এবং "ঘর্ম্মস্রোত না বাড়ে," তজ্জন্য লেখক "সহানুভূতির" ঘাড়ে বোঝা চাপাইয়া, উভয়ে উভয়কে বাতাস করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। কবিরাজী মতে লেখকের নাড়ী-জ্ঞান পাকা বটে! 'মাসিক সাহিত্য সমালোচন'—বেস চলিয়াছে।

ভারতী।—ফাল্গুন, ১৩১১। 'মহর্ষির লোকান্তর গমন'—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রবাবু তদীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবন্ধ রচনা করেন, এবং উহা গত ১১ই মাঘের ব্রহ্মোৎসবে পঠিত হয়। প্রবন্ধের প্রতি ছত্রে ছত্রে অক্ষরে অক্ষরে রবীন্দ্র বাবুর অকৃত্রিম পিতৃ-ভক্তির অমৃত-উৎস ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'জুলিয়াস্ সীজার'—(পদ্যানুবাদ) শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবার চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত হইয়াছে। অনুবাদ মোটের উপর মন্দ হইতেছে না। 'ভীমা'—(গল্প) শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার। গল্পটি বেস কৌতুহলোদ্দীপক হইয়াছে। পাঠ করিয়া, প্রীত হইয়াছি।

'বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম'—শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধটি অতি উপাদেয় হইয়াছে। 'ফকির খয়ের উদ্দীন'—শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল। মন্দ লাগিল না। 'বৈশালী'—(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর) শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিবার অনেক কথা আছে। 'সাময়িক কথা'—শ্রীমতী সরলা দেবী। অতি সুন্দর হইয়াছে। 'সমালোচনা'—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। বলিবার কিছু নাই।

নবনূর।—ফাল্গুন, ১৩১১। "আবাহন"—(কবিতা) কায়কোবাদ। কাবুলের আমীর-তনয় সর্দ্দার এনায়েৎ উল্লা খাঁর ভারতাগমন উপলক্ষে লিখিত। কবিতাটি ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত এবং প্রাণের কথায় ভরা হইলেও, একদেশ-দর্শী। "মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত"—(পূর্ব্বানুবৃত্ত) মৌলবী আবদুল করিম। যতদূর পাঠ করা গেল, মন্দ লাগিল না। "দুইখানি নূতন গ্রন্থ"—(আলোচনা) শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। "হজরত মোহাম্মদ" ও "মোস্লেম-জগতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা" গ্রন্থদ্বয়েরই আলোচনা চলিতেছে। "লাভের হিসাব"—(কবিতা) শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন। শশাঙ্কবাবুর 'লাভের হিসাবে' যেন ক্ষতিই সার হইল! কবিতাটি যেন কোন ইংরাজী কবিতার অনুবাদ বলিয়াই মনে লয়। কারণ, লেখাটা যেন নিতান্ত কষ্ট-কল্পিত। "ঈদুজ্জোহা"—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত। প্রবন্ধটি অতি উপাদেয় ও সরস হইয়াছে। "নায়কের-সাম্রাজ্য'—শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল। ক্রম-প্রকাশ্য হইলেও, যতটুকু পাঠ করিলাম, তাহাতে বুঝা গেল, প্রবন্ধটি সাহিত্য-সেবিগণের উপভোগ্য হইবে। "পীর্-শাহ-শাহী"—মতীয়র রহমান। মন্দ লাগিল না। আমরা ইহার সুখ-সমাপ্তি দেখিলে, আরও সুখী হইব। "কবিতা গুচ্ছে" —কতকগুলি বাসি-ফুল রহিয়াছে। মাত্র "পাপ" কবিতাটিই উল্লেখ-যোগ্য।

প্রবাহ।—ফাল্গুন, ১৩১১;—(দ্বিতীয় সংখ্যা)। "বিশ্ব-রূপ'—(কবিতা) শ্রীযুক্ত "অভিরাম"। প্রবাহ-সম্পাদক কবিতাটির, শীর্ষদেশে নোট করিয়া দিয়াছেন যে, 'বিশ্বরূপের' কবি, "একজন ভক্ত-প্রেমিক" হইলেও, "অভিরাম" "ব্যতীত অন্য নামে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন না"। যাহা হউক, যে নামেই পরিচিত হউন না কেন, আমরা 'শ্রীযুক্ত অভিরামের' "বিশ্বরূপ" পাঠ করিয়া, প্রীত হইয়াছি। 'নবীনা'—(উপন্যাস) শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায়। "নবীনায়" নবীনত্ব কিছু না থাকিলেও, চলিয়াছে বেস। সমাপ্তির পর আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব। "ভারতে সমাক্ষর"—শ্রীযুক্ত জষ্টিশ সারদাচরণ মিত্র, এম্, এ, বি, এল। প্রবন্ধটি ক্রম-প্রকাশ্য। ভরসা আছে, ইহার সুখ-সমাপ্তি দেখিয়া, আমরা প্রীতি লাভ করিব। "৺গোঁফ্"—শ্রীযুক্ত বাঞ্ছারাম। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যাঁহারা নাড়ী-বিজ্ঞানে সবিশেষ পারদর্শী, তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাঞ্ছারামকে "বিষ্ণুতৈল" ব্যবহার করিতে উপদেশ দিবেন! যদিও প্রবন্ধটি হাস্য-রস উদ্রেকের জন্য পত্রস্থ হইয়াছে, তথাপি স্থান বিশেষ পাঠ করিলে, ইহাকে সাহিত্য-ক্ষেত্রের পুতিগন্ধময় ড্রেনে ফেলিয়া রাখিবার উপযুক্ত বলিয়াই মনে লয়। বাঞ্ছারামের পাগ্লামির মাত্রা কোন্ গ্রামে চড়িয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত স্থল হইতেই সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। যথা,—"কথনও কথনও প্রণয়িনীর মুখে কিছু খাইবার সময় সুন্দরী বিরক্ত হন। গোঁফের এ অত্যাচার অসহ্য! * * * * * আরও বুঝিয়া লয়, আমার সম্মুখ হইতে স্ত্রী কন্যা সরাইয়া দেওয়া আবশ্যক।"—ইত্যাদি ইত্যাদি। এক্ষণ জিজ্ঞাস্য, ইহা হইতে কুরুচি-পূর্ণ আর কি আছে? প্রবাহ-সম্পাদক একজন প্রবীণ লেখক; সুরুচির গণ্ডীর বাহিরে তিনি অবস্থিত, একথা আমরা বিশ্বাস করিতে

পারি না। ভরসা আছে, ভবিষ্যতে তিনি প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-ব্যাপারে সতর্ক হইবেন। "চাহিলে না চায়'—(কবিতা) শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু। কবিতাটি মন্দ লাগিল না। "বৈদিকতত্ত্ব"—শ্রীযুক্ত আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী। বিশেষজ্ঞের উপাভোগ্য হইলেও হইতে পারে। "দেরাদুন"—শ্রীযুক্ত জষ্টিশ সারদাচরণ মিত্র, এম্, এ, বি, এল। ক্রম-প্রকাশ্য। "মহামায়া"—(ক্ষুদ্র কথা) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বেস লাগিল। "গীতারধর্ম্ম"—শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায়। ক্রম-প্রকাশ্য হইলেও, যতদুর পাঠ করা গেল, মন্দ লাগিল না। "অভিনন্দন"—(কবিতা) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘটক। পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইতে পারি নাই। শুধু মটর-কড়াই চিবাইলে, চলিবে কেন? "পাশ্চাত্য বৈদিক"—শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষাল। মন্দ লাগিলনা। "স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ"—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শর্ম্মা এম্, এ। ক্রম-প্রকাশ্য জীবন-চরিত।

অর্চ্চনা।—মাঘ, ১৩১১। "কত দূরে!"—(কবিতা) শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র। মন্দ লাগিল না। "দ্বন্দ্ব ও জীবন"—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, বি, এল। পাঠ-যোগ্য প্রবন্ধ। "বাঙ্গালার প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার"—আবদুল করিম। উদ্যম প্রশংসনীয়। "মাধুরী"—বাস্তবিকই মাধুরী-বিহীন। পড়িতে পড়িতে ধৈর্য্যচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। "রাঠোর বালক"—(কাব্য) শ্রীউমাচরণ ধর। এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। লেখা মন্দ নহে। "কবিতাকুঞ্জ"—এবার নীরব! এই বসন্ত কালেও, নির্ম্মম কোকিল যেন 'অর্চ্চনার' 'কবিতা-কুঞ্জ' হইতে পলাইয়া গিয়াছে! মলয় বহে না,—ভ্রমর গুঞ্জরে না,—কারণ, ফুল আদৌ ফুটে নাই। সুতরাং আমরাও আর এই নীরব কুঞ্জের গায় ঘেঁষিলাম না।

জাহ্নবী।—পৌষ, ১৩১১। "নববধূর প্রার্থনা"—শ্রীদেবেন্দ্র

নাথ সেন। এই উপহার কবিতাটি সম্পাদক মহাশয়ের বিবাহ উপলক্ষে লিখিত; সুতরাং পত্রস্থ হইবার অনেক কারণ আছে। "প্রপঞ্চ"—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল। সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ; সংক্ষিপ্ত হইলেও জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। "মহানাটকের নান্দী"—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সংগ্রহ করিয়াছেন বেস। "ছদ্মবেশী"—(ডিটেক্‌টিভের গল্প) শ্রীপাঁচকড়ি দে। কৌতুহলোদ্দীপক বটে। পাঁচকড়ি বাবুর হাত এদিকে পাকা। "সন্ধ্যায়"—(কবিতা) শ্রীমতী সরলাবালা দাসী। কবিতাটি বড়ই প্রাণ-স্পর্শী হইয়াছে। ভাব-বিকাশে ও বচন-বিন্যাসে লেখিকার হাত খুব পাকা বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আমরা ইহার কএক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি:—

> "অশান্ত সংসার শিশু, খেলিয়াছে সারাদিন,
> ছুটা-ছুটি-খেলা,—
> ধূলা দিয়া খেলা-ঘর, গড়িয়াছে, ভাঙ্গিয়াছে,
> শুধু সারা বেলা"।

"লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ"—শ্রীজলধর সেন। ক্রমপ্রকাশ্য ভ্রমণ-কাহিনী। আমরা জানি, জলধরবাবু ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখায় সিদ্ধহস্ত। তবে এ কাহিনী কিরূপ হইল, তাহা পশ্চাৎ বলিতে পারিব। "রূপ-তৃষ্ণা"—(কবিতা) শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী। ভাল হয় নাই। "আমিত্ব-লোপ"—(কবিতা) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন। চলন-সই খণ্ড কবিতা। "সমালোচনা"—চলিতেছে বেস।

আরতি।—ফাল্গুন, ১৩১১। "নবযুগের নবশিক্ষা"—শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার এম্, এ, বি, এল। প্রবন্ধটি সুদীর্ঘ না হইলেও, পাঠ-যোগ্য; পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। "খেদা"—শ্রীমন্মহারাজ কুমদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বিএ। এবারকার সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধটি সমাপ্ত হইয়াছে। সন্দর্ভটি বাস্তবিকই

কৌতূহলোদ্দীপক ও বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। "রাজা রঘুনাথ সিংহ"—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এ,। এই প্রবন্ধে সুসঙ্গের রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রঘুনাথ সিংহের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্ত বেস সরল ও সরস ভাষায় প্রকটিত হইয়াছে। এতাদৃশ বিস্ময়াবহ ইতিকথা পাঠ করিতে পাইলে, বাস্তবিকই পাঠকের মন আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়। "প্রতিফল"—(গল্প) লেখকের নাম নাই। গল্পটি নিতান্ত আড়ম্বরহীন হইলেও, কর্ম্ম-বীর সঞ্জীবচন্দ্রের পুরুষকারের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। লেখকের রুচি ভাল—ভাষার গাঁথুনি সরল ও মধুর। "ময়মনসিংহ জেলা স্থাপন ও বন্দোবস্ত"—শ্রীকেদারনাথ মজুমদার। ইহা ক্রম-প্রকাশ্য প্রবন্ধ হইলেও, যতদূর পাঠ করা গেল, বুঝিলাম, কেদার বাবু তাঁহার লেখনী অতি সংযতভাবেই চালাইয়াছেন। পুরাতত্ত্ব-সংগ্রহে প্রবন্ধকার সিদ্ধহস্ত; আমরা এই প্রবন্ধের সুখ-সমাপ্তি দেখিতে চাই। "মাতৃপূজা"—(জাতীয় সঙ্গীত) শ্রীমনোমোহন সেন। বেস লাগিল,—সহৃদয়তা ও স্বদেশ-প্রীতির পরিচায়ক বটে। "নির্ঝর"—(কবিতা) শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, বি; এল। নিতান্ত ছোট হইলেও, কবিতাটি মধুর হইয়াছে। "অদৃষ্ট"—(কবিতা) শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী। উচ্চভাবের সমাবেশে ও প্রাঞ্জল বচনবিন্যাসে কবিতাটি হৃদয়-গ্রাহিণী হইয়াছে। "বিরহে"—(কবিতা) শ্রীরজনীকান্ত চৌধুরী। একটি চলন-সই প্রেম-কবিতা। 'কবিতা'—(কবিতা) শ্রীকামিনীকুমার দে রায়। মন্দ লাগিল না।

নববিকাশ।—মাঘ, ১৩১১। "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত"—শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী। এই প্রবন্ধে রাধাময় কৃষ্ণ ও কৃষ্ণময়ী রাধার প্রেম-বিলাসের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ধর্ম্ম-প্রাণ ভক্তবৃন্দের নিকট ইহা উপাদেয় হইবে কিনা জানি না; তবে আমরা এই "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের" আবর্ত্তে বহু ঘুরপাক খাইয়াও, সেই প্রেমের

া পাইলাম না। "আমেরিকার প্রথম বাঙ্গালী"—শ্রীধর্ম্মা-
হাভারতী। প্রবন্ধটি ক্রমপ্রকাশ্য হইলেও, বহুতর জ্ঞাতব্য
। পূর্ণ। "প্রেম-তত্ত্ব"—শ্রীজানকীনাথ পাল বি, এল,
। বলিতে কি, এবারের "নববিকাশের" পৌনে ষোল
াই কৃষ্ণ-রাধার প্রেম-কাহিনীতে গুলজার! কিন্তু এমনটি
লু চলিবে কেন? মাসিক পত্রিকাগুলিতে বিষয়-বাহুল্য
য় নিতান্ত দরকার। এই সব দেখিয়া শুনিয়া, বাধ্য
বলিতে হয় যে, "নববিকাশের" নামকরণ 'প্রেম-বিকাশ'
ই যেন মানান-সই হইত। যদি প্রবন্ধের অভাব নিবন্ধন
নটি হইয়া থাকে, তবে বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়ের পক্ষে ইহা
ার কথা নহে। শুধু পরের জিনিষ লইয়া, বাজার সরগরম
রলে, পত্রিকার সম্পাদক হওয়া চলে না;—নিজস্বও
কিছু থাকা চাই। "নববিকাশ"-সম্পাদক মহাশয়কে এমন ভাবে
নাকে তৈল দিয়া ঘুমাইতে দেখিলে, কাহার না দুঃখ হয়? "তা'
লাগেনা ভালো।"—(কবিতা) ডাক্তার শ্রীরমণীমোহন সেন।
ডাক্তার বাবু পদ্যাকারে যে পেটেণ্ট ঔষধটি বাহির করিয়াছেন,
বলিতে কি, আমাদের নিকট "তা' লাগেনা ভালো।" লেখকের
ডায়গ্নেসিসে জ্ঞান আদৌ নাই বলিলেও হয়। ডাক্তার বাবুর
অন্য পন্থা অবলম্বন করা উচিত,—এহেন অনধিকার চর্চ্চা কেন?
"প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ বাণিজ্য এবং অভাব"—শ্রীকামাখ্যপ্রসাদ
বসু বি, এল। ক্রম-প্রকাশ্য প্রবন্ধ। "যুগলরূপ"—(কবিতা)
শ্রীমতী চারুশীলা দাসী। লেখিকার বোধ হয়, ইহাই প্রথম
উদ্যম; সুতরাং "যুগল রূপের' জ্যোতিঃ ভাল করিয়া ফুটাইতে
পারেন নাই। তবে কবিতাটি যে লেখিকার সুরুচির পরিচায়ক,
তাহা আমরা নিঃসন্দেহ বলিতে পারি।

প্রবাসী।—মাঘ, ১৩১১। "জঞ্জিরা"—শ্রীবামনদাস বসু।

নিতান্ত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। লেখকের হাতে উপাদানের নিতা
ছিল বলিয়াই মনে লয়। "পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েলী ব্রত"—ই
পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত কএকটি মেয়েলী ব্রতের তথ্য ও হিঁয়ালী
য়াছে। 'জাপান-ব্যায়াম-প্রণালী'—(জিউজিৎসু) শ্রীনগেন্দ্র
সোম। প্রবন্ধটি সুলিখিত। নিরন্ন দুর্ব্বল বাঙ্গালীর পক্ষে এত
প্রবন্ধ-পাঠ যথেষ্ট উপকারে আসিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।
লব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'—মন্দ লাগিল না। "আধুনিক সন্ন্যা
(গল্প) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। গল্পটি মন্দ হয়
ধর্ম্মের আবরণে যে অধর্ম্ম বিচরণ করিতেছে একথা সত্য
তাই বলিয়া সকল সাধুই চোর নহে। "দুইদিক"—শ্রীচারু
বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা ইহার কোন দিকই বুঝিতে
নাই। "পাশ্চাত্য প্রভাব ও ধনক্ষয়"—নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইলে
ভাল লাগিল। "ভারতে বাণিজ্য'—মন্দ হয় নাই। 'কবিতা'—
শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী। ইহা লেখকের চারি বর্ষ বয়স্কা
কন্যাটি দ্বিতল হইতে পড়িতে পড়িতে রক্ষা পাইবার ঘটনা
অবলম্বনে লিখিত। "বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা'—শ্রীললিত-
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সুলিখিত সসার প্রবন্ধ। "৺সর্দ্দার উমাচরণ
মুখোপাধ্যায়"—শ্রী :—। এই জীবন-চরিতটি পাঠ করা প্রত্যেক
শিক্ষিত বাঙ্গালীরই উচিত। ইহাতে শিক্ষণীয় অনেক বিষয়ই
রহিয়াছে। "প্রবন্ধ চিন্তামণি'—(মুঞ্জরাজ প্রবন্ধ) শ্রীপূরণচাঁদ
সামসুখা। মন্দ লাগিল না। "ধোলপুর"—বেস হইয়াছে। "শ্রীমতী
গেঁয়ো"—ক্রম-প্রকাশ্য প্রবন্ধ। "গৃহলক্ষ্মী"—(কবিতা) শ্রীসুধীন্দ্র
নাথ ঠাকুর। বেস লাগিল। "সুখ-কানন'—(কবিতা)—
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। উল্লেখ-যোগ্য বটে।